

সমসাময়িক উন্নয়ন চিন্তা ৭

২০২২ সালে মিডিয়াতে প্রকাশিত
সিপিডি'র নির্বাচিত বক্তব্যসমূহ



সমসাময়িক উন্নয়ন চিন্তা ৭

২০২২ সালে মিডিয়াতে প্রকাশিত
সিপিডি'র নির্বাচিত বক্তব্যসমূহ



প্রকাশক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

বাড়ি ৪০/সি, সড়ক নং ১১ (নতুন)

ধানমন্ডি, ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ

ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০

ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮১

ই-মেইল: info@cpd.org.bd

ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারি ২০২৩

স্বত্ব

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

এই বইটিতে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকারগুলোতে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবে লেখকদের নিজস্ব। এর সাথে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতে পারে।

প্রচ্ছদ

অত্র ভট্টাচার্য

অক্ষর ও পৃষ্ঠা বিন্যাস

মোঃ সাইফুল হাসান

ISBN 978-984-95073-7-6

মূল্য

৩৮০ টাকা

মুদ্রক

লিথোগ্রাফ

৪১/৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

C12023_1SOM_SPE

১৯৯৩ সালে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) যাত্রা শুরু করে। নীতিনির্ধারণ ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সহযোগীদের সাথে সংযোগ ও সংলাপের প্রসার এবং নীতিমালা প্রণয়নের জন্য বস্তুনিষ্ঠ সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে একটি নাগরিক উদ্যোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় সিপিডি। নীতি গবেষণার ফলাফলকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে নিরলস কাজ করছে থিংক ট্যাঙ্কটি।

দীর্ঘ ৩০ বছরের পথ চলায় সিপিডি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি স্বাধীন থিংক ট্যাঙ্ক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সিপিডি'র অন্যতম কার্যক্রম হলো দেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ও নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করা এবং গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত নিয়ে সংলাপের আয়োজন করা। গবেষণা ও সংলাপ— এই দুই মূলমন্ত্রের সমন্বয়ে নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্টদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থেকে সিপিডি দেশের উন্নয়ন গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

সিপিডি তার পথপরিক্রমায় ক্রমান্বয়ে একটি স্বনামধন্য থিংক ট্যাঙ্কে পরিণত হয়েছে যা কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সমস্যাগুলো সমাধানের উপায় বের করার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করছে। সিপিডি'র গবেষণা ফলাফল বরাবরই সুশাসন, গণতন্ত্র, সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণের উপর গুরুত্ব দেয়। এর গবেষণার বিষয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সামষ্টিক অর্থনীতি, রাজস্ব নীতি, দারিদ্র্য ও বৈষম্য, বাণিজ্য, আঞ্চলিক যোগাযোগ, ব্যাংকিং খাত, শ্রমবাজার, তৈরি পোশাক শিল্প, সুশাসন, গণতান্ত্রিক উত্তরণ, মানব উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা, সামাজিক সুরক্ষা, কৃষি, জলবায়ু ইত্যাদি।

সিপিডিই প্রথম বাংলাদেশে সংলাপের ধারা চালু করেছে যা গঠনমূলক মতবিনিময়কে উৎসাহিত করে। সিপিডি এর গবেষণা ফলাফলগুলোকে কেবল একটি নির্দিষ্ট ছকে সীমাবদ্ধ না রেখে সংলাপের মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরে এমনকি প্রান্তজনের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। সেইসাথে সামগ্রিক নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অংশীদারদেরকে সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর জনমতকে প্রতিফলিত করে বিভিন্ন প্রস্তাবনা তুলে ধরে।

এর কাজের ধারাবাহিকতা হিসেবে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ), দক্ষিণ এশিয়া অর্থনৈতিক সম্মেলন (সাসেস), বিসিআইএম (বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মায়ানমার) অর্থনৈতিক করিডোর ফোরাম, সাউথ এশিয়ান সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ (সাসেপস) ইত্যাদি বিভিন্ন খ্যাতনামা নেটওয়ার্ক ও পার্টনার-এর সাথে সিপিডি কাজ করছে। সিপিডি একটানা দুইবার বৈশ্বিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে থিংক ট্যাঙ্ক ইনিশিয়েটিভ (টিটিআই) পুরস্কার লাভ করেছে।

সিপিডি প্রকাশিত বই, মনোগ্রাফ, সাময়িকপত্র, সংলাপ প্রতিবেদন ও সংক্ষিপ্ত নীতি-পরামর্শের সংখ্যা ইতিমধ্যে ৫০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। সিপিডি'র প্রকাশনা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি নিয়মিতভাবে সিপিডি'র ওয়েবসাইটে (www.cpd.org.bd) প্রকাশ করা হয়।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান
চেয়ারম্যান

ড. ফাহিমদা খাতুন
নির্বাহী পরিচালক

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
সম্মাননীয় ফেলো

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সম্মাননীয় ফেলো

অধ্যাপক রওনক জাহান
সম্মাননীয় ফেলো

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম
গবেষণা পরিচালক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) ১৯৯৩ সাল থেকে বাংলাদেশের একটি স্বাধীন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য নানান বিষয় যেমন অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য, অসমতা, সুশাসন, স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রভৃতি নিয়ে সিপিডি তথ্যভিত্তিক ও বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা করে আসছে। বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণার পাশাপাশি সেই গবেষণার ফলাফলকে বৃহত্তর পরিমন্ডলে তুলে ধরার জন্য সিপিডি'র গবেষকরা নিরলস কাজ করছেন।

উন্নয়ন ইস্যুতে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসে সিপিডির গবেষণাধর্মী মতামতসমূহ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়, যা তার তিন দশকের কর্মকাণ্ডের এক ঐতিহ্যবাহী অংশ। এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় নির্বাচিত মতামত ও সাক্ষাৎকারগুলো ২০১৫ সাল থেকে পূর্ণাঙ্গ বই আকারে অমর একুশে গ্রন্থমেলায় প্রকাশিত হয়ে আসছে। বর্তমান গ্রন্থটি ২০২২ সালে প্রকাশিত সিপিডি গবেষকদের নির্বাচিত বাংলা মতামত, কলাম ও সাক্ষাৎকারের সংকলন।

এ লেখাগুলোতে জাতীয় বাজেট ও অর্থনীতি, উন্নয়ন ও অগ্রগতি, শিল্প ও বাণিজ্য, জ্বালানি, জেন্ডার ও নারী সমতা, সামাজিক সুরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তব্য রয়েছে। বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে বর্তমান সংকলনটিকে এটি আলাদা আলাদা অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক, সহনশীল ও সমৃদ্ধ একটি বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সিপিডি'র গবেষকরা নিয়তই কাজ করে যাচ্ছেন। বইটির প্রবন্ধগুলো তারই প্রতিফলন। নানামুখী বিষয় নিয়ে অনন্য এই সংকলনটি উৎসুক পাঠকদের আগ্রহ পূরণে সহায়ক হবে বলে আশা করছি।

প্রকাশনার সময়ানুক্রমে প্রতিটি অধ্যায়ের প্রবন্ধগুলো সাজানো হয়েছে। বিষয় অনুযায়ী অধ্যায়গুলো বিন্যাস করার পর যে প্রবন্ধগুলো আগে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোকে ঐ অধ্যায়ে আগে রাখা হয়েছে। আশা করছি, সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে সিপিডি'র গবেষকদের বিশ্লেষণ সংবলিত এই বইটির জন্য বরাবরের মতই গবেষক, তরুণ সমাজ এবং বৃহত্তর জনমানুষের আগ্রহ থাকবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সিপিডি'র গবেষণাকর্মকে বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যেসব গণমাধ্যম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, এ গ্রন্থের সকল লেখকের পক্ষ থেকে আমি সেসব গণমাধ্যম কর্মীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। উল্লেখ্য যে, মিডিয়ায় প্রকাশিত বক্তব্যসমূহ গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করে প্রকাশের উপযোগী করতে গিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে কিছু পরিমার্জন ও পরিবর্তন করা হয়েছে।

সিপিডি'র ডায়ালগ বিভাগের সহকর্মীরা এ সংকলন প্রকাশের জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন; বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই ডায়ালগ বিভাগের যুগ্ম পরিচালক অত্র ভট্টাচার্য-কে। লেখা ও মন্তব্যসমূহ নির্বাচন ও বাছাই, পাশাপাশি সেগুলোকে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যাস ও পরিমার্জন করে প্রকাশনা উপযোগী করে তুলতে এ বিভাগের সহকর্মীরা একনিষ্ঠ পরিশ্রম করেছেন। বইটি সংকলন ও সম্পাদনায় সার্বিক নেতৃত্ব দিয়েছেন সিপিডি'র জ্যেষ্ঠ প্রকাশনা সহযোগী ফারাহ নুসরাত। অক্ষর ও পৃষ্ঠা বিন্যাসে ভূমিকা রেখেছেন প্রোগ্রাম সহযোগী (ডিটিপি) মো: সাইফুল হাসান। তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঢাকা

ফেব্রুয়ারি ২০২৩

ফাহিমদা খাতুন

নির্বাহী পরিচালক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

অধ্যায় ১: বাজেট ও অর্থনীতি

বাজেটে ৫ ঝুঁকি মোকাবিলার প্রতিফলন থাকতে হবে মোস্তাফিজুর রহমান	৩
বাংলাদেশের কোভিড অভিজ্ঞতা: সাত ঐকমত্য দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	৫
মূল্যস্ফীতির চাপ তবুও রয়েছে মোস্তাফিজুর রহমান	৯
সরকারের আকাঙ্ক্ষা আছে, পূরণের সক্ষমতা নেই দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	১০
সুশাসন থাকলে শ্রীলঙ্কার পরিণতি হবে না মোস্তাফিজুর রহমান	১৫
বাংলাদেশের বৈদেশিক দায়দেনা পরিস্থিতি ২০২৪-২৫ সালে অস্বস্তির দিকে যাবে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	১৮
অর্থনীতিকে আরেকটু পূর্ণাঙ্গভাবে এবং সততার সাথে বিশ্লেষণ করতে হবে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	২৯
জিডিপি এত বাড়ল তার ন্যায্য অংশটা গরীব মানুষ পেল না কেন? দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	৩৬
বাজেটে মূল্যস্ফীতি ও কর্মসংস্থান মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	৪২
বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীলতার জন্য দরকার বহুমুখী পদক্ষেপ ফাহিমদা খাতুন	৪৪
বৈদেশিক মুদ্রাবাজারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা দরকার ফাহিমদা খাতুন	৪৭
অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মূল স্তম্ভ হতে হবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	৪৯

রাজস্ব নীতি ও মুদ্রানীতির মধ্যে সমন্বয় দরকার ফাহিমদা খাতুন	৫১
সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখা মূল চ্যালেঞ্জ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	৫৩
প্রবাসী আয়ের জাদু শেষ হয়ে গেছে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	৫৮
বাজেটে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে মোস্তাফিজুর রহমান	৬০
টিসিবির গুদামে চাল ঢুকাতে হবে এবং এই টিসিবিকে জেলা পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	৬৪
মূল্যস্ফীতি হতে হবে কেন্দ্রীয় সূচক দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	৮১
বাজেট ২০২২-২৩ ভাবনা: ব্যতিক্রমী সময়ের ভিন্নতর দাবি মোস্তাফিজুর রহমান	৮৬
কোনো প্রশ্ন ব্যতিরেকে অর্থ ফিরিয়ে আনা রাজনৈতিক প্রশ্নের জন্ম দেবে, এটা হঠকারী সিদ্ধান্ত দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	৯০
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য গুণগত মান না বাড়লে জিডিপির প্রবৃদ্ধি বাড়ার কোনো মানে হয় না দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	৯৩
সংযত উচ্চাশার বাজেট দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	৯৯
রাজনৈতিক উদ্দীপনার পরিসংখ্যান দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	১০১
কার স্বার্থে এসব পদক্ষেপ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	১০৪
বড় কথার ছোট বাজেট দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	১০৬
মূল্যস্ফীতি কমানোর চেষ্টা পর্যাণ্ড নয় মোস্তাফিজুর রহমান	১০৮
মূল্যস্ফীতির অভিঘাত মোকাবেলায় বাজেটে উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে ফাহিমদা খাতুন	১১০

সামষ্টিক অর্থনীতি কিছুটা হলেও ঝুঁকিতে পড়েছে মোস্তাফিজুর রহমান	১১৫
আইএমএফ-এর কাছে ঋণ সহায়তা চাইলো সরকার, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	১১৭
বাংলাদেশের দায়দেনা নিয়ে কেন চিন্তিত হবো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	১১৯
সমস্বয় দরকার ছিল, ধাপে ধাপে হলে ভালো হতো মোস্তাফিজুর রহমান	১২৩
অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় প্রয়োজন উত্তরণকালীন নীতি সমঝোতা দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	১২৬
অর্থনীতি নিয়ে উত্তরণকালীন সমঝোতা প্রয়োজন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	১৩১
সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকে বড় ধরনের টানাপোড়েন লক্ষণীয় খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	১৩৬
অর্থনৈতিক কাঠামোর সাশ্রয় আগামীর ভাবনা খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	১৩৮
অর্থনীতিতে ঝুঁকি বাড়ছেই দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	১৪০
সামষ্টিক অর্থনীতির সংস্কার জরুরি মোস্তাফিজুর রহমান	১৪২
তথ্য হালনাগাদ হলে নীতি নির্ধারণে সুবিধা মোস্তাফিজুর রহমান	১৪৪
স্বপ্রণোদিত হয়েই সংস্কার করা উচিত ফাহিমদা খাতুন	১৪৬
স্বস্তির খবর, সংস্কার নিজেদের গরজেই করতে হবে মোস্তাফিজুর রহমান	১৪৯
সরকারের দৃষ্টিগত মনোভাব দরকার মোস্তাফিজুর রহমান	১৫১
আর্থিক খাতে সংস্কার আমাদের গরজেই করতে হবে মোস্তাফিজুর রহমান	১৫২

ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	১৫৬
দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে মোস্তাফিজুর রহমান	১৫৮
চাই সমঝোতাপূর্ণ রাজনীতি মোস্তাফিজুর রহমান	১৫৯

অধ্যায় ২: গণতান্ত্রিক উত্তরণ এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতি

২০২২ হোক গণতান্ত্রিক উত্তরণের ভিত্তি বছর দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	১৬৩
বিদেশে কণ্ঠ শোনাতে চাই আর দেশের ভেতরে শুনব না— তা হবে না দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	১৬৭
সরকার এবং রাষ্ট্র দুটো ভিন্ন জিনিস, সরকারের বিরোধিতা করা মানেই রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা না দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	১৭৩
প্রস্ততির জায়গা হলো দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর জনসম্পৃক্ততা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	১৮৩
দেশের সাফল্যগুলোকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমুন্নত রাখতে যোগ্য কূটনৈতিক উদ্যোগ দরকার দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	১৯৪
রাজনৈতিক নেতৃত্ব, নীতি প্রণয়নের দক্ষতা এবং সামাজিক জবাবদিহিতা— এই তিনটি এক জায়গায় আনতে হবে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	২০০
অর্থনৈতিক সুশাসন যদি না থাকে তাহলে এক সময় তা রাজনৈতিক সংঘাতে পরিণত হয় দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	২০৭
২০ মেগা প্রকল্পের পরিস্থিতি ও প্রবণতা দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	২১৭
বর্তমানের গণতান্ত্রিক চর্চার অভাবে সরকারই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	২২৪

বাংলাদেশের উন্নয়ন আখ্যানের অন্তর্নিহিত চার বিচ্যুতি দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	২৩০
উচ্চ প্রবৃদ্ধির দরিদ্র সরকার দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	২৩৪
গণমানুষের মুক্তির সংগ্রাম এগিয়ে নিতে হবে রওনক জাহান	২৪১

অধ্যায় ৩: শিল্প, বাণিজ্য এবং বাজার ব্যবস্থাপনা

রপ্তানি বহুমুখীকরণে দরকার বাজার বহুমুখীকরণ খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	২৪৭
চালের বাজারে নজরদারি বাড়ান খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	২৫০
বাজারে ব্যবসায়ীদের এক ধরনের অলিখিত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	২৫৩
পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে হবে মোস্তাফিজুর রহমান	২৫৮
আমদানিতে শুল্ক কমিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	২৬০
রপ্তানি ধরে রাখতে দেশকে ব্র্যান্ডিং করতে হবে খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	২৬৪
ঢাকা-মস্কো সম্পর্কের ৫০ বছর— মুক্তিযুদ্ধ থেকে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	২৬৫
পণ্যের উচ্চমূল্যের প্রভাব সামাল দিতে প্রয়োজন সামগ্রিক পদক্ষেপ ফাহিমদা খাতুন	২৬৭
বাজার নিয়ে সময়ে এক ফোঁড় দিন খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	২৭০
রপ্তানিতে নগদ সহায়তা পুনর্গঠন করা দরকার খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	২৭৩

বহুপক্ষীয় ব্যবস্থায় আস্থা দেখা গেল মোস্তাফিজুর রহমান	২৭৪
পদ্মা সেতু হবে অর্থনৈতিক করিডরের মূল কেন্দ্রবিন্দু মোস্তাফিজুর রহমান	২৭৫
সয়াবিন তেলের আরও মূল্য হ্রাসের সুযোগ রয়েছে খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	২৭৭
রপ্তানি বাড়াতে চারটি কাজ করতে হবে খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	২৭৮
সেবা রপ্তানিতে আরও মনোযোগ দিতে হবে মোস্তাফিজুর রহমান	২৭৯
ভারতের কাছ থেকেও এখন রাশিয়ার তেল কেনা যায় মোস্তাফিজুর রহমান	২৮০
ভোক্তার পক্ষে কেউ নেই বলে অযৌক্তিক দাম বাড়ছে বাজারে খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	২৮২
পণ্যের দাম বেঁধে দেওয়া সাময়িক ফল দিতে পারে মোস্তাফিজুর রহমান	২৮৪
ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ দিতে অনীহা, ব্যাংকের আগ্রহ বড়দের দিকে মোস্তাফিজুর রহমান	২৮৬
ট্রানজিট প্রস্তাব আরো স্পষ্ট করা দরকার মোস্তাফিজুর রহমান	২৮৭
পোশাকশিল্পে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হাতছানি খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	২৯১
তৃতীয় দেশে ট্রানজিট নিয়ে বিবেচ্য বিষয়াবলি খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	২৯৪

অধ্যায় ৪: সামাজিক সুরক্ষা

শ্রমজীবী গর্ভবতী নারী, আহত এবং বেকার শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	২৯৯
সামাজিক নিরাপত্তা জাল বিস্তৃত করা দরকার খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	৩০১

নিম্ন আয়ের মানুষকে সুরক্ষা দিতে ভর্তুকি বাড়ানো উচিত দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	৩০৭
নিম্ন আয়ের মানুষকে সহায়তা দিতে হবে মোস্তাফিজুর রহমান	৩০৯
ফ্যামিলি কার্ডে নয়ছয়ে কার লাভ? খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	৩১১
সুরক্ষার আওতা বাড়াতে হবে মোস্তাফিজুর রহমান	৩১৪
স্বল্প আয়ের মানুষ আগামীতে পণ্য ক্রয়ের ক্ষমতা হারাবে খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	৩১৫

অধ্যায় ৫: বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

এখন কি জ্বালানির মূল্য কমানো যায় না? ফাহিমদা খাতুন	৩১৯
এলএনজি আমদানিতে উৎসাহীদের থামানো জরুরি খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	৩২২
নবায়নযোগ্য জ্বালানি টেকসই ও লাভজনক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম	৩২৬

অধ্যায় ৬: জেন্ডার ও নারী সমতা

নারীর ভয়ের বিষয়টি আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে ফাহিমদা খাতুন	৩৩১
আর্থিক শিক্ষার বিষয়টি জরুরি ফাহিমদা খাতুন	৩৩৩
শ্রমবাজারে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়লেও অনানুষ্ঠানিক খাতেই তারা বেশি কাজ করছে ফাহিমদা খাতুন	৩৩৫

অধ্যায়: অন্যান্য

অস্থির সময়ের প্রশান্তি রেহমান সোবহান	৩৩৯
আমার জীবন ও কর্ম: কিছু ভাবনা রওনক জাহান	৩৪৭
বিভাজন থেকে বিজয় রওনক জাহান	৩৫৫
অর্থনীতি নিয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তা ছিল দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	৩৫৮
সততায় নিঃসন্দেহে উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	৩৬০
স্মৃতিতে আকবর আলি খানঃ পরার্থপরতার দর্শন তিনি নিজ জীবনে প্রতিফলিত করেছেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	৩৬২
শ্রদ্ধা ও স্মরণে আকবর আলি খান দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য	৩৬৪

অধ্যায় ১

বাজেট ও অর্থনীতি

বাজেটে ৫ ঝুঁকি মোকাবিলার প্রতিফলন থাকতে হবে

মোস্তাফিজুর রহমান

করোনার তৃতীয় ধাক্কা চলে এসেছে। করোনার ক্ষতি কতদিনে কাটিয়ে ওঠা যাবে তা বলা মুশকিল। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনীতির যে গতিবিধি, তা সন্তোষজনক; আমদানি-রপ্তানি আয়, এমনকি বেসরকারি খাতের অবস্থাও অনেক ভালো। তবে নতুন বছরে অর্থনীতির যে পাঁচটি ঝুঁকি রয়েছে, আগামী বাজেটে এগুলো মোকাবিলার প্রতিফলন থাকতে হবে বলে জানিয়েছেন সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান। ভোরের কাগজের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় তিনি আরো বলেন, এলডিসি থেকে উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলারও উপায় থাকতে হবে এবারের বাজেটে।

এ অর্থনীতিবিদ বলেন, ২০২২ সালে অর্থনীতি কয়েকটি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এগুলো আগামী বাজেটে বিবেচনায় রাখতে হবে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে স্বাস্থ্যঝুঁকি। এ জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি রাখা প্রয়োজন, তা রাখতে হবে। তিনি বলেন, করোনা মহামারির সঙ্গে আমাদের হয়তো আরো কয়েক বছর থাকতে হতে পারে। এ জন্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যবিধি ও স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ মাথায় রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, মূল্যস্ফীতিকে বিবেচনায় রাখতে হবে। আমরা আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতিও দেখছি আবার স্থানীয় মূল্যস্ফীতিও দেখছি। এজন্য সামাজিক সুরক্ষায় যে সমস্ত বরাদ্দ আছে সেগুলোকে বাজেটে আরো সুসংহত করতে হবে। তৃতীয়ত হচ্ছে, করোনা মহামারিতে শিক্ষা খাত অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেকে বারে পড়েছে। এজন্য শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে এবং বারে পড়া অর্থাৎ যারা স্কুল ছেড়ে চলে গেছে বা বাল্যবিয়ে হয়েছে তাদের জন্য বাজেটে আলাদা বরাদ্দ রাখতে হবে।

চতুর্থ হচ্ছে, চলমান মেগা প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করতে বাজেটে এদিকে নজর দিতে হবে। কারণ মেগাপ্রকল্পগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন হলে বেসরকারি খাতেরও গতি ফিরবে। ফলে অর্থনীতি চান্দা হবে। পঞ্চমত, আর্থিক খাতকে সচল রাখতে রাজস্ব বোর্ডেরও সংস্কার দরকার। বিশেষ করে ডিজিটাইজেশন করাসহ নানা পদক্ষেপ। চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে এনবিআরের কর আহরণ বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম। তাদের সক্ষমতা বাড়াতে

হবে। পাশাপাশি ট্যাক্সের আওতা বাড়ানোর জন্য আরো কাজ করতে হবে। মূল কথা, রাজস্ব আহরণে সরকারকে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করতে হবে। যারা নিয়মিত আয়কর পরিশোধ করছেন তাদের ঘাড়ে আরো চাপানো যাবে না। আগামী বাজেটে এসব জায়গায় বিনিয়োগ বাড়তে হবে এবং বরাদ্দ বাড়তে হবে।

এলডিসি থেকে উত্তরণে আগামী বাজেটে বরাদ্দের প্রয়োজন প্রসঙ্গে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এ উত্তরণের প্রভাব ৪টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে পড়বে। এর ফলে বৈশ্বিক বাজারে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশগম্যতার বিনাশ ঘটবে, বিশেষ ও তারতম্যমূলক বাণিজ্য সুবিধার ক্ষেত্রে প্রভাব পড়বে, ব্যবসাক্ষেত্রে বৈশ্বিক পর্যায়ের কঠোর মান নিশ্চিত করার বিষয়টি সামনে আসবে এবং অ-পারস্পরিক বাণিজ্য সুবিধা কমবে। তবে ইইউ বাজারে বাংলাদেশ ২০২৬ সালের পর আরো তিন বছর অর্থাৎ ২০২৯ সাল পর্যন্ত শুষ্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা ভোগ করতে পারবে। এ ছাড়া প্রস্তুতিকালে বাংলাদেশ এলডিসি হিসেবে যেসব সুযোগ-সুবিধা পেয়ে আসছিল সেগুলো অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, এলডিসি থেকে গ্র্যাজুয়েশনের জন্য আমাদের মধ্যমেয়াদি কৌশল যেটা আছে সে কৌশল বাস্তবায়নের দিক থেকে এ বাজেটে তার প্রতিফলন থাকতে হবে। যেমন গ্র্যাজুয়েশনের ফলে মার্কেটে আমরা শুষ্কমুক্ত সুবিধা পাব না। এজন্য আমাদের দক্ষতা বাড়তে হবে, প্রযুক্তি বাড়তে হবে। সুতরাং টেকনোলজি আপগ্রেডেশন ফান্ড আরো বাড়তে হবে, দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে আরো বেশি বিনিয়োগ করতে হবে। এলডিসি থেকে উত্তরণে সরকারের যেসব কমিটি গঠন করা হয়েছে তাদের সুপারিশের আলোকে বাজেটে বরাদ্দ থাকতে হবে।

ভোরের কাগজ

১৩ জানুয়ারি ২০২২

বাংলাদেশের কোভিড অভিজ্ঞতা: সাত ঐকমত্য

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাংলাদেশে কোভিড সংক্রমণ, এর ব্যবস্থাপনা এবং অভিঘাতের ওপর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা সংস্থা কাজ করেছে। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি), এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বিআইজিডি, পিপিআরসি, সানেমসহ বেশকিছু প্রতিষ্ঠান গত দুই বছরে বিভিন্ন সময়ে জরিপ পরিচালনা করেছে। এসব প্রতিষ্ঠান বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সংলাপ বা আলোচনার আয়োজনও করেছে। নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ও সিপিডি বেশ কয়েকটি ফোকাস গ্রুপ এবং এক্সপার্ট গ্রুপ আলোচনা করেছে। সব আলোচনা ও পর্যালোচনায় কতগুলো বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিভাত হয়।

বাংলাদেশে প্রথম কোভিড সংক্রমণ শনাক্ত হয় ২০২০ সালের ৮ মার্চ। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হয় গত বছর মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে। দুটি ঢেউয়ের পর গত বছরের শেষদিকে এসে বাংলাদেশে কোভিড শনাক্ত ও মৃত্যুহার একেবারেই কমে গিয়েছিল। নতুন বছরের শুরুতে আবার সংক্রমণ বাড়ছে এবং কোভিডের নতুন ধরন ওমিক্রন বিশ্বব্যাপী নতুন করে উদ্বেগ ছড়াচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে কোভিডের অভিজ্ঞতার ওপর ঐকমত্যের বিষয়গুলো নীতি ব্যবস্থাপনার পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরা এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি।

আমার বিবেচনায় অন্তত সাতটি বিষয়ে সবার মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে। প্রথমে কোভিডের পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ে বলতে চাই। পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সংক্রমণের হার বিবেচনায় বাংলাদেশ পরিমিত ধরনের কোভিড আক্রান্ত দেশ, যেখানে তুলনামূলক মৃত্যুহার কম। তবে টিকাদানে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ এখনও প্রথম ডোজ টিকা নেয়নি। বাংলাদেশে কোভিডের প্রভাবে আগে থেকে থাকা কিছু দুর্বলতা বা ভগ্নরতা আরও প্রকট হয়। অন্যদিকে, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের ওপর অভিঘাত ছিল তুলনামূলক বেশি। অনেক মানুষ কোভিডের কারণে নানাভাবে ক্ষতির মুখে পড়ার কারণে ‘নব্য দারিদ্র্যের সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর অতিমারির প্রভাব নিয়ে। সব বিশ্লেষকই একমত, অতিমারির সময় সামষ্টিক অর্থনীতিতে এক ধরনের স্থিতিশীলতা ছিল। মোট দেশজ উৎপাদন-জিডিপি প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক ছিল। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩ দশমিক ৫ শতাংশ। আর গত অর্থবছরে (২০২০-২১) প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫ দশমিক ৪৩ শতাংশ। এ ছাড়া সংক্রমণের সময় রেমিট্যান্স বেড়েছিল। খাদ্য উৎপাদন পরিস্থিতি সন্তোষজনক ছিল। তবে প্রথম ঢেউ শুরুর পর রপ্তানি কমে যায় এবং বেসরকারি বিনিয়োগ ধীর হয়ে পড়ে। যদিও ২০২১ সালে রপ্তানি পরিস্থিতির উন্নতি হয় এবং সে ধারা বজায় রয়েছে।

তৃতীয় ছিল শ্রমবাজারের সমন্বয় নিয়ে। বড় সংখ্যক অভিবাসী শ্রমিক দেশে ফেরত আসতে বাধ্য হলেও দেশের শ্রমবাজারে মোটামুটি এক ধরনের সহিষ্ণু আচরণ করেছে। তবে শহর-গ্রাম অভিবাসন বেড়ে যায়। বিভিন্ন খাতে মজুরি কমে যায় এবং একই সঙ্গে কর্মসংস্থান কমে যাওয়াসহ অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিকতার মাত্রা বেড়ে যায়। ক্রিস্টিয়ান এইডের সহযোগিতায় গত বছর জুন মাসে নাগরিক প্ল্যাটফর্মের উদ্যোগে খানাভিত্তিক মুখোমুখি জরিপ করা হয়। গার্মেন্ট কারখানা অধ্যুষিত ঢাকা, চট্টগ্রাম, গাজীপুর এবং নারায়ণগঞ্জ জেলায় শ্রমিকদের ওপর জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, প্রথম ঢেউয়ের সময় ৫৮ শতাংশ কর্মী আংশিক বেতন বা বোনাস পেয়েছেন। একেবারেই পাননি ৭ দশমিক ৪ শতাংশ। কোভিডের আগের তুলনায় প্রথম ঢেউয়ের সময় প্রায় ৫৭ শতাংশ ওভারটাইম কমে যায় এবং দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় এ হার দাঁড়ায় ৪০ শতাংশ। বেতন কমে যায় প্রথম ঢেউয়ের সময় ১৮ শতাংশ এবং দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় ১২ দশমিক ৭ শতাংশ।

চতুর্থত, ব্যাপক ও গভীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি সবার পর্যালোচনা, গবেষণা বা জরিপে এসেছে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সংকটের চেয়ে প্রকট ছিল আয়, সঞ্চয় এবং ঋণগ্রস্ততার বিবেচনায় আর্থিক সংকট। সঞ্চয় ভেঙে ফেলার উচ্চপ্রবণতা, সম্পদ বিক্রি এবং ঋণ গ্রহণের কারণে অনেকে ঋণের দুষ্টচক্রে জড়িয়ে যান। এর পাশাপাশি গৃহে নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ও শিশুদের প্রতি নির্যাতনের তথ্যও পাওয়া যায়।

পঞ্চমত, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে উদ্বেগের বিষয়ে ঐকমত্য ছিল। দেখা গেছে, পেশার ধরন ও আয় নির্বিশেষে পুষ্টি গ্রহণের পরিমাণ কমে যায়। আয় কমে যাওয়ার কারণে অনেককে খাদ্য গ্রহণ কমাতে হয়, যা পুষ্টি পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়। গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা এবং শিশুদের সম্প্রসারিত টিকাদান কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়।

শিক্ষা পরিস্থিতি নিয়েও একই ধরনের মতামত উঠে এসেছে। দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকা এবং পরিবারের আয় কমে যাওয়ার কারণে বাল্যবিয়ে, শিশুশ্রম ও স্কুল থেকে ঝরে পড়ার ঘটনা বেড়ে যায়। প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্ষেত্রে অনলাইনে শিক্ষা (ই-লার্নিং) কার্যক্রমে মারাত্মক বৈষম্য দেখা যায়, দরিদ্র ও প্রান্তিক শিশুরা তুলনামূলক বেশি শিখন ঘাটতিতে পড়ে এবং তার সঙ্গে স্কুলে ভর্তি ও শিক্ষা শেষ করার হার কমে যাওয়ারও প্রবণতা তৈরি হয়েছে। লকডাউনের সময় ‘মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন’ দেশের ২১টি জেলায় একটি দ্রুত জরিপ করে।

সেখানে দেখা যায়, বেসরকারি সংস্থাটির কর্মএলাকায় ১০ থেকে ১৭ বছর বয়সের ১৩ হাজার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। অনেক স্কুলে দেখা যাচ্ছে, নবম ও দশম শ্রেণিতে কোনো কন্যাশিশু নেই। অন্যদিকে, লকডাউনের কারণে যখন ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজ বন্ধ হয়ে যায়, তখন আর্থিক অনটনের কারণে অনেক অভিভাবক বাচ্চাদের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত করে।

সপ্তম ছিল নীতি হস্তক্ষেপের কার্যকারিতা নিয়ে। যথাযথ নীতি উদ্যোগের মাধ্যমে কোভিড সংক্রমণের প্রথম দিকেই সরকারি সহায়তা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়, যার মধ্যে রয়েছে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, বাজারে তারল্য বৃদ্ধি এবং সামাজিক নিরাপত্তা সম্প্রসারণ। তবে সরকারি প্রণোদনা প্যাকেজগুলোর চারটি সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। প্রথমত, জিডিপির অংশ হিসেবে এখানে অপরিাপ্ত বরাদ্দ ছিল। সরকারি হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রণোদনার আকার জিডিপির ২ দশমিক ৭৬ শতাংশ। তবে শুধু খাদ্য সহায়তা ও প্রত্যক্ষ আর্থিক সহায়তা মাত্র শূন্য দশমিক ১৬ শতাংশ। দ্বিতীয়ত, নগদ হস্তান্তর এবং খাদ্য সহায়তা কার্যক্রম পর্যাপ্ত ছিল না। গত বছর নাগরিক প্ল্যাটফর্মের এক পর্যালোচনায় দেখা যায়, মোট ৩০টি কর্মসূচির মধ্যে মাত্র ১৩টি কর্মসূচি আর্থিক সহায়তা নিয়ে কথা বলে। চারটি ছিল প্রত্যক্ষ খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি। এই ১৭টি কর্মসূচি প্রায় এক লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকার সরকারি ঘোষিত প্রণোদনার মাত্র ২০ শতাংশ। ৮০ শতাংশই হাইব্রিড অর্থাৎ ঋণ কর্মসূচি। তৃতীয়ত, প্রকৃতপক্ষে সরকারের এ সহায়তা যাদের পাওয়ার কথা, তাদের অনেকেই পাননি। অর্থাৎ প্রকৃত সুবিধাভোগী কম ছিল। চতুর্থত, সহায়তা বিতরণের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট ঘাটতি ছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে, শুধু আর্থিক সহায়তা কম দেওয়া হয়েছে তা নয়, যা দিয়েছে তার সব খরচ করতে পারেনি। আড়াই হাজার কোটি টাকার বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণের মাত্র ৪৩ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে। ৫০ লাখ দরিদ্র মানুষকে আড়াই হাজার করে নগদ টাকা দেওয়ার কর্মসূচিও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।

সুবিধাবঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া এবং ফেরত আসা অভিবাসী শ্রমিক, অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মী এবং ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাসহ নতুন করে পিছিয়ে পড়া এবং পেছনে ঠেলে দেওয়া জনগোষ্ঠীর সহায়তার জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ পর্যাপ্ত ছিল না। ভৌগোলিকভাবে প্রত্যন্ত এলাকার (যেমন- চর, হাওর ও উপকূলীয় এলাকা) মানুষ, বস্তিবাসী, আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়, প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গ এবং ভাসমান জনগোষ্ঠীর ওপর বৈরীভাবে কোভিডের প্রভাব পড়ে। এ ছাড়া বয়স্ক নাগরিক ও শিশুদের প্রতি প্রণোদনা প্যাকেজগুলো আলাদাভাবে নজর দেয়নি। পিছিয়ে পড়া এবং পেছনে ঠেলে দেওয়া মানুষ কোনো ‘নেটওয়ার্ক’-এর আওতায় ছিল না। এ কারণে সামাজিক এবং সাংগঠনিক বিভিন্ন যোগাযোগ তাদের জন্য সরকারি সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি। প্রথম লকডাউনের সময় ব্যক্তি উদ্যোগে বিভিন্ন সাহায্য-সহযোগিতা বেশ দৃশ্যমান ছিল। নিজেদের কর্মসূচির সঙ্গে জুতসই না হওয়া এবং তহবিলের অভাবে ওই সময় এনজিওর ভূমিকা ছিল সীমিত। তবে ক্ষুদ্রঋণ আদায় সাময়িকভাবে স্থগিত করার সিদ্ধান্ত ঋণগ্রহীতাদের জন্য সহায়ক ছিল।

কোভিড কিংবা এ ধরনের অতিমারির জন্য আগামী দিনের নীতিনির্ধারণে এবং মাঠ পর্যায়ে যারা কাজ করেন তাদের জন্য এই সাত ঐকমত্যের বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ। শেষ করব এই বলে, কোভিড সংক্রমণের অতি সাম্প্রতিক প্রবণতার কারণে সরকার নতুন করে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। আবার যদি লকডাউনের মতো পরিস্থিতি হয়, তাহলে সরকারের পক্ষ থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য প্রত্যক্ষ আর্থিক সহায়তা বাড়াতে হবে। খাদ্য সাহায্য দিতে হবে। এটি না করা গেলে অসুবিধাগ্রস্ত মানুষদের ভোগ ও জীবনের মানের গুরুতর অবনমন ঘটবে এবং দেশে আর্থসামাজিক বৈষম্য আরও বেড়ে যাবে।

সমকাল

১৬ জানুয়ারি ২০২২

মূল্যস্ফীতির চাপ তবুও রয়ে গেছে

মোস্তাফিজুর রহমান

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, সরকারের নানা পদক্ষেপে গত দেড় মাসে নিত্যপণ্যের দাম যতখানি বেড়েছিল, তার থেকে কিছুটা হয়তো কমেছে। এতে করে দাম বাড়ানোর প্রবণতা কিছুটা রোধ করা গেলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে স্থিতি ফেরেনি। ক্রয়ক্ষমতার উপরে চাপ রয়েই গেছে। এখনো মানুষের কাঁধে মূল্যস্ফীতির চাপ রয়েছে। কারণ দাম অনেকদূর উঠে গিয়েছিল। গতকাল মঙ্গলবার ভোরের কাগজকে তিনি এসব কথা বলেন।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, গত কয়েক বছর ধরেই দেশে আয়ের বৈষম্য বাড়ছে। নিম্ন আয়ের মানুষের আয় বাড়েনি। বরং করোনার কারণে অনেকের আয় কমেছে। শ্রমজীবী এবং নিম্ন আয়ের মানুষ যেসব পণ্য ভোগ করেন সেগুলো মূল্যস্ফীতি ১২-১৪ গুণ। মানুষের জীবনযাত্রার মান ঠিক রাখতে হলে মূল্যস্তরকে স্থিতিশীল রাখার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, আয় বাড়িয়ে এটা ঠিক রাখা সম্ভব না। কারণ শুধু সরকারি চাকরিজীবীদের আয় বাড়ালেই হবে না। যারা বেসরকারিভাবে বিভিন্ন পেশায় আছেন তাদের তো আয় বাড়ে না। এই জায়গাগুলোতে আমাদের অবশ্যই নজর দিতে হবে। আয় বৈষম্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, সঠিকভাবে বাজার তদারকি করতে হবে এবং মূল্যস্তর ঠিক রাখতে হবে। তবেই মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে।

বাজার ব্যবস্থাপনায় সরকারের অনেক দুর্বলতা আছে জানিয়ে তিনি বলেন, তদারকির অভাব আছে। আইনের প্রয়োগ সঠিক হচ্ছে না। এজন্য টেকসই বাজার ব্যবস্থাপনা, বাজারে সমস্যা সৃষ্টির আগেই আমদানির ব্যবস্থা, কৃষকদের বিভিন্ন সহায়তার সঠিক বন্টন, আমদানি পর্যায় বা উৎপাদক পর্যায় থেকে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষতা সাধন করেই আগামীতে বাজার সামাল দিতে হবে।

ভোরের কাগজ

৩০ মার্চ ২০২২

সরকারের আকাঙ্ক্ষা আছে, পূরণের সক্ষমতা নেই

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

শওকত হোসেন: দুই বছরের বেশি সময় ধরেই অর্থনীতি স্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে নেই। আপনার কী মূল্যায়ন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমাদের সর্বশেষ স্বাভাবিক অর্থবছর ছিল ২০১৮-১৯। সে বছর আমাদের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধিও হয়েছিল। এরপর ২০২০ সালের মার্চ মাসে অতিমারি শুরু হলে অর্থবছরের (২০১৯-২০) শেষ সময়টায় অর্থনীতি সংকটে পড়ে। তারপরও অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ছিল ভালো। পরের অর্থবছরে (২০২০-২১) অবশ্য অতিমারির প্রভাব প্রকটভাবে প্রকাশ পায়। এরপর চলমান ২০২১-২২ অর্থবছরের শুরুতে এসে অর্থনীতিতে কিছু কিছু আংশিক পুনরুজ্জীবন দেখা যায়। এ পরিস্থিতির আবার পরিবর্তন দেখা দিল ২০২২ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির দিকে এসে। সুতরাং অতিমারি থেকে পুনরুজ্জীবনের যে আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনা আমাদের ছিল, সেটা সম্প্রতি আবার ধাক্কা খেয়েছে।

এখন অতিমারির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইউক্রেনের যুদ্ধ, বৈশ্বিক অর্থনীতির বিভিন্ন ধরনের উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলা, সরবরাহব্যবস্থার ভঙ্গুরতা, জ্বালানি তেলসহ পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। এসব কারণে আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরটি পুনরুজ্জীবনের সফল ব্যতিরেকেই শুরু হবে বলে মনে হয়। তাই বলা যায়, চলতি ২০২১-২২ একটি দুর্বল ভিত্তিতে শেষ হবে এবং আগামী ২০২২-২৩ থাকবে একটি অনিশ্চিত যাত্রায়।

শওকত হোসেন: এখন যদি আর্থিক ও রাজস্ব খাত নিয়ে জানতে চাই?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এই সময়ে দেশে আয় বাড়লেও সে অনুপাতে কর আদায় বাড়েনি। এটি একটি অদ্ভুত অর্থনীতি, যেখানে জিডিপির উচ্চ প্রবৃদ্ধি হয় কিন্তু কর আদায়ের হার বাড়েনি না। এখানে কর জিডিপির অনুপাতে ১০ শতাংশের নিচে আটকে আছে, যা এ অঞ্চলে সর্বনিম্ন। অপর দিকে চেষ্টা সত্ত্বেও সরকারের ব্যয় ১৩-১৪ শতাংশের ওপরে উঠছে না। সাধারণভাবে

আদায় কম, ব্যয়ও কম। সুতরাং বাজেট ঘাটতির আশঙ্কা নিয়ে যাঁরা চঞ্চল থাকেন, তা বাস্তবসম্মত নয়। যে বাজেট ঘাটতিটা হচ্ছে, তা জিডিপি ৫ বা সাড়ে ৫ শতাংশের মধ্যেই থাকছে। তবে দেখার বিষয়, সেটার অর্থায়নটা কীভাবে হচ্ছে। বাজেটে বারবারই বলা হয়, ঘাটতির বেশির ভাগ অর্থায়ন করা হবে বৈদেশিক উৎস থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেশি অর্থায়ন হয় অভ্যন্তরীণ উৎস থেকেই। এক বছর যদি জাতীয় সংগঠনপত্র বিক্রি করে বেশি অর্থ আনে, অন্য বছর আনে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে। এই দোলাচল এবারও বিদ্যমান। সরকার এক দিকে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে বিপুল পরিমাণে ঋণ নেয়, পুঁজিবাজারে রয়েছে ব্যাংকের অনিশ্চিত বিনিয়োগ এবং বিপুল পরিমাণ ঋণ অনাদায়ি থাকায় ব্যাংকের ভেতরেও তারল্য নিয়ে সংকট আছে। সব মিলিয়ে আর্থিক খাত আরও দুর্বল হচ্ছে ২০২১-২২ অর্থবছরে।

তবে এ পরিস্থিতি কেবল কোভিডের কারণে নয়। এর বড় কারণ হচ্ছে রাজস্ব ও আর্থিক খাতের যে প্রয়োজনীয় সংস্কার করার কথা ছিল, তা হয়নি। ফলে এনবিআরের আকাজ্জনা থাকলেও তাদের কারিগরি প্রস্তুতি নেই।

শওকত হোসেন: সরকার কি ব্যয়টা তাহলে ঠিক করে করতে পারছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এবার রাজস্ব বাজেটে দুটি ব্যয় খাত বড়ভাবে সামনে আসছে। ভর্তুকি, হস্তান্তর, প্রণোদনা ইত্যাদি সব মিলিয়ে একটা, অন্যটা ঋণের দায়-দেনা পরিশোধ। বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ পরিশোধ। এসবের ফলে বিপুল পরিমাণ বাড়তি বরাদ্দ দিতে হচ্ছে সংশোধিত বাজেটে। যদিও এর পূর্ণাঙ্গ চিত্র এখনো আমাদের কাছে নেই। তবে ভর্তুকি ও সুদ বাবদ এবার রাজস্ব বাজেটের প্রায় ৫৫ শতাংশ খরচ হয়ে যাবে। বেতন-ভাতা তো আর সরকার বাদ দিতে পারবে না। সুতরাং বেতন-ভাতাসহ এই তিন খাতে অর্থ ব্যয়ের পরে খুব সামান্যই রাজস্ব উদ্বৃত্ত সরকারের হাতে থাকবে।

এসব কারণে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থের সংস্থান করা অনেকটাই কঠিন হয়ে পড়ছে। এবার তো এডিপি বাস্তবায়নের হার অন্য যেকোনো বছরের তুলনায় কম। এডিবিতে যেসব প্রকল্প আছে, তাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখাও হয় না, আবার শুরু করার সময় থেকে গুণগত মানসম্পন্ন কারিগরি ও সম্ভাব্যতা যাচাইও হয় না। এমনকি প্রকল্প শেষ হওয়ার পর লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীর কী উপকার হলো, তা-ও যাচাই করা হয় না। মূলত আর্থিক ব্যয়ের হিসাবটাই হয়, ফলাফলের ওপরে গুরুত্ব কম। সুতরাং সাধারণভাবে বলা যায়, ব্যয়ের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতির তেমন উন্নতি দেখছি না।

শওকত হোসেন: তাহলে সরকার যে বলছে সম্প্রসারণশীলভাবে বড় বাজেট করবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: অর্থনীতিকে তেজি করতে এখন একটি সম্প্রসারণশীল আর্থিক নীতিমালা দরকার। তবে আয় ও ব্যয়ের এই পরিস্থিতিতে সরকার চাইলেও একটি সম্প্রসারণশীল বাজেট কার্যকরভাবে করতে পারবে না। কেননা বড় ধরনের আর্থিক সংস্থান এবং তা কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থাপনাগতভাবে যে দক্ষতা প্রয়োজন—এ দুটোই নেই। আসলে সম্প্রসারণমূলক

বাজেট দেওয়া একধরনের বাগাডম্বর, বাস্তবতা নয়। সরকার যদিও অর্থায়ন বাড়ানোর জন্য বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে ৫০ কোটি ডলার ঋণ নিচ্ছে। তবে শেষ পর্যন্ত গুণমানসম্পন্নভাবে সরকার এই অর্থ সময়মতো ব্যয় করতে পারবে কি না, তা চিন্তার বিষয়।

শওকত হোসেন: এখন তো অর্থনীতির কিছু সূচক নতুন করে চাপের মধ্যে পড়ে গেল, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক কিছু সূচকে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমাদের অর্থনীতির শক্তির একটা জায়গা ছিল বৈশ্বিক লেনদেন। সেই জায়গায়ও বেশ ভাঙন ধরেছে। এমনকি যে রপ্তানি বৃদ্ধির প্রবণতাকে ভালো বলছি, সেটাও তো ঠিক না। এ সময়ে দেশের রপ্তানি বেড়েছে ৩৩ শতাংশ, এর বিপরীতে আমদানি বেড়েছে ৫১ শতাংশ। আর পোশাক খাত তো টিকে আছে রপ্তানির পরিমাণ দিয়ে, পণ্যের দাম দিয়ে নয়। আর রেমিট্যান্স খাতের মধ্যমেয়াদি প্রবণতা হচ্ছে তা আরও নিচের দিকে যাবে। ঈদ, কোভিড, নির্বাচন—এসব সময়ে ওঠানামা করবে ঠিকই, কিন্তু বৈশ্বিক যে পরিস্থিতি তাতে প্রবাসী আয় অস্থিতিশীল থেকে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগও (এফডিআই) তো কোনো অবস্থাতেই নিট প্রবাহ ১০০ কোটি ডলারের বেশি হচ্ছে না। বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ প্রভূতভাবে বাড়লেও এর মধ্যে সাস্রয়ী সাহায্যের অংশ অনেক কম।

বৈদেশিক লেনদেনে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা যে সূচকে বোঝা যায়, সেটি হলো চলতি হিসাবের ভারসাম্য, যা বিদেশের সঙ্গে দেশের মূলধনি ও আর্থিক লেনদেন বোঝায়। ২০২০-২১ অর্থবছর শেষ হয়েছিল চলতি হিসাবে ৩৮০ কোটি ডলার ঘাটতি নিয়ে। এটি এখন এক হাজার কোটি ডলার ঘাটতির মধ্যে আছে। আর যদি বৈদেশিক লেনদেনের ঘাটতি দেখি, গত অর্থবছরে এখানে ৯০০ কোটি ডলারের উদ্ভূত ছিল, এখন এটা ২০০ কোটি ডলারে ঋণাত্মক হয়ে গেছে।

বলতে চাচ্ছি, দেশের আর্থিক খাত একধরনের নড়বড়ে অবস্থায় ছিল, এবার এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈদেশিক খাতের দুর্বলতা। এর পাশাপাশি আছে মূল্যস্ফীতির চাপ। শুধু আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বেড়েছে বলেই যে মূল্যস্ফীতি হয়েছে, তা-ও ঠিক না। টাকা ক্রমান্বয়ে দুর্বল হওয়ার প্রভাবও আছে এখানে। অথচ অন্যান্য দেশে মূল্যস্ফীতি যেটা দেখা দিয়েছে, তার অন্যতম কারণ সরকার বেশি খরচ করেছে বলে। অর্থাৎ সম্প্রসারণশীল অর্থায়নের জন্য। বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, তারা অনেকে কোভিড-উত্তর অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে সরকারি ব্যয় কমাচ্ছে অর্থাৎ বাজারে অর্থপ্রবাহ কমিয়ে দিচ্ছে। আমরা তো বড় কোনো সরকারি খরচই করিনি।

এখন যদি মূল্যস্ফীতি বাড়ে, টাকার বিনিময় হারে যদি পতন ঘটে, তাহলে সরকারের জন্য সুদের হার বাড়ানো ছাড়া উপায় থাকবে না। এটা অবশ্য ব্যক্তি বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। যদিও আমি মনে করি না যে বাংলাদেশে একমাত্র সুদের হারের কারণে ব্যক্তি বিনিয়োগ আটকে আছে। এর বাইরেও আরও দশটা কারণ আছে। তবে এটা ঠিক ব্যক্তি বিনিয়োগ তেজি হওয়ার লক্ষণ খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। ব্যক্তি খাতে ঋণপ্রবাহ এ বছরের জানুয়ারি থেকে আবার কমে যাচ্ছে এবং তা বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতিতে ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশ কম।

শওকত হোসেন: সরকারের চেষ্টাগুলোকে কীভাবে দেখছেন? ভালো কাজও তো অনেক করছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সরকারের নীতি উদ্যোগ সঠিকমুখী হলেও তা আসে বেশ দেরিতে এবং অপরিপাতিভাবে। মূল্যস্ফীতির পরিপ্রেক্ষিতে অসুবিধাগ্রস্ত মানুষদের জীবনমান ঠিক রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, আমদানি সহজীকরণ, ভর্তুকি বৃদ্ধি, টিসিবির ব্যবহার সম্প্রসারণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিস্তৃত করা ইত্যাদির কথা আমরা অনেক আগেই বলেছিলাম। সরকার অনেকটাই করেছে কিন্তু বেশ দেরিতে ও যথেষ্টভাবে না। সরকার যে সঠিক সময় করতে পারে না, এর কারণ কাঠামোগত অদক্ষতা। আর আছে তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি। তথ্যনৈরাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে তথ্যের অক্ষত বা ব্যাপক তথ্যের অভাব সরকারকে সঠিক সময়ে নীতি সংস্কার করতে দেয় না এবং প্রায়ই বিপর্যয়গামী করে। যেমন মূল্যস্ফীতির হিসাব করি আমরা ১৭ বছরের পুরনো ভোগ-কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে, যা বাজারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ না।

শওকত হোসেন: সরকার যে ১ কোটি পরিবারকে খাদ্য সাহায্য দিতে চাচ্ছে, সে ব্যাপারে কী মনে করেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সরকার ১ কোটি মানুষকে খাওয়ানোর কথা বলছে। এই ১ কোটি মানুষ কীভাবে নির্দিষ্ট হবে? কোভিডকালে সরকার ৫০ লাখ মানুষকে সহায়তা করবে বলে ঠিক করেও তথ্যের অভাবে সব মিলিয়ে সাড়ে ৩৮ লাখের বেশি মানুষকে তা দিতে পারেনি। এক কোটি মানুষকে সহায়তা দেওয়ার জন্য তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করার কথা ছিল। বলা হয়েছিল, এগুলো করা হবে রোজার ১৫ দিন আগে। এখন তো রোজার এক সপ্তাহের ওপর চলে গেল। মার্চপর্যায়ের পরিস্থিতি কী আমরা তো পরিষ্কার করে জানি না।

তাছাড়া যাদের সহায়তা দেওয়া হবে, সেই পুরো তালিকা কি জনমানুষের জ্ঞাতার্থে টানিয়ে দেওয়া হবে? কেননা আগেও দেখেছি সহায়তা দিতে সরকারের সদিচ্ছা থাকলেও বিতরণের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি, দুর্নীতি ও বৈষম্য হয়েছে। সুতরাং সরকার এক কোটি পরিবারকে সহায়তা দেওয়ার যে ঘোষণা দিয়েছে, তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিয়ে দৃষ্টিশক্তি থেকে যাচ্ছে।

শওকত হোসেন: তাহলে সারকথা কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: একদিকে সরকারের সার্বিক ব্যয় বাড়তে হবে, বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা খাতে গুণমানসম্পন্ন ব্যয় করতে হবে। আবার লক্ষ্য নির্দিষ্টভাবে অসুবিধাগ্রস্ত মানুষদের প্রত্যক্ষ অর্থসাহায্য ও খাদ্যসহায়তা দিতে হবে। সমস্যা হচ্ছে, এই দুইয়ের সমন্বয় করা, তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে পরিবীক্ষণে রাখা, এই ব্যয়কে জবাবদিহির মধ্যে নিয়ে আসা—এসব করার মতো যে প্রাতিষ্ঠানিক-প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দক্ষতার দরকার হয়, তা সরকারের নেই।

এটা যে নেই, এর বড় কারণ হচ্ছে ২০১৩-১৪ সালের পর থেকে আর্থিক খাতে বড় ধরনের কোনো সংস্কার আমরা দেখি না। এখন সরকার যে আয় ও ব্যয় বাড়াতে না পারার অসুবিধার মধ্যে পড়েছে, এটা তার নিজস্ব সৃষ্টি। যেহেতু পুরনো সমস্যাগুলো সমাধান করা হয়নি, সেহেতু নতুন সমস্যা মোকাবিলা করতে গিয়ে সরকার পুরনো সমস্যার কাছে জিম্মি হয়ে থাকছে।

অথচ কোভিডের টিকা সংগ্রহ, সরবরাহ ও প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে কত বড় সাফল্য অর্জন করেছি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সরকারি আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে সক্ষমতার যে সীমাবদ্ধতা দেখতে পাচ্ছি, সেটি কি রাজনৈতিক অনীহা ও উদ্যোগহীনতার প্রকাশ?

প্রথম আলো

১১ এপ্রিল ২০২২

সুশাসন থাকলে শ্রীলঙ্কার পরিণতি হবে না

মোস্তাফিজুর রহমান

দক্ষিণ এশিয়ায় এক অনন্য দেশ হিসেবেই এত দিন শ্রীলঙ্কার পরিচিতি ছিল। শিক্ষার হার, মাথাপিছু আয়, জনকল্যাণ— সব সূচকেই তারা এগিয়ে ছিল। কিন্তু সম্প্রতি শ্রীলঙ্কা সফর করে মানুষের দুর্দশার চিত্রই দেখতে হলো। যেদিন শ্রীলঙ্কায় পৌঁছালাম, সেদিন ১৩ ঘণ্টা বিদ্যুৎ ছিল না। জ্বালানিস্বল্পতার কারণে সরবরাহ—সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে তখন। মানুষের মনে অসন্তোষ। সরকারের প্রতি মানুষের একধরনের আত্মহীনতার সৃষ্টি হয়েছে— জাতীয় সরকারের দাবি করেছে জনগণ।

শ্রীলঙ্কার এ অবস্থা দেখে বুঝতে হয়, অর্থনীতি যত ভালোই থাক না কেন, ঠিকঠাক ব্যবস্থাপনা করা না গেলে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা কঠিন। শ্রীলঙ্কার এ পরিস্থিতি এক দিনে হয়নি। অর্থনীতিবিদেরাও অনেক দিন ধরে এসব বলে আসছিলেন। কিন্তু তাঁদের কথায় কর্ণপাত করা হয়নি। এ সবকিছু পাশ কাটিয়ে তারা হয়তো ঘুরে দাঁড়াতে পারত, কিন্তু কোভিড ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো দ্বৈত দুর্ঘটনার কারণে তারা আরও বিপাকে পড়েছে।

দেশটির অর্থনীতি মূলত তিনটি খাত ঘিরে ঘুরপাক খায়— তৈরি পোশাক, পর্যটন ও চা। অর্থনীতির বহুমুখীকরণ করতে পারেনি তারা। আর কোভিডের সময় দেখা গেল, যেসব দেশ পর্যটনের ওপর বেশি নির্ভরশীল, তারাই বেশি মার খেয়েছে। শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রেও তা ঘটেছে। গত দুই বছরে পর্যটন খাত থেকে তারা তেমন একটা রাজস্ব আয় করতে পারেনি। অথচ পর্যটন থেকে তারা বছরে গড়ে ৫০০ থেকে ৬০০ কোটি ডলার উপার্জন করে। বস্তুত কোভিডের আগে ২০১৯ সালে কলম্বো শহরে ইস্টার সানডে চলার সময় কয়েক দফা বোমা হামলায় দুই শতাধিক মানুষ নিহত হওয়ার পর থেকেই পর্যটক কমতে শুরু করে শ্রীলঙ্কায়। তবে গত বছর কোভিডের প্রভাব কাটিয়ে শ্রীলঙ্কায় পর্যটক আসা শুরু হলেও ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা শুরু হওয়ার পর আরেক দফা ধাক্কা খায় শ্রীলঙ্কা। কারণ, তাদের পর্যটকদের বড় একটি অংশ রুশ নাগরিক। এখানেই শেষ নয়, শ্রীলঙ্কার চায়ের বড় বাজার হচ্ছে রাশিয়া। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রাশিয়ার সঙ্গে লেনদেন করা সম্ভব হচ্ছে না তাদের পক্ষে।

কৃষি উৎপাদন কমেছে শ্রীলঙ্কার। ২ কোটি ২০ লাখ মানুষের দেশ শ্রীলঙ্কায় সার ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ায় ধান ও চায়ের উৎপাদন কমে যায়। এ ছাড়া দেশটির মানুষের মাথাপিছু আয় সাড়ে তিন হাজারের বেশি। ফলে সেখানে শ্রমিকের মজুরি বেশি। এত মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ দিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা বড় চ্যালেঞ্জ। কৃষির যন্ত্রীকরণ শুরু করেছিল তার, কিন্তু উৎপাদন শেষমেশ বৃদ্ধি করতে পারেনি।

মূলত বড় প্রকল্পগুলো সফলতার মুখ না দেখায় বিপাকে পড়েছে শ্রীলঙ্কা। সম্ভাব্যতা যাচাই না করে তারা যেভাবে বড় বড় প্রকল্প হাতে নিয়েছে, সেগুলোর অর্থায়ন করতে তাদের বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ নিতে হয়েছে। এমন এক বিমানবন্দর তারা নির্মাণ করেছে, যেখানে দিনে বিমান ওঠানামা করে হাতে গোনা কয়েকটি। ফলে এখন যখন ঋণ পরিশোধ করতে হচ্ছে, তখন তারা বিপাকে পড়েছে।

এত দিন শ্রীলঙ্কা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছে যায়নি, কিন্তু এখন উপায়ন্তর না দেখে তারা যাচ্ছে। আইএমএফ যথারীতি কিছু শর্ত দিয়েছে। এ ছাড়া ভারতের সহায়তায় ইতিমধ্যে শ্রীলঙ্কার বন্দরে ৪০ হাজার টন ডিজেলবাহী এক জাহাজ ভিড়েছে। চীনের কাছেও তারা সহায়তা চেয়েছে।

বাংলাদেশেও এখন বড় বড় প্রকল্প চলছে। ফলে এ বাস্তবতা থেকে আমাদেরসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা নেওয়ার যথেষ্ট সুযোগ আছে। প্রথমত, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই না করলে কী হয়, শ্রীলঙ্কা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। এরপর আমরা দেখলাম, সুশাসন না থাকলে কী হতে পারে, এ নিয়ে বাংলাদেশে তো কম কথা হলো না।

বাংলাদেশের সুবিধা হলো, এখানে যেসব অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে, তার ব্যবহার না হওয়ার সুযোগ কম। এখানে জনসংখ্যা অনেক বেশি। ঘনবসতিপূর্ণ দেশে উপকারভোগীর নিরিখে মাথাপিছু প্রকল্প ব্যয় কম হয়। প্রকল্পের সেবার মূল্যও কম রাখা যায়। তাই এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধা আছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, পদ্মা সেতু নির্মিত হলে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে আরও গতি আসবে।

শিল্পায়নের কারণে বিদ্যুতের চাহিদাও থাকবে। এ ছাড়া আমাদের ঋণের পরিমাণ খুব একটা বেশি নয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, দেশের ঋণের হার এখন জিডিপি ৩৮ শতাংশ। গত জুন পর্যন্ত হিসাবে বাংলাদেশের মোট দেনার পরিমাণ ছিল ১১ লাখ ৪৪ হাজার ২৯৭ কোটি টাকা। এর প্রায় ৩৭ শতাংশ এসেছে বিদেশি উৎস থেকে, পরিমাণ ৪ লাখ ২০ হাজার ৩৫৮ কোটি টাকা। আর বিদেশি ঋণের হার জিডিপি ১৩ শতাংশ।

আর ঋণ দিয়ে নির্মিত অবকাঠামো আর তার আয় দিয়ে ঋণের পরিষেবা— এ সমীকরণের ব্যত্যয় হয় প্রকল্পের ব্যয় যখন অযৌক্তিকভাবে বেড়ে যায়, আয় ও ঋণ পরিষেবার ক্ষেত্রে সময়ের সামঞ্জস্য যখন বিঘ্নিত হয়।

শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞতা আমাদের তথ্য-উপাত্তনির্ভর নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় পেশাদারি, যৌক্তিক প্রাক্কলন, বাছাই ও প্রকল্পের আয় ও ঋণ পরিষেবার মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়ে গুরুত্ব দিতে শেখায়।

তবে বাংলাদেশ এলডিসি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে আমরা মধ্যম আয়ের কাতারে প্রবেশ করেছি। ফলে ঋণের সুদহার বাড়তে শুরু করেছে। এ বাস্তবতায় আমাদের ঋণ গ্রহণ বা প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাবধান হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। সবচেয়ে বড় কথা সুশাসন। সব ক্ষেত্রে সুশাসন থাকলে আমরা বিপদ ও ঝুঁকি পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে পারব।

প্রথম আলো

১১ এপ্রিল ২০২২

বাংলাদেশের বৈদেশিক দায়দেনা পরিস্থিতি ২০২৪-২৫ সালে অস্বস্তির দিকে যাবে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সাম্প্রতিককালে দায় দেনা নিয়ে আলোচনা যতখানি না দেশের কারণে হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রতিবেশি শ্রীলংকার কারণে হচ্ছে। নেপালের অভিজ্ঞতাও আগামীতে বাংলাদেশের জন্য প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে। সার্বিকভাবে সরকারি দায়দেনা অতিমারি উত্তর পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

দায়দেনা কী এবং কেন জটিল হয়

সরকারি দায়দেনা হলো সরকার দেশে এবং বিদেশে কার কাছ থেকে কত পরিমাণ ঋণ নিয়েছে ও অন্যান্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা আর্থিকভাবে মেটাতে হয়। দায়দেনা পরিস্থিতির চরম অবস্থায় কীভাবে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়, শ্রীলঙ্কা তার উদাহরণ। এ সংকট ঘানা, জিম্বাবুয়ে এবং পাকিস্তানেও এ মুহূর্তে চলছে। এসব দেশে দায়দেনা পরিস্থিতি জটিল হয়ে যাওয়ায় অর্থনৈতিক সংকট রাজনৈতিক সংকটে রূপান্তরিত হয়েছে। খেয়াল করতে হবে, এর কোনটা কারণ এবং কোনটা উপসর্গ। অনেক সময় উপসর্গকে কারণ হিসেবে দেখা হয়। তখন কারণগুলো পরিস্কার বোঝা যায় না।

দায়দেনার ক্ষেত্রে উদ্বিগ্ন হওয়ার তিনটি উল্লেখযোগ্য কারণ রয়েছে। প্রথমত- যথেষ্ট পরিমাণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ না থাকলে অর্থাৎ কর আহরণ ব্যবস্থা খুব দুর্বল হলে সরকার যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্ব ব্যয় মেটাতে পারে না এবং উন্নয়ন ব্যয় মেটানোর ক্ষেত্রেও বড় ঘাটতি থেকে যায়। দ্বিতীয়ত- বহির্বিপ্লবের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে যদি দুর্বলতা সৃষ্টি হয় অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য যদি ঠিক না থাকে এবং বৈদেশিক সম্পদ অর্থাৎ রেমিট্যান্স কমে যায়, রপ্তানি আয় কমে যায়, বৈদেশিক বিনিয়োগ কমে যায় এবং বিদেশে থাকা দেশের সম্পদ থেকে যদি আয় বন্ধ হয়ে যায়। অবিবেচকের মতো শাস্ত্রী উৎসের বদলে অনেক বেশি ব্যয়বহুল উৎসে চলে গেলে বিনিময় হারের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটে। নিজস্ব মুদ্রার মূল্যমান কমে যেতে থাকলে ঋণ পরিশোধে আরও বেশি অর্থ লাগে। বেশি সুদে ঋণ আনলে, গ্রেস পিরিয়ড

কম সময়ের জন্য হলে এবং যে প্রকল্পের জন্য ঋণ আনা হয়, সেই প্রকল্প যদি যথোপযুক্তভাবে আয় সৃষ্টি করতে না পারে তাহলে দায় পরিশোধ জটিল হয়ে যায়। দায়দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রবৃদ্ধির হার কমে যায়, মূল্যস্ফীতি বেড়ে যায়। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ কমে থাকে। বিনিময় হারের ক্ষেত্রে অবনমন ঘটে। প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমে যায় এবং ক্রেডিট রেটিংও কমে যায়। সাম্প্রতিককালে শ্রীলংকাতে যা হয়েছে।

সরকার যখন তার নিজস্ব অর্থ দিয়ে দায়দেনা মেটাতে পারে না অথবা দায়দেনা মেটানোর জন্য তাকে আবার ঋণ নিতে হয়, তখনই তার দায়দেনার টেকসইত্ব নেই বলে প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ পাওনাদারদের টাকা দিতে পারে না অথবা পরিশোধ করার জন্য আবার ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন হয়। অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে, জিডিপি এর শতাংশ দায়দেনা হলে খুবই বিপজ্জনক বা এর নিচে থাকলে খুব ভালো। অর্থনীতি শাস্ত্রে এভাবে বিষয়টিকে খুব যৌক্তিকভাবে এখন পর্যন্ত উপস্থাপন করা যায়নি। জাপান এবং আমেরিকার দায়দেনা তাদের জিডিপি ১০০ শতাংশের ওপরে। কিন্তু তারা কোনো সময়ে খেলাপি হয়নি। আবার এমনও দেখা গেছে, ৪০ থেকে ৫০ শতাংশতেও যারা আছে, তাদের কেউ কেউ অভ্যন্তরীণ বা অন্য উৎস থেকে দায়দেনা মেটানোর জন্য অর্থ জোগাড় করতে পারেনি। যদিও বিশ্বব্যাংক এক গবেষণায় বলছে, জাতীয় দায়দেনা জিডিপি ৭৭ শতাংশে গেলে প্রবৃদ্ধির হারকে ক্রমাশয়ে কমিয়ে দেয় এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অসুবিধা হয়। কিন্তু সাধারণভাবে অর্থনীতি শাস্ত্রে যে ঐক্যমত আছে, তা হলো ফিসক্যাল কনসোলিডেশন অর্থাৎ কীভাবে আর্থিক খাত সংহতকরণ হচ্ছে তার ভিত্তিতে দায়দেনা পরিস্থিতি বুঝতে হবে। আর্থিক খাত সংহতকরণ মানে হলো, অর্থ আহরণ বা কর আহরণ বাড়ছে এবং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় বা সরকারি ব্যয় হচ্ছে এবং যে বাজেট ঘাটতি হচ্ছে, তা ক্রমাশয়ে বাড়ছে না। অর্থ বিজ্ঞান বলছে, আর্থিক সংহতকরণ হলো মূল চাবিকাঠি। সেজন্য জিডিপি অনুপাতে দায়দেনার নিরাপদ শতাংশ খোঁজার চেয়ে দেখা উচিত যে, আর্থিকভাবে কতখানি দায়িত্বশীলভাবে কোনো দেশ নিজেকে পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশ কোন জায়গায়

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মিলিয়ে দেখতে হবে, কোন ক্ষেত্রে কোন কারণ আসছে এবং এ ধরনের পরিস্থিতির কারণে কোন কোন চিহ্ন দৃশ্যমান হচ্ছে? সরকারি বা জাতীয় দায়দেনা পরিস্থিতি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বটা কার? এটি এমন একটা জিনিস যে, শুধুমাত্র আর্থিক ব্যবস্থাপনা দিয়েও হয় না অথবা মুদ্রানীতির ব্যবস্থাপনায় যারা থাকেন, তাদের দিয়েও হয় না। এখানে আর্থিক এবং মুদ্রানীতির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের এক সাথে কাজ করতে হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংককেও কাজ করতে হবে। এর সাথে ইআরডিকে লাগবে, অর্থ বিভাগকে লাগবে। মনিটরিং, ফিসক্যাল অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল পলিসির জন্য বাংলাদেশে কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল আছে। সঠিকভাবে বললে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তারাই এর জন্য সবচেয়ে দায়িত্ববান। তাদের দায়িত্বটাই প্রত্যক্ষ, কারণ ওখানে সমন্বয় করা হয়। পাশাপাশি অবশ্যই অর্থ মন্ত্রণালয় মূল দায়িত্বের ভেতরে আসে।

আমাদের দেশে দায়দেনা পরিস্থিতিকে বড় দু'ভাবে দেখা হয়। একটা অভ্যন্তরীণ, আরেকটা বৈদেশিক দায়দেনা। অভ্যন্তরীণ দায়দেনার ভেতর বড় তিনটি বিষয় থাকে- সরকারের ট্রেজারি বিল, ট্রেজারি বন্ড এবং জাতীয় সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে নেওয়া ঋণ। বৈদেশিক দায়দেনার ভেতরে সাশ্রয়ীভাবে কতটুকু, আধা-সাশ্রয়ী কতটুকু এবং অন্যান্য যেগুলো নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ সাপ্লায়ারস ক্রেডিট থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ধরনের হার্ডলোন থাকে। আরও অনেক কিছু থাকে, যেগুলো দায়দেনার সরকারি হিসাবের ভেতরে প্রকাশিত হয়না বা বিবেচিত হয়না। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব দায়দেনা আছে, সেগুলো অভ্যন্তরীণ দায়দেনার ভেতরে বিবেচিত হয় না। সরকারের কিছু কনটিনজেন্ট লায়াবিলিটি বা সংযুক্ত দায় আছে অর্থাৎ সরকার যে সমস্ত দায়দেনা অধিগ্রহণ করেছে বা দায়িত্ব নিয়েছে বা গ্যারান্টি দিয়েছে সেগুলোও হিসাবের ভেতরে নেই। সরকার অনেক সময় অফ-বাজেট ফাইন্যান্সিং করে, অর্থাৎ বাজেটের বাইরে রেখে বিভিন্ন ধরনের অর্থায়ন করে। আবার সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একে অপরের কাছে যে দায়দেনা সেগুলোও কিন্তু অনেক সময় আসে না। ব্যক্তি খাত বিদেশ থেকে যেসব ঋণ নিচ্ছে, সেক্ষেত্রে অনেক সময় সরকার দায়িত্ব নিয়েছে, আবার অনেক সময় নেয়নি। এটিও দায়দেনার হিসাবের মধ্যে দেখানো হয় না। একইরকমভাবে অনেক পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ হচ্ছে সেখানে সরকারের অংশের জন্য বা তার সহযোগির জন্য অনেক সময় গ্যারান্টি দেওয়া হয়। সেগুলোও যদি খেলাপি হয় তাহলে এর দায় সরকারের ওপর আসবে। ফলে সরকারি দায়দেনার যে হিসাব দেওয়া হয়, তা পূর্ণাঙ্গ বা সম্পূর্ণ নয় এটি বিবেচনায় রাখতে হবে। কারণ এগুলো যদি কোনো কারণে বিগড়ে যায়, তাহলে সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। সেজন্য তথ্যের স্বচ্ছতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের দায়দেনা কত

তুলনীয় রাখা এবং এক ধরনের সাজুয়া বজায় রাখার জন্য তার উপস্থাপনায় জিডিপি ২০০৫-০৬ ভিত্তিবছর ব্যবহার করা হয়েছে। আইএমএফের হিসাবে বাংলাদেশের দায়দেনা তুলনামূলকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে কম, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি ৩৪ দশমিক ৭ শতাংশ। এ সময় শ্রীলঙ্কার দায়দেনা ১১২ দশমিক ২ শতাংশ এবং ভুটানের ১২০ দশমিক ৭ শতাংশ। সরকারি হিসাবে ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দায়দেনা ১৩১ দশমিক ১৪ বিলিয়ন ডলার, যা গত তিন বছরে গড়ে ১৬ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন ডলার বা জিডিপি প্রায় আড়াই শতাংশ হারে বেড়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বেড়েছে ১৮ দশমিক ৬৪ বিলিয়ন ডলার, যার ৫৪ শতাংশের বেশি ছিল অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। ২০০১-০২ থেকে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত এক দশকে বৃদ্ধির হার ছিল ৪৪ দশমিক ১ শতাংশ। পরের দশ বছর (২০১১-২০১২ থেকে ২০২০-২০২১) বেড়েছে ৬৬ দশমিক ৬ শতাংশ। সর্বশেষ অর্থবছরে বেড়েছে ৯ দশমিক ৬২ বিলিয়ন ডলার। পরিশোধ বেড়েছে গুণ্য দশমিক সাত বিলিয়ন ডলার। দায়দেনা বাড়ার হার সাম্প্রতিককালে খুবই বেশি, বিশেষত গত তিন বছরে। ২০২১ অর্থবছরে যা দাঁড়িয়েছে জিডিপি ৩৬ দশমিক ৯ শতাংশ।

অভ্যন্তরীণ দায়দেনার স্থিতি ২০২১ অর্থবছর শেষে দাঁড়িয়েছে ৬৯ বিলিয়ন ডলার। এটি ২০০২ থেকে ২০১১ অর্থবছর পর্যন্ত বেড়েছে ১৩ শতাংশ। পরের দশকে ২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত

বেড়েছে প্রায় ২০ শতাংশ। ২০০৩ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ ঋণ ছিল মোট দায়দেনার ৩৫ দশমিক ৬ শতাংশ। ২০২১ অর্থবছরে তা বেড়ে দাড়িয়েছে ৫৩ দশমিক ৪ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ উৎসের দায়দেনা আগামী বছরগুলোতেও প্রাধান্য বিস্তার করবে। এটি অর্থবছর ২০০২ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত স্থিতিশীল ছিল। ২০১৮ এর পরে এর বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি। ২০২১ অর্থবছরে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ৬০ দশমিক ১৫ বিলিয়ন ডলার, যা মোট ঋণের ৪৬ শতাংশ। বৈদেশিক দায়দেনা ২০০৩ অর্থবছরে ছিল মোটের ৬৪ দশমিক ৪ শতাংশ। গত তিন বছর গড়ে ৭ বিলিয়ন ডলার করে বেড়েছে, যা জিডিপি প্রায় ১ শতাংশ। জিডিপি অংশ হিসেবে বৈদেশিক ঋণ বেড়ে ২০২১ অর্থবছরে ১৬ দশমিক ৯ শতাংশ হয়েছে। শুধু ২০২১ অর্থবছরে ৯ বিলিয়ন ডলার বেড়েছে, যা জিডিপি ১ দশমিক ১ শতাংশ।

বেসরকারি খাতের বিদেশি ঋণ, সংযুক্ত দায় এবং আন্তঃসরকারি দায় যোগ করলে ২০২১ অর্থবছরে প্রকৃত অর্থে দায়দেনা জিডিপি ৪৪ দশমিক ১ শতাংশ। এর মধ্যে অবশ্য পিপিপি জন্য পাবলিক গ্যারান্টি নেই। কারণ যেসব তথ্য সরকারি উৎস থেকে পাওয়া গেছে, সেগুলোই নিয়ে তিনি হিসাব করেছেন। মোট দায়দেনার মধ্যে জিডিপি ১৬ দশমিক ৯৪ শতাংশ বিদেশি উৎসের এবং ১৯ দশমিক ৪৫ শতাংশ অভ্যন্তরীণ উৎসের। ৫ দশমিক ৩ শতাংশ ব্যক্তি খাত বিদেশ থেকে নিয়েছে। সরকারের সংযুক্ত দায়দেনা আছে ২ দশমিক ৫ শতাংশ মতো।

দায়দেনা পরিশোধ পরিস্থিতি

২০০৬ অর্থবছরে দায়দেনা বাবদ পরিশোধের ৬১ শতাংশ ছিল বিদেশি ঋণের জন্য। ২০২১ অর্থবছরে যা উল্টো হয়ে গেছে অর্থাৎ প্রায় ৬৭ শতাংশ অভ্যন্তরীণ উৎসের জন্য আর ৩৩ শতাংশ দেশের উৎসের জন্য। দেখতে হবে যে, যেসব ঋণ বিদেশি উৎস থেকে নেওয়া হয় তার কাঠামোতে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে কি না। এখন পর্যন্ত প্রায় ৯৬ শতাংশ ঋণ দীর্ঘমেয়াদি এবং তার প্রায় ৫৪ শতাংশের ওপরে বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া। স্বল্পমেয়াদি ঋণের পরিমাণ খুবই কম, ২ দশমিক ২৪ শতাংশ। কিন্তু ২০২০ অর্থবছরে স্বল্পমেয়াদি ঋণ ছিল ২ দশমিক ০৮ শতাংশ, যা পরের অর্থবছরে বেড়ে ৩ দশমিক ৭৭ শতাংশ হয়েছে। অর্থাৎ স্বল্পমেয়াদি ঋণ বড় হয়ে যাচ্ছে; বাণিজ্যিক ঋণের পরিমাণও বাড়ছে। শূন্য দশমিক শূন্য এক থেকে ২ দশমিক ১৫ শতাংশে চলে গেছে। আর যে পরিবর্তন আসছে, তা হলো বৈদেশিক বহুপাক্ষিক ঋণের পরিমাণ কমে দ্বিপাক্ষিক ঋণে ঝুঁকছে সরকার। দ্বিপাক্ষিক ঋণে প্রথাগত ঋণদাতা ছিলো ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি। এখন রাশিয়া, ভারত, চীন যুক্ত হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে যে ঋণ নেওয়া হচ্ছে তার প্রায় ৫৯ শতাংশই জাতীয় সঞ্চয়পত্র থেকে। আর একটা বড় অংশ ব্যাংকিং খাত। জাতীয় সঞ্চয়পত্রে সুদের হার বেশি এবং দিতে হয় স্বল্প মেয়াদে। ফলে সরকারের আর্থিক চাপ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ব্যাংকিং খাত থেকে সরকার বেশি ঋণ নিলে অনেক সময় তারল্য সংকট সৃষ্টি হয় এবং ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগে অর্থায়নে সমস্যা হয়।

পুরো রাজস্ব বাজেটের প্রায় ২৭ শতাংশ শুধুমাত্র দায়দেনা পরিশোধ করতে যাচ্ছে। দায়দেনা, ভৃত্তিক এবং সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা ইত্যাদি মিলিয়ে কিন্তু ৮০ শতাংশের ওপরে হয়ে যায়। অর্থাৎ খুব সামান্যই থাকে রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে। আরও অনেক কম থাকে আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অর্থায়ন করার ক্ষেত্রে। এর ফলে উন্নয়ন ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থের যোগান কমে যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশি উৎস থেকে ব্যয়বহুল ঋণ নেওয়া হচ্ছে। ভারত থেকে দুটো ডলার ক্রেডিট লাইন আছে। একটা ২ বিলিয়ন ডলার আরেকটা সাড়ে ৪ বিলিয়ন ডলার। এ ঋণের রেয়াতি সময় ৫ বছর আর পরিশোধের সময় ১৫ বছর। অর্থাৎ রেয়াতি সময় খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। মাতারবাড়ি এবং রূপপুর ১০ বছর করে রেয়াতি সময় আছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে রাশিয়া থেকে ১১ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার নেওয়ার কথা। পাওয়া গেছে সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলার। আগামী দিনে আরও বড়ভাবে দেওয়া হবে। যত দেওয়া হবে তত বড় পরিমাণে দায়দেনার পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আসবে। কিছু উচ্চমূল্যের সাপ্লায়ারস ক্রেডিট রয়েছে। একটা হল পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প। রেল সেতুর জন্য ২ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার চীন থেকে সাপ্লায়ারস ক্রেডিট নেওয়া হচ্ছে। সাপ্লায়ারস ক্রেডিট হলো, কাজটা যে করে সে-ই অর্থের যোগান দেয়। সেখানে অনেক সময় ঋণের মূল্য প্রতিযোগিতা সক্ষম হয় না। একইরকমভাবে ডিপিজিসির সম্প্রসারণের জন্য চীন থেকে সাপ্লায়ারস ক্রেডিট নেওয়া হচ্ছে এক বিলিয়ন ডলার। এক্ষেত্রেও ৫ বছরের রেয়াতি সময় এবং ১৫ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। রেয়াতি সময় প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ার পথে। অন্যান্য অংশীদাররাও সাপ্লায়ারস ক্রেডিট দিচ্ছে। জাপান, নেদারল্যান্ড, ইউকের মতো দেশ সাপ্লায়ারস ক্রেডিটের দিকে এগোচ্ছে। সবচেয়ে বড় সাপ্লায়ারস ক্রেডিট চীনের, ৫ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন ডলার। তার ভেতর ২ বিলিয়ন ডলার ছাড় হয়েছে। সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে সাড়ে ১০ বিলিয়ন ডলারের সাপ্লায়ারস ক্রেডিট বা উচ্চমূল্যের ঋণ রয়েছে।

সবুজ থেকে হলুদ অবস্থানের দিকে

বাংলাদেশের দায়দেনা পরিস্থিতির গুণগত একটি পরিবর্তন হয়েছে। পরিমাণগত পরিবর্তন ২০২৪ এবং ২০২৫ সালের দিকে দেখা যাবে। ২০২৪/২০২৫ সালে সম্ভবত বাংলাদেশ তার যে সবুজ অবস্থান আছে, সেই অবস্থান থেকে অর্থাৎ স্বস্তিদায়ক অবস্থান অতিক্রম করে একটি অস্বস্তির ভেতরে বা হলুদ অবস্থানের দিকে যাবে।

বৈদেশিক দায়দেনা পরিস্থিতি নিয়ে যত চিন্তিত থাকতে দেখা যায়, অভ্যন্তরীণ উৎসের দায়দেনা নিয়ে তত দেখা যায় না। অভ্যন্তরীণ উৎসের দায়দেনা পরিস্থিতি কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাংলাদেশ কর-জিডিপি অনুপাত সর্বনিম্ন অবস্থানে আছে, মাত্র ১০ শতাংশের নিচে। এখানে সাড়ে ১৬ কোটি মানুষের দেশে মাত্র ৭৪ লাখ মানুষের টিআইএন নম্বর আছে। ২৩ লাখ মানুষ কর দেয়। ২৩ লাখ মানুষের কর দিয়ে বাংলাদেশে এত বড় উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন বা অর্থায়ন করা সম্ভব নয়। যার ফলে বাজেট ঘাটতি থাকছে। অবশ্য বাজেট ঘাটতি খুব বাড়ছে না, এখনও জিডিপির ৪ শতাংশের আশেপাশে থাকে। ৬ শতাংশ বললেও সরকার

ব্যয় করতে পারে না দুটো কারণে। একটি হলো যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক সংস্থান নেই অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। দ্বিতীয়ত টাকা থাকলেও খরচ করার সক্ষমতা নেই।

দেশের শক্তির জায়গা ছিল বৈদেশিক লেনদেন কাঠামোতে, সেখানেও এখন বড় ধরনের ঘাটতি হয়েছে। চলতি হিসাবে গত মার্চে ঘাটতি ছিল ১২ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার। গত বছরও এ সময়ে প্রায় এক বিলিয়ন ডলারের মত উদ্ভূত ছিল। বৈদেশিক লেনদেনের ঘাটতি দাঁড়িয়েছে আড়াই বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ কখনও জিডিপির এক শতাংশের ওপরে উঠতে পারিনি। বৈদেশিক সাহায্য জিডিপির এক দশমিক ৭ শতাংশ। ৭ বিলিয়ন ডলার গত অর্থবছরে এসেছে, যার সবটাই শাস্যীয় নয়। সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়, বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ নিয়ে তুষ্টির অভাব নেই, সেই মজুদ গত ৫ মে নেমে এসেছে ৪২ বিলিয়ন ডলারে। এটি এখন পাঁচ মাসের আমদানির সমান। আমদানি মূল্য বেড়ে যাওয়ার কারণে মাসের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এর মানে ধাক্কা সহ্য করার জায়গা ক্ষীণ হয়ে আসছে। এর ফলে টাকার মূল্যমান ধরে রাখা যাচ্ছে না।

আমরা ক্রমান্বয়ে বহুপাক্ষিক উৎসের বদলে অনেক বেশি দ্বিপাক্ষিক উৎস থেকে আমাদের মেগা প্রকল্পগুলোতে, অবকাঠামো প্রকল্পগুলোতে অর্থায়নে যাচ্ছি। আগে বিশ্বব্যাংক বা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বা জাপান আমাদের অনেক বেশি রেয়াতি সুদে ঋণ দিতো। আজকাল এরাও উচ্চ সুদে ঋণ দিতে চাইছে। এর পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক সুদ্রে চীন এবং রাশিয়া থেকে অন্য সম্পূরক ঋণ নিচ্ছি, যেগুলোর সুদের হার অনেক বেশি। এই ঋণগুলো আমরা তখনই নিচ্ছি, যখন কিনা আমার পাইপলাইনে অর্থাৎ অব্যবহৃত শাস্যীয় বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার। সেই অর্থ আমরা ব্যবহার করতে পারছি না। তাহলে শেষে দাড়াচ্ছে যে, জাতীয় দায়দেনা জিডিপি বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হচ্ছে। দায়দেনা বৃদ্ধির হার যদি জিডিপি বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি থাকে তাহলে আগামী দিনে অবশ্যই জিডিপির অংশ দায়দেনা হিসেবে বাড়বে। দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে বৈদেশিক উৎসের চাপ ক্রমান্বয়ে বাড়বে। কারণ রেয়াতি সময়গুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে উচ্চমূল্যের ঋণের। তবে এ পরিস্থিতির সবচেয়ে দুর্বলতম জায়গা দাড়াচ্ছে অভ্যন্তরীণ ঋণ। অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রায়শই আমাদের দায়দেনা পরিস্থিতির সাথে মিলিয়ে দেখে আলোচনা করা হয় না। এটার ক্ষেত্রে বড় ধরনের ট্রেড অফ আছে। যত বেশি অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধে অর্থ খরচ হবে, তত বেশি উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগে অর্থ কম আসবে।

সরকারের নীতি ও আইন কী আছে

সরকার দায়দেনা ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন ধরনের নীতি প্রণয়ন করেছে। ২০১৭ সালে বৈদেশিক সহায়তার ক্ষেত্রে একটি জাতীয় নীতি তৈরি করে ইআরডি। এটি পরে হালনাগাদ করা হয়নি। সরকারি দায়দেনা ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি প্রতিবেদন তৈরি করে ২০০৮ সালে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জাতীয় সংসদে পাশ করা সরকারি অর্থ এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন। এর অধীনে তিন মাস পরপর অর্থমন্ত্রীর বাজেট বিবরণী বা আর্থিক বিবৃতি দেওয়ার কথা সংসদে। কিন্তু অর্থমন্ত্রী তা দেন না। এরপর ট্রেজারী

বভুলো কিতাবে ব্যবহার করা হবে, তার ওপর সরকার নীতি করেছে। ২০২১ সালে অর্থ বিভাগ দায়দেনার পরিস্থিতির ওপর তিনমাস অন্তর একটি বুলেটিন প্রকাশ করার উদ্যোগ নেয়। দুটো সংখ্যা বের হওয়ার পর আর বের হয়নি। পাবলিক ডেট অ্যাক্ট - গত সেপ্টেম্বর মাসে সংসদে গেছে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আইন। এই আইনটি ভালো করে প্রণিধান করা দরকার। অধ্যয়ন করা দরকার। এর বাইরে আমাদের উন্নয়ন সহযোগিতা মূল্যায়ন করে থাকে। আর্টিকেল ফোরের অধীনে আইএমএফের পক্ষ থেকে গত মে মাসে করা হয়েছে ডেট সাসটেইনেবিলিটি অ্যানালাইসিস। সেখানে বাংলাদেশ ভালোই আছে বলা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, যেসব নীতি কার্ঠামো তৈরি করা হয়েছে, সেগুলো আদৌ ব্যবহার করা হয় কি না। ঋণ এসব নীতিমালা অনুসরণ করে নেওয়া হয় কিনা এবং এসবের মাপকাটিতে ঋণগুলোকে মূল্যায়ন করে তারপর 'হ্যা' বলা হয় কি না।

পাঁচ ঝুঁকি

দায়দেনার ক্ষেত্রে পাঁচ ধরনের ঝুঁকি রয়েছে। একটি হলো বিনিময় হারের ঝুঁকি, অর্থাৎ যে বিনিময় হারে ঋণ নেওয়া হয়েছিল, তার চেয়ে টাকার মূল্য অবনমন হয়ে গেলে বেশি টাকা দিতে হবে যা বাড়ছে। আমাদের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ যেটা নিয়েছি এই সুদের হার বৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়ছে। বৈদেশিক ঋণের সুদের হারের ঝুঁকিও কিছুটা বাড়ছে, কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থায় আছে। কারণ ইউক্রেনের যুদ্ধ এবং বিশ্বে পণ্যমূল্য কি রকম হয়, তার সাথে মিলিয়ে বিদেশের ঋণের সুদ হার বাড়বে। আমেরিকান ফেড এবং যুক্তরাজ্য তাদের বেসিক ব্যাংক রেট মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাড়িয়েছে যার চাপ আমাদের এখানে আসবে। অন্যদিকে যেসব প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে, সেগুলোর কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থায়ন উচ্চ মূল্যে হচ্ছে, যা প্রকল্পে ব্যয় বৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়ছে। এর সাথে ইকোনোমিক রিটার্ন অর্থাৎ এসব প্রকল্পের আর্থিক সুবিধা থেকে ঋণ শোধ করা যাবে কিনা তার ঝুঁকি রয়েছে। এটা এখন যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্লেষণ করার জন্য তথ্য উপাত্ত নেই। যদিও কিছু প্রকল্পের অর্থমূল্য অনেক বেশি এবং কয়েকটির পরিশোধের সময় চলে এসেছে।

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা

রাজস্ব আয় বাড়ানোর মাধ্যমে আর্থিক খাতের সুসংহতকরণ করতে হবে। দায়দেনা পরিস্থিতি টেকসই রাখার জন্য আর্থিক সংহতকরণ হল সবচেয়ে বড় বিষয়। দ্বিতীয়ত হল যেসমস্ত বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্যের বিষয় আছে, সেই সূচকগুলোকে সুরক্ষা দিতে হবে; রেমিট্যান্স ঠিক রাখতে হবে এবং রপ্তানিকে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়াও বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়তে হবে। শেষ কথা হচ্ছে— অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গভাবে, স্বচ্ছভাবে এবং প্রতিনিয়ত দায়দেনা পরিস্থিতির একটা মূল্যায়ন রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের পক্ষ থেকে এ নিয়ে যে বুলেটিন চালু করা হয়েছিল, যা ছিল খুবই ভালো উদ্যোগ। এটি অব্যাহত রাখতে হবে।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন: বাংলাদেশ কি শ্রীলঙ্কার মতো হবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশের এখনকার যে পরিস্থিতি তাকে নিকট মেয়াদে শ্রীলঙ্কার মত হওয়ার কি আশংকা আছে কিনা আমি এটা দেখিনা। এই তুলনাটাও অযৌক্তিক বলে আমি মনে করি। এক দেশের সাথে অন্য দেশের তুলনা হয়না। কারণ একেকটা দেশ একেকভাবে বিকশিত হয়। বিবেচনার বিষয় হলো, শ্রীলংকা থেকে কী শিখলাম। শ্রীলংকা থেকে শিখলাম যে, শ্রীলংকা যে ধারটা নিয়েছে তার অনেকটাই হল ব্যক্তি খাতের ধার এবং সরকার বন্ড ছেড়ে ঋণ নিয়েছে। এক সময় আমাদের এখানে অনেক বেশি বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের কথা বলে সভরেন বন্ড ছাড়ার কথা বলা হয়েছিল। আমরা তার সমালোচনা করেছিলাম। আমরা এ বিষয়ে অনেক বেশি রক্ষণশীল ছিলাম। শ্রীলংকাতেও এরকম রক্ষণশীল লোক ছিল, যারা হ্যান্ডানটোটার (শ্রীলংকার বন্দর) নির্মাণের বিরুদ্ধে ছিল। তারা বিদেশে বন্ড দিয়ে টাকা তোলার বিরোধী ছিল। কিন্তু সরকারতো তাদের কথা শোনেনি। এবং সেই সময় এগুলোকে অপপ্রচার বা দেশ বিরোধী কথা বলা হয়েছে। সেই সময় যারা এই প্রাক্কলন করেছে, তাদেরকে লোকজন ভিন্নভাবে নিয়েছে।

প্রশ্ন: নির্বাচনের বছরের সঙ্গে দায়দেনা বৃদ্ধির যোগসূত্র কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশের দায়দেনা পরিস্থিতির ব্যাখ্যার জন্য নির্বাচনী চক্র অবশ্যই একটি সূচক হিসেবে আসছে। ঋণ গ্রহণের প্রবণতা নির্বাচনের আগের বছর অথবা নির্বাচনের বছর বা তার পরবর্তী বছর, এক কথায় নির্বাচনী চক্রকে কেন্দ্র করে দ্রুততর হচ্ছে। বাংলাদেশে নির্বাচনপূর্ব ও ঠিক নির্বাচন পরবর্তীকালে সাধারণত ঋণ গ্রহণের প্রবণতা বাড়ে। সরকারি তথ্য বলছে, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনের পরে এ ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে। শুধু যে দায়-দেনার পরিমাণনয়, একই সাথে বেড়েছে দেনা পরিশোধের খরচ। ব্যক্তি খাতের ঋণও ২০১৩ পরে খুবই দৃশ্যমানভাবে উর্ধ্বগামী হয়েছে এবং অব্যাহত থেকেছে। এখন দেখার বিষয় পরবর্তী নির্বাচনের আগে-পরে ঋণ গ্রহণের প্রবণতা কেমন থাকে।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভেতরে কোনো ধরনের ঘাটতি থাকলে সরকারের পক্ষ থেকে দৃশ্যমান অর্থনৈতিক প্রকল্প দিয়ে এক ধরনের সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়; গণতান্ত্রিক ঘাটতিকে পূরণ করার চেষ্টা করা হয়। সেই গণতান্ত্রিক ঘাটতিকে পূরণ করার চেষ্টা থেকে এমন ধরনের দৃশ্যমান প্রকল্পে যাওয়া হয়, যার অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিগ্রাহ্য এবং গ্রহণযোগ্য হয় না। নির্বাচনের আগে-পরে এসব প্রকল্প হয়। অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচনের আগে, নির্বাচনের বছরে বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারের পরিমাণও বাড়ে। বিশেষত গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনীতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থার সংকট কোনো সময় যদি হয়। আর্থিক লেনদেনগুলো অনেকটা বাজারের বিশ্বাসযোগ্যতা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা থেকে হয়।

প্রশ্ন: গত তিন বছরে ঋণ সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। নির্বাচনের সাথে সরকারের ঋণের সম্পর্ক আজকের উপস্থাপনায় দেখানো হয়েছে। এর কারণ কী? বলা হয়েছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গিয়ে এখনকার স্বস্তি থাকবে না। তাহলে কি আমরা ২০২৪-২৫ এ শ্রীলংকার মত পরিস্থিতি দেখবো বা হতে যাচ্ছে?

জাকির হোসেন: আইএমএফের সর্বশেষ ডেট সাসটেইনেবিলিটি অ্যানালাইসিসে ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের দায়দেনা বাংলাদেশের জিডিপির ৪১ দশমিক ৪ শতাংশ। আইএমএফ একইসাথে তাদের প্রাক্কলনে বলছে সীমার কম আছে, ঝুঁকি এখনও কম ইত্যাদি। আবার তারা বলছে দীর্ঘ মেয়াদে এটা আরও কমে আসবে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ সবুজ পরিস্থিতি থেকে হলুদের দিকে যাবে বলে কেন আশঙ্কা করছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দায়দেনা পরিস্থিতির বিশ্লেষণের জন্য যে ধরনের পূর্নাঙ্গ তথ্য উপাত্ত থাকা দরকার, সেটি নেই। আর যেগুলো আছে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে থাকে না। আর ধারাবাহিকভাবে থাকলেও পদ্ধতিগত পরিবর্তনগুলো পরিস্কারভাবে আসে না। এখানে তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। এখানে সংজ্ঞার ব্যাপার রয়েছে। যেমন আমরা জিডিপির শতাংশ নিয়ে আলোচনা করছি। এটা নির্ভর করে কোন জিডিপি ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০০৫-০৬ ভিত্তিবছরের জিডিপি ব্যবহার করা হচ্ছে, নাকি ২০১৫-১৬ ভিত্তিবছর। তিনি ২০০৫-০৬ বছরের জিডিপি ব্যবহার করেছেন তুলনীয় রাখার জন্য। জিডিপি নিয়ে যে প্রশ্ন এসেছে তার উত্তরে তিনি বলেন, জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারের সাথে যেসব নিয়ামক বা সূচক থাকে সেগুলো সঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছে না। ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ কম হচ্ছে কিন্তু জিডিপি বাড়ছে। রাষ্ট্রীয় খাতে যেটুকু বিনিয়োগ হচ্ছে তার তুলনায় অনেক বেশি জিডিপি হচ্ছে। পুঁজিপণ্যের আমদানি, মেয়াদি ঋণ, গ্যাস বা বিদ্যুতের ব্যবহার- এগুলো জিডিপি প্রবৃদ্ধির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছে না। সমাধান ছিল ত্রৈমাসিক জিডিপি মূল্যায়নের ব্যবস্থা সৃষ্টি করা। আইএমএফের পক্ষ থেকে ত্রৈমাসিক জিডিপি তৈরি করার ব্যাপারে বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাথে বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। আ অনেক ক্ষেত্রে সরকারে পক্ষ থেকে এক পা এগিয়ে দু'পা পিছায়। শ্রম জরিপ শুরু হয়েছিল। দু'টির পরে আর হয়নি। ঠিক একইরকমভাবে দায়দেনার বুলেটিন গত সেপ্টেম্বরে দুটো বের হলো, তারপর আর হচ্ছে না।

জিডিপির শতাংশের হিসাবে মূল্যায়নটি পরিপূর্ণ নয়। অর্থনীতিতে কোনোদিনই কোনো নীতি শুধুমাত্র একটি সূচকের ওপর ভিত্তি করে হয়নি। কারণ একটি সূচক আরেকটির সাথে যুক্ত। শুধু দায়দেনা পরিস্থিতি দেখলে হবে না। এর সাথে টাকার মূল্যমানের পতন, মূল্যস্ফীতি, চলতি হিসাবে ঘাটতি, পরিশোধ যোগ্যতাসহ আরো কিছু বিষয় মেলাতে হবে। তিনি বলেন, ২০২৪-২৫ অর্থবছর থেকে যে অস্বস্তি আসতে পারে, তার বড় কারণ হলো, উচ্চ মূল্যে নেওয়া ঋণের অনেকগুলোর পরিশোধের সময় উপনীত হচ্ছে। প্রথাগত দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এখন আরও বেশি উচ্চমূল্য চাইছে। এমন কিছু প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে, যেখানে সাশ্রয়ী মূল্যে প্রথাগত উৎস থেকে সেখানে অর্থায়ন করতে চাইছে না। পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য বিশ্বব্যাংক, এডিবি টাকা দেবে না। অন্যান্যদেক ব্যক্তি খাতের দায়দেনা পরিশোধের কিছু দায়িত্ব সরকার নিয়েছে। অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধ করার জন্য যে ধরনের

কর আহরণ হওয়া দরকার, তা কম হওয়ার ফলে অভ্যন্তরীণ উৎসের যে দায়দেনা আছে সেগুলো পরিশোধ করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে। ফলে উন্নয়ন বাজেট থেকে অর্থ কেটে নিয়ে এসে এখানে দিতে হচ্ছে। সামগ্রিক সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এসব লক্ষণ বড় বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। যেকোনো অর্থনীতির বিশ্লেষণে আজকে আছে কালকে নেই, এভাবে হয় না। এটা একটা ধারাবাহিকতার ভেতর দিয়ে হয়। সেটা যদি পর্যবেক্ষণে রাখা না হয়, যদি আমরা অস্থায়ীতার মনোভাবে থাকে, তাহলে কিন্তু দেশের পরিস্থিতি ওই রকম দাড়াই। সুতরাং জিডিপির কত শতাংশ হলে ভালো-মন্দ, এভাবে না দেখে সামগ্রিকভাবে দেখা উচিত।

এখন তো খুব পরিষ্কার যে এত বড় রিজার্ভ নিয়ে আমরা আত্মতুষ্টি পাই, সেই রিজার্ভের ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। অনানুষ্ঠানিক খাতে বিনিময় হারে প্রায় ৪ থেকে ৫ টাকা পার্থক্য হয়ে যাচ্ছে। যদি বিনিময় হারে চাপ থাকে, মূল্যস্ফীতি থাকে এবং বিনিময় হার অবনমন করতে হয়, তাহলে মূল্যস্ফীতি বাড়ার আশংকা আছে। এখন কথা হল এই মূল্যস্ফীতি সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের, নিম্নমধ্যবিত্তের ক্রয় ক্ষমতার ওপরে প্রভাব ফেলবে কি না। কারণ আমদানিকৃত যে পণ্যটি আসবে সেটা যদি খাদ্যপণ্য না হয়, যদি সয়াবিন তেল না হয়, যদি অন্যান্য জীবিকার প্রয়োজনের মৌলিক পণ্য না হয়, তাহলে অন্য ধরনের মানুষের ওপর পড়বে, যারা বেশি আমদানি নির্ভর পণ্যের ওপর নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে টিসিবিকে আপনি কত বেশি ব্যবহার করবেন এগুলো আপনাকে চিন্তা করতে হবে। কিন্তু যদি টাকার মূল্যমান ধরে রাখতে না পারেন আর যদি মূল্যস্ফীতি বাড়ে, তাহলে অবধারিতভাবে আপনাকে সুদের হার বাড়াতে হবে। বাংলাদেশে সুদের হার বাড়ানোর পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে আসছে। সুদের হার কিছুটা বেড়েছে বিশেষত আমানতের ক্ষেত্রে। কিন্তু ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে এখনও বাড়েনি। এটা আজ হোক কাল হোক বাড়াতে হবে। এটার জন্য যে যুক্তি বলা হয় যে, এর জন্য বিনিয়োগ ব্যয় বহুল হবে। এটা ভ্রান্ত যুক্তি। কারণ বাংলাদেশে সুদের হারের কারণে বিনিয়োগ হয় না। কারণ সুদের হার গত দুই তিন বছর তো ৯ শতাংশে রাখা হয়েছে। তাতে কি ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বেড়েছে? জিডিপির ওই ২৩ শতাংশের ভেতরই আটকে আছে। সুদের হার কমানোর ফলে যদি ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ না বাড়ে, তাহলে চিন্তা করতে হবে আসলে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ কেন বাড়ে না। সুদের হারের সহজ সমাধানে না যেয়ে অন্যান্য সংস্কারের বিষয়গুলো আসতে হবে। ব্যবসায়িক পরিবেশের ক্ষেত্রে যেসমস্ত অন্যান্য অংশ থেকে খরচ বাড়ে সেগুলো চিন্তা করতে হবে। অবকাঠামোর দক্ষতা লাগবে। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে সীমিত আয়ের মানুষের জন্য, যারা অবসরে আছে তাদের জন্য প্রণোদনা দিতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে এটা অপটিমাম নয়। সর্বসঙ্গীভাবে সঠিক নয়। অন্য ধরনের সামাজিক সুরক্ষা এবং অন্যান্য আর্থিক ব্যবস্থাপনায় যেত হবে।

এইচ এম মোর্তজা: আমদানি পরিস্থিতি এবং রিজার্ভ যে হারে কমে যাচ্ছে তো এখন যেরকম আমদানি পরিস্থিতি আছে সেটা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে ২০২৪ সাল পর্যন্ত এই রিজার্ভ দিয়ে স্বস্তিতে থাকা যাবে কিনা?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: মুদ্রার অবমূল্যায়ন হলে, চলতি হিসাবে ঘাটতি বাড়লে এবং সামগ্রিক লেনদেন বড় অংকের ঋণাত্মক থাকলে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। এর প্রভাব মূল্যস্ফীতির ওপর পড়বে। এটা চক্রাকারে কাজ করে। তিনি বলেন, প্রথম বিষয় হলো সংহতকরণ দ্বিতীয়টা হলো সুরক্ষা। তবে সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার জন্য যে ধরনের নীতি নেতৃত্ব, যে ধরনের সমন্বয়, যে ধরনের উদ্যোগ, যে ধরনের তথ্য দরকার, সেখানে বড় ঘাটতি আছে।

হুমায়ুন কবির: জিডিপির কত শতাংশ দায়দেনা?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এই হিসাবটা নম্বরের চেয়ে অনেক বেশি কনসেপচুয়াল। আমরা যখন দায়দেনার কথা বলি প্রায়শ শুধুমাত্র বৈদেশিক দায়দেনা বলি। সেটাও যখন বলি তখন ব্যক্তি খাতের দায়দেনা বলিনা। অভ্যন্তরীণ উৎসের দায়দেনার কথা বলি না। অভ্যন্তরীণ উৎসের সরকারি দায়দেনা যখন বলি তখন কনটিনজেন্ট লায়বেলিটির কথা বলি না। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে ব্রডার সিস্টেমে প্রকৃত পূর্নাঙ্গ পরিমিতিটা আরও ৪/৫ শতাংশ বেশি হবে আরকি। এটাই বলতে চেয়েছি। ৪৪ না ৩৪ সেটা পয়েন্ট না। পয়েন্ট হল যে অনেকগুলো এলিমেন্ট নেই। আইএমএফও যে ডেট সাসটেইনেবিলিটি অ্যানালাইসিস করে তার ভেতরও বেসরকারি খাতের ঋণ থাকে না। অভ্যন্তরীণ ঋণের হিসাবটাও থাকে না ঠিকমতো। এখানে খেয়াল রাখতে হবে কোন জিডিপি ব্যবহার করে হিসাব করা হচ্ছে। আজকাল দুই জিডিপির দুটি হিসাব চলছে। তিনি জিডিপির ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬ ব্যবহার করেছেন। কারণ পুরানো টাইম সিরিজ ২০১৫-১৬ ভিত্তি বছরের মধ্যে নেই।

ফরহাদ হোসেন: গত এক দশক বা আধা দশকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ক্রটি থেকেই কি এই অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: যদি গণতন্ত্রে ঘাটতি থাকে তাহলে অনেক ক্ষেত্রে বৈদেশিক অর্থায়নে সঠিক চয়ন হয় না, যাকে বলে বিরূপ চয়ন। ইংরেজিতে যাকে বলে 'অ্যাডভার্স সিলেকশন'। নির্বাচনের আগে পরে যে বড় ধরনের ঋণ নেওয়ার প্রবণতার কারণের সাথে এটি সম্পর্কিত।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সাথে গণমাধ্যমকর্মীদের ভার্চুয়াল আলাপচারিতার অংশবিশেষ
৯ মে ২০২২

অর্থনীতিকে আরেকটু পূর্ণাঙ্গভাবে এবং সততার সাথে বিশ্লেষণ করতে হবে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

মতিউর রহমান চৌধুরী: দর্শকমন্ডলী, আমাদের সাথে রয়েছেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, অর্থনীতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন যিনি। যেহেতু আপনি আজকেই গণমাধ্যমের শিরোনাম হয়েছেন তো সেটা নিয়েই আপাতত আলোচনা করবো। এদিকে শ্রীলঙ্কাপরিস্থিতি আছে আবার বাণিজ্যমন্ত্রী খুব আক্ষেপ করে বলেছেন আবার যে আমি ভুল করেছি ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস করে। এ তিনটা বিষয় মূলত আলোচনায় থাকবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ডাকার জন্য ধন্যবাদ মতিউর ভাই।

মতিউর রহমান চৌধুরী: শুরুতেই বলব আপনি বাংলাদেশের অর্থনীতি তিন বছরে কী হবে এটা একটা রূপরেখার মধ্যে নিয়েছেন, আর তিন বছর পরে বাংলাদেশের পরিস্থিতিটা পাল্টে যেতে পারে কারণ যে ঋণ আমরা নিয়েছি সে ঋণের একটা মূল্য হয়ত আমাদের দিতে হতে পারে। আপনি তুলনা করেছেন আন্তর্জাতিক ঋণ অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে ঋণ আনা এবং দ্বিপাক্ষীয় যে ঋণ, কয়েকটা দেশের নামও বলেছেন। তো এই অবস্থায় আপনি কেন এ বিশ্লেষণটা করলেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ আপনাকে মতিউর ভাই এবং আমি আজকের যে মিডিয়ার কর্মীদের সাথে আলাপচারিতা করেছি এটা মূলত বাংলাদেশের বর্তমান যে অর্থনৈতিক বা দায়-দেনার পরিস্থিতি এটা কেমন হতে পারে এবং এটার প্রবণতাটা কী হতে পারে, এর থেকে সুরক্ষা পাওয়ার পদ্ধতিটা কী এ নিয়ে আগাম কিছু আলোচনা এখানে হয়েছে। এ আলোচনাটা আমি করেছি এ জন্য যে সাম্প্রতিককালে শ্রীলঙ্কাকে ঘিরে আমাদের বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে। আসলে আলোচনা বলতে শুরু শ্রীলঙ্কা না, পাকিস্তান আর এখানে বসে আপনাকে কয়েক বার নেপালের কথা বলেছি। এর পাশাপাশি ঘানা, জিম্বাবুয়ে বিভিন্ন দেশে এ দায়-দেনার কারণে অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে এবং সে সংকট রাজনৈতিক

স্থিতিশীলতাকে বিঘ্নিত করেছে এবং সে পরিস্থিতি অনেক দেশেই ভালো হয়নি। এর ফলে অনেক দেশেরই সাফল্য বা অর্জন অনেক ক্ষেত্রে হুমকির মুখে পড়ে গিয়েছে।

মতিউর রহমান চৌধুরী: কয়েক বছর আগে কিন্তু আপনি এই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: মন্দ কথা বলে এর মধ্যে আনন্দ হওয়ার কিছু নেই আমার। আমরা তীর্থক কথা বলে থাকি, সমালোচনার কথা বলে থাকি এই নীতি নির্ধারকরা এগুলো বিবেচনায় নিয়ে তা সংশোধন করে আমরা আগাবো কিন্তু বাংলাদেশের সমস্যা হচ্ছে আমরা সবসময় অস্বীকারে থাকি এবং এসব কথা বললে পরে এমন সমস্ত রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দেয়া হয় যেখানে আমাদের মত পেশাজীবীরা আর আলোচনায় থাকতে পারে না আর কী অনেক সময়। যাই হোক, এখন বাংলাদেশের দায়-দেনা পরিস্থিতিটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বিবিধ কারণে। কারণ সাম্প্রতিককালে আমরা যে সমস্ত ঋণ নিয়ে বা যেসব প্রকল্প নিয়েছি তা থেকে আয় দিয়ে এগুলোকে পরিশোধের ব্যাপারে এবং টাকার বিনিময় হার, মূল্যস্ফীতি, আমাদের চলতি হিসাবে একটা বড় ধরনের ঘাটতি, বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি ইত্যাদি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে আমার মনের মধ্যে একটা শঙ্কা এসেছিল যে এটা বোধহয় এখন মনোযোগে নিয়ে আসা দরকার। সেই আকাজক্ষা থেকেই এটা করা। তো সেটার ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সাম্প্রতিককালে, গত তিন বছরেও ঋণ নেয়ার হার অত্যন্ত বেশি, উচ্চ ছিল এবং এই ঋণের ক্ষেত্রে কতগুলো বড় ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে। পরিবর্তন হচ্ছে আগে আমরা শাস্ত্রীয় মূল্য এবং সুদে বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান থেকে নিতাম সেখানে এখন আমাদের দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন আলোচনায় যেতে হচ্ছে।

বাংলাদেশ স্বল্প আয়ের দেশের তালিকা থেকে বের হয়েছে, মধ্য আয়ের দেশ হবে। সব চেয়ে বড় কথা আমরা নিম্ন মধ্যবিত্ত আয়ের দেশ হলে আগের মত আর শাস্ত্রীয় ঋণ পাচ্ছি না, অনুদানের পরিমাণ কমে যাচ্ছে এবং এর সাথে সাথে যেটা দাঁড়িয়েছে সেটা হলো আমরা এমন কিছু প্রকল্প নিচ্ছি সেখানে শাস্ত্রীয় ঋণ কেউ কোনোদিন দিবে না। ধরেন আপনি একটি পারমাণবিক কেন্দ্র স্থাপন করবেন। বিশ্বের কোন্ প্রতিষ্ঠান আপনাকে পারমাণবিক কেন্দ্রের জন্য শাস্ত্রীয় ঋণ দিবে? কেউ যেহেতু দেয়নি তাই আপনাকে বেশি সুদে অন্যান্য দেশ থেকে নিতে হয়েছে, রাশিয়া থেকে নিয়েছেন। এগুলো কি সময়ে পরিশোধ করবেন, কীভাবে করবেন এ ব্যাপারেও যে সবসময় সচেতনতা থাকে তা না। ধরুন আমরা বলি আমরা নিজের টাকায় পদ্মা সেতু তৈরি করেছি কিন্তু এখানেও কিন্তু চীনা ২/৫ বিলিয়ন সাপ্লাইয়ারস ক্রেডিট আছে। সাপ্লায়ার ক্রেডিট হলো এখানে যে ঠিকাদার সেই টাকা নিয়ে আসছে। অর্থাৎ এটাকে কোনো প্রতিযোগিতাপূর্ণ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে বাছাই করে নেননি। পদ্মা রেলসেতু করার জন্য যা নিয়েছেন তাও বেশি মূল্যে স্বল্প সময়ে। এখানে যে শুধু সুদের হার বাড়ছে তা না, যে সময়টাতে রেয়াতের সময় থাকে প্রথম পাঁচ বছর আপনি দিবেন না বা প্রথম দশ বছর আপনি দিবেন না তারপর ত্রিশ বছরে আপনি দিবেন। এখন বিশ বছর কমতে কমতে পাঁচ বছর হয়ে যাচ্ছে, এর শোধ করার সময় কমতে কমতে ত্রিশটা কমে দশ হয়ে যাচ্ছে।

আমি যদি বিভিন্ন প্রকল্পের সময় দেখি তাতে দেখছি যে অনেক বড় বড় প্রকল্পের পরিশোধের সময় শুরু হবে এবং এর আগে আমরা সাশ্রয়ীভাবে যে ঋণগুলো নিয়েছিলাম সেগুলো হবে। সমস্যাটা আরো আছে। সমস্যাটা হলো আমরা শুধু বিদেশের ঋণ নিয়ে চিন্তা করি। আসলে বাংলাদেশে এখন অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ অনেক বেশি। আমার যে ঋণ আছে তার ৫৪-৫৬ শতাংশ হলো ভেতরের থেকে। অর্থাৎ আমি সঞ্চয়পত্র বিক্রি করেছি, বিভিন্ন ব্যাংকিং খাত থেকে নিয়েছি, আমি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নিয়েছি। আর এই ঋণ এবং বিদেশী ঋণ শোধ করতে যেয়ে আমার রাজস্ব বাজেটের ২৭ শতাংশ এখানেই চলে যাচ্ছে। রাজস্ব বাজেটের ২৭ শতাংশ এখানে, এবার তো ভর্তুকি বাড়ছে ৩০ শতাংশ এখানে, আর আমাদের সরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতা। এটাতাই তো আমাদের রাজস্ব আয়ের ৮০ শতাংশ চলে গেলো। তাহলে আপনার হাতে কতটুকু থাকলো এ বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে অন্য কোনো বিনিয়োগ করার জন্য আর কোনো অর্থ আপনার থাকছে না। তাহলে আপনার সেক্ষেত্রে অবশ্যই ঋণ নিতে হচ্ছে। আবার ঋণের পরিমাণ ৪-৫ শতাংশের বেশি যে হচ্ছে না বাজেট ঘাটতিটা এটার কারণ হলো বাংলাদেশের টাকা যদি থাকেও সেটা খরচ করার সক্ষমতা নাই। এর জন্য যে দক্ষ প্রশাসন আর গবেষণা সেটাও আমার এ মুহূর্তে নাই। সেহেতু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চাপ এখন বিভিন্ন দিক থেকে আছে। এর সাথে আপনারা দেখবেন যে মূল্যস্ফীতি, মানুষের পণ্যমূল্য যেভাবে বাড়ছে এবং শুধুমাত্র বিদেশের জিনিসের দাম বেড়েছে এ ব্যাখ্যা দিয়ে আপনি দেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন না।

আমাদের দেশের ভেতরে যে সমস্ত পণ্য আমরা বিক্রি করি এগুলো বিদেশে যে দামে আমরা বিক্রি করি তার চেয়ে অনেক বেশি। তার মানে হলো বাজার ব্যবস্থাপনাতে আপনার কোনো না কোনো সংকট আছে। বাণিজ্য মন্ত্রী উনি সুশীল ব্যক্তি একজন কারণ উনি জনগণের কথা চিন্তা করেন। কিন্তু দেখেন বিশ্বাসটা তো অর্থনীতি পরিচালনা করার জন্য একটি মাধ্যম হতে পারেনা। অর্থনীতি পরিচালনা করার জন্য কিছু জিনিস থাকে তার একটি মাধ্যম হলো তথ্য উপাত্ত। অর্থাৎ বাজারের ভেতরে আমার সরবরাহ এবং চাহিদার যে হিসাব সে হিসাব যদি ঠিক না থাকে তাহলে তেল আপনি যতই আনেন না কেন বাজার আপনাকে এটাকে সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করতে দিবে না। কিছু লোক এটা থেকে মুনাফা করার জন্য সদা তৎপর থাকবে। এটা ধরে নিয়েই আপনাকে কাজ করতে হবে। তো এটার জন্য ব্যবস্থাপনার জন্য আপনার লোক লাগবে। বিদেশী পণ্যমূল্য বৃদ্ধি কিন্তু এখনো ঢাকাতে এসে আঘাত দেয়নি, এখনো যেগুলো চলছে এগুলো পুরানো হিসেবেই চলছে। এর সাথে যেটা আমার যুক্ত হবে সেটা হলো বিদেশের যে লেনদেন সে লেনদেনের ঘাটতি ক্রমাশয়ে বাড়ছে। চিন্তা করে দেখুন এক বছর আগে যদি পাঁচ বিলিয়ন ডলার বাড়তি হিসেবে থাকতো চলতি হিসেবে যেখানে মূলধন বা অন্যান্য হিসাব থাকে, এখন এটা দশ বিলিয়ন ডলার ঘাটতিতে চলে গেছে। এই যে ঘাটতি এটা তো টাকাকে দুর্বল করে দিল। টাকাকে দুর্বল করা থেকে আটকাতে বাজারে ডলার ছাড়তে হয় যাতে টাকার পতন না হয় এবং ডলারের সাথে হিসাবটা ঠিক থাকে।

মতিউর রহমান চৌধুরী: এটা কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছেড়েছে বোধহয়।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: কিন্তু এই যে আমাদের মজুদ নিয়ে এত পরিতৃপ্তি এখন তো পাঁচ মাসের মজুদ নাই। এখন যে মজুদ আছে ৪৩ বিলিয়ন ডলারের কথা বলা হয় এটা দিয়ে কিন্তু পাঁচ মাসে আমাদের আমদানির টাকা নাই। এটা আবার তাও ঠিক হয়েছে ইদের সময় কিছু রেমিট্যান্স এসেছে দেখে। কিন্তু আগামীতে যদি রেমিট্যান্স কম হয়, যেহেতু রপ্তানি বাড়ছে সে হারে বাড়ছে আমদানি। রপ্তানির ভেতরে যে সমস্ত তুলা, সুতা ইত্যাদি থাকে এগুলোর দাম বেড়েছে যার ফলে বাণিজ্য ঘাটতি বাড়ছে। এটা হলে পরে আপনার টাকার উপর চাপ পড়বে এবং টাকা সেক্ষেত্রে দুর্বল হলে পড়ে আমদানি করা পণ্যের দাম যদি বাড়ে আরো তাহলে মূল্যক্ষীতির উপর আবার চাপ আসবে। এর সাথে যেটা যুক্ত হয়েছে সেটা হলো পৃথিবীর অনেক দেশেই এগুলোকে মোকাবিলা করার জন্য সুদ বাড়ছে এবং আগে যে একটা সম্প্রসারণমূলক আর্থিক খাত ছিল অনেক প্রণোদনা দেয়া হয়েছে ইত্যাদি এগুলো তারা টাইট করার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশে কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত সুদের হার বাড়ানি না। আমাদের ধারণা বিনিয়োগ এটাতে নষ্ট হবে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস বলে আপনি গত কয়েক বছর যে নয়-ছয় রেখেছেন। নয়-ছয় করেছেন বলিনি কিন্তু। নিয়ে আপনি করেছেন এবং ছয়ে আপনি রাখবেন। ছয় শতাংশ যদি মূল্যক্ষীতি থাকে তাহলে টাকা আপনার ব্যাংকে রেখে ওখানে টাকা আপনার ক্রমাঙ্কণে কমে যাচ্ছে। এটাতে তো সঞ্চয়ের হারে গরীব মানুষের, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত কারো উপকার হয়না। আবার অন্যদিকে আপনি উপরেরটা বাড়িয়েছেন না বিনিয়োগ কমাতে ভয়ে। কিন্তু ইতিহাস বলে সুদের হার কমিয়ে আপনি বিনিয়োগ বাড়ানো পারবেন না। গত কয়েক বছরে কিন্তু সুদের হার কমিয়েও আপনার কিন্তু বিনিয়োগ বাড়েনি।

আপনাকে আমি সহজ কথা বলি যে অর্থনীতি একটা চাপের মধ্যে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এবার যে বাজেটটা আসতে যাচ্ছে তা একটি জটিল অর্থনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আছে। এটা থেকে শিক্ষাটা হলো এই যে আপনি শ্রীলঙ্কার কথা বলেছেন যে অর্থনৈতিক সুশাসন যদি ঠিকমত না থাকে রাষ্ট্রীয় এবং বাজার ব্যবস্থাপনায় তাহলে অবধারিত ভাবে এটি একটি রাজনৈতিক সংকটে উত্তরণ হয়। এ ঘটনা নেপালেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, এ ঘটনা জিম্বাবুয়েতে দেখেছি আমরা, সুদানে দেখেছি, ঘানাতে দেখেছি, গ্রীসে দেখেছি, আর্জেন্টিনাতে দেখেছি। সুতরাং বাংলাদেশ যদি এ গ্রহের দেশ হয় তাহলে এগুলো সবই তার জন্য প্রযোজ্য। আমার দুঃখটা হলো এই যে নীতি নির্ধারকদের ভেতরে এটার ব্যাপারে আগ্রহ অনেক কম। যদিও সাম্প্রতিককালে প্রধানমন্ত্রী এটা বুঝতে চেয়েছেন, জানতে চেয়েছেন। বলেছেন যে ঋণ নেয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে, বা অন্যান্য জিনিসগুলো বলছেন। কিন্তু আমরা এ মূর্ত্তে সামষ্টিক ব্যবস্থাপনায় যে চাঞ্চল্য দরকার পড়ে, প্রতিদিন এটা নিয়ে যে নীতিগত নেতৃত্ব দিতে হয়, সকলকে সমন্বয় করতে হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, অর্থমন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। কেমন জানি এ শব্দটা উচ্চারণ করতে আমার কষ্ট হচ্ছে যে আমরা সামষ্টিক অর্থনীতিকে একটা অটো-পাইলটে দিয়ে দিয়েছি। এখানে যে পাইলট আছে যে এটার বামেলা সামলিয়ে আমার বিমানটাকে যে অবতরণ করাবে সেটার ক্ষেত্রে কেন যেন সংশয় দেখা দিচ্ছে।

মতিউর রহমান চৌধুরী: আজ এ পর্যন্তই থাক। আপনি জানেন যে শ্রীলঙ্কা পরিস্থিতি, ইতিমধ্যে প্রাইম মিনিস্টার পদত্যাগ করেছেন, তার ছেলে এবং ছেলের বউ দেশ ছেড়েছেন, সারাদেশে কারফিউ জারি করা হয়েছে, এমপি মন্ত্রীর গাড়িতে হামলা হচ্ছে, বাড়িতে হামলা হচ্ছে। এই যে রাজনৈতিক বাস্তবতা এটা অর্থনীতির সাথেও সম্পর্কিত যেটা আপনি বললেন সেটা কীভাবে দেখছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি আপনার এ অনুষ্ঠানে বসে বলে গেছি যে অর্থনৈতিক সুশাসন না থাকলে, রাজনৈতিক সুশাসন এর যে অভাব এটা ঘাটতিতে পরিণত হতে পারে এবং সংকট সৃষ্টি করে। আবার রাজনীতির ভেতর যদি জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ইত্যাদি না থাকে তাহলে কোনো অবস্থাতেই আপনি অর্থনীতি পরিচালনা করতে পারবেন না, প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করবে না। এটা একে অপরের সাথে সংযুক্ত এবং শ্রীলঙ্কাসেটারই উদাহরণ যে কেমন করে অর্থনৈতিক সমস্যা রাজনৈতিক সমস্যায় পরিণত হলো। কিন্তু দুই-এক বছর আগেও রাজা পাকসের পরিবার এটা মনে করেনি। উনাদের অবশ্য রাজনীতির সাথে সাথে পরিবারতন্ত্র একটি বড় বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমি শ্রীলঙ্কাকে জানি, যেটুকু বুঝি আমার বন্ধু-বান্ধব, গবেষণা আছে, শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী আছে। এটা ব্রিটিশ আমল থেকেই সেখান থেকে আসা তাদের শিক্ষা, আচরণ ইত্যাদির ভিত্তিতে। দেখেন যখন ওখানে জাতিগত দাঙ্গা চলছিল তামিলদের সাথে তখনও তারা নির্বাচন করেছে যদিও মানব অধিকারে লঙ্ঘনের একটা বড় বিষয় এখনো অভিযোগ রয়ে গেছে রাজা পাকসে এবং তার সরকারের প্রতি। সেহেতু আমি মনে করি খুব দ্রুতই এই নির্বাচনের জন্য শ্রীলঙ্কা আগাবে এবং শ্রীলঙ্কানির্বাচনের ভেতর দিয়ে একটা গণতান্ত্রিক পন্থায় একটি জাতীয় পুনরুদ্ধার কর্মসূচিতে যাবে। জাতীয় পুনরুদ্ধার কর্মসূচি সামগ্রিকভাবে সকলের সমর্থন নিয়ে, সামগ্রিকভাবে আলোচনা করে।

মতিউর রহমান চৌধুরী: এটা জাতীয় সরকার হতে পারে বোধহয়।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: জাতীয় সরকারের সমস্যাটা এর আগে পর্যন্ত যেটা ছিল বিরোধীদের তো প্রধানমন্ত্রী হতে বলেছিল কিন্তু তারা তো ওখানে যাননি। এখন নতুন ভাবে প্রধান বিচারপতি, স্পিকার, অন্যান্য, তাদের ওখানে জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদ তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে একটা সমাধানে যাবে। এটা শ্রীলঙ্কাতে হবে বলে আমরা মনে করি। তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি হয়ত এটা নিবে যেভাবে তারা বোঝে একটা জাতীয় পুনরুদ্ধার কর্মসূচি ছাড়া এবং সেখানে যৌক্তিক নেতৃত্ব ছাড়া তারা এখন থেকে বের হতে পারবেনা। যদি তারা এখনো যায়, তাহলে তারা বছর তিনেকের মধ্যে বের হয়ে যাবে বলে আমি ধারণা করি। তবে যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা একটা বৈরী, বৈশ্বিক পরিবেশের মধ্যে আছি।

মতিউর রহমান চৌধুরী: ইউক্রেনের যুদ্ধটাও বোধহয় ...

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: যুদ্ধ এটা একটা স্থায়ী ক্ষত-এর ভেতরে আছে। আগামী দিনের বিশ্ব এটাকে কীভাবে মোকাবিলা করবে, যুদ্ধ যদি শান্তি চুক্তিও হয় বৈশ্বিক ব্যবস্থাপনা এটা নিয়ে কি হবে

সেটাও জানিনা। বাংলাদেশ এ মুহূর্তে নিরপেক্ষতার যে জায়গাটা আছে সেটাতে সুবিধাও আছে, অসুবিধাও আছে। আগামী দিনে এ সুবিধা-অসুবিধার টানাপোড়নের ভেতরে ঢুকবে। পাকিস্তান থেকে তার শিক্ষা নিতে হবে কী হয়েছে, একই ভাবে নেপাল থেকেও শিক্ষা নিতে হবে যে কীভাবে নেপাল সেখানে এগিয়ে যাচ্ছে আপনার রাজনৈতিকভাবে। চীন বা ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্রিমুখী চাপের মধ্যে কীভাবে আছে।

মতিউর রহমান চৌধুরী: চীন, নেপাল বা পাকিস্তানের পরিস্থিতিতে চীনের ভূমিকাটা কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: শ্রীলঙ্কার বর্তমান পরিস্থিতি এক অর্থে চীনের নীতির পরাজয় হিসেবেই অনেকে দেখবে। কারণ এ মুহূর্তে যে ঋণের এবং অন্যান্য আর্থিক অসুবিধাগুলো সৃষ্টি হয়েছে এটা আসলে শুধু যে চীনের ঋণের জন্য হয়েছে তা না, এটা হয়েছে কোভিডের কারণে তাদের বৈদেশিক আয় কমে গেছে, এটা হয়েছে কারণ তারা বিদেশ থেকে যে টাকাটা নিয়েছিল সে টাকাটাতে সুদের হারের টাকার পতন হয়েছে এবং এটা জটিল একটা জিনিস। কিন্তু এ মুহূর্তে চীন একটু দ্বিধাগ্রস্ত হবে সেক্ষেত্রে। তবে তার অর্থ এই নয় যে ভারত এটাতে আগাতে পারবে। এরকম ঘটনা আমরা মালদ্বীপে দেখতে পাবো, মালদ্বীপে এ ধরনের ঘটনা সামনে হবে বলে আমার ধারণা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনীতি থেকে অর্থনীতিতে যাবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থনীতি থেকে রাজনীতিতে যাবে। কিন্তু রাজনৈতিক অর্থনীতিতে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে বলে আমার মনে হয় না।

মতিউর রহমান চৌধুরী: এ ধরনের পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের কি করণীয় আছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশের প্রথম যে আমি মনে করি তা হলো অত্যন্ত সততার সাথে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিটাকে বিচার বিশ্লেষণ করা। এ মুহূর্তে অর্থনৈতিক বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ কী হচ্ছে এটা আমাদের কাছে খুব একটা পরিষ্কার না। কারণ সবাই একটা মন জোগানোর ভাবের মধ্যে থাকে, অস্বীকারের মনোভাবের মধ্যে সেটার ভিত্তিতে বাস্তবসম্মতভাবে একটা আলোচনা করা উচিত। আমি মনে করি মুক্তভাবে পরামর্শ করা উচিত, স্বাধীন মতামতগুলোকে জায়গা দেয়া উচিত। কারণ এটার ফলে সরকারই উপকৃত হবে। কারণ সরকার তো চায়না যে এই ডামাডালের ভেতরে পড়ে একটা রাজনৈতিক সংকট বা রাজনৈতিক উত্তেজনার ভেতরে চলে যাক। এটা যদি সরকার না চায় তাহলে অর্থনীতিকে আরেকটু সুষ্ঠুভাবে, নিরপেক্ষভাবে সততার সাথে বিশ্লেষণ করতে হবে, তথ্য উপাত্তগুলোকে সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে। যেমন আমি আজকের আলোচনায় বলেছি সরকার যে দায়-দেনা বলে তারপরেও হয়তো আড়াই বিলিয়ন ডলার বাইরোড হয়ে যাচ্ছে।

সরকারের সংযুক্ত দায়-দেনাগুলো রয়েছে এ বিপিসি থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য জায়গার ভেতর রয়েছে। সরকার অনেকগুলো পিপিপিতে গ্যারান্টি দিয়েছে যে যদি খেলাপি হয় তাহলে আমি নিয়ে নিব। সেই দায়-দেনা কিন্তু তার হিসাবের ভেতরে রয়েছে। আইএমএফের তদারকিতেও এগুলো ধরা পড়েছে। কিন্তু এ সমস্ত বিষয়গুলো সততার সাথে নেতৃত্বের মাধ্যমে উপস্থাপন করা উচিত। আমি আপনাকে এখানে বসে আরেকবার বলছি সেটা হলো আমার

কাছে আশ্চর্য লাগে যে আমাদের সংসদ সদস্য যারা অর্থ বিষয়ক স্থায়ী বিভাগের সদস্য তারা এ ব্যাপারে কোনো ভূমিকা এখানে রাখছে না। আমরা যে বলি আমরা নির্ভর। এই নির্ভর তো দোষের কারণে হচ্ছে, কোনো গুণের কারণে তো হচ্ছে না।

মতিউর রহমান চৌধুরী: মানে রাজনীতিক ব্যক্তির দায়িত্ব নিচ্ছেন না?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: না, আমি তো কোথাও দেখিনা। এটা তো সংসদে আলোচনা হচ্ছে না, সংসদের স্থায়ী কমিটিতে হচ্ছে না, অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটি তো কয়েক মাসে অন্তত একবার বসার কথা, গত তিন বছরে তারা পাঁচবার বসেছে কিনা আমি আপনাকে সেটা জিজ্ঞাসা করতে চাই। বসলে তো আমরা জানতাম। উনারা বসেননি হয় উনারা তাদের কোনো ভূমিকা দেখেন না, অথবা উনারা এ বিষয়গুলো নিয়ে অতটা চঞ্চল না, অথবা তাদের সে অর্থে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে এটাকে চালু করা হয়নি। সুতরাং আমি জনপ্রতিনিধিদের কোনো ভূমিকা এখানে দেখছি না এবং এটা আমার কাছে আরো অস্বস্তি লাগছে। আপনি লক্ষ্য করে দেখেন যদি কোনো কারণে কোনো উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, সবচেয়ে বেশি কিন্তু আক্রান্ত হবেন জনপ্রতিনিধিরা, রাজনীতিবিদরা। আমরাও না, সরকারি কর্মচারীও না। উনারা তখন প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে থাকবেন। কিন্তু রাজনীতিবিদদের কিন্তু জনগণের মুখোমুখি হতে হবে। আমার কাছে রাজনীতিবিদদের এরকমের নিঃস্পৃহ ভাব এবং এটা সম্পর্কে কোনো আলাপ-আলোচনার অভাব দলের ভেতরে এবং দলের বাইরে এটা আমার কাছে খুব আশ্চর্য লাগে। এটা তো রাজনীতিবিদদের ধ্রুপদী চরিত্রের সাথে মিলে না।

মতিউর রহমান চৌধুরী: শেষ বিবেচনায় তাহলে কী দাঁড়াল?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: শেষ বিবেচনায় নাগরিকদের কণ্ঠস্বর ব্যতিরেকে আমি কিছু দেখিনা এ মুহূর্তে এবং নাগরিকদের সাথে কণ্ঠস্বর যখন উচ্চারিত হয় তা যে কত শক্তিশালী হতে পারে এবং সে নাগরিকদের সাথে যদি মিডিয়া যুক্ত হয়, ব্যক্তিখাত যুক্ত হয় তাহলে এটা বড় হয়। সাম্প্রতিককালে আমরা তেঁতুলতলার ঘটনায় দেখেছি যে নাগরিক শক্তির প্রকাশ, নাগরিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, রাজনৈতিক শক্তির ও প্রকাশ। এখন সাম্প্রতিককালে কী করতে পারে আমাদের গণমাধ্যম সেটা আমরা তো রেলের টিকিটের ঘটনাতেই দেখতে পেলাম। যদি গণমাধ্যম জনসচেতনতা সৃষ্টি করে এই টিকিট কাটা না কাটাটাকে নিয়ে না আসতো তাহলে কিন্তু এ পরিবর্তন আসতো না। এ পরিবর্তনগুলো যখন দেখি তখন কিন্তু একটা আশা জাগে বাংলাদেশকে নিয়ে। যে বাংলাদেশের অন্তর্নিহিত শক্তি হলো নাগরিক, জনগণ এবং তাদের সম্মিলিত চেষ্টায় আমার ধারণা আমরা মোকাবিলা করবো।

মতিউর রহমান চৌধুরী: ধন্যবাদ আপনাকে।

চ্যানেল আই ‘আজকের সংবাদপত্র’-এ প্রচারিত

১০ মে, ২০২২

জিডিপি এত বাড়ল, তার ন্যায্য অংশটা গরীব মানুষ পেল না কেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

জহিরুল আলম: বাজেটের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ আমরা দেখলাম। অনেক চ্যালেঞ্জ এর মধ্যে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে কীভাবে সহায়তা দেয়া যায় এবং সেটি মূলত প্রধান চ্যালেঞ্জ। আমাদের সাথে রয়েছেন অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তার কাছ থেকে আমরা শুনতে চাই যে আসন্ন বাজেটে তিনি কী কী বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে চান।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: জহির আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমি আমার সাথে মঞ্চে উপবিষ্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে দু' জন আছেন এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যারা আছেন তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং আমার সামনে যারা উপবিষ্ট আছেন তাদের সকলকে আমার শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি বলছি। আমি হয়ত এ আলোচনাতে সব থেকে বেশি ভেটেরান, আমি অন্তত চার পাঁচ বার তো আপনার সাথে এ অনুষ্ঠানে এসেছি। বিভিন্ন ধরনের সরকার এবং বিভিন্ন মন্ত্রীদের সাথে আমার এখানে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। তবে বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে আমার আজকে সর্বপ্রথম যেটা মনে হচ্ছে, সকলের প্রতি সম্মান রেখেই বলছি যে আজকাল বাজেট আলোচনা হয় অনেকটা যেমন হ্যামলেটের অভিনয় হয় ডেনমার্কের রাজপুত্র ছাড়া। এটাই আপনারা কাছে আমার প্রথম মন্তব্য যা আমি করতে চাইলাম।

এবারের বাজেটকে কেন্দ্র করে প্রথমেই আমি তিনটি অগ্রাধিকারকে আপনারা সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করব এবং অগ্রাধিকারগুলো আনার ক্ষেত্রে আপনারা মনে রাখা দরকার যে এ বাজেট প্রণয়ন হচ্ছে যখন দেশ পূর্ণভাবে করোনা থেকে পুনরুজ্জীবিত হয়নি। ২০১৯ সাল শেষ স্বাভাবিক অর্থবছর ছিল। সে অর্থবছরের যে সকল সূচক ছিল সেখানে আমরা আবার ফিরে যেতে পারি। দ্বিতীয় হয়েছে যে এখন বিশ্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনারা অবহিত। আর আমি আজকে আপনারা যে বিষয়টা সবচেয়ে জোর দিয়ে বলতে চাই, গত পনেরো বছরের ভেতরে ২০০৮-০৯ এর বৈশ্বিক পরিস্থিতির পরে যে সংকট ছিল তার পরে এত জটিল সামষ্টিক

অর্থনীতির পরিস্থিতি আমাদের দেশে ছিল না। এ সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ভঙ্গুরতা, চ্যালেঞ্জগুলো সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায় আমাদের মূল্যস্ফীতির ভেতর দিয়ে, আমাদের টাকার বিনিময় হারের ভেতর দিয়ে এবং খুব দ্রুত যেটা আসবে আমি আপনাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি সুদের হার উপরের দিকে যাবে। এটার সাথে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হলো বড় ধরনের ঘাটতির জন্য যে আর্থিক সঙ্গতি দরকার সেটার জন্য আমাদের বার্ষিক যে রাজস্ব বাজেট আছে তার ভেতরে ভর্তুকির পরিমাণ অনেক বেশি পরিমাণে বাড়বে এবার এবং সেটা ৫৫,০০০ কোটি টাকা থেকে ৮০-৯০ হাজার কোটি টাকায় যেতে পারে এবং ভর্তুকির প্রয়োজনীয়তা আরো খুব দ্রুততার সাথে বাড়বে, মূল্যস্ফীতি বাড়ার সাথে সাথে বৈশ্বিক পরিস্থিতির এই অপনয়নের কাছে। দ্বিতীয় যেটা আসছে সামষ্টিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় সেটা হলো সরকারের দায়-দেনা পরিশোধের ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন আরো বেশি হবে। এ মুহূর্তে প্রায় এক-চতুর্থ অংশ এখন সরকারের রাজস্ব বাজেটে সরকারের দায়-দেনা, অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক। অভ্যন্তরীণ দায়-দেনা এখন অনেক বেশি বৈদেশিক দায়-দেনার চেয়ে। আপনাদের এটা সময় পেলে হয়তো বলতাম, এটা দেখা যাচ্ছে।

আপনারা দেখবেন সামষ্টিক অর্থনীতির বিগত সময়ে সবচেয়ে শক্তির জায়গাটা ছিল বৈদেশিক ঋণ। সেখানে আমাদের চলতি খাতে গত বছরে আমাদের বাজেট যেমন কিছুটা হয়তো ইতিবাচক ছিল সেটা এখন প্রায় ১,৪০০ কোটি টাকা ডলারের মত ঘাটতিতে চলে গেছে এবং এই ঘাটতি আরো বাড়বে। অনেকে আমরা উৎফুল্ল বোধ করি যে বোধহয় আমাদের রপ্তানি বাড়ছে, আমরা এটা ভুলে যাই যে রপ্তানিটা হলো এ আমদানি পণ্যের দাম বাড়ার কারণে এটা হচ্ছে এবং বাণিজ্য ঘাটতি আমার ধারণা ৩,২০০ কোটি টাকাতে গিয়ে পরবর্তীতে ঠেকবে। অর্থাৎ টাকার মূল্যমানের উপরে যে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এখনই আপনারা বাজারে দেখছেন যে আপনারা ৯৪-৯৫ টাকায় একটার এলসি খোলা হচ্ছে আর সরকারি হিসেবে থাকে সেটা ৮৭ টাকা। এই যে পার্থক্যটা হচ্ছে এটাকে সরকার কয়দিন টিকিয়ে রাখতে পারবে এটার ব্যাপারে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। কারণ যে মজুদ আছে, মজুদের এই ৪৪ বিলিয়ন ডলার দিয়ে আমরা ইংরেজিতে অর্থনীতির ভাষায় বলি স্টেরেলাইজেশন করা অর্থাৎ টাকাকে শক্তিশালী রাখা জটিল হবে। আমি এটাকে আরো বড় করতে পারতাম যা এ মুহূর্তে দরকার নেই।

তবে সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা এ বছর খুবই জটিল ভাবে আছে। আমাদের সিদ্ধান্ত করতে হবে যে মূল্যস্ফীতি নাকি টাকার বিনিময় হার না সুদের হার এগুলোর মধ্যে কোনটাকে স্থিতিশীল রেখে অন্যগুলোকে নাড়াবো। দ্বিতীয়ত হলো বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান। বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানে আপনারা খুব ভালো করে জানেন যে ৩১ শতাংশ জিডিপির তার ভেতর ২৩ শতাংশ আমাদের ব্যক্তিখাতের। এটা আমার ২০১৮-১৯ এর পর থেকে এতও বাড়িনি এবং এর ফলে অবধারিতভাবে কর্মসংস্থানের বিষয়টি বড়ভাবে সামনে চলে আসে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি আমি তথ্য-উপাত্ত আপনাদের এ মুহূর্তে বলছি না। প্রকাশ্য এবং প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব কর্মহীনতা যেটা করোনাকালে শুরু হয়েছিল এবং করোনা আমরা সফলভাবে মোকাবিলা করেছি এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তৃতীয়ত যে ব্যাপারটাকে আমি বলবো সেটা হলো সুরক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে। অবশ্যই এ মুহূর্তে সুরক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই স্বল্প আয়ের মানুষদের করযোগ্য সীমা সাড়ে ৩ লক্ষতে নিয়ে যাওয়া উচিত এবং আরো দেখা উচিত আর

কোনো দুর্বল জনগোষ্ঠীকে আমরা করের দিক থেকে সুবিধা দিতে পারি কিনা। আমাদের নিরাপত্তা বেষ্টনীতে গত বাজেটে ৪ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছিল কিন্তু ২ শতাংশের বেশি আমরা খরচ করতে পারিনি। যে ২ শতাংশ খরচ করেছে যেটা প্রতক্ষ্যভাবে গরীব মানুষের কাছে মাত্র আধা শতাংশ খাদ্য সহায়তা এবং অর্থ সহায়তায় গেছে। তাই সুরক্ষার বিষয়টি এ বাজেটে দেখা উচিত।

জহিরুল আলম: ড. দেবপ্রিয়, মেগা প্রজেক্টগুলোর বেনেফিট আমরা কতটুকু পাবো?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি মাইক্রোর মানুষ আমার মেগা আলাপ করতে অসুবিধা হবে একটু। আমি ম্যাক্রোর আলাপ করি একটু এরপর মেগা প্রজেক্টে আসবো। আমি ছোট করে বলি, আমি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং মাননীয় কৃষিমন্ত্রী উভয়ের কথাই শুনেছি। আমি উনাদের উন্নয়নের যে আকাঙ্ক্ষা এবং উন্নয়নের যে অর্জন এটার সাথে আমি কোনো দ্বিমত করি না। বিষয় হলো এ উন্নয়নকে টেকসই করতে পারবেন কিনা? পৃথিবীর বুকে অনেক স্থিতিশীল দেশ তিন মাসে অস্থিতিশীল হয়ে যায় শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার কারণে। যদি আপনার অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ঠিক না থাকে তাহলে শ্রীলঙ্কার দিকে দেখেন সেটা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাতে আপনাকে অবশ্যই নিয়ে যাবে।

সুতরাং যদি আকাঙ্ক্ষা করেন যে রাজনৈতিক স্থিতিশীল হিসেবে বাংলাদেশকে দেখতে চান তাহলে অবশ্যই আগামী বছর আপনার সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। আপনি চিন্তা করে দেখেন, আপনার চলতি খাতের ঘাটতি যদি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে এবং টাকার সাথে সরকারি ব্যয়ের পার্থক্য যদি ৮-১০ এ যায়, এক সময় কিন্তু বাঁধ ভেঙে ওটা ১৩০ এ চলে যেতে পারে। আপনারা চিন্তা করে দেখেন যে প্রকৃতভাবে এটাকে ব্যবস্থাপনার জন্য আমার কোনো সক্রিয় নীতি আছে কিনা। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস থেকে আমরা বলেছি যে রিজার্ভ কমে যাচ্ছে কিন্তু কোনো ধরনের প্রক্রিয়া বা পদক্ষেপ এটার জন্য নেয়া হয়নি। পুরো জিনিসটা একটা প্রতিক্রিয়া নীতির ভেতরে থাকে, কোনো উদ্যোগী নীতির ভেতরে থাকে না। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা যেন ঘটনার পেছনে দৌড়ায়, ঘটনার নেতৃত্বে সামনে থেকে দাঁড়ায় না সেটা। গত দশ বছরে এ সরকারের যদি সবচেয়ে বড় অবদান থেকে থাকে সেটা হলো সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ছিল বলেই অন্য জিনিসগুলো হতে পেরেছে। এই স্থিতিশীলতা যদি আগামী বছর না থাকে সেটা টাকার মানে বলেন, সুদের হারে বলেন, মূল্যস্ফীতি বলেন তাহলে আর কিছু থাকবে না।

একটা বাজেটের সবচেয়ে বড় অবদান হলো স্থিতিশীলতা রক্ষা করা। এটার কৌশল সবচেয়ে বড় ভাবে সামনে আসতে হবে। রাজ্যক ভাই এর কথার সাথে বিতর্ক করতে হয় সম্মানের সাথে যেহেতু তিনি আমার এলাকায়। তিনি বলছেন এবং অন্যেরাও বলছেন বড় বাজেট, বড় বাজেট আমি এটাকে বলি ফিস্কাল ইল্যুশন। এত বড় বাজেট দেয়ার পরেও জিডিপি অনুপাতে ১৩ শতাংশের উপরে কোনো সরকারি ব্যয় উঠতে পারলো না? দশ বছর আগেও এটা ১৩ শতাংশের উপরে ছিল, এখনো এটা ১৩ শতাংশেই আছে। আপনি এত বড় বাজেট দেয়ার পরেও কেন এখনো এটা ৯.৬ শতাংশ। কিসের বড় বাজেট? যে বাজেট ঘোষণা করেন

তার ২০ শতাংশ আপনি কেটে দেন সংশোধনের সময় আর বাস্তবায়ন করেন তারও ২০ শতাংশ কম। সেহেতু প্রকৃত বাস্তবায়নের হার নিয়ে আলাপ করবো আমরা, কী ঘোষণা হয়েছে সেটা নিয়ে আলাপ করবো না। আপনি লক্ষ্য করে দেখেন বাংলাদেশের এ মুহূর্তের কর পরিস্থিতি কী। সাড়ে ষোলো কোটি লোকের দেশ সেখানে মাত্র চুয়াত্তর লক্ষ লোকের ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার আর ট্যাক্স দেয় মাত্র তেইশ লক্ষ মানুষ। এর বাইরে কেনো মানুষ বাড়লো না? এত যদি জিডিপি পার ক্যাপিটা বেড়ে থাকে তাহলে সে মানুষগুলো কর দেয়না কেন? আমি জিজ্ঞাসা করি জসীম ভাই এর কাছে, আপনি যে বলছেন এই কর দেয়ার মানুষগুলো তো আপনার কাছে আছে।

আপনারা যে ব্যক্তিখাতের নেতারা অভিযোগ করেন যে সরকার এই করে নাই, ওই করে নাই। সরকার তো বলছে এই সরকার ব্যক্তিখাত চালিত সরকার। সংসদের ভেতরে বেশিরভাগ মানুষই কোনো না কোনো ব্যক্তিখাতের সাথে যুক্ত তাহলে কেন বাংলাদেশে এই উন্নয়নগুলো হয় না এর উত্তর তো আমি এফবিসিসিআই এর কাছেও চাইবো যে উনারা কি মনে করেন? উনারা কেনো সংস্কার দিতে পারেন না? আমি আরেকটা কথা বলি যে বাংলাদেশের এ মুহূর্তে যদি আপনি সুরক্ষার কথা বলছেন আপনারা জানেন এ সরকার যখন প্রথম সুরক্ষা কর্মসূচি চালু করে এবং আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তার সাথে সে পরিকল্পনায় যুক্ত থাকার। কিবরিয়া সাহেবের আমলের কথা বলছি। তখন যে একশ টাকায় শুরু হয়েছিল এখন সেটা পাঁচশ টাকা। তখন একশ টাকা আমার মাথাপিছু জিডিপির আয়ের ৬ শতাংশ ছিল। আজকে এ গরীব মানুষ এত কিছু বাড়ার পর এটার তিন শতাংশ পায়। জিডিপি এত বাড়লো তার অংশটা কেন সে গরীব মানুষ পেল না? তার কেন ৩ শতাংশে থাকতে হলো এটা একটু চিন্তা করে দেখেন। আর জসিম ভাই উল্লেখ করলেন কর্মসংস্থানের কথা। আমি আপনাদের আবার সরকারি হিসাব বলছি। বাংলাদেশের যুব সমাজ চারজনে একজন বেকার হয় গড়ে এবং শিক্ষিত যুবক তিনজনে একজন বেকার হয়। যে যত শিক্ষিত সে তত বেকার। তাহলে এ কী শিক্ষা আমাদের হলো বাংলাদেশের? এটা কী ধরনের প্রজন্ম তৈরি করলাম যে বাজার তাকে স্বীকৃতি দেয় না, বিদেশ থেকে আমাদের বিশেষজ্ঞ এনে লক্ষ লক্ষ টাকায় তাদের ভরণ পোষণ করতে হয়। যে কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি আপনাদের কাছে, আপনারা তো শুধু বরাদ্দের কথা বলছেন বা এ জায়গাতে বিভিন্ন বিষয় বলছেন। আসলে একটা হলো এ জায়গাতে স্থিতিশীলতা, আরেকটা হলো সংস্কার। যদি সংস্কারের কর্মসূচি না থাকে এ সরকারের কর্মসূচির চেষ্টা ২০১৪ সালের পর থেকে অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। ওই জায়গাতে যদি না নিতে পারি এবং নির্বাচনের ক্ষেত্রে কতদূর হবে আমি সেটা জানি না। কিন্তু আমি মনে করি এটার একটা সম্পূরক উদ্যোগ এখানে দরকার।

জহিরুল আলম: দর্শকদের থেকে কিছু প্রশ্ন এসেছে যেমন মেগাপ্রজেক্টের বিষয়, তথ্য বিভ্রান্তির বিষয়ে ড. দেবপ্রিয় যদি সংক্ষেপে আপনার শেষ মন্তব্য রাখেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি যেটা বলতে চাই, আমি দ্বিমত করছি না মন্ত্রী মহোদয়রা যা বলেছেন সে আকাঙ্ক্ষার সাথে। কিন্তু ব্যবস্থাপনা এ মুহূর্তে খুব জরুরি একটা বিষয়। এ অবস্থাতে আমি একটা শব্দ ব্যবহার করি। আমি গত তিরিশ বছর বাজেট প্রণয়ন এবং এর বাস্তবতার সাথে

যুক্ত। খুব ঘনিষ্ঠভাবে কিবরিয়া সাহেব এবং সাইফুল সাহেবের সাথে কাজ করেছি। আমি এটাকে বলতে পারি যে অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে এ মুহূর্তে বাজেটকে নিয়ে এ বছর বিশেষ করে খোলামেলা আলোচনা এ বছর তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে, সংলাপ অনেক কম হয়েছে। এমনকি অর্থনীতিবিদদের সাথেও আলোচনা সে অর্থে হয়নি। এখন সে বিষয়টি মনে রাখতে হবে দেখুন এই সরকারই কিন্তু অর্থ এবং মুদ্রানীতি তৈরি করেছিল যেখানে অর্থমন্ত্রী তিনমাস পর পর বিবৃতি দেয়ার কথা। সে তিনমাসের বিবৃতি কিন্তু অর্থমন্ত্রী কখনো সংসদে দিচ্ছেন না। যার ফলে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার জায়গাটা দুর্বল হয়ে গেছে। এখানে যে অর্থ বিষয়ক তিনটি স্থায়ী কমিটি আছে যাদের দায়িত্ব হলো বাজেট সংক্রান্ত বিষয়ে মতামত দেয়ার, সে তিনটিরও কিন্তু কোনো সভা সে অর্থে হয়নি এবং তাদের ঘটনা অনেক দুর্বল।

আমি শেষ কথা এখানে আপনাদের যেটা মনে করিয়ে দিতে চাই অর্থমন্ত্রণালয়েরই একটা মুদ্রানীতি এবং আর্থিক নীতি সমন্বয়ের জন্য একটি কাউন্সিল আছে যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানরা থাকে। আপনারা দেখেন আপনারা যেটাকে আশাবাদ হিসেবে ব্যক্ত করছেন বাজার সেটাকে মূল্যায়ন করবে সেটার উপর কতটুকু আস্থা রাখতে পারে সেটার উপরে। কারণ ‘Market believes in the trust and credibility’. এটা রাখার জন্য যে নেতৃত্ব দেয়া দরকার সেটা আমি এ মুহূর্তে দেখছি। আমি খুব পরিষ্কারভাবে বলছি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এখন অটোপাইলটের মধ্যে আছে। এটা এরকম সময় সবচেয়ে বড় ভয়ংকর একটা অবস্থা যেটা সামনের দিকে আগানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সেটা মেগা প্রজেক্টই বলেন, কৃষিতে ভতুর্কিই বলেন। ভতুর্কির বিষয় সমন্বয় করা কোনো ব্যাপারই না। আপনারা বলছেন যে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো উচিত না, আমিও মনে করি বিদ্যুতের দাম বাড়ানো উচিত না এবং আমি মনে করি সরকারের সামর্থ্য আছে এখানে ভতুর্কিকে সমন্বয় করার। কিন্তু ভতুর্কিকে সমন্বয়ের জন্য যে আন্ত-মন্ত্রণালয় ব্যবস্থার ভেতরে যেতে হয় সে উদ্যোগ এবং নেতৃত্বের অভাব আমি সেখানে দেখি। আপনারা যে সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার কথা বললেন, রাজ্জাক ভাই বলছেন মজুদের কথা আমি আপনাদের বলছি আজকে যে এ মুহূর্তে পৃথিবীতে রেমিট্যান্স আসা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাবে। এটার ঐ অর্থে নাই। যে রেমিট্যান্স এ মুহূর্তে আছে সেটা চারমাসের খরচ মেটানোর মত এবং জিনিসপত্রের দাম বাড়লে আরো মুশকিল হবে। যদি তাই থাকতো বাংলাদেশ ব্যাংক মাত্র চার বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত খরচ করতে পেরেছে টাকাকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে, এখন যে বন্ধ করে দিয়েছে। এখন একটা সক্রিয়, দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখনই সময় ছিল এখানে অর্থনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ইউ নিড এ পাবলিক ফেস। We do not have a public face to create a quality and have a confidence on it. আমি এটাকে নীতি প্রণয়ন বাস্তবায়নে ২০২২ সালের আগামী অর্থবছরের সবচেয়ে বড় দুর্বলতার একটা অংশ হিসেবে দেখি।

প্রত্যেকটা দেশ তার নিজের মত করে আগায়। আমার বন্ধুরা এই হাসান টোটার ব্যাপারে কী বলেছে না বলেছে এ বন্দরটা না বানানোর ব্যাপারে শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে। তাদের তখন দেশদ্রোহী, অদেশপ্রেমী, কাভজ্ঞানহীন কত কথা বলা হয়েছে। এখন আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করবো। মেগাপ্রজেক্টের ব্যাপারে আমি আপনাদের বলেছি, রাজ্জাক ভাই বলেছেন তিন বছরের কথা। আপনি যদি পৃথিবীতে এখন চুল্লি সম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে যান,

কোনো আন্তর্জাতিক অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান এর জন্য আপনাকে টাকা দিবে না। কারণ পারমাণবিক চুল্লির বিদ্যুৎ কেন্দ্র তারা অনুৎসাহিত করে। আমাদের মত দেশে এটার নিরাপত্তার বিষয় রয়েছে। তখন আমাদের যা করতে হয় এটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি অর্থনীতির ভাষায় হেলাল সাহেব ভালো বলতে পারবেন, এডভার্স সিলেকশন বলি। অর্থাৎ, বিরূপ চয়ন করি। যেটা রূপে আমার মিলে না, বিরূপে হয়। তখন আমি বেশি দামের টাকায় যাই, আমার রেয়াতের সময় কম থাকে, ফেরত দেয়ার সময় কম থাকে, সুদের হার বেশি থাকে। আপনারা বলেন এখন যেটা তৈরি করা হচ্ছে আমি দেশের নাম বলছি না, এই ঠিকই সমধর্মী প্রকল্প ভারতবর্ষে চারটি হয়েছে। তাদের খরচ ছিল ম্যাক্সিমান ৩-৪ বিলিয়ন ডলার। এখন এটার খরচ ১২-১৪ বিলিয়ন ডলারে গেছে। আপনি নদী শাসনের কথাই বলেন আর মাটি ভরাটের কথাই বলেন এটা দিয়ে আপনি ব্যাখ্যা করতে পারবেন না।

বিশেষ আলোচনা (মন্ত্রীদেব সাথে)

এনটিভি ‘কেমন বাজেট চাই ২০২২-২৩’-এ প্রচারিত

১৪ মে, ২০২২

বাজেটে মূল্যস্ফীতি ও কর্মসংস্থান মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে মূল্যস্ফীতি, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এ ছাড়াও করমুক্ত আয়ের সীমা সাড়ে তিন লাখ টাকা করা উচিত। যুবকদের জন্য কমপক্ষে ১ হাজার টাকা যুব ভাতা দেওয়ার বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় আনতে হবে। সময়ের আলোকে আগামী বাজেট সম্পর্কিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই সুপারিশ রাখেন।

আগামী বাজেট সম্পর্কে জনমনের প্রত্যাশা অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। কারণ, কোভিড উত্তর অর্থনীতির যে পুনরুজ্জীবন গত ২০২১ সালের শেষে দেখা গেছে। আবার ২০২২ সালের শুরুতে নতুন ধাক্কা খেয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। যার ফলে খাদ্য, জ্বালানি, সার ও অন্যান্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন বছরে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে পণ্য চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। আগামী অর্থবছরের বেশ কিছু সঙ্কট ঘনীভূত হওয়ার আভাস দিয়ে এই অর্থনীতিবিদ বলেন, বৈশিষ্ট্য, অঞ্চল ও দেশের চলমান পরিস্থিতির চাপ বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য দুশ্চিন্তার কারণও হতে পারে। যে কারণে আগামী অর্থবছরের বাজেটকে আরও বেশি জনসম্পৃক্ত করার বিষয়টি সরকারকে গভীরভাবে ভাবতে হবে।

আগামী বাজেটে দুটি মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। একটি হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি অন্যটি মূল্যস্ফীতি। কারণ, করোনা উত্তর পরিস্থিতিতে প্রচলিত ও প্রত্যাশিত কর্মহীনতা বেড়েছে। অনেকের আয় কমেছে। তারা সঞ্চয় ভেঙেছেন। তাই আগামী বাজেটের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত কর্মসংস্থান সৃষ্টি। জিডিপি লক্ষ্যমাত্রার পরিবর্তে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রাই আগামী বাজেটে গুরুত্ব দিতে হবে। বিনিয়োগ ও এসএমইকে সমর্থন দেওয়া প্রয়োজন।

আগামী বাজেটে দ্বিতীয় লক্ষ্য হওয়া উচিত মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরা। সাধারণ মানুষ, নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবন এখন খুবই বিপর্যস্ত। যে হারে তাদের ব্যয় বেড়েছে, সেই হারে আয়

বাড়েনি। বরং অনেকাংশে কমেছে। সরকার প্রত্যক্ষ সহায়তার মাধ্যমে কীভাবে মানুষের জীবনে স্বস্তি আনবে তা বাজেটে পরিষ্কারভাবে আসতে হবে। মানুষের নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়াকে ঠেকাতে হবে। আগামী বাজেট প্রথাগত বাজেট তৈরির প্রক্রিয়ায় কিছুটা ব্যত্যয় ঘটানো প্রয়োজন। অসাধারণ সময়ে একটি ব্যতিক্রমী বাজেট দরকার।

বর্তমানে সঞ্চয়ের হার নেমে এসেছে। চলতি আয়ে তাদের ভোগের জন্য বাধ্য হচ্ছে। মোট কথা মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তরা আর্থিক কষ্টের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এই কষ্টের কথা চিন্তা করে বাজেটে এর পরিত্রাণের একটি পথরেখা থাকা উচিত। আগামী বাজেটে করমুক্ত আয়ের সীমা সাড়ে তিন লাখ টাকা করা প্রয়োজন। পাশাপাশি প্রান্তিক ও দুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ প্রণোদনা রাখতে হবে।

আগামী বাজেটে সরকারকে মোটা অঙ্কের টাকা ভর্তুকি দিতে হবে। যার পরিমাণ হতে পারে ৯০ হাজার কোটি টাকা। তবে ভর্তুকির টাকা যেন মেগা প্রকল্প খাতে ব্যয় না হয়। সরকার পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়াতে চাচ্ছে। তবে এই মুহূর্তে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো ঠিক নয়।

বাজেটে অনেক সময়ে মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প অবহেলিত থেকে যায়। এই এসএমই অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। তাই আগামী বাজেটে এসএমইর দিকে নজর দিতে হবে। যুবসমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে আগামী বাজেটে। যুবকদের জন্য ভাতার প্রচলনের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন আগামী বাজেটে।

বিশ্ববাজারে দ্রব্যমূল্য যদি আরও বাড়তে থাকে তা হলে আমাদের রিজার্ভের ওপর বড় ধরনের টান পড়বে। ইতিমধ্যে ব্যাংকের ডলার ছাড়ার সক্ষমতা অনেকাংশে কমে এসেছে। তাই টাকা ও ডলারের বিনিময় হারে পার্থক্যের বিষয়টি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দেখতে হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর জন্য তথ্যভান্ডার গড়ে তুলতে হবে। দুস্থ মানুষদের আরও খাদ্য ও অর্থ সাহায্য দেওয়া উচিত। যেসব বিষয় নেতিবাচকের প্রভাব রয়েছে তা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি বাজেটে প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন। পিছিয়ে পড়া ও অনগ্রসর মানুষের প্রতি বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি সমর্থন থাকা উচিত। কৃষির ওপর গুরুত্ব দিয়ে কৃষি সম্প্রসারণে জনবল বাড়ানোর পাশাপাশি দক্ষতা বাড়ানোর বিষয়টি বাজেটে লক্ষ্য রাখতে হবে। ধান-চালের সংগ্রহ বিষয়টি সঠিকভাবে কার্যকর করা প্রয়োজন। বিশেষ করে উচ্চফলনশীল উৎপাদনের দিকে নজর বাড়ানো দরকার আগামী বাজেটে।

সময়ের আলো

১৯ মে ২০২২

বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীলতার জন্য দরকার বহুমুখী পদক্ষেপ

ফাহিমদা খাতুন

বর্তমান বিনিময়হারের অস্থিরতা ব্যবসার জন্য বা ব্যক্তির জন্য উপযোগী নয়। বৈদেশিক মুদ্রার বাজার মুদ্রাস্ফীতির প্রধান নির্ধারক। তাই মূল্য স্থিতিশীলতার জন্য একটি স্থিতিশীল বিনিময়হার গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনীতি বজায় রাখতে সাহায্য করবে। সরকারকেও সক্রিয় হওয়া উচিত, কারণ মুদ্রাস্ফীতির চাপ বর্তমান পরিস্থিতিতে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনযাত্রায় মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমদানি ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। আমদানির পরিমাণের চেয়ে ব্যয় বেশি বাড়ছে। বিলাসপণ্য আমদানি ও বিদেশভ্রমণে নিরুৎসাহ করা হচ্ছে। এটা ভালো উদ্যোগ। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থাপনা আরো ভালো করে করতে হবে, যাতে সংকটকালে কোনো অপচয় না হয়। কারণ আমাদের রিজার্ভও কমে যাচ্ছে।

এদিকে আতঙ্কিত মানুষ খোলাবাজার থেকে চাহিদার চেয়ে বেশি ডলার কিনছে, যার কারণে দাম বেড়ে যাচ্ছে।

দেশে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা যা আছে, তার মাত্র ৪ থেকে ৫ শতাংশ বেচাকেনা হয় খোলাবাজারে। এখানে ব্যবস্থাপনা করতে হলে ব্যবধান ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনতে হবে। তাহলে বৈধ পথে প্রবাসীরা রেমিট্যান্স পাঠাতে উৎসাহিত হবেন।

আমাদের প্রতিযোগী দেশগুলোসহ ভারত, ভিয়েতনাম, তুরস্ক ও যুক্তরাজ্য ছাড়া বিভিন্ন দেশ গত কয়েক মাসে মুদ্রার মান ৫ থেকে ৫০ শতাংশ অবমূল্যায়ন করেছে। এখন আমাদেরও করা হচ্ছে।

বৈদেশিক মুদ্রাবাজারের অস্থিরতা দেশের মূল্যস্ফীতির ওপরও চাপ ফেলছে। বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যেও যেহেতু আমরা বেশি আমদানি করছি, সুতরাং সামগ্রিকভাবে আর্থিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে অবশ্যই এক ধরনের চাপ পড়ছে।

বিনিময়হার ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বাংলাদেশে যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি ভাসমান বিনিময়হার অনুসরণ করে, এর পরও বৈদেশিক মুদ্রার মার্কেটে অস্থিরতা রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছেছে। এখন অর্থনীতিতে ডলারের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় কম।

এই অবস্থায় আমার কয়েকটি পরামর্শ আছে:

এক. সরকারি আমদানি, যেমন—জ্বালানির জন্য একটি পৃথক তহবিল গঠন করা উচিত। এটি কেবল সরকারি আমদানি নিষ্পত্তির জন্য ব্যাংকগুলোকে দিয়ে দেওয়া উচিত। ব্যাংকগুলো এই পেমেন্টগুলোর জন্য কোনো লাভের মার্জিন রাখবে না। এতে অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানিতে ডলারের জন্য বেসরকারি খাতের চাহিদার ওপর চাপ কমবে।

দুই. রপ্তানি ধরে রাখার কোটা আগামী ছয় মাসের জন্য রপ্তানিকারকদের প্রত্যাবাসিত আয়ের ৫ থেকে ১০ শতাংশে কমিয়ে আনা উচিত। তাদের পরবর্তী ছয় মাসের জন্য ব্যাক-টু-ব্যাক আমদানি পেমেন্ট ছাড়া অন্য সব কিছু এনক্যাশ করতে হবে।

তিন. বাজারে বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহ করার জন্য ব্যাংকগুলোর বর্তমান নেট ওপেন পজিশন (এনওপি) অবিলম্বে ৫০ শতাংশ হ্রাস করা উচিত। বিভিন্ন ব্যাংকে সরবরাহের সুবিধার্থে বিদ্যমান এনওপির ৭৫ শতাংশ অবিলম্বে আন্ত ব্যাংক বাজারে বিক্রি করা উচিত।

চার. বাজার স্থিতিশীল করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে আরো এক থেকে দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজারে সরবরাহ করা উচিত।

পাঁচ. আন্ত ব্যাংক হারের কাছাকাছি হওয়ার জন্য টাকার অবমূল্যায়ন করা উচিত এবং বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য বাজারের হারের সঙ্গে বাস্তবসম্মত হতে হবে।

ছয়. বৈদেশিক মুদ্রা বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত বিলাসবহুল সামগ্রীর আমদানি সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

সাত. রেমিট্যান্স প্রবাহ উন্নত করার জন্য সব অংশীদারের কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। প্রেরকদের প্রণোদনা দেওয়ার পরও বৈধ পথে বেশি রেমিট্যান্স আসছে না। প্রেরকদের কাছে হুন্ডি বেশি লাভজনক, কারণ এটি বৈধ পথের তুলনায় বেশি লাভ দেয় তাঁদের।

আট. কিছু বৈশ্বিক সরবরাহকারীর সঙ্গে একটি দীর্ঘমেয়াদি সরবরাহ চুক্তি নিশ্চিত করা দরকার। এ জন্য ধীরে ধীরে ভবিষ্যতের পণ্যবাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা উচিত। আন্তর্জাতিক পণ্যবাজারে কাজ করার জন্য বাংলাদেশকে বাণিজ্যক্ষমতাও বাড়াতে হবে।

কালের কণ্ঠ

২৪ মে ২০২২

বৈদেশিক মুদ্রাবাজারের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা দরকার

ফাহিমদা খাতুন

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহিমদা খাতুন বলেছেন, দু-তিন মাস ধরে ডলারের বাজারে অস্থিরতা চলছে। এর জন্য একটি পৃথক তহবিল গঠন করা যেতে পারে। এর অধীনে ব্যাংকগুলো আপাতত আমদানির ক্ষেত্রে কোনো মার্জিন রাখবে না। রপ্তানির ধারা ধরে রাখতে হবে। আগামী কিছুদিনের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের ডলার ধরে রাখার ক্ষমতা ৫০ শতাংশ কমিয়ে আনতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের উচিত হবে বাজারে ডলার সরবরাহ বাড়ানো। এ সময় টাকার অবমূল্যায়ন কিছুটা কমানো যেতে পারে। তবে তা হতে হবে বাস্তবসম্মত। বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহার করতে হবে বিচক্ষণতার সঙ্গে। বিলাসবহুল পণ্য আমদানির লাগাম টানতে হবে। এখানে সরকার যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে তা কার্যকর করতে হবে। ব্যাংকগুলোর রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়াতে হবে। এখানে রেমিট্যান্স যাঁরা পাঠাচ্ছেন, নীতিনির্ধারক, যাঁরা রেমিট্যান্স আহরণ করছেন তাঁরা মিলে একটা সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। তা না হলে ফরমাল চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বাড়ানো সম্ভব হবে না বলে তিনি মনে করেন।

বাংলাদেশ মুদ্রা বিনিময় হার কখনই বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়নি। অর্থনীতি যখন স্বস্তিদায়ক অবস্থায়, বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে কোনো সংকট ছিল না তখনো টাকার বিনিময় হার কৃত্রিমভাবে ধরে রেখেছে বাংলাদেশ। আর এখন চরম সংকটের সময় বাংলাদেশ ব্যাংক পরিস্থিতি সামাল দিতে দফায় দফায় টাকার মান কমাচ্ছে। পরিস্থিতি এতটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে যে বাংলাদেশে নির্ধারিত টাকায় ডলার কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বেঁধে দেওয়া দরে খোদ ব্যাংকের ভিতরেও ডলার মিলছে না। কার্ব মার্কেটে পরিস্থিতি তো আরও কঠিন। এখানে আরেকটি বড় সমস্যা হলো ব্যাংক ও খোলাবাজারে ডলার রেটের পার্থক্য সব সময়ই অনেক। এ ব্যবধানটা কমিয়ে আনতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং এখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এদিকে ডলারের বাজারে অস্থিরতার কারণে বাড়ছে আমদানি ব্যয়। আবার করোনা মহামারির ফলে বিশ্বব্যাপী উৎপাদন কমেছে। বাংলাদেশেও শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে এর একটা প্রভাব

রয়েছে। এ ছাড়া বৈরী আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে কৃষিজ উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে দফায় দফায়। এবারও হাওরাঞ্চলের কৃষক সময়মতো ধান কাটতে না পারায় লোকসানের মুখে পড়েছে। এসব প্রেক্ষাপটে খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছে। অনবরত বাড়ছেও। এর প্রভাবে মার্চ-২০২২ শেষে মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ২২ শতাংশ; যা ১৭ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। অথচ করোনা মহামারিতেও মূল্যস্ফীতি এতটা বাড়েনি; যা বেড়েছে গত তিন মাসে।

প্রবাসী আয়ের ধারায়ও নেতিবাচক প্রবৃদ্ধি চলছে। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়লেও ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত দেশে রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি ছিল বেশ ভালো। শুরুতে রপ্তানি নিয়ে নানা শঙ্কা দেখা দিলেও পরে তা-ও ঘুরে দাঁড়ায় খুব কম সময়েই। এমনকি আমদানি ব্যয়ও ছিল সহনীয়। কিন্তু চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের শুরু থেকেই কয়েকটি সূচকে অস্থিরতা দেখা দেয়। এর মধ্যে প্রবাসী আয়ে প্রবৃদ্ধি দূরের কথা, আগের বছরের সমান আয়ও করা যায়নি। অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে প্রবাসী আয় আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় কমে গেছে ১৬ দশমিক ২৫ শতাংশ। আগের অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধি ছিল ৩৬ দশমিক ১০ শতাংশ।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

২৬ মে ২০২২

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মূল স্তম্ভ হতে হবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আসন্ন বাজেট নিয়ে এত কম আলোচনা গত ৩০ বছরে দেখিনি। আমি মনে করি, বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে: ১. পরিস্থিতির বিশ্লেষণ, ২. ব্যবস্থাপত্র কী ও এই ব্যবস্থাপত্র বাস্তবায়নে প্রক্রিয়াগত কী বিষয় আছে।

প্রথমেই আসি পরিস্থিতির বিশ্লেষণে। যদি বলেন, পরিস্থিতি বোঝা যায়নি, তাহলে এটা আমি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করি। কারণ, গত এক বছর বা তার বেশি সময় ধরে এখানে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা অর্থনীতিতে বিভিন্ন কাঠামোগত অসংগতির কথা বলছেন, সংস্কারের অভাবে এগুলো অর্থনীতিতে কত ধরনের বাঁধা সৃষ্টি করছে, তা বলে আসছেন। তাই এসব বিষয় নিয়ে একধরনের অস্বীকৃতির মনোভাব আছে। তথ্যের প্রতি অবজ্ঞা, অনেক ক্ষেত্রে তথ্যের প্রতি অন্ধত্ব আমাদের এই জায়গায় নিয়ে এসেছে। আমরা যে উন্নয়ন উপাখ্যান তৈরি করেছি, এটি যদি যুক্তিসংগত না হয়, তাহলে তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণকেও অপমানসূচক বক্তব্য দিয়ে ছোট করার চেষ্টা করছি।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরকার ক্রমান্বয়ে মেনে নিচ্ছে, অর্থনীতিতে সংকটময় পরিস্থিতি বিকাশমান। আমরা বলি বিরাজমান। বিকাশমান ও বিরাজমান—দুটিই সত্য। একধরনের ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েছে যে আয়-ব্যয় পরিস্থিতি, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, চলতি খাতে ক্রমবর্ধমান ঘাটতি সৃষ্টি হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন ও অপরিপূর্ণ পদক্ষেপ দেখতে পাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটিতে আলোচনা করার কথা বলছেন। বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকির মধ্যে আছে, যা বড় ধরনের সংকট সৃষ্টি করতে পারে। দেরিতে হলেও অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় হলো, এ পরিস্থিতি থেকে বেরোনোর উপায় কী, ব্যবস্থাপত্র কী? এখন সময় হলো মধ্য মেয়াদের চেয়ে স্বল্প মেয়াদে বেশি মনোযোগ দেওয়া। দু-তিন বছরের একটি স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা দরকার। পাশাপাশি ব্যাংক-বিমাসহ আর্থিক খাত, পুঁজিবাজার, রাজস্ব খাত, স্থানীয় সরকার—এসব বিষয়েও মনোযোগ রাখতে হবে।

প্রবৃদ্ধিকে আমরা এখন অনন্য দেবতার স্থানে নিয়ে গেছি। প্রবৃদ্ধিকে সেখান থেকে নামাতে হবে। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্য হতে হবে নিম্নবিত্ত, সীমিত আয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে সুরক্ষা দেওয়া। ব্যয় ও আয়—দুই ক্ষেত্রেই তাদের সুরক্ষা দিতে হবে।

মূল্যক্ষীতিকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মূল স্তম্ভ হিসেবে দেখতে হবে। খাদ্যমূল্যক্ষীতি এখন অনেক বেশি। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যেসব কথা বলা হচ্ছে, তা একধরনের ‘ছদ্ম অর্থনীতি’-র মতো। যেমন দুই মাসের রেমিট্যান্স আয় দিয়ে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করা, আমদানি খরচ বৃদ্ধির ফলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।

বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় গরিব মানুষকে সুরক্ষা দেওয়ার কথা চিন্তা করলে বাজেট ঘাটতি বড় বিষয় নয়। এই শ্রেণির মানুষের জন্য প্রত্যক্ষ অর্থসহায়তা ও খাদ্যসহায়তার ব্যবস্থা রাখা দরকার। তাদের সুরক্ষা প্রতিষেধক হলো টিসিবির কার্যক্রম বিস্তৃত করা, খাদ্যমূল্য কমানো, এক কোটি পরিবারকে সহায়তা দেওয়া।

দ্বৈত বিনিময় হার অর্থনীতির জন্য সুবিধাজনক হয় না। সুদের হার ধরেবেঁধে রাখা উচিত নয়। আরেকটু নমনীয় বা মুক্ত করা উচিত। আবার ব্যক্তি খাতের ঋণপ্রবাহ বিঘ্নিত না করে সরকারি ঋণ নেওয়ার সুযোগ করতে হবে।

এত দিন যে সংস্কার হয়নি, আমরা এখন তার ফল পাচ্ছি। বর্তমানে আমরা একটা প্রশাসননির্ভর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে আছি। এই সংকটের মধ্যে মুদ্রা সমন্বয়-সংক্রান্ত কমিটির বৈঠক হয়েছে কি না, জানি না। তিন মাস অন্তর সংসদে আর্থিক বিবৃতি দেওয়ার কথা থাকলেও তা দেওয়া হয় না। গত তিন বছরে অর্থ মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির তিন-চারটি সভা হয়েছে। অর্থ ও মুদ্রানীতি-সম্পর্কিত এই সরকারের করা আইন আছে। সেখানে যেসব কাজ করার কথা বলা আছে, সেগুলোও সরকার করে না। এর ফলে যেটা হচ্ছে, সব নীতিব্যবস্থায় সমস্যা তৈরি হলে পদক্ষেপগুলো প্রতিক্রিয়ার মতো আসে। সমস্যার আগে উদ্যোগ নেওয়া হয় না। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এখন একটি অটো পাইলটের ভেতরে আছে। অদৃশ্য পাইলটের মাধ্যমে এটি চলে। এটা তো হতে পারে না।

বর্তমান সংকটকে সুযোগ হিসেবে দেখে সংস্কার করতে হবে। কোভিডের সময় টিকা দেওয়ার জন্য অ্যাপস ব্যবহার করা হয়েছে। এটা সফল হলো। আমরা যে পারি না, তা নয়। তাই রাজস্ব খাত, আর্থিক খাত ও স্থানীয় সরকারের মতো জমে থাকা সংস্কারগুলো করতে হবে। কিন্তু আমরা সেই ধরনের উদ্যোগ দেখছি না।

প্রথম আলো

২৭ মে ২০২২

রাজস্ব নীতি ও মুদ্রানীতির মধ্যে সমন্বয় দরকার

ফাহিমদা খাতুন

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ফাহিমদা খাতুন বলেন, ‘মূল্যস্ফীতি আসলে কত? সরকারি তথ্য বলছে, এ হার ৬ শতাংশ। আসলে কি তাই? আমরা সিপিডি থেকে বলেছি, মূল্যস্ফীতি কারও কারও ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশের ওপরে। চালসহ কিছু মৌলিক পণ্যের দাম ৪০-৬০ শতাংশ বেড়েছে। প্রশ্ন হলো এই মূল্যস্ফীতির তথ্য সঠিক কি না। তাই প্রথম কথা হচ্ছে, মূল্যস্ফীতির হিসাব না করে যতই নীতি নেন না কেন, তা কোনো কাজে আসবে না।’

ফাহিমদা খাতুন বলেন, ‘আমরা বাজার অর্থনীতির কথা বলছি, আবার অন্যদিকে সংরক্ষণবাদী নীতিও নিয়েছি। প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী না করলে সবাই সুফল পাবে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম কাজ হলো মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু প্রবৃদ্ধি, বেকারত্ব নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আবার বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু কাজ অর্থ মন্ত্রণালয় করছে। এসব কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতা ও সক্ষমতা নিয়ে কথা হচ্ছে।’

ছন্ডি একটি অপ্রতিরোধ্য বিষয় হয়ে গেছে বলে মত দেন ফাহিমদা খাতুন। তিনি বলেন, যত দিন টাকা পাচার বন্ধ না হবে, তত দিন ছন্ডি চলবে। অনেকে অভিবাসী হয়ে অন্য দেশে চলে যাচ্ছেন। তাঁরা ১০, ৫০, ১০০ কেটি টাকা নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা তো এ দেশের ঘরবাড়ি ফেলে যাচ্ছেন না। এসব বন্ধে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার উদ্যোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটি দুঃসাধ্য কাজ। আইনি কাঠামো নেই। যাঁরা চলে গেছেন, তাঁরা তো ওই দেশের অংশ হয়ে গেছেন। যেসব দেশে পাচারের টাকা যাচ্ছে, ওই সব দেশও বোঝে, এগুলো দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত টাকা। তারপরও তারা পাচার হওয়া অর্থ গ্রহণ করছে।

অর্থনীতিতে সংস্কার প্রসঙ্গে ফাহিমদা খাতুন বলেন, ‘আমরা সংস্কার ভুলে গেছি। সংস্কার এখন ধরাছোঁয়ার বাইরের বিষয় হয়ে গেছে। রাজস্ব নীতি ও মুদ্রানীতির মধ্যে সমন্বয় দরকার। বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন না বাজার অর্থনীতি, না কেন্দ্রীভূত অর্থনীতি।’ তিনি আরও বলেন, দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা ও তথ্যপ্রযুক্তি—এই তিন বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে। আবার তথ্য-উপাত্ত নিয়ে নীতিনির্ধারণকদের মধ্যে একধরনের অনীহা তৈরি হয়েছে। কিন্তু তথ্য-উপাত্ত না থাকলে নীতি নির্ধারণও যথাযথ হয় না।

প্রথম আলোর আয়োজনে

‘কোন পথে অর্থনীতি ও আগামী বাজেট’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রকাশিত মতামত
২৮ মে ২০২২

সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখা মূল চ্যালেঞ্জ

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

যুগান্তর: আপনার বিবেচনায় এবারের বাজেটের মূল চ্যালেঞ্জ কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এবারের বাজেটের মূল চ্যালেঞ্জ হলো সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ধরে রাখা। এই স্থিতিশীলতার মূল স্তম্ভটা হতে হবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ। বিশেষ করে খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতিতে নজর দিতে হবে। সরকারিভাবে ৬ দশমিক ২৯ (এপ্রিল ২০২২) শতাংশ মূল্যস্ফীতির কথা বলা হচ্ছে।

কিন্তু এটি বাস্তবতার সঙ্গে আদৌ সংগতিপূর্ণ নয়। এক্ষেত্রে সরকারি তথ্যে আরও কৌতূহলের বিষয় হলো শহরের চেয়ে গ্রামে মূল্যস্ফীতি বেশি। গ্রামে খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি ৬ দশমিক ৬৪ শতাংশ (এপ্রিল ২০২২)। মোট মূল্যস্ফীতির চেয়ে বেশি। একই সঙ্গে খাদ্যবাহির্ভূত পণ্যের চেয়ে খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি বেশি। এটি ঠিক নয়। বাস্তবে মূল্যস্ফীতি আরও বেশি। আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও কঠিন হবে। কারণ সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম যে হারে বেড়েছে, সেই উচ্চমূল্যের পণ্য এখনো বাংলাদেশে আসেনি। এছাড়াও মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধি পাওয়ায় তা পণ্যমূল্যে প্রভাব ফেলছে।

ফলে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতার জন্য মূল্যস্ফীতিকে কেন্দ্রীয় সূচক হিসাবে বিবেচনার সুপারিশ করছি। অন্য সূচকগুলোকে সহযোগী হিসাবে বিবেচনায় নিতে হবে। কারণ, অর্থনীতির স্থিতিশীলতা নষ্ট হলে নিম্ন আয়ের মানুষ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো-মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে গেলে অর্থনীতির অন্য কয়েকটি সূচক বিবেচনায় নিতে হয়। এর মধ্যে টাকার মান স্থিতিশীল, সুদের হার উর্ধ্বমুখী এবং বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম নিম্নমুখী থাকলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়। কিন্তু সব জায়গাতেই বর্তমান অবস্থান আগের চেয়ে অনেক দুর্বল হয়েছে।

মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমছে, সুদের হারও ক্রমান্বয়ে বাড়তে হবে এবং বিশ্ববাজারে বিভিন্ন কারণে পণ্যের দাম বাড়ছে। ফলে এবারের বাজেটে আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে বড় ধরনের চাপ আসবে।

আমার কাছে মনে হচ্ছে, প্রকৃত অর্থেই সরকারকে আগের চেয়ে অনেক বেশি ধারণা করতে হবে। এটা দেশ ও দেশের বাইরে দুই জায়গায়ই হবে। দেশের ভেতরে ব্যাংকিং খাত থেকে ইতিমধ্যে সরকার বড় ধরনের ঋণ নিয়েছে। আগামী দিনে এটা আরও বাড়বে। দ্বিতীয়ত, সরকার ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে ৫০০ মিলিয়ন ডলারের একটি ঋণচুক্তি করেছে। পাশাপাশি পাইপলাইনে ৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি বৈদেশিক সাহায্য রয়েছে। সেগুলোকে ব্যবহারের উদ্যোগ নিতে হবে।

সেক্ষেত্রে খুবই দক্ষ, করিৎকর্মা এবং সচেতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ছাড়া বাজেট ঘোষণা করা হলে তা জনমানুষের কল্যাণে বাস্তবায়ন করা খুবই কঠিন হবে। আর মূল্যস্ফীতিকে মোকাবিলা করতে সবচেয়ে অসুবিধাগ্রস্ত নিম্ন আয়ের মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া বড় বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। এক্ষেত্রে টিসিবির মাধ্যমে আরও ব্যাপকভাবে খাদ্য পরিবেশন কিংবা সরাসরি অর্থসহায়তা অথবা তাদের মজুরি যাতে না কমে, সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

যোগান্তর: দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কীভাবে মূল্যায়ন করছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রতিটি বাজেটের একটি প্রেক্ষিত থাকে। সেক্ষেত্রে এ বছরের বাজেটের তিনটি প্রেক্ষিত রয়েছে। প্রথমত, করোনার আগে সর্বশেষ অর্থবছর ছিল ২০১৮-১৯। বর্তমানে করোনা উত্তরণের কথা বলা হলেও অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক এখনো আগের অবস্থায় ফিরে যায়নি। এ ঘটনিত নিয়েই ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করা হচ্ছে। দ্বিতীয় বিষয় হলো-আন্তর্জাতিক বাজারে বড় ধরনের সংকট চলছে।

এক্ষেত্রে জ্বালানি তেল এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সব ধরনের পণ্যের দাম বাড়ছে। রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আরও জটিল করে তুলছে। এই পরিস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একধরনের অস্থিতিশীলতা ও অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। তৃতীয়ত, ২০০৮-০৯ সালে বিশ্ব অর্থনীতি ও ব্যাংকিং খাতে বড় সংকটের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি হয়েছিল।

এরপর গত ১৩-১৪ বছরে বর্তমানে সবচেয়ে চাপে বা টানা পোড়েনে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি। অর্থাৎ এখনো করোনা-উত্তর পরিস্থিতিতে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এর মধ্যেই বিশ্ব অর্থনীতিতে সংকট, আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতিকে বড় ধরনের চাপে ফেলেছে। অন্যদিকে বিগত বছরগুলোয়ও দেশের আর্থিক দায়দেনা পরিস্থিতির কাঠামোটি সর্বদাই দুর্বল ছিল। এটি এখনো অব্যাহত রয়েছে।

আর দুর্বলতার লক্ষণ হলো কর-জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) অনুপাত ১০-এর ওপরে ওঠেনি। অর্থাৎ জিডিপির আকার ১০০ টাকা হলে, বর্তমানে কর আদায় মাত্র ৯ টাকা ৪০ পয়সা। দক্ষিণ এশিয়ায় যা সবচেয়ে কম। একই সঙ্গে সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্মসূচির চেয়ে পরিচালন ব্যয় অনেক বেশি।

যুগান্তর: সরকারের আয় বাড়ানোর জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আয় বাড়ানোর জন্য করের আওতা বাড়াতে হবে। কারণ দেশে বিপুলসংখ্যক মানুষ কর দেয় না। ১৭ কোটি মানুষের দেশে করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) আছে মাত্র ৭৪-৭৫ লাখ। আর কর দেয় ২৩-২৪ লাখ মানুষ।

এটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ যারা বিদেশে অর্থ পাচার করছে, তাদের সুবিধা দিয়ে টাকা দেশে আনা হচ্ছে; কিন্তু দেশের ভেতরে মানুষ কর দিচ্ছে না। এক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে কর আদায় করতে না পারা রাষ্ট্রক্ষমতার ব্যর্থতা। ফলে যারা কর দেয় না, তাদের করের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। তবে করমুক্ত আয়সীমা ৩ লাখ থেকে বাড়িয়ে সাড়ে ৩ লাখ টাকা করা উচিত। কারণ, করোনার কারণে বেশকিছু নিম্ন আয়ের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

যুগান্তর: বিভিন্ন কারণে বৈদেশিক খাতে চাপ বাড়ছে, এ ব্যাপারে বিশ্লেষণ কী বলছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শক্তির জায়গা ছিল বৈদেশিক খাত। রপ্তানি, রেমিট্যান্স, বৈদেশিক সাহায্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ শক্তিশালী ছিল। এতে বৈদেশিক আয়ব্যয় বা চলতি হিসাবের ভারসাম্য শক্ত অবস্থানে ছিল। এ অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। গত বছরের মার্চ পর্যন্ত চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ৫৫ কোটি ডলার ঘাটতি ছিল। এ বছরে মার্চে ওই ঘাটতি ১ হাজার ৪০৭ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। এই সংকট আরও বেশি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে। অনেকে লেখেন বা বলে থাকেন, বাংলাদেশের রপ্তানি আয় এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে। কিন্তু আমি বলব, এখানে অর্থনীতি বোঝার ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। কারণ রপ্তানির যে উল্লফন, এটি আমদানীকৃত উপকরণের দাম বৃদ্ধির কারণে হয়েছে।

ফলে এত রপ্তানি বৃদ্ধির পরও চলতি বছরের জুলাই থেকে মার্চ পর্যন্ত ৯ মাসে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি ২৪ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার। আর গত বছর এই ঘাটতি ছিল এর অর্ধেকের কাছাকাছি। অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে আমরা এত আত্মতুষ্টিতে ভুগছি। কিন্তু এটি ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। গত বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে রিজার্ভ কমতে শুরু করে।

এখনো এই কমা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে যে রিজার্ভ আছে (৪২ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার, এপ্রিল ২০২২), তা নিয়ে ৪-৫ মাসের বেশি আমদানি ব্যয় মেটানো যাবে না। এরপর বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম বাড়তে থাকলে রিজার্ভে বড় ধরনের টান পড়বে। এ কারণে টাকার মান আরও কমতে থাকবে। অর্থাৎ এ বছরে অর্থনীতির নতুন বিষয় হলো-রাজস্ব খাতের সঙ্গে

বৈদেশিক খাতের দুর্বলতা বাড়ছে। এছাড়াও বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ছে। এতে বাজেটে ভুতুর্কি বাড়বে বলে মনে হচ্ছে।

যুগান্তর: পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনতে সরকার প্রণোদনার কথা বলছে-এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: চুরি করে দেশের টাকা যারা বাইরে নিয়ে গেছে, সরকার তাদের দ্বিগুণ সুযোগ দিয়ে দেশে টাকা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে-এটা আমি এখনো বিশ্বাস করি না। এটা সত্য হলে, প্রমাণ হবে অর্থ পাচারকারীরা সরকারের নীতিকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখেন। অর্থাৎ যারা এই নীতি করছেন, তারাই বিদেশে অর্থ পাচার করেছেন কি না, এ প্রশ্নটি সামনে আসছে। তারা প্রথমে দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি প্রকল্প থেকে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করে বিদেশে নিয়ে গেছেন আবার সুনীতির মাধ্যমে সেই অর্থ দেশে ফেরত এনে সাদা করতে চাচ্ছেন।

এ ধরনের কার্যক্রম সং করদাতাদের মুখে চপেটাঘাত। অর্থনৈতিক বিবেচনায় কোনোভাবেই এটি যৌক্তিক পদক্ষেপ নয়। নৈতিকভাবে এটি অত্যন্ত খারাপ কাজ হবে। পাশাপাশি এটি রাজনৈতিকভাবে কোনো সরকারের জন্য গ্রহণযোগ্য বা রুচিকর সিদ্ধান্ত হতে পারে না। এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে দুদক বন্ধ করে দেওয়া হোক।

যুগান্তর: ঘাটতি অর্থায়ন নিয়ে আপনার মন্তব্য কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: অনেকে বলছেন, বিশাল বাজেট ঘাটতি। আমি তাদের সঙ্গে একমত নই। কারণ দেশে বাজেট ঘাটতি বেশি নয়। প্রতিবছরই বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৬ শতাংশের নিচে ধরা হয়। বাস্তবে ঘাটতি আরও কম। মূলত সরকার টাকা খরচ করতে পারে না। এর মূল কারণ হলো দুটি। প্রথমত, সম্পদের অভাব এবং দ্বিতীয়ত সম্পদ থাকলেও এর গুণগতমান সম্পূর্ণ ব্যয় করতে না পারা। আর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এটি একটি কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা বা ব্যর্থতা। অর্থাৎ কর আদায় কম, ব্যয়ও কম এবং নিয়ন্ত্রিত বাজেট ঘাটতি। এটি কোনো অবস্থাতেই অর্থনীতির শক্তির লক্ষণ নয়।

যুগান্তর: বিনিয়োগ বাড়াতে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে মনে করছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: গত কয়েক বছরে দেখা গেছে, বিনিয়োগ একটি নির্দিষ্ট হারের মধ্যে আটকে আছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ছিল জিডিপির ৩১ দশমিক ০২ শতাংশ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩১ দশমিক ৬৮ শতাংশ। এর মধ্যে বেসরকারি বিনিয়োগের হার হলো ২৩-২৪ শতাংশ। কিন্তু করোনার আগে ২০১৯ অর্থবছরে বিনিয়োগ ছিল জিডিপির ২৫ শতাংশ। অর্থাৎ এখনো আমরা আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারিনি।

এরপরও জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। এখানেও আমরা বলছি, জিডিপি প্রবৃদ্ধির সঙ্গে বাস্তবতার মিল নেই। অন্যদিকে সরকার বলছে বৃহৎ শিল্পে জিডিপির ১২ দশমিক ৮৭ শতাংশ বিনিয়োগ হয়েছে। এক্ষেত্রে ছোট ও মাঝারি শিল্পে ১১ দশমিক ৭১ এবং কুটিরশিল্পে ১১ দশমিক ৭৫ শতাংশ।

এখানেও দেখা যাচ্ছে বড় শিল্প বেশি সুবিধা পাচ্ছে। কিন্তু সাধারণ নিয়মে ছোট শিল্পে বিনিয়োগ হলে কর্মসংস্থান বাড়ে। ফলে এখানেও বৈষম্য হচ্ছে। ফলে করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এবারের বাজেটে দেশীয় বাজারমুখী শিল্পকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

যুগান্তর

৩ জুন ২০২২

প্রবাসী আয়ের জাদু শেষ হয়ে গেছে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে সংকট এখন বিকাশমান। অর্থনীতি যে চাপে তা বলার অবকাশ রাখে না। আগে আর্থিক খাতে দুর্বলতা থাকলেও বৈদেশিক খাত শক্তিশালী ছিল। কিন্তু এখন বৈদেশিক খাতও দুর্বল। রেমিট্যান্স প্রবাহে ভাটা পড়েছে। এমনকি রপ্তানি আয়ও কমে গেছে আকস্মিকভাবে। অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, বর্তমানে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির যে অবস্থা, তাতে এখন আর শুধু খাত বিশেষে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপ নিলে হবে না, দরকার সমন্বিত প্যাকেজ পরিকল্পনা। তা না হলে অর্থনীতিতে সংকট আরও প্রকট হতে পারে।

এই মুহূর্তে শুধু খাত বিশেষে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও অপরিপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়ার সময় আর নেই। এখন সময় সমন্বিত পরিকল্পনার।

আমি আগেও বলেছিলাম প্রবাসী আয়ের যাদু শেষ হচ্ছে। এখন যাদু তো শেষ! প্রবাসী আয় এখন কোনো মাসে বাড়বে কোনো মাসে কমবে।

এখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সামগ্রিক অর্থনীতিতে— আমরা অনেক আগে থেকেই বলে আসছি, রেমিট্যান্সের যাদু শেষ হচ্ছে। আজ থেকে ৬ মাস আগেই বলেছি। তখন থেকেই পদক্ষেপ নেয়া যেত, বিদেশে লোক পাঠানোর খরচ কমানো যেত। তিনি বলেন, এখন প্রবাসী আয় প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার চেয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াতে অনেক বেশি চলে গেছে। সরকারি হিসাবের বাইরে ছুঁড়ি দিয়ে আসছে। এটা ফিরিয়ে আনতে হলে আড়াই শতাংশ প্রণোদনা কোনো দীর্ঘ মেয়াদে কার্যকর ব্যবস্থা না। টাকার বিনিময় হার বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখাটাই কাজের কথা।

এখন অর্থনীতি যে চাপের মধ্যে আছে এটা সবাই বুঝে। গুরুত্বপূর্ণ হলো— আগে আমার আর্থিক খাতে দুর্বলতা ছিল এবং বৈদেশিক খাত শক্তিশালী ছিল। কিন্তু এখন বৈদেশিক খাতও দুর্বল হয়ে গেছে। অর্থাৎ অর্থনীতির দুই ইঞ্জিনের মধ্যে এক ইঞ্জিন একটু শক্তিশালী ছিল, এখন দু'টো ইঞ্জিনই দুর্বল হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে অর্থনীতিতে একটি সংকট বিকাশমান।

এখন এটার সমাধান হলো- এই সংকটকে স্বীকার করে নিয়ে সর্বমুখী যথাপযুক্ত কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। এখানে একটু মুদ্রানীতি ঠিক করলাম, এখানে একটু এলসি মার্জিন বাড়লাম এগুলো বিষয় না, এখানে একটি সমন্বিত প্যাকেজ পরিকল্পনা লাগবে। একটি স্থিতিকরণের ৩ বছর মেয়াদি প্যাকেজ পরিকল্পনা লাগবে। এই মুহূর্তে খাত বিশেষে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপ নেয়ার সময় আর নেই। এখন সমন্বিত পরিকল্পনার সময়।

এখন শুধু রেমিট্যান্স আয়ের বিষয় না, এখন সামগ্রিক চলতি হিসাবের ভারসাম্যের হিসাবের বিষয়। সুতরাং শুধু বাংলাদেশ ব্যাংক না, এখানে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ- এদের মিলে সমন্বিতভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। মুদ্রানীতি এবং আর্থিক নীতির সমন্বিত পদক্ষেপ দরকার। এ রকম বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন, অপরিপূর্ণ পদক্ষেপে কোনো কাজ হবে না। এতে শুধু অপচয় হবে। এখানে নীতি নেতৃত্বের দুর্বলতা আছে। আমরা তো ঘটনার পেছনে ছুটছি, ঘটনার আগে নেতৃত্ব দিতে পারছি না।

টাকার সঙ্গে ডলারের বিনিময় হার নমনীয় ও বাস্তবসম্মতভাবে নির্ধারণ করা উচিত। আমরা এটাকে বলি কার্যকর বিনিময় হার। যেটা এখনো সরকারি হিসাবে টাকা অতিমূল্যায়িত রয়েছে। সুতরাং কৃত্রিমভাবে ডলারের মূল্য নির্ধারণ করে দিয়ে এটাকে কার্যকর করা যায় না। এটার ফলে বিকল্প বাজার সৃষ্টি হয় এবং ব্যাংকের মাধ্যমে না এসে হুন্ডির মাধ্যমে রেমিট্যান্স আসে। তাই বিনিময় হার সমন্বয় করা উচিত বাস্তবতার নিরিখে। বাংলাদেশ ব্যাংক যে দর নির্ধারণ করে দেয় সেটা বাস্তবসম্মত নয়। উদাহরণ টেনে এই গবেষক বলেন, নদীতে যখন জোয়ার আসে তখন খড়কুটো দিয়ে বাঁধ দিতে পারেন না, ওটা ভেসে যাবে। অর্থাৎ চাহিদা এতবেশি যে, সেটার প্রশাসনিক ব্যবস্থার অর্থনীতির মৌল পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে কোনো সময় এটা কার্যকর হয় না।

মানবজমিন

৩ জুন ২০২২

বাজেটে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে

মোস্তাফিজুর রহমান

আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট, করোনা পরবর্তী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে দেশ রূপান্তরের সঙ্গে কথা বলেছেন অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন দেশ রূপান্তর সম্পাদকীয় বিভাগের এহসান মাহমুদ।

দেশ রূপান্তর: দেশের গত দু'টি বাজেট করোনা মহামারীর মধ্যে হয়েছিল। এবারের বাজেটে করোনা মহামারীর ভয়াবহতা না থাকলেও অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হওয়ার বিষয়টি বেশ আলোচনা হচ্ছে। আসছে বাজেটে এই বিষয়গুলো কীভাবে মোকাবিলা করা যাবে বলে মনে করেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: এবারের বাজেটে বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ আমি দেখি। কোভিড থেকে অতিক্রমের বাজেট হতে হবে এটি। কোভিডকালীন দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা, তারা যেসব সমস্যার মধ্য দিয়ে গিয়েছে অনেকে চাকরি হারিয়েছেন, অনেকের পেশা বদল করতে হয়েছে, অনেকে ব্যবসায় আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছেন তাদের কথা বিবেচনায় আনতে হবে। করোনার ফলে অর্থনৈতিক মন্দ অভিঘাতে যারা পড়েছেন, তাদের অর্থনৈতিক মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে এই বাজেটে পরিকল্পনা রাখতে হবে। এই সময়টাতে অর্থনীতি যতটা পিছিয়েছে তা পুনরুদ্ধারে সরকারের পরিকল্পনা রাখতে হবে, বাজেটে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এটা গেল প্রথম দিক।

দ্বিতীয়ত, আমরা এখন যেটি দেখছি বৈশ্বিকভাবে অর্থনীতি এখন একটি চাপের মধ্যে আছে। বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম বৃদ্ধি, তার কারণে আমদানি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং তার ফলে মানুষের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতার ওপর চাপ এটা হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ। তৃতীয় যে চাপটি 'ব্যালেন্স অব পেমেণ্ট' এর ওপর একটি চাপ দেখা যায়। এর অভিঘাত এসে পড়েছে বৈদেশিক মুদ্রার ওপর। এবং এই অভিঘাত এসে পড়েছে আমাদের মুদ্রাস্ফীতির ওপরও। চার নম্বরে আমরা দেখি যে, আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় যে দুর্বলতা, সেই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার

চ্যালেঞ্জ। এছাড়া বাজারে দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখতে সরকারের যে উদ্যোগ তার সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার একটি ঘাটতি দেখা যায়। এসব জায়গাতে উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়া ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগকে চাঙ্গা করতে হবে। ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বাড়ানো গেলে এমন অবস্থা ধীরে ধীরে কমে আসবে। এর জন্য এবারের বাজেটে রাজস্ব ব্যয়, রাজস্ব প্রণোদনার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

দেশ রূপান্তর: আগামী ২৫ জুন পদ্মা সেতু উদ্বোধন করা হবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। পদ্মা সেতু নিয়ে গুরুতে নাটকীয় ঘটনা কম হয়নি। সবশেষে এখন এই সেতু চালুর অপেক্ষায়। অর্থনীতিতে এর প্রভাব কী হতে পারে?

মোস্তাফিজুর রহমান: আমার মনে হয়, এই সেতু বাংলাদেশের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য, দেশের বাইরে নিজেদের সক্ষমতা জানান দেওয়ার জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আমরা যে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের কথা বলি, সেখানেও এটি একটি বড় কাজ। তাই এটি যে কেবল একটি বৃহৎ অবকাঠামো তা নয়, এর বাইরেও আরও বেশি কিছু এটা। পদ্মা সেতুর ফলে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে অবদান বাড়বে। এটাকে আমি কেবল আর্থিক দিক থেকেই নয়, একে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সামগ্রিক উন্নয়নের অংশ হিসেবেই দেখি। এটা আমাদের দেশের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন। আমি বলব যে, বাংলাদেশের একটি অংশ যা এতদিন যোগাযোগে কিছুটা বিচ্ছিন্ন ছিল, এই সেতুর মধ্য দিয়ে তা একত্রিত হবে। পুরো দেশের মধ্যে একটি সমন্বয় হবে। এটি যেমন যোগাযোগের ক্ষেত্রেও হবে আবার সামগ্রিকভাবেই হবে। পদ্মা সেতুর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একটি সমন্বিত অর্থনীতির দেশ হিসেবে সামনে এগিয়ে যাবে।

আর অর্থনীতির কথা যদি বলি, বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে পদ্মা সেতু চালু হলে বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) দেড় থেকে দুই শতাংশ বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে পদ্মা সেতু। এই সেতুর মাধ্যমে অর্থনীতি আগের চেয়ে উন্নত হবে। নানা কর্মকাণ্ডের সৃষ্টি হবে। এর ফলে শিল্পপার্কে সৃষ্টি হবে। দেশের বিপণন ব্যবস্থা, বিতরণ ব্যবস্থার সুযোগ বাড়বে পাশাপাশি ব্যয় কমবে। এই সেতুর ওপর দিয়ে সড়কের সঙ্গে রেললাইনও যাবে। এগুলো সবকিছুর সমন্বিত কর্মকাণ্ডের ওপরই নির্ভর করবে। তখনই আমরা সুফল পাব। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ২১ জেলায় যে কৃষিপণ্য উৎপাদন হয় তা অন্যান্য অঞ্চলে পৌঁছতে বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত হতো। পদ্মা সেতু চালু হলে কৃষকরা ভালো দাম পাবেন। দ্রুততার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় আসবে। পচনশীল পণ্য তাড়াতাড়ি আসবে। কৃষক ও ভোক্তা পর্যায়ে যে মধ্যস্থত্বভোগী তা দূর করা সহজ হবে। কৃষকরা ন্যায্য দাম পাবেন। এ ছাড়া কৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাত শিল্প হবে। এটা করার মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প গড়ে উঠবে। সেই ক্ষেত্রে পদ্মা সেতু ইতিবাচক অবদান রাখবে। এর ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে উৎপাদন পর্যায়ে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়বে। যা দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এছাড়া এই সেতুর মাধ্যমে একইসঙ্গে উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ভারত, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে সংযোগ থাকবে। এটা তখন শুধু পরিবহন করিডর নয় অর্থনৈতিক করিডর হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

দেশ রূপান্তর: বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণে বাংলাদেশের যে সক্ষমতা দেখা যাচ্ছে, এটিকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: আমরা পদ্মা সেতু নিজস্ব অর্থায়নে ও নিজেদের ব্যবস্থাপনায় করেছি। প্রকৌশলীরা এর প্রকিউরমেন্ট থেকে শুরু করে এর নির্মাণকাজও শেষ পর্যন্ত করেছেন। বাংলাদেশের যে সামর্থ্য আছে প্রকল্প বাস্তবায়ন করার সেটা ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরবে। এই সেতু এশিয়ান হাইওয়ে ও রেললাইন লিংকেও যুক্ত হবে। এটার পরিচিতি কেবলমাত্র যে বাংলাদেশে থাকবে তা না, এর বাইরে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে চলে যাবে। এর গুরুত্ব তাই দেশের বাইরেও যাবে। সার্বিকভাবে অবশ্যই পদ্মা সেতু বাংলাদেশের ভাবমূর্তিতে একটা ইতিবাচক ও উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করবে।

দেশ রূপান্তর: সময়মতো প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় বাজেট বাড়তে হয়, আবার কাল্পনিক ফলাফলও অনেক সময় পাওয়া যায় না। এতে করে অর্থ খরচের বিষয় ছাড়াও প্রকল্প ব্যয়ে অস্বচ্ছতার বিষয়ও রয়েছে। এটিকে কীভাবে দেখছেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: এটা সত্য যে সময়মতো কাজ শেষ করতে না পারলে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায় একের পর এক সময় বৃদ্ধি করা হয়। আবার সেই সঙ্গে প্রকল্পের প্রস্তাবিত বরাদ্দও বাড়তে থাকে। এটা একটি সামগ্রিক বিষয়। জবাবদিহি ও সুশাসন নিশ্চিত করা গেলে এইসব রোধ করা অসম্ভব নয়।

দেশ রূপান্তর: সম্প্রতি সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে কৃষ্ণ সাধনের নির্দেশনা এসেছে। এটাকে কীভাবে দেখছেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: আমরা যদি গত দুই বছরের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে দেখি, তবে বলতে পারি এই সময়টা ছিল লড়াই করার। করোনার অভিঘাতে বিশ^ অর্থনীতিতেই একটি ধাক্কা লেগেছে এটা সত্য। আবার এর পরেই এখন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ দেখতে হচ্ছে বিশ্ববাসীকে। আন্তর্জাতিক পরিম-লেও এই যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে। বিনিয়োগ, ব্যালেন্স অব পেমেণ্ট এসব স্থিতিশীলতা হারিয়েছে। এটা সার্বিকভাবে প্রভাব ফেলেছে। তাই সবাই এখন অতিরিক্ত ব্যয় এবং খরচ কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে। আমাদের সবারই উচিত অপব্যয় ও অপচয় বন্ধে গুরুত্ব দেওয়া।

দেশ রূপান্তর: সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারের দাম নির্ধারণ করেছিল। সব ব্যাংকের জন্য একই হার নির্ধারণ করেছিল। কিন্তু দেখা গেল এখন সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কঠোরভাবে এটি পালন করতে পারল না কেন বলে মনে করেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: সারা বিশ্বেই কিন্তু ডলারের মূল্য ওঠানামা করছে। এক্ষেত্রে আমাদের এখানেও তাই ঘটেছে। দেখা গেল, একজন পাঁচানব্বই টাকায় ডলার কিনেছে, কিন্তু এখন

তিনিও চাইবেন এর চেয়ে বেশি দামে না হলেও অন্তত এই দামে বিক্রি করতে। তিনিও ক্ষতি এড়াতে চাইবেন, এটাই স্বাভাবিক। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত ছিল।

দেশ রূপান্তর: বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য থেকে শুরু করে সবকিছুর বাজারমূল্য উর্ধ্বমুখী। এমনিতেই বাজেটের পরে দেশে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পায়। নিত্যপণ্যের দাম জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে আসছে বাজেটে কোন দিকগুলোকে বিবেচনায় রাখতে হবে?

মোস্তাফিজুর রহমান: বাজেটের আগে থেকেই প্রতি বছর কিছু কিছু পণ্যের দাম বাড়তে থাকে। এটা এক শ্রেণির ব্যবসায়ীর অতি মুনাফার ইচ্ছা এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরদারি বলি আর মনিটরিং যা-ই বলি এসবের ঘাটতির ফলেই এমনটা হয়। পাশাপাশি কিছু পণ্যে কর কমিয়ে আনা গেলে বাজারের উর্ধ্বমুখী অবস্থা থামানো যায়। এছাড়া পণ্যের চাহিদা অনুসারে জোগান কেমন আছে তার সঠিক হিসাব নির্ণয় করাও জরুরি। আবার মজুদদারদের কারসাজিও আছে। এসব ক্ষেত্রে সজাগ থাকা গেলে বাজার সহনীয় রাখা যায়।

দেশ রূপান্তর: আপনার পরামর্শ কী? বাজেট কেমন হওয়া উচিত?

মোস্তাফিজুর রহমান: সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। কিছু কিছু অপ্রত্যক্ষ কর রয়েছে, এসবের পরিমাণ যদি কমিয়ে আনা যায়, তার সুফল সাধারণ লোকজন পাবে। কর আদায়ের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করতে হবে। তবে তা করতে গিয়ে যেন সাধারণের ভোগান্তি বৃদ্ধি না পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া দীর্ঘদিনের পদ্ধতির সংস্কার করতে হবে। কম আয়ের মানুষদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য গত বাজেটে যে সুযোগ রাখা হয়েছিল, এটি এবারও অব্যাহত রাখতে হবে। কিছু কিছু ভোগ্যপণ্য রয়েছে, সে সবের ভ্যাট-ট্যাক্স কমিয়ে আনতে হবে। তাতে করে কিছুটা শাশয় হবে সাধারণ লোকজনের। বাজেটে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। শুধু বৃদ্ধি করাই নয়, এর ব্যবস্থাপনায়ও গুরুত্ব দিতে হবে। ডিজিটাল ডিভাইসসহ, ইন্টারনেট খাতের ভ্যাট-ট্যাক্স কমিয়ে আনতে হবে।

দেশ রূপান্তর: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

টিসিবির গুদামে চাল ঢুকাতে হবে এবং এই টিসিবিকে জেলা পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

জিঙ্কুর রহমান: বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরের পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্যে। প্রিয় দর্শক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে আলোচনার জন্যে আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন অর্থনীতিবিদ এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। স্বাগত আপনাকে তৃতীয় মাত্রায়। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, প্রতি বছর আমরা অপেক্ষায় থাকি অনেকটা যেমন বাজেটের জন্য, বাজেটে কী থাকবে না থাকবে, তেমনি বাজেটকে আপনি এক কথায় কীভাবে চিত্রায়িত করেন সেটিও বোঝার জন্যে। তো আমি এই পর্যন্ত যা দেখলাম যে আপনি বাজেটকে বলছেন যে বড় কথার ছোট বাজেট, সমৃদ্ধির জন্য সতর্কতা বাজেট, সংযত উচ্চাশার বাজেট— তিনটা কাগজে আমি দেখলাম এরকম তিনটি হেডলাইন, অন্যান্য হেডলাইনও করেছে কেউ কেউ এবং একটি কাগজে দেখলাম যে আপনি প্রথমত তিনটি বিষয়ে বাজেট সম্পর্কে বলতে চান। সে ব্যাপারে গুনতে চাই আপনার কাছে আমার দর্শকদের জন্যে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রথম কথা যে জিঙ্কুর আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ। এবং আপনার মাধ্যমে বাংলাদেশে এবং দেশের বাইরে দর্শক-শ্রোতা যারা আছে তাদেরও শুভেচ্ছা জানাই। এবারের বাজেট তো একটু বিশেষ প্রেক্ষিতে এসেছে, প্রত্যেক বছরই বাজেটের একটা প্রেক্ষিত থাকে, এবারের প্রেক্ষিতটা বিশেষভাবে ছিল তিনটি। প্রথমত হলো যে আমাদের অতিমারি উত্তর যে পরিস্থিতি, তার থেকে সম্পূর্ণরূপে আমরা এখনো বের হতে পারিনি। স্বাস্থ্যগতভাবে হয়তো বের হয়েছি কিন্তু আর্থ-সামাজিক তাৎপর্যের থেকে, অভিঘাতের থেকে বের হইনি। ঘটনাক্রমে অর্থমন্ত্রী কিন্তু তার বক্তব্যে বলেছেন যে আমরা করোনা থেকে বের হয়ে গেছি। এটা আসলে, আবার বলছি, পূর্ণভাবে হয়তো সত্য না। কারণ স্বাস্থ্যগত কারণে অর্থনীতির উপর দিয়ে যে ধাক্কা গেছে তা এখনো নিম্নবিত্ত মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষ ভোগ করেছে এবং এটা আরো বেশি জটিল হয়েছে দ্বিতীয় একটি কারণে এবং সেটি হলো যে এই

মুহূর্তে অর্থনীতিতে সামগ্রিক স্থিতিশীলতা কিছুটা অসুবিধায় পড়েছে; বিশেষ করে মূল্যস্ফীতির কারণে। আগের করোনা সময়কালে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তারা এর থেকে উত্তরণের আগেই আবার মূল্যস্ফীতিটা তাদের আঘাত করেছে। তৃতীয় কারণ হলো যে, এই মুহূর্তে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটছে যা আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য মূল্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে, সরবরাহ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছে, আপনার পরিবহন খরচ বাড়িয়ে দিয়েছে এবং এটার কবে যে কীভাবে শেষ হবে সেটার কোনো নিশ্চয়তা নেই। অনেক দিন পরে অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেছেন, যে অর্থনীতিতে একটা সংকট বিরাজ করছে, বিদ্যমান। সেই সংকটটির কারণে এই মুহূর্তে বাজেট প্রণয়ন করা এবং বাজেট বাস্তবায়ন করা জটিল হয়ে গেছে।

জিল্লুর রহমান: এবং উনি ছ'টি চ্যালেঞ্জের কথাও বলেছেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: উনি চ্যালেঞ্জের কথা বলেছেন। কিন্তু আপনারা যদি আরেকটু ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করে দেখেন, তাহলে দেখবেন যে তিনি এই পরিস্থিতিতে পুরো দোষারোপটাই করেছেন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপরে। আমাদের দেশের অর্থনীতির ভিতরে যে ব্যবস্থাপনাপ্রণালী বা প্রাতিষ্ঠানিক কোনো সীমাবদ্ধতা আছে, সেটার কোনো কিন্তু স্বীকারোক্তি দেন নাই। এর পরবর্তীতে দ্বিতীয়তে যেটা হয়েছে, সেটা হলো যেই বাজেটটি তৈরি করা হচ্ছে, সেই বাজেটটির ভিতরে এইসে বড় বড় কথাগুলি হয়েছে, এই বড় বড় কথাগুলোর প্রতিফলন থাকবে না। বরং যে বাজেটটি প্রস্তাব করছেন, সেই বাজেটটি আপনারা দেখবেন যে জাতীয় আয়ের সাথে যদি আপনি তুলনা করেন, তাহলে গত যেকোনো বছরের চেয়ে ছোট বাজেট হয়েছে। আসলে আপনারা লক্ষ-কোটি টাকা বলেন, আমরা অর্থনীতিবিদরা ঐ লক্ষ-কোটি টাকা বুঝি না।

আমরা বুঝি যে দেশের সরকারের অর্থনীতির যে আয়তন, সেই অনুযায়ী কী হয়েছে। অর্থাৎ আপনার শরীরটা যদি বড় হয়, আর আপনি যদি বলেন যে আমি বড় বড় জামা গায়ে দিচ্ছি, আসলে তো আপনি বড় জামা গায়ে দিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু আপনার শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী জামাটা গায়ে দিবেন। তো আপনি তো ছোট জামা নিয়ে বড় গায়ের আপনি গর্ব করতে পারেন না। এই জায়গাটাই আমাদের বুঝার ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। এবারের বাজেটে আপনি দেখেন যে যে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, সেটা জাতীয় আয়ের ৯.৭ শতাংশ। এটি যেকোনো বিগত সময়ের চেয়ে কম। এখনো আমরা ১০ এর উপরে উঠতে পারছি না কোনো অবস্থাতেই। এটা এখনো ৯.৩ এর ভিতরে রয়েছে। সেইতো দেখুন রাজস্বের দিক থেকে কিন্তু আমাদের উচ্চাশাটা বেশ সংযত। দ্বিতীয়ত হলো, ব্যয়ের দিক থেকে আপনি যদি দেখেন, তাহলে ১৫.৭ শতাংশ আমি মোট সরকারি ব্যয়ের কথা বলছি। লক্ষ্য করে দেখবেন, অর্থমন্ত্রী তার বাজেট বক্তৃতার ভিতরে বিভিন্ন দেশের জাতীয় আয়ের অংশ হিসেবে তাদের রাজস্ব এবং অন্যান্য বিষয় বলেছেন এবং বাংলাদেশ তার নিচে এবং তিনি নিজেই তা স্বীকার করেছেন। ঐ যে বললাম উনার দিক থেকে সমস্যার স্বীকৃতি প্রথমবার আমি লক্ষ্য করেছি এবং সেজন্য উনাকে সাধুবাদ দেই। সেহেতু ১৫.৭ এর মধ্যে যদি আপনি লক্ষ্য করেন, যে এটার ভিতরে আপনার উন্নয়ন বাজেটের যে অবদান, সেই উন্নয়ন বাজেটের অবদান কিন্তু আগের চেয়ে বাড়ে নাই; বরঞ্চ তার চেয়ে একটু কমেছে। এবং এইটার বড় কারণ হলো সরকারের

পরিচালন ব্যয় অর্থাৎ রাজস্ব ব্যয় প্রভূত পরিমাণে বেড়েছে। যার ফলে সরকারের যে ঘাটতিটা দেওয়া হয়েছে, এটা ৫.৫ শতাংশ, গতবার এটা ৫.৩ দেওয়া হয়েছিল, হয়তো ৪ এর কাছাকাছি হবে, সেই অর্থে।

অর্থাৎ, পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আমরা যে বলি সম্প্রসারণশীল অর্থনীতি লাগবে, অর্থাৎ আপনি আরো বেশি টাকা সঞ্চালন করবেন, আরো বেশি মুদ্রা দিবেন, আরো বেশি ঋণ দিবেন, সেইরকম পরিস্থিতি থেকে একটুখানি সংযত হয়েছে। এইজন্যই আমি বলেছি সংযত উচ্চাশার বাজেট। আর ছোট বলেছি এইজন্য যে, কার্যত এই বাজেটটা গত দুইবছরের চেয়ে অর্থনীতির মাপকাঠিতে ছোট বাজেট হয়েছে। এটা যে ভুল হয়েছে এটা কিন্তু আমি বলিনি; আমি বলছি ছোট হয়েছে। কারণ হলো, এর চেয়ে বড় বাজেট করতে গেলে দেশের যে আর্থিক সংস্থান করতে হবে, সে আর্থিক সংস্থান নেই। বাংলাদেশে এই মুহূর্তে সরকারের খরচ করার ক্ষমতা আসলেই খুবই সীমাবদ্ধ তো বটেই বরং প্রয়োজনের তুলনায় কম।

জিল্লুর রহমান: সেটা তো এই বাজেটেও প্রতিফলন ঘটেছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এই বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে বিভিন্নভাবে, এক নম্বর হলো যে এই মুহূর্তে আমার সকলে আপনারা শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশ আলোচনা করেন না? আপনাকেও বলেছি, বাইরেও হয়তো বলেছি যে বাংলাদেশের সাথে শ্রীলঙ্কার অন্যতম পার্থক্য হলো, দুটি দেশই কিন্তু ঋণ করছে। শ্রীলঙ্কা ঋণ করেছে বেশি বাইরের থেকে, আমরা ঋণ করেছি ভিতর থেকে। আমার যে ঋণের দায়-দেনা পরিশোধ, এটা অভ্যন্তরীণ ঋণে অনেক বেশি; এবং এটা আমরা কোন্ সময় করেছি? উচ্চ সুদে জাতীয় সঞ্চয়পত্র বিক্রি করে এবং ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগকারীদেরকে বাদ রেখে সরকার ব্যাংকের থেকে টাকা নিয়ে। এবারও যদি আপনি দেখেন, যে ঘাটতিটা হয়েছে, সেটা দুই উৎস থেকে মেটানোর কথা বড় ভাবে হয়েছে। ৪০-৪৪ শতাংশ হবে আপনার বিদেশি ঋণের থেকে আবার ৫০-৬০ শতাংশ ভিতর থেকে, তার ভিতরে মূলত ব্যাংকের থেকে। আর বিদেশেরটা যেটা হবে, সেটার জন্য আপনি ইতিমধ্যেই গুনেছেন যে সরকার ইতিমধ্যে ৫০০ মিলিয়ন ডলার বাজেট সহায়তা চেয়েছে বিশ্বব্যাংকের কাছে, আরো ৫০০ মিলিয়ন ডলার এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কাছে, আরো ৫০০ মিলিয়ন ডলার হয়তো পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংকের কাছে চাইবে। কিছুটা কোভিড-উত্তর পরিস্থিতি, কিছুটা এই বাজেট ঘাটতি মেটানোর জন্য। দেখার বিষয় হল, বাংলাদেশ কোনো একটি সময়ে আইএমএফ-এর আছে যায় কিনা।

জিল্লুর রহমান: আইএমএফ-এর কাছে গেলে কি হয়?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেখুন বিশ্বব্যাংকের থেকে যে টাকাটা আমরা নেই, তা হল আর্থিক খাতের ঘাটতি মেটানোর জন্য। আইএমএফের থেকে যেই ঋণটা নেই, সেটা বৈদেশিক লেনদেনের ঘাটতি মেটানোর জন্য। বৈদেশিক লেনদেনের ঘাটতি এবং বাণিজ্য ঘাটতি যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং সেটার ফলে টাকার উপরে যে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, তা ঠেকা দেয়ার মত আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক মজুদ থেকে বাজারে বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়তে পারছে না। সেক্ষেত্রে কোনো সময়

আপনাকে আইএমএফের কাছে থেকে ধার করে কিছু নিয়ে এসে জমা রাখতে হয়।
জিল্লুর রহমান: শ্রীলঙ্কার কথা বলছিলেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তো শ্রীলঙ্কার কথা আমি বলছিলাম যে শ্রীলঙ্কার সাথে তফাতটা হলো আমাদের অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে আছে, অন্যান্যটা আমি পরে রাখছি। এখন আমাদের অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে আমাদের রাজস্ব ব্যয় তিনটি খাতে বড়ভাবে চলে যাচ্ছে। একটি হল সরকারি বেতন-ভাতা এবং বাকিগুলো হল দায়-দেনা পরিশোধ, ভর্তুকি এবং বিভিন্ন ধরনের হস্তান্তর। এখন এবারের বাজেটের ক্ষেত্রে যে বিষয়ে আমি সরকারের পদক্ষেপকে অবধারিতভাবে সঠিক মনে করি, সেটা হল আমাদের বিভিন্ন ভর্তুকির জন্য টাকা রাখতে হয়েছে। আমরা অনেকেই বলেছিলাম যে এই মুহূর্তে সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা এবং বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিত্য প্রয়োজন ছাড়া; এটার উপরে একটা নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত যেরকমভাবে সরকার বিদেশ ভ্রমণের উপরে নিয়ন্ত্রণ দিয়েছে। এটাতে খুব সামান্যই হয়তো অর্থ সঞ্চয় হবে, কিন্তু এটি সরকারের মিতব্যয়িতার সংকেত হিসেবে কাজ করবে। এরকম মিতব্যয়িতার সংকেত হিসেবে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার উপরে ১-২ বছরের জন্য একটা নিয়ন্ত্রিত অবস্থা দেয়া প্রয়োজন।

আমরা যে টাকা উদ্ধৃত দিতে পারছি না, এর ফলেই কিন্তু উন্নয়ন বাজেট এবার খুব সামান্য বেড়েছে। কার্যত এ বাজেট বাস্তবায়ন হলে এটা হয়তো গত বছরের চেয়েও কম হয়ে যাবে। এজন্য আমি বএত কথা বললাম আপনাকে, ছোট বাজেট বুঝানোর জন্য। অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে এবং বিশ্বের বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এইবার বাংলাদেশের খুব বড় একটা বাজেট দেওয়ার সুযোগও খুব সীমিত এবং যদি ঐ এক-দেড় বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক সাহায্য আমরা না পাই, তাহলে কিন্তু এইটুকুও করা আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে। আবার এটার সাথে যদি আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি বাড়তে থাকে, রেমিট্যান্সের আয় কমতে থাকে এবং আমার তো সেই অর্থে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ এক বিলিয়ন ডলারের নিচে কার্যত হয়, বিশ্বে তেল এবং অন্যান্য পণ্যের দাম বাড়তে থাকে, তাহলে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি মেটানোর জন্য আরেক ধরনের টাকার প্রয়োজন পড়বে। আসলে আইএমএফের কাছে যাব কথাটা যেকোনো অর্থনীতির লোকের কাছে বললে বা নীতির লোকের কাছে বললে এটা মনে হয় যে ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যাওয়ার মতো আরকি, যে আমার একটা দুরারোগ্য ব্যাধি হয়ে গেছে। কিন্তু আমি এটাকে এরকমভাবে দেখি না। আমি মনে করি যে এ প্রতিষ্ঠানগুলো হয়েছেই আমাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য, এটার ভিতর সমস্যাটা হয় অন্য জায়গায়। এই মুহূর্তে যখনই আপনি বিশ্বব্যাংকের কাছে বা আইএমএফের কাছে যানেন তারা তখন আপনাকে অর্থনৈতিক সুশাসনের জন্য কিছু শর্ত দিয়ে দেবে। সেই শর্তগুলো যদি আপনি পালন করার মতো অবস্থায় না থাকেন তখন কী হবে? আবার শ্রীলঙ্কায় ফিরে আসি। দেখুন, শ্রীলঙ্কায় কী হয়েছিল? শ্রীলঙ্কাতো আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংক এইরকমই শর্ত দিয়েছিল, যে তোমরা যেই করের হার রেখেছ এটা গ্রহণযোগ্য না। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে কী হয়েছিল? তাদের বলা হয়েছিল যে সমস্ত ক্ষেত্রে ভর্তুকি দিচ্ছ যেমন তেলের ক্ষেত্রে ভর্তুকি; এটা গ্রহণযোগ্য না। ইমরান খান তার ক্ষমতা ছাড়ার আগের দিনও তেলের দাম কমিয়ে সে নির্বাচনে নিজেকে বা রাজনীতিতে নিজেকে জনপ্রিয় করতে চেয়েছে। রাজাপাকসের দল এবং

সেও ঠিক একই পদ্ধতি অবলম্বনের চেষ্টা করেছে যার কোনো মানে নাই। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত এরচেয়ে অনেক বড় কিছু মেনেছে। আর তা হলো ভতুরির বদলে নিজের পদটা দিয়ে দিয়েছে। এখান থেকে বাংলাদেশের জন্য শিক্ষণীয় হল যে সময় থাকতে সংস্কারগুলো করতে হবে, সময় থাকতে ব্যবস্থা নিতে হবে। এইটাই বাজেটের ব্যাপারে আমার যে কথা ছিল সেটা হল যে, সমস্যার স্বীকৃতি আছে কিন্তু সে সমস্যার সমাধানের পথের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সততা নেই। আমি বলছি সেইটার সততা নেই। সততা নেই কারণ এ সমস্যাটা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বের থেকে সৃষ্ট না। উদাহরণস্বরূপ, আপনার বাজারের ভেতরে আপনার সমস্যা হচ্ছে; জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, পণ্য আছে, কিন্তু ভোক্তারা বেশি দামে নিচ্ছে। ভোক্তারা বেশি দামে নিচ্ছে এর কারণ কী? কারণ বাজার পরিচালনার ক্ষেত্রে যে স্বচ্ছতা থাকার কথা, তার প্রধান উপপাদ্য হলো আপনার তথ্য। সেই তথ্যে যদি সমস্যা থাকে তাহলে সমাধানের পথে জটিলতা সৃষ্টি হবে।

দেখুন আপনি যদি বলেন যে আপনার খাদ্য উৎপাদন হচ্ছে ১ লক্ষ মেট্রিক টন, আর কার্যত হয় ৭০; তাহলে ঐ যে ১০০-এর জায়গায় যদি ৭০ হয়, বাজার তো এটা জানে। কিন্তু যে তথ্য সে তৈরি করেছে আপনাকে খুশি করার জন্য, ৭০ এর জায়গায় ১০০ বলেছে এবং আপনি সেটা বিশ্বাস করেছেন। তারপরে যখন বাজারের ভিতরে ক্রাইসিসটা হল, তখন আপনি চিন্তা করলেন আসলেই কম। তখন আপনি দ্বিতীয় মেথডে, দ্বিতীয় পদ্ধতিতে এটা করলেন, তখন আপনি আমদানি করার জন্য শুদ্ধ কমালেনকিন্তু ততদিনে বাজারের থেকে ভোক্তার লক্ষ-কোটি টাকা কিন্তু পকেট কেটে চলে গেছে। সুতরাং একইরকমভাবে আপনি যদি দেখেন, এই যে টাকার বিনিময় হয়, গত অক্টোবর-নভেম্বর এর দিকে আপনার এই অনুষ্ঠানেই আমি বলে গেছিলাম যে রেমিট্যান্সের জাদু কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বিনিময় হারকে কার্যকরভাবে ঠিক রাখা উচিত। আর এটাকে যদি আমরা অল্প অল্প করে, ১০ পয়সা, ২০ পয়সা করে করে আস্তে আস্তে করে সহনশীলভাবে আসতাম, তাহলে আজকে এরকমভাবে জোয়ারের জলের মতো, খড়কুটোর মতো ভেসে যেত না। কীরকম দেখেন, আপনি তো নিয়তির কাছে অবধারিতভাবে আত্মসমর্পণ করলেন; কিন্তু এটা যেভাবে হল এটা তো নীতির জন্য ভালো না। বরং নীতির ক্ষেত্রে আপনার অবিশ্বাস সৃষ্টি করে।

অর্থনীতিতে নীতিটা তার বিশ্বাসযোগ্যতার উপর চলে। আমি যদি বলি যে বাজারে এত জিনিস আছে, এটা ভোক্তা যদি বিশ্বাস করে, তাহলেই ঐ দামে একজন বিক্রেতা বিক্রি করবে, একজন ক্রেতা এটাকে কিনবে। বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেলে এটা অসুবিধা হয়। একইরকমভাবে আপনার অসুবিধা হবে এখন সুদের হার নিয়ে। সুদের হার এখনো আমরা আটকে রেখেছি নিচে; আমি আপনাকে এখানে কয়েকবারই বলেছি যে নয়-ছয় হয়েছে; কিন্তু বিনিয়োগ সেভাবে বাড়েনি। কারণ বাংলাদেশে সুদের হার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু একমাত্র বিষয় না। অর্থনীতিকে বিনিয়োগ-বান্ধব করার জন্য অনেক রকমের বিষয় রয়েছে; আমলাতন্ত্র থেকে আরম্ভ করে, জ্বালানি পাওয়া থেকে আরম্ভ করে, জমি পাওয়া থেকে আরম্ভ করে আরো অনেক কিছু। তা এখন দেখুন সুদের হার বাড়তেই হবে। যদি আপনার বিনিময় হার পতন ঘটে, মূল্যস্ফীতি হয়, অর্থনীতির মানে খেতাবের প্রথম বর্ষের প্রথম লেকচারের আপনাকে এটা বুঝিয়ে দিবে যে তিনটির ভিতরে একটা আত্মসম্পর্ক আছে।

যদি আপনার দেশে মূল্যস্ফীতি হয়, তাহলে আপনাকে অবশ্যই আপনার সুদের হার বাড়িয়ে ঐ মূল্যস্ফীতির হার হ্রাস করার জন্য জন্য আপনার অর্থ সঞ্চালন এবং ঋণ সঞ্চালনকে কমাতে হবে। কিন্তু আমার কথা হলো আপনি তাহলে প্রবৃদ্ধি কিভাবে করবেন? লক্ষ্য করে দেখেন, যদি কোনো জায়গায় বড় কথার ছোট বাজেটের সবচেয়ে বড় কথা থেকে থাকে, সবচেয়ে বড় কথাটা কোথায় আছে? সবচেয়ে বড় কথাটা হচ্ছে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা। আপনি রাজস্ব আয় কমিয়ে দিয়েছেন, আপনি বিনিয়োগ কমিয়ে দিয়েছেন, আপনি বিনিয়োগের হার আপনি ব্যক্তিখাতে বাড়ান নাই এবং আপনি সরকারি বিনিয়োগকে ৬ শতাংশের নিচে নামিয়ে নিয়ে আসছেন কারণ সে সক্ষমতা নাই; কিন্তু আপনার এই স্তিমিত বিনিয়োগেও ৭.৫ এ চলে গেছে। এটা তো অবাস্তব একটা জিনিস করেছেন। এইযে আমি বললাম না, এ ধরনের পদক্ষেপগুলো বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করে ফেলে। আপনাকে আরেকটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করি, বিশ্বাসযোগ্যতার জায়গাটা তত্ত্বের। দেখা যাচ্ছে আগামী বছর, আপনার রপ্তানি বাড়বে ২০ শতাংশ, আর আমদানি বাড়বে ১২ শতাংশ। বিশ্ববাজারে জিনিসপত্রের দাম বাড়ার ফলে আপনার এখন আমদানি বেড়ে গেছে ৪০ শতাংশ। আপনি বলছেন আগামী বছরেও এই বিশ্ববাজারে এইরকমই দাম থাকবে, এ কারণে অসুবিধায় আছি, কিন্তু আপনি আমদানি রেখে দিয়েছেন ১২ শতাংশ। যাকে আপনি হিসাব মেলানোর জন্য কারণ হিসেবে বলেছেন; অর্থাৎ, ইতিবাচক হয়ে বের হবার জন্য আপনি ওটাকে উল্লেখ করেছেন। এইযে তথ্য-উপাত্তের ছলচাতুরি, এটা কোনদিন নীতি প্রণেতাদের পক্ষে যায় না। এটা সাময়িকভাবে হয়তো প্রশাসনিক অর্ধসত্য বলে আমরা বের হতে পারি, কিন্তু অর্থনীতির কতগুলো অঘোষ নিয়ম আছে যা নিষ্ঠুরভাবে আপনার কাছে ফিরে আসবে এবং তা অনেক দেশের ক্ষেত্রেই এসেছে। তাই আমাদের এ ব্যাপারে সচেতন থাকা উচিত।

জিল্লুর রহমান: এই আলোচনাটা চালিয়ে নেবার মাঝখানে শুধু অন্য আরেকটা বিষয় আনতে চাই, একটু শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে যে, অর্থমন্ত্রী যে প্রক্রিয়ায় বাজেট উপস্থাপন করছেন, সেটি তো অনেকটা বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছে। আপনি কি মনে করেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি তো খুব সুন্দরভাবে বৈচিত্র্য শব্দটা ব্যবহার করলেন। কেউ হয়তো এটাকে নাটকীয়তাও বলতে পারে। একজন পেশাজীবী হিসেবে আমি মনে করি যে এই বিষয়ের উপরে আমরা তিন দশক ধরে কাজ করছি আমি আমার জীবনে, অন্য অনেকেই নিয়ে কাজ করেন, সাংবাদিকরা কাজ করেন, প্রশাসনের লোকেরা কাজ করেন, রাজনীতিবিদ আছেন যারা অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বা অনুমতি কমিটির সদস্য তারাও কাজ করেন। বাজেট একটা খুবই রাষ্ট্রীয় দলিল; যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, জটিল এবং এটার একটা গাভীর্ষ রক্ষা করার বিষয়। আপনি যদি বাজেটকে একটি প্রামাণ্য চিত্রে পরিণত করেন, তাহলে বাজেটের যে অন্যান্য বিষয়াবলি থাকে, সরকারের নীতি সম্বন্ধে যে দৃষ্টিপাত করা হয়, আলোকিত করা হয়, এটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, সেইখান থেকে মনোযোগ বিচ্যুত হয়ে যায়। এর ফলে বাজেটের যে মূল বক্তব্য, কারণ বাজেটের তো একটা স্পৃহা থাকে, সরকারের একটা নীতির দলিল হিসেবে আসে, সেই দলিলটি ব্যক্তি উচ্চারণের মাধ্যমে উপস্থাপনের ভিতর দিয়ে মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপিত হয়। সেই সংযোগটাকে যদি আপনি অন্যান্য বিষয় যেগুলো

কম গুরুত্বপূর্ণ আমি বলছি না, আমি বলছি সবকিছুরই একটা স্থান-কাল-পাত্র আছে। এইটা বাজেটের সময় প্রামাণ্যচিত্র দেখানোটা আমাদের কাছে আমরা একটু রক্ষণশীল পুরনো মানুষ, আমরা কি মানে তাজউদ্দিন সাহেবের বাজেট আমি দেখি নাই, আমি সাইদুজ্জামান সাহেব থেকে, আমি সাইফুর রহমান, শামস কিবরিয়া সাহেব এবং পরবর্তীতে মোহিত সাহেবের সাথে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে। এইটা একটা সম্পূর্ণ নতুন বিষয়। আমার মনে হয় যদি এই সরকারের উন্নয়ন অর্জনকে দেখাতে হয়, তাহলে তার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচার মাধ্যম আছে সেগুলো ব্যবহার করা উচিত। বাজেটের মাধ্যমে এটা করলে বাজেটের যে মূল সংহতি এবং তার যে গাষ্ঠীর্থ্য এবং তার যে এক ধরনের সততা, সেটা অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়।

জিল্লুর রহমানঃ বাজেটটা কতটা জনবান্ধব, কতটা ব্যবসাবান্ধব? কারণ কেউ কেউ সেভাবে বলার দেখার চেষ্টা করেছে যে এই বাজেটটি ব্যবসাবান্ধব হয়েছে কিন্তু জনবান্ধব হয়নি। কিন্তু আপনি কি মনে করেন? এবং আবার ব্যবসাবান্ধব যারা বলছেন তারা আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলছেন কোনো কোনো বিশেষ বিশেষ ব্যবসা বা শিল্প এতে উপকৃত হবে, সামগ্রিকভাবে সবাই সেটা হচ্ছে না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: কেউ হয়তো বলবেন যে, ব্যবসায়ীরা কি জনতা না? তারাও তো মানুষ, তারাও তো এই নাগরিক। এই তর্ক হতে পারে আরকি। তবে দেখুন আমি আপনাকে দুই-একটা উদাহরণ বলি। এই মানে পৃথিবীতে অর্থনীতিতে আপনার কোনো ধরনের এমন কোনো পদক্ষেপ নেই, যেই পদক্ষেপ নিরঙ্কুশ ভালো অথবা নিরঙ্কুশ খারাপ হয়। এটার ভালো-মন্দ থাকে, সেজন্য আমরা অর্থনীতিবিদরা বলি যে একটা পদক্ষেপ নিলে তার যেসমস্ত নেতিবাচক অযাচিত প্রভাব থাকে সেগুলোকে মোকাবিলা করার জন্য আবার আরেকটা নীতি নিতে হয়; সেটার আলোচনায় আসবো। দেখুন এবারের বাজেটে খুব সঠিকভাবে বিভিন্ন ধরনের কর্পোরেট আয়কর কমানো হয়েছে। যারা শেয়ারবাজারে আছে, নিবন্ধিত আছে তাদের জন্য ১০ শতাংশের বেশি যারা ১০ শতাংশের কম আছে, কিন্তু নিবন্ধিত তাদের জন্যও করা হয়েছে, যারা নিবন্ধিত না, এরকম ব্যবসা করেন তাদের জন্যও কমানো হয়েছে। আবার ব্যক্তি হিসেবে যারা প্রতিষ্ঠান চালায় তাদের জন্যও কমানো হয়েছে। আমি সরকারের এই কর্পোরেট আয়কর কমানোর সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই। এর কারণ হল যেহেতু আপনার চাহিদা কম, আবার অন্যদিকে আমরা এখনো মুহূর্তে অতিমারির পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠিনি, সেহেতু অভ্যন্তরীণ চাহিদা চাপা করতে হলে বিনিয়োগযোগ্য, বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ মানুষের হাতে দিতে হবে। এবং সেইজন্য আপনি ব্যবসায়ীদের হাতে কম কর নিয়ে তাদের ঐ টাকাটা দিয়েছেন যাতে তারা বিনিয়োগ করে এবং কর্মসংস্থান হয়। দেখুন, এর পাশাপাশি আর কে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল? এই উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে সবচেয়ে বেশি চাপের মুখে কারা আছে? বাজারে জিনিসপত্রের দাম বাড়লে যাদের রুজি-রোজগার বাড়ে না; সীমিত আয়ের, সীমাবদ্ধ আয়ের মানুষ। একটা দিনমজুর, সে ৪০০ টাকার জায়গায় ৪৫০ টাকা দাবি করবে, বাজার তাকে হয়তো ঐটা দিবে। কিন্তু একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের একটি মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তা, সে ২০ হাজার টাকা বেতন পেত, সে ২৫ হাজার টাকা চাইলে তাকে কেউ দিবে না, বুঝেছেন? তাহলে এই মানুষটাকে আমরা কীভাবে সাহায্য করবো? এই মানুষটাকে সাহায্য করার পদ্ধতি হল,

তার কাছ থেকে সরকার আয়করের মাধ্যমে যে টাকাটা নিয়ে যাচ্ছে, সেইটা যদি কিছু রেখে যেত, যেইভাবে কর্পোরেট খাত করছে, তাহলে সে উপকৃত হত। আমরা বারবার বলেছি যে দেশে জাতীয় আয় বেড়েছে, মূল্যস্ফীতি হয়েছে, আপনি ৩ লক্ষ টাকাকে যেই করযোগ্য আয়ের সীমা করেছেন, এটাকে বাড়ান। ৫ লক্ষ বলেছিলেন, ৫ লক্ষ দরকার নাই, অন্তত সাড়ে ৩ লক্ষ করেন। তাহলে ১৫-২০ হাজার টাকার মাসিক আয়ের মানুষ যারা আছে, তারা অন্তত কিছুটা হলেও সাশ্রয় পেত। এ নতুন সীমিত আয়ের মধ্যবিত্তকে তো আপনি সেই সুযোগটা দিলেন না। আমি মনে করি, এটা আপনার দৃষ্টিভঙ্গিগত সীমাবদ্ধতা।

আপনি যেভাবে ঐ কর্পোরেট ট্যাক্সের ব্যাপারে সচেতন, সেভাবে আমার এই সীমাবদ্ধ আয়ের এই মধ্যবিত্ত কষ্টটা সম্বন্ধে আপনি সচেতন না। তাদের কথা বলার, তাদের কণ্ঠস্বরটা পৌঁছানোর জন্য আপনার কাছে কোনো মাধ্যম সে অর্থে নাই। এবং উনাদের পক্ষ হয়ে সংঘবদ্ধভাবে এই কথাটা বলার জন্য সমাজে সেরকম কিছু নাই। যদি আপনার প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতি থাকতো, যেটা নাই এই মুহূর্তে দেশে, তাহলে হয়তো প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে তাদের ভোট পাওয়ার জন্য কেউ কেউ হয়তো বলতো। এই মুহূর্তে তারা এই অর্থে অভিভাবকহীন হিসেবে রয়ে গেল এবং সেজন্য তারা এই কষ্টের ভিতরে পড়ে গেল। যদিও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বলবে যে এদের বাড়িতে হবে, আমাদের করের জালে তাদের ফেলতে হবে কিন্তু আসলে আপনি যদি একটু কমিয়ে আরো বিস্তৃতভাবে অন্যদের কাছে পৌঁছাতেন, তাহলে কিন্তু এই করের যে ঘাটতিটা আপনি মনে করেন এদের ছেড়ে দিলে হতো, সেটা পূরণ করার অনেক উপায় আছে।

বিশ্বের অভিজ্ঞতা হলো, করের হার কম করে, বেশি মানুষকে নিয়ে আসা। আপনি করের হার কম করে বেশি মানুষকে নিয়ে আসবেন। বাংলাদেশে আপনি দেখেন এটা অনেকেই জানেন আমি বিভিন্ন জায়গায় বলেছি, অর্থমন্ত্রী তার বক্তৃতাতেও বলেছেন, ১৬ কোটি মানুষের দেশ, তাতে করের নিবন্ধন হল ৭৫ লক্ষ; আর কর দেয় ২৫ লক্ষেরও কম। আবার সে ২৫ লক্ষের ভেতরে আমাদের মতো পেশাজীবী, কর্মচারী, চাকুরিজীবী-এরাই হলো বেশি, আর সাথে হলো সরকারি কর্মচারী। সরকারি কর্মকর্তারাও এর ভিতরে আছে। তাহলে, আপনি দেখেন, যাদের আয় স্বচ্ছ, দৃশ্যমান, তাদের উপরেও আপনি করের বোঝা দিচ্ছেন, কিন্তু বিত্ত-বৈভবে বাংলাদেশ যে ছেয়ে গেছে, কানাডাও ছেয়ে গেছে, আপনার মালয়শিয়াও ছেয়ে গেছে, দুবাইও ছেয়ে গেছে, কিন্তু তাদের কাছ থেকে আপনি কিন্তু কর আহরণ করতে পারছেন না।

জিল্লুর রহমান: বরং তাদেরকে নানারকমের সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। আপনি এই প্রশ্ন যদি করেন, তাহলে আমি বলবো যে এই বড় কথার সবচেয়ে উদ্ভট এবং সবচেয়ে ছোট কাজটি ছিল, ছোট অর্থে নীচ শব্দ হিসেবে, ছোট শব্দটা এখন আমি নীচশব্দ হিসেবে ব্যবহার করছি, কাজ ছিল হলো, যে যারা বাংলাদেশে টাকা চুরি করেছে, অন্যায় করেছে, তারা দুর্নীতি করেছে। করে তারা একধরনের অর্থ-বিত্ত সঞ্চয় করেছে। তারপরে, তারা বাংলাদেশের ভবিষ্যতে বিশ্বাস না করে, এই দেশ থেকে টাকা নিয়ে অন্য দেশে গেছে। সেইখানে সম্পদ করেছে, সেইখানে থাকছে।

তাদের টাকা এখন আপনি নিয়ে এসে, আমি ট্যাক্স দেই ২৫ শতাংশ থেকে আরম্ভ করে সবকিছু মিলিয়ে ৩২ হয়, তাকে আপনি ৭ শতাংশে, ডবল চুরির টাকাকে আপনি এখন পুরস্কৃত করবেন ৭ শতাংশ দিয়ে-এই কথাটা যখন প্রথম বাজেটের আগে আলোচিত হয়, অর্থমন্ত্রী প্রথম বলেন, আপনি বিশ্বাস করেন আমি এইটা বিশ্বাস করি নাই। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মতো একটা দল, বঙ্গবন্ধুর দল, এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নেত্রীর যেসমস্ত বক্তব্য, তার সাথে তো এইটা কোনোভাবেই মেলে না।

আমার কাছে এটা বিশ্বাসই হয় না যে একটা জনমানুষের পক্ষের দল হিসেবে, বক্তব্যের দল হিসেবে তারা লুটেরা পুঁজির বিদেশি অবস্থানকারীদের দ্বারা এরকমভাবে বাজেটটাকে হাইজ্যাক করে নিয়ে গেল। আমি দেখেন, বাজেটটাকে হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছে। কারণ এছাড়া যত ভালো পদ্ধতি কাজ এই বাজেটের ভিতর দিয়ে আছে, সেটা প্রতিবন্ধীদের কাজের বিনিময়ে তাদের মানে কর সুবিধা দেওয়া হোক, শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের কানের যন্ত্র এনে দেওয়ার কথাও যদি হয়, আপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষার বিভিন্ন কথা যেখানে বলা হয়, আপনার হুইলচেয়ার দিয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে— এগুলি এখন আর আলোচনায় নাই। পুরো আলোচনাটা চলে গেছে এখন এই কথা। তো আমার বক্তব্য হলো যে এইটা যদি করতে হয়, তাহলে এ বর্তমান সরকারকে আপনার ফিন্যান্স ইন্টিলিজেন্স ইউনিট যেটা বাংলাদেশ ব্যাংকে আছে ওটা বন্ধ করে দিতে হবে। মানি লন্ডারিং অ্যাক্টকে রহিত করতে হবে, দুদককে তালা লাগাতে হবে এবং ঐ লোকটার নাম কি যেন?

জিল্লুর রহমান: পি কে হালদার।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: হ্যাঁ। নামটা নিতেও আমার অসুবিধা বোধ হয়। তাকে তাহলে ফুলের মালা দিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে আসা উচিত। দেখুন, তাৎপর্যটা কোথায়? এ কাজটা কে করলো এবং কীভাবে করলো? কারণ এটা নিয়ে রাজনৈতিক পর্যায়ে শাসকদলের ভিতরে আলোচনা হয়েছে বলে আমরা দেখি নাই। যখন এই বাজেটটা কেবিনেটে পাশ হলো, তখন এই বিষয়টিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আলোচনা হয়েছে কিনা আমরা জানিনা। সংসদীয় স্থায়ী কমিটি যতগুলো আছে, অর্থমন্ত্রণালয় সহ, তারা এটা আলোচনা করেছে কিনা আমরা জানিনা। এবং এটা সর্বোচ্চ পর্যায়ের থেকে রাজনৈতিক অনুমোদন কীভাবে দেওয়া হয়েছে এ সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞান নাই। সম্পূর্ণভাবে উড়ে এসে জুড়ে বসার একটা নীতি এভাবে আসল, তাতে মনে হল যে বাংলাদেশে আসলেই রাজনৈতিক অর্থনীতিতে সবচেয়ে প্রভাবশালী গোষ্ঠী কে? বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী গোষ্ঠী এখন তাহলে আপনি আমি বা এই দেশের নাগরিকরা না। যে নাগরিকরা এই দেশে বিশ্বাস না করে অর্থ সম্পদ নিয়ে গেছে বাইরে, তারাই হলো আসল মালিক। আপনি কখন করলেন এটা? যখন করলেন বাংলাদেশ আর এক বছর পরে বা হয়তো দেড় বছর পরে নির্বাচনে যাবে। নির্বাচনের প্রাক্কালে, এই রকম লুটেরা, বাংলাদেশকে লুট করা মানুষ গুলোকে সুবিধা দিলেন কোন যুক্তিতে? তারা কি নির্বাচনের অর্থায়ন করবে?

জিল্লুর রহমান: আমি প্রশ্ন করতে চাইছিলাম আপনাকে এর পরে এইটা যে এই বাজেটে সামনে নির্বাচন। নির্বাচন কতটা আছে, রাজনীতি কতটা আছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমার এই নিয়ে অনেক ক্ষোভ আছে। আমি একটু শেষ করি দুটো বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেখুন আরো কি ঘটনাটা ঘটলো, এটা কখন হলো দেখুন। এই মুহূর্তে বিদেশে, আমেরিকা, ইউরোপ, কানাডায়, সবজায়গায় প্রবাসীদের বেনামী সম্পদ খোঁজা হচ্ছে। আপনারা তার ইঙ্গিত হয়তো পেয়েছেন বিভিন্ন ভাবে। সুতরাং তারা এটাকে এই মুহূর্তে আইনানুগ করার জন্য পাগল হয়ে রয়েছে। তাদের সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে ব্যংকের থেকে, এই টাকার কোনো সূত্র বা উৎস দেখাতে না পারে, তাহলে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। তাহলে তো আপনি তাদের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল হয়ে এই কাজটা করলেন। আগে আপনি স্থানীয় কালো টাকার কাছে জিম্মি হতেন, আজকে আপনি বিদেশি কালো টাকার কাছে জিম্মি হলেন। এইটা অর্থনীতির বিষয় না, এইটা রাজনীতির বিষয়। এইটার মাধ্যমে, যারা এইটা করলো, তারা সরকারকে বিপদে ফেলার জন্য করলো। এইটা একটা রাজনৈতিক ভাবে হটকারী পদক্ষেপ হলো। এইটা যারা ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে জানে, বোঝে বা দেখে এসেছে, তাদের কাছে এইটা কোনোভাবে বিশ্বাসযোগ্য হবে বলে আমার কাছে মনে হয় না। অনেকে হয়তো এইটার রাজনৈতিক তাৎপর্যও ভালো করে অনুধাবন এখনো করেননি, আগামীতে এটা আরো বোঝা যাবে।

জিল্লুর রহমান: সম্পদের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে যে তাদের সম্পদ রিটার্নে দাখিল করলে ১৫ % দিয়ে.....

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তো উনি যদি সম্পদ ওখানে ঘোষণা দিয়ে এখানে ১৫ শতাংশ দেন, এবং আপনি বললেন কোনো প্রশ্ন করবেন না। আপনি কি মনে করেন, যে বুদ্ধিমান লোকেরা দেশের উপর বিশ্বাস না রেখে বিদেশে টাকা নিয়ে গেছে, তারা আপনার এ কথায় বিশ্বাস রেখে আবার ১৫ শতাংশ দিয়ে এসে বলবে যে এইগুলো আমার চুরি করা টাকা? আপনি মনে করতে পারেন যে কোনো একটা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই লোক গুলো সমস্যায় পড়বে না? আপনি কি বাংলাদেশের তালিকা গোপনে রাখতে পারবেন? আপনাদের মতো সাংবাদিকরা খুঁজে বের করে প্রকাশ করে দেবে না? তখন কি তারা কোনো আইনের অধীনে যাবে না? এই কথাটির সাংবিধানিক ভিত্তি কি হবে? আমি যদি কালকে সুপ্রীম কোর্টে গিয়ে একটা রিট পিটিশন করি, আমি সৎ করদাতা, আমি ৩০-৪০ বছর ধরে ট্যাক্স দিয়ে বাংলাদেশে এই অবস্থায় এসেছি, আর উনি চুরি করে এই অবস্থায় যাবেন, সরকার এই নীতিটা দিয়েছে। এইটা সংবিধানের মৌলিক, সকল নাগরিকের প্রতি সমান আচরণের পরিপন্থী হয়ে আসছে, তখন কি জবাবটা হবে? আপনি বুঝছেন কোথায় যেতে পারে এই জিনিসটা? আমি এখনো বলতে পারি যে এটা পাবলিক ইন্টারেস্ট মিটিগেশনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে। আমি গতকাল সরকারের একজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি বর্গের সাথে আলাপ করছিলাম। উনারা আমার এই কথার চাপের মুখে বলেছেন, আপনি এখনি এত কি বলেছেন, এটা তো সংসদে আছে এখন, আলোচনা হবে, আলোচনা শেষে উনারা বলবেন। উনারা নিজেদের একটু পিছনে নিয়ে গেছেন। উনারা নিজেরা যুক্তি তর্কে বা নৈতিকভাবে এটাকে সমর্থন করতে পারছেন না। তারা ভরসায়

আছে; আমিও ভরসায় আছি, যে শেষ পর্যন্ত এইটা তুলে নিবে। এইটা তুলে নিলে রাজনৈতিক ভাবে অর্থনীতির জন্য, এবং আমাদের নৈতিকতার দিক থেকে অনেক উপকার হবে।

জিল্লুর রহমান: অর্থমন্ত্রী ৬টি চ্যালেঞ্জ দেখছেন। আপনি কি মনে করেন সেটা কি যথেষ্ট, ঠিকঠাকমতো আইডেন্টিফাই করতে পেরেছেন সেখানে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: উনার যেসমস্ত চ্যালেঞ্জগুলোর কথা বলছেন, এগুলো ঠিকই আছে। এজন্যই বললাম, যে চ্যালেঞ্জগুলো বা চাহিদাগুলো যে সমস্যাগুলোর সৃষ্টি হয়েছে, ওগুলোকে আন্তে আন্তে স্বীকার করে এই জায়গাতে এসছেন। কিন্তু এঁটার পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি আসে, সেখানে আমি নিষ্ঠার অভাব দেখছি। এই মুহূর্তে দেশের ভেতরে অর্থনৈতিক নীতিমালা যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে এই নিষ্ঠার অভাবের একটা বড় কারণ। দেখুন, বাংলাদেশে, আমি তো বারবারই বলি, আমার সুযোগ হয়েছে, শহীদ আমাদের কিবরিয়া সাহেবের সাথে কাজ করা, আমার সুযোগ হয়েছে সাইফুর রহমান সাহেবের সাথে কাজ করার। দেখুন ওনাদেরকে আমি দেখতাম। উনারা একটা অর্থনৈতিক টিমের মতো, দলের মতো গঠন করতেন। উনারা ৩ রকমের লোক নিয়ে দল গঠন করে কাজ করেছেন। কোনো দিন সময় হলে লিখবো এই ব্যাপারে। একটা হলো পেশাজীবীদের সাথে। প্রতিনিয়ত পেশাজীবীদের সাথে সকাল-বিকাল মতামতের ভিতরে থাকতেন। আমাদের ফোন করতে হতো না। কিবরিয়া সাহেব সকালবেলা ফোন করে বলতেন, দেবপ্রিয় এই কথাটা যে বলেছেন, কি বলেছেন, ব্যাখ্যা করেন তো আমার কাছে। উনি মিডিয়ার কাছে যেয়ে আমার নামে বকাবকি, কটুক্তি করতেন না। উনি আগে বুঝতে চাইতেন যে আসলে কথাটা কি বলেছে, কথাটা কেমন হল। এবং, সাইফুর রহমান সাহেব, ওনার গাড়ি দিয়ে বিয়ানিবাজার যেতে যেতে যে সুন্দর করে ওনার সিলেটি উচ্চারণে বলতেন, তুমি যে এই পাওয়ার পয়েন্টটা দিসো, এইটা তো আমি এখন দেখছি। দেখে তো মনে হচ্ছে তুমি তো কিছু কিছু ঠিকই বলছ। ওনাদের সাথে পেশাজীবীদের একটা সততার সম্পর্ক ছিল, আস্থার সম্পর্ক ছিল। এইটা নাই এর মধ্যে। দ্বিতীয়ত, উনাদের এখন রাজনৈতিক পরামর্শক, দলের সিনিয়র নেতা ছিলেন। আমি নিজে দেখছি কিবরিয়া ভাই, তোফাইল ভাই ছিলেন, আমু ভাই ছিলেন। উনারা খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে পরামর্শ করে চলতেন। তারপর হয়তো প্রধানমন্ত্রীর কাছে যেতেন। একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ছিল।

এই মুহূর্তে তো অর্থমন্ত্রীরা রাজনৈতিক ভাবে এতিমের মতো কাজ করেন। ওনাদের সাথে, উনিই নীতি নিয়ে পরামর্শ করছেন, উনিই নিয়ে আসছেন, এইটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হিসেবে ক্যাবিনেটের ভিতরে যাচ্ছে, বা অর্থনৈতিক উপকমিটিতে এটা আলোচনা হয়ে তারপর এখানে— এইটা বলে কিছু নাই। আমি দেখি না। হয়তো যারা ভিতরে আছে, তারা আমার চেয়ে ভালো জানে। আমি বাইরে থেকে দেখি না, শুনি না। সেহেতু রাজনৈতিক সমর্থনের জায়গাটা ছিল একটা একমত গড়ে তোলার, সেইটাও এই মুহূর্তে নাই। আরেকটা ছিল, উনারা অর্থনৈতিক দল গঠন করতেন। সেখানে অর্থমন্ত্রী আছেন, এর সাথে অর্থ সচিব আছেন, এর সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আছেন, এটার সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আছেন, সিকিউরিটি ও এক্সচেঞ্জ বোর্ডের চেয়ারম্যান আছেন, বৈদেশিক বিনিয়োগ যে প্রতিষ্ঠান তার লোক লোক আছে এবং ফাইন্যান্স মিনিস্টারের ভিতরে অর্থনৈতিক বিষয়ক আছে,

ইআরডি ও আছে, বৈদেশিক অর্থ বিষয়কও আছে। উনারা একটা যৌথতার ভিতরে কাজ করতেন, এবং একটা সম্বন্ধীয় হতনীতির। মানে, আপনি মুদ্রানীতি নিচ্ছেন, অর্থাৎ আপনি টাকার বিনিময় হার বাড়াবেন কি কমাবেন, এর আর্থিক তাৎপর্যটা কি, এর ফলে টাকশালে সুদের কি হবে, আমদানিরিকি হবে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে ডেকে একসাথে করে, আপনি নীতি প্রণয়ের জন্য যৌথতা নিয়ে আসছেন এটার জন্য একটা কাউন্সিলও আছে।

মুদ্রা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল; এই সরকারেরই করা আছে। যেটার জন্য ৩ মাস পর পর আর্থিক বিবৃতি দিতে হয়। যেটা এই সরকার দেয় না। এই অর্থমন্ত্রী দেননি; দুঃখের ব্যাপার হল এটা মুহিত সাহেবের সময় থেকে অনিয়মিত হয়ে গেছে। এই জিনিসটা ছিল; এক দিকে পেশাজীবীরা ছিল, এক দিকে রাজনীতিবিদরা ছিল, আর মধ্যখানে যৌথতা টিম ছিল। দুঃখের বিষয় এই তিনটাই নাই এই মুহূর্তে। এবং যার ফলে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে যৌথতা যে ইংরেজিতে যেটাকে বলে ঔনারশীপ বা মালিকানা বোধ, আরেকজনের প্রতি একটু সমর্থনে থাকা, এবং এইটার ভিত্তিতে একটু দীর্ঘ মেয়াদী দেখা; এখন কী ঘটনা হচ্ছে? এখন আমরা ঘটনার পিছনে দৌড়াই। ঘটনাকে প্রাক-অনুমান করে আমি প্রস্তুত হই না। কারণ প্রস্তুত হবার জন্য যে ধরনের প্রক্রিয়ার দরকার পরে, সে প্রক্রিয়া নাই। এবং সবচেয়ে বড় হলো অস্বীকারের মনোভাব। কারণ হলো আমি যদি কিছু বলি, আপনি প্রথমই মনে করবেন এটাকে তো গ্রহণ করা যাবে না। কারণ অদ্ভুত একটা জিনিস হয়েছে, কেউ কেউ, কেউ এই মুহূর্তে বিশ্বাস করতে চায় না যে আমরা দেশকে সবাই সমান ভাবে ভালোবাসি। কেউ কারোর চেয়ে বেশি ভালোবাসে, এমন তো না। কারণ এই দেশকে তো আমরা সকলে মিলেই গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। এই দেশের স্বাধীনতা থেকে আরম্ভ করে, ঐ মানুষগুলো চলে গেল, আমরা রয়ে গেলাম, এবং ওরা টাকা পয়সা নিয়ে গেলো, আমরা আপনাদের সাথে মূল্যস্ফীতি নিয়ে করছি, তাহলে কার দেশপ্রেম কার চেয়ে কম, কার চেয়ে বেশি? তো সেহেতু আমার মনে হয় ঐ জায়গাতে একটা আস্থা এবং সম্মানের জায়গা নিয়ে আসতে হবে। আস্থা এবং সম্মানের জায়গা না আনলে পরে, এই বছরটাও আমার পার করার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধায় পড়তে হবে।

জিল্লুর রহমান: এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সামনের বছর যদি নির্বাচন হয়, সামগ্রিক ভাবে অর্থনৈতিক অবস্থা যেভাবে চলছে, সব মিলিয়ে আপনার মনে হয় কি, নির্বাচনেরই কি হবে আর রাজনীতির কি হবে, বা অর্থনীতির হালচাল কি হবে, বৈদেশিক সম্পর্ক-চারটা জায়গায় যদি আপনাকে অ্যাড্রেস করতে বলি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি জিল্লুর আপনাকে স্মরণ করাতে চাই একটা জিনিস। গত ৩ বছরে যাবত আপনার এই অনুষ্ঠানে, আমার মতো দূমুখরা তো সমালোচনামূলক বিভিন্ন কথা বলেছি। এটা তো কাউকে ছোট করার জন্য না, দেশটা যাতে ভালো চলে সেটার জন্য বলেছি। এবং এখনো বলছি। দেখেন কি দূর্ভাগ্য! যে কথা গুলো গত সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে বলেছি, সেইগুলোও যদি আপনি মনোযোগে নিনেন, আজকে আপনি তার চেয়ে ভালো অবস্থায় থাকতেন। এবং আগামী বছর, নির্বাচনের প্রাক-কালে, এই ১২ বছরের সবচেয়ে খারাপ বছর নিয়ে আপনি নির্বাচনে যেতেন না। দেখুন আপনি কি হয়েছে। এই সরকার নির্বাচনে যাবে,

আমি বর্তমান সরকারের কথা বলছি। যে কোনো রাজনৈতিক দলের জন্য নির্বাচনের আগের বছরটা স্বস্তির বছর হওয়া উচিত। এবং, স্বস্তি পায় মানুষ কোথায় সবচেয়ে বেশি? যখন বাজারে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল থাকে। দুর্নীতির চেয়েও সে অনেক বেশি প্রতিদিনকার বাজার খরচকে হিসাব করে। এখন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসার লক্ষণ তো আমরা খুব বেশি দেখছি না। এবং এই বাজেটেও সেইরকমভাবে আনে নাই। বিশেষ করে কারণ হলো যে, মূল্যস্ফীতিতে আপনি পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না, আপনার যেটা করতে হবে সেটা হলো, মানুষের ক্রয় ক্ষমতাকে সমর্থন দিতে হবে। অর্থাৎ আপনার ভর্তুকি দিতে হবে বেশি মাত্রায়। আপনার করে রেয়াদ দিয়ে তাকে বিনিময়যোগ্য সম্পদ দিতে হবে, এবং সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যেসমস্ত সেবা খাত আছে, যেখানে কোনো অর্থ বাড়ানো হয় নাই এবার জিডিপির অংশ হিসাবে। শিক্ষাখাতেও ২ শতাংশের নিচে, স্বাস্থ্যখাতেও ১ শতাংশের নিচে, সামাজিক সুরক্ষায় ১ শতাংশের মতো। তাও পেনশন তার ভিতরে বেশি। তো এই জায়গাটাতে কষ্টের ভিতরে বর্তমান সরকার যাবে। দুঃখজনকভাবে হলেও এটা ঠিক যে, এই সময়কালে সরকারের অনেক বড় বড় মেগা প্রকল্প উন্মোচিত হবে। অবশ্যই এটার সাধুবাদ দিতে হবে, এইটা প্রশংসার বিষয় যে আমরা বাংলাদেশে এইরকম প্রকল্প, আমরা স্বপ্ন দেখছি, বাস্তবায়ন করছি। আপনারা পদ্মা সেতু বলেন, কি কর্ণফুলীর নিচে দিয়ে টানেলের কথা বলেন, কি এলিভেটেড হাইওয়েজের কথা বলেন, অথবা শাহজালালের খার্ড টার্মিনালের কথা বলেন, এমনকি রূপপুর ধরে বলেন, এইগুলি ঠিক আছে। কিন্তু কথা হলো, এইগুলো তো শেষ বিচারে আপনার অর্থনৈতিক ফলাফল দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট আছে, এইটার অংশ হিসেবে। তো এটার আর্থিক যৌক্তিকতা, আবার ফিরে যেতে হবে শ্রীলঙ্কার দিকে। সেটা হলো শ্রীলঙ্কার যতো প্রকল্প হয়েছিল, জনবান্ধব মানে মনোগ্রাহী ছিল, কিন্তু অর্থনৈতিক যুক্তিযুক্ততার সাথে এইটা মেলে নাই। এবং এটাকে পেটানোর জন্য যেই টাকাটা তাকে শিক্ষার, স্বাস্থ্য বা অন্য জায়গা থেকে যখন সরিয়ে আনতে হয়েছিল, জনগণ যখন সেটা টের পেলো তখন কিন্তু সে সেটাতে আর রাজি হয়নি। এইটা কিন্তু একটা শিক্ষার বিষয়। একটা উন্নয়নের উচ্ছ্বাস আমাদের থাকবে আগামী একবছর ধরে। এটাতে আমরা সকলেই অংশীদার হবো, কারণ এটা আমাদের নিজেদের অর্জন। কিন্তু এইটা কারো ব্যক্তি অর্জন না। এটা আমার জাতীয় অর্জন এবং আমরা প্রত্যেকে এইটার ভাগীদার এবং গর্ব করি যে সরকার এইটা করতে পেরেছে। এ ব্যাপারে কোনো ক্লেঞ্চ বা দ্বিধা আমার নাই।

কিন্তু বিষয়টা হলো, যে অন্যান্য বিষয়, আপনার ভৌত অবকাঠামোর সাথে, মানব সম্পদ তো মেলাতে হবে। মানবের সম্পদ মেলাতে হলে তার পুষ্টি লাগে, মানসম্পন্ন শিক্ষা লাগে, তার গ্রহণযোগ্য স্বাস্থ্য ব্যবস্থা লাগে, তার বাজার থেকে সুরক্ষার দিতে হয়। তো সেই জায়গাটা থেকে সমস্যা, এটা অর্থনৈতিকভাবে। আর অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে আমি তো দেখছি যে, আমরা অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যেটা বুঝি, বারবার আপনাকে বলেছি, একটা প্রতিযোগিতাপূর্ণ অর্থনীতি ব্যতিরেকে জবাবদিহিতার সৃষ্টি হয় না। এই যে আপনার ১০ টাকার জিনিস হাজার টাকায় কিনছেন, আবার ঐটা আবার ২ হাজার টাকা দিয়ে ১ তাল্লা থেকে ৫ তাল্লাতে নিচ্ছেন, তো এইটা হতে পারে যখন আপনার জবাবদিহির কাঠামো কাজ করে না। আমার ধারণা যে, যারা অর্থনীতি পরিচালনা করেন দেশে, তারাও এইটা ক্রমান্বয়ে উপলব্ধি করছে। যে এই স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা না থাকলে, উনারা যেই টাকা অর্জন করতে চাচ্ছেন,

উনারা সেইটাতে কিন্তু মুখ খুবড়ে পড়তে পারেন। এইটা শাসক গোষ্ঠীর কাছে ক্রমান্বয়ে আসছে বলে আমি বিশ্বাস করতে চাই। কারণ উনারাও তো চোখের সামনে দেখছেন, উনারাও তো এই দেশের নাগরিক, উনারাও তো আমার মতোই দেশ ছেড়ে যাননি, সেহেতু উনারাও বুঝতে পারছেন এইটার ভিতরে, উনারাও তো দেশের ভালো চাচ্ছেন। আমি সেই আস্থা রাখছি, সম্মান রেখে বলছি কথাটা। এই জায়গাগুলো ওনাদের উপলব্ধি করতে হবে। তাহলে প্রতিযোগিতাপূর্ণ জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতার অংশগ্রহণমূলক অর্থনীতি তৈরি করার, আরো কার্যকর দক্ষ কেন প্রয়োজন হচ্ছে? কারণ দেখুন আপনি স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরোবেন। আপনি নিম্ন আয়ের, নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হয়ে গেছেন।

নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হয়ে আপনি নিম্ন আয়ের প্রতিষ্ঠান দিয়ে আপনি এটাকে চালাবেন, এইটা কি হয়? আপনি যদি একটা গাড়ি কিনেন, তাহলে তো গাড়ির গ্যারেজ লাগবে, তাই না? তো অবশ্যই ছেলেকে যদি আপনি কোথাও উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠানতাহলে তার একটা কম্পিউটার লাগবে। তো আপনার এই যে প্রয়োজনগুলো, এটা আপনার বুঝতে হবে যে আধুনিক সমাজ, উচ্চ আয়ের দেশরা কিভাবে চলে। মধ্যম আয়ের দেশ কি দিয়ে হয়? শুধু কি মাথাপিছু আয় দিয়ে হয়? না এটা সেবা দিয়ে, প্রতিষ্ঠান দিয়ে। আপনি ঢাকা এয়ারপোর্টে নামলে আপনার কি উচ্চ আয়ের দেশ, মধ্যম আয়ের দেশ মনে হবে, না নিম্ন আয়ের দেশ মনে হবে, আপনি ঐ মানুষগুলোর দিকে যদি তাকান? তাহলে তো আমার ব্যবস্থা কি করতে হবে? আপনি রাস্তার ভিতরেই যদি ২ ঘণ্টায় যদি আপনি ৩ কিলোমিটার যেতে না পারেন, তখন কি আপনি মধ্যম আয়ের দেশের মতো মনে হবে নাকি আপনার নিম্ন আয়ের দেশের মতো মনে হবে? অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানগুলো বদলাতে হবে। তো ঐ প্রতিষ্ঠান গুলোকে উন্নয়ন করার জন্য সবচেয়ে বেশি যেইটা দরকার পরে, যে প্রতিযোগিতা এবং প্রতিষ্ঠান, সেইটা হলো একটি জবাবদিহি মূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার। একটা জবাবদিহি মূলক, বৈধভাবে গ্রহণযোগ্য, মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য, একটা বৈধ এবং একটি অংশগ্রহণমূলক প্রতিযোগিতা পূর্ণ নির্বাচনী ব্যবস্থাটা আপনার খুবই মৌলিক হয়ে দাঁড়ায়। এবং সেইজন্য যতগুলো অর্জন আপনার এই সময়কার আছে, এই অর্জনগুলো কিন্তু এ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কাছে জিম্মি হয়ে যায়। সেহেতু আপনি যে উন্নয়নটা করলেন, যেই উন্নয়নটা আপনিও চান, আমিও চাই, সবাই চায় এবং হয়েছে উন্নয়ন, সেই উন্নয়নটাকে টেকসই করতে হলে, ধরে রাখতে হলে, তাকে আরো সুসম করতে হলে, যেসকল ঘটতি ছিল সেইগুলো মেটাতে হলে, আগামী ১০ বছরে, তাহলে আপনার একটা অংশগ্রহণ মূলক জনমতের প্রকৃষ্ট প্রকাশের মাধ্যমে একটা ব্যবস্থা আপনার লাগবে। এইটা একটা ন্যূনতম চাহিদা একটা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের জন্য।

সাম্প্রতিককালে, বিশ্বব্যাপী আপনি যদি লক্ষ করেন, এইটা একটা নব উপলব্ধি এসেছে ট্রাম্প-উত্তর যুগে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালে আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশে আপনার সামরিক অভ্যুত্থান হওয়া, এবং একইসাথে নির্বাচিত কর্তৃত্ববাদী সরকার, এইটা একটা নতুন শব্দ বাজারে চালিত হয়েছে, না? নির্বাচিত কর্তৃত্ববাদী সরকার। অর্থাৎ আপনার জনতুষ্টিবাদী সরকার বিভিন্ন ভাবে হচ্ছে। শুধু আগে বাম দের বলা হতো, এখন দক্ষিণরাও করছে। ট্রাম্প তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তো সেইক্ষেত্রে একটা নতুন উপলব্ধি এসেছে, এবং ইউক্রেনের যুদ্ধ ব্যাপারটাকে আরো সংহত করেছে। এটা হল, যে দেশের ভেতর আপনার যদি এই অর্থনৈতিক

আচারআচরণ না থাকে, প্রতিষ্ঠান কাজ না করে, জবাবদিহিতা কাজ না করে, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে অনেক দেশ অনেক শাসনকে বেপরোয়া করে তোলে। বেপরোয়া করে এমন দূরে যায় যে তারা প্রতিবেশিকেও আক্রমণ করে। এটা একটা ব্যাখ্যা।

আবার অনেক সময় এমন হয় যে সে নিজের দেশের মানুষের প্রতি অসৎ আচরণ করতে পারে। এ বিষয়টি উপলব্ধির ভিতরে আন্তর্জাতিকভাবে এসেছে। অবশ্য এর সাথে চীন আছে, প্রতিবেশি ভারত আছে। কিন্তু আমি আপনাকে যে জায়গাটাতে নিতে চাইবো, যারা এত দিন বলেছে উন্নয়ন আগে, গণতন্ত্র পরে, আর আমি আপনাদের এখানে এসেই বলেছি এইটা হচ্ছে সীমিত বুদ্ধির অপরিপক্ক চিন্তা, তাদের আবার নতুন করে চিন্তা করতে হবে। পৃথিবীব্যাপী আমরা ট্রাম্প-উত্তর যুগে পুরো একটা চক্র ঘুরে এসেছি, যেখানে আমাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, আমাদের পরিবেশগত নিরাপত্তা, আমাদের কৌশলগত নিরাপত্তা, এগুলো সব এক সূত্রে গাঁথা হয়ে যাচ্ছে। এবং ধরা হচ্ছে জবাবদিহিতা, গণতান্ত্রিক চেতনা, এবং সংলাপ, কথা বলা, এটার পরিবেশটাকে যদি আমরা উন্নত না করতে পারি, তাহলে এটাতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শুধু না, এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতা, এবং সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনা, এটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বাংলাদেশ এখন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দেশ। যত বেশি আমরা গুরুত্বপূর্ণ হয়েছি, সেই সাথে আমাদের দায়িত্বও বেড়েছে। সেহেতু আমাদের দায়িত্বশীল আচরণ করার এইটাই সময়। এবং সেই দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে, আমরা এখন পর্যন্ত যেই অর্জনটা করেছি, এই অর্জনটাকে রাখতে হবে, এই অর্জনকে সামনে নিতে হবে, এই অর্জনের সুযোগ সবাইকে দিতে হবে, এবং এই সুযোগের জন্য তাদের কথা বলার সুযোগ করে দিতে হবে।

জিল্লুর রহমান: আগামী এক-দেড় বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিবেশ পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ক বাংলাদেশের সব মিলিয়ে। অন্য কোনো ধরনের চাপ দেখেন আপনি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি দেখছি দেখুন বাংলাদেশ এমন একটি দেশ, যে এইটা তুলনামূলকভাবে ছোট বাজার ইত্যাদির কারণে আন্তর্জাতিক বাজারের উপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল। এটা শুধু গার্মেন্টস এক্সপোর্ট দিয়ে বলছি না। আমাদের বিনিয়োগের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, আমাদের রেমিট্যান্স আয়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, এবং আমাদের বৈদেশিক সাহায্যের ব্যাপার তো আছেই। সেহেতু, এ ছাড়া আমাদের যে জাত্যাভিমান আছে, আমাদের যে অহংকার আছে, আমাদের যে সম্মানবোধ আছে, এটা সর্বদা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য কিছুটা, আগ্রহ ভরে তাকিয়ে থাকি আমরা। এটার একটা রাজনৈতিক প্রণোদনাও আছে। কারণ আমরা তো আসলেই সেই অর্থে সম্মান নিয়ে, বীরের জাতি হিসেবে আমরা সকলের স্বীকৃতি নিয়ে আমাদের অর্জনকে সকলের কাছ থেকে গ্রহণযোগ্য করতে চাই। তাহলে এখানে আপনার অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার দিকটাও আছে, আবার একটা রাজনৈতিক প্রণোদনাও আছে এর ভিতর। এখন আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে রাজনৈতিক প্রণোদনার জায়গাটা তুলনামূলকভাবে একটু সংকুচিত হয়ে গেছে। আগে আমরা বলতাম যে এইটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করছে কিনা।

আপনি সাম্প্রতিককালে লক্ষ করে দেখবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যুক্তরাজ্য, তারপরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্যান্য দেশগুলো একটা স্বচ্ছ গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের কথা বলছে। দেখুন সকলেই কিন্তু প্রক্রিয়ার কথা বলছে, ফলাফল কেউ বলছে না। ফলাফল মানুষ ঠিক করবে। বিদেশের কোনো মানুষ এইটা ঠিক করে দিবে না, এইটা যদি আপনি আমি ভোট দিতে যেতে পারি, তাহলে আমরা ঠিক করব। তো, সেখানে দেখুন, এটা শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান বা ব্যক্তি বিশেষের অবস্থান না। এটা এখন সম্প্রসারিত হয়েছে যুক্তরাজ্য, তারপরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে। গত ৩ দিন আগের ঘটনা আপনি যদি দেখেন, তাহলে এখানে যাদের আমরা মনে করতাম, ইংরেজিতে যাদের বলে ফেস্টিটার, মানে এদিকেও না ওদিকেও না, সে যৌথ টুইটে জয়েন করেছে। এখানে নাগরিক সমাজের ভূমিকাকে বিশ্বে নির্দিষ্ট একটি প্রেক্ষিতে তুলে ধরা হয়েছে, বলেছে যে জাতীয় অগ্রগতির জন্য এদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিতে হবে, জায়গা দিতে হবে, যেখানে জাপানও যুক্ত হয়েছে।

আমি মনে করি পরবর্তীতে এখানে দক্ষিণ কোরিয়াও যুক্ত হবে। এটা হলে, একদম পরিষ্কার ভাবে একটা সারি আপনি দেখতে পাবেন। এর বাইরে রয়েছে আমাদের বড় বড় দুইটা প্রতিবেশি দেশ। ওনাদের বোঝার ব্যাপার উনারা প্রক্রিয়াতে আগ্রহী নাকি ফলাফলে আগ্রহী। উনারা এখন একসাথে বুঝছেন যে, ভাল ফলাফল যদি ভাল প্রক্রিয়া দিয়ে না আসে, তাহলে ঐ ফলাফলের কার্যকারিতা তুলনামূলক ভাবে সীমিত থাকে। সেই উপলব্ধিটাও ক্রমান্বয়ে আসছে। কারণ উনারাও উন্নয়নের কাজের জন্য যেই সব জায়গায় যুক্ত হন, সেই সমস্ত জায়গাতে মসৃণ ভাবে যাওয়ার কথা। উনারা সেটাও যেতে পারছেন না। তখন উনাদের উপলব্ধি হচ্ছে, হচ্ছে কেন এটা? সেহেতু এটা, এই প্রক্রিয়াটা আছে, যদি আপনি শেষ করতে চান, আমি সাধারণ ভাবেই বলি, আর ১০টা মানুষের মতো আমিও বাংলাদেশ নিয়ে খুবই আশাবাদী। এই আশা যদি না থাকতো, তাহলে তো আপনার এখানে এসে রাত-বিরাতে সময় দেয়ার তো কোনো দরকার ছিল না। আমাদের অন্য ভাবে সময় দেয়ার আরো সুযোগ ছিল। দেশের বাইরে, ভিতরে এবং সব জায়গাতে। আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশের ভবিষ্যতে। আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশ উদ্যম, এবং তার যে শক্তি, আত্মশক্তি, তার যে মর্যাদাবোধ তাতে। এবং এটাকে আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দ সামনে এগিয়ে নিয়ে গেছে, নাগরিকরা তার সাথে থেকেছে। এইযে সময়টা আগামী ২ বছর আসছে, আমি খুবই ভরসা করে আছি, আমরাও সেই উজ্জ্বল আলোক পাতের মাধ্যমে, এই বাঁধাকে অতিক্রম করে অনেক দূর আগাবো।

জিল্লুর রহমান: অনেক অনেক ধন্যবাদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। দর্শক তিনি কথা বলছিলেন প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এবং এ বাজেটের আলোচনায় দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, নির্বাচন সবই গুরুত্ব পেয়েছে। একটি কথা উনি খুব গুরুত্বের সঙ্গে বলেছেন যে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যে সুযোগ-সুবিধা সেটাকে একটা স্থিতিবস্থার মধ্যে রাখতে হবে। এবং সময় থাকতে সংস্কারের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। যদিও বাংলাদেশে সংস্কার একটি পরিত্যাজ্য বিষয়। এবং সমস্যার স্বীকৃতি অস্বস্তি নিয়ে বাজেটের মধ্যে থাকলেও, তিনি মনে করেন সমাধানের পথে যে সতর্কতা, যে নিষ্ঠা থাকার দরকার ছিল, যে সততা দেখার কথা ছিল, তার অভাব তিনি দেখেছেন। এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মনে করেন যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে গড়ে তোলবার দিকে অনেক বেশি

মনোযোগ দিতে হবে। জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে প্রধান বা প্রাথমিক একটা অনুসঙ্গ হচ্ছে নির্বাচন। সেটিকে স্বচ্ছ ও অবাধ করে দিতে হবে। এবং সব মিলিয়ে অর্থনৈতিক পরিবেশ ও কৌশলগত যে নিরাপত্তা সেইটা নিশ্চিত করবার জন্যে জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই এবং সেটি নিশ্চিত করবার দিকেই মনোযোগ দিতে হবে।

চ্যানেল আই ‘তৃতীয় মাত্রা’-এ প্রচারিত

৬ জুন ২০২২

মূল্যস্ফীতি হতে হবে কেন্দ্রীয় সূচক

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

প্রতিটি বাজেটেরই বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত থাকে। এ বছরেও তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, দেশে ২০১৯-২০ অর্থবছরে অতিমারি দেখা দেওয়ার পর আমরা এখনও স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ফিরে যেতে পারিনি। কিছু ক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবন ঘটলেও, সম্পূর্ণরূপে উত্তরণ ঘটেনি। দ্বিতীয়ত, ইউক্রেনে যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত এবং পণ্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এক ধরনের সংকট সৃষ্টি করেছে। তৃতীয়ত, প্রায় দেড় দশক পর এবারই সামষ্টিক অর্থনীতি সবচেয়ে কঠিন চাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরটি আমাদের এসব অস্থিতিশীলতা ও অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে কাটাতে হবে।

দুর্বল কাঠামো

বাংলাদেশের সরকারি আয়-ব্যয়ের কাঠামো সর্বদাই দুর্বল ছিল। এ পরিস্থিতি এখনও অব্যাহত। এ দুর্বলতার প্রধান লক্ষণ হলো কর-জিডিপি অনুপাত ১০ শতাংশের ওপরে না ওঠা। একই সঙ্গে উন্নয়ন ব্যয়ের তুলনায় রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির হার বেশি। বাংলাদেশে বাজেট ঘাটতি বাড়ছে না। এর কারণ, আমাদের সীমিত সম্পদও আমরা যথোপযুক্তভাবে খরচ করতে পারি না। তাই আমরা সম্প্রসারণমূলক আর্থিক নীতির কথা বলেও আসলে কম কর, কম ব্যয় ও নিয়ন্ত্রিত বাজেট ঘাটতি- এ রকম একটা পরিস্থিতি নিয়ে আগামী অর্থবছরেও চলতে হবে।

সাম্প্রতিককালে আমাদের শক্তির জায়গা ছিল বৈদেশিক খাত। রপ্তানি, প্রবাসী আয়, বৈদেশিক সাহায্য এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগ জোরদার থাকায় বৈদেশিক আয়-ব্যয়ের সার্বিক ভারসাম্য বাংলাদেশের পক্ষে ছিল। বৈদেশিক খাতের চলতি হিসাবের মোট ঘাটতি গত বছরের ৫৫৫ মিলিয়ন ডলার থেকে প্রায় তিন গুণ হয়ে এখন দাঁড়িয়েছে ১৪৭২ মিলিয়ন ডলারে। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঘাটতির বিষয়টি আরও প্রকট। বাংলাদেশের রপ্তানি আয় এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে। কিন্তু এর মূল কারণ তুলা এবং সুতার দাম বৃদ্ধি। এরই মধ্যে চলতি অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলারের ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। এ

ঘাটতির প্রতিফলন দেখা যাবে বৈদেশিক মুদ্রা মজুতে, যেটি ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। আগামীতে বৈদেশিক মুদ্রার মজুতের ওপর চাপ আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা।

এর ফলে টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার জন্য বাজারে ডলার ছাড়ার ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংকের সীমিত হয়ে যাচ্ছে। বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখতে বিগত সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক যে চার-পাঁচ বিলিয়ন ডলার বাজারে ছেড়েছিল, এখন আর তা সেভাবে সম্ভব হচ্ছে না। এসব কারণেই বাংলাদেশ ব্যাংককে টাকার বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণকে শিথিল করতে হয়েছে। আগামীতেও এ বিনিময় হারের কিছুটা অবনমন হতেই থাকবে।

মূল্যস্ফীতির হিসাব

সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মূল্যস্ফীতি বর্তমানে ৬ শতাংশের কিছুটা বেশি। এই হিসাব বাস্তবতাবির্ভিত। সরকারি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, গ্রাম পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি শহরের তুলনায় বেশি এবং খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতির চেয়ে বেশি। সাধারণভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়- তেল, ডাল, ডিম, আটা-ময়দা, মুরগি, মাছ, দুধ ইত্যাদির দামের ক্ষেত্রে টিসিবি গত এক বছরের যে তালিকা দিয়েছে, তার সঙ্গে বিবিএসের উপাত্তের সামঞ্জস্য নেই। অনেকেই বলেন, আমাদের দেশে যেসব আমদানি করা পণ্য রয়েছে, তার দাম প্রতিবেশী দেশের তুলনায় কম, যেটি সঠিক নয়। টিসিবির তথ্যে দেখা যাচ্ছে (মে মাস) বাংলাদেশে এক লিটার পাম অয়েলের দাম ছিল ১৮৩ টাকা; ভারতে তা ছিল বাংলাদেশি টাকায় ১৭৩ টাকা। যে পণ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের চেয়ে ভারতে দাম বেশি ছিল তা হলো তেল ও ডিজেল। সম্প্রতি ভারত অভ্যন্তরীণ শুল্ক হার কমিয়ে এসব জ্বালানির খুচরা দাম কমিয়েছে।

বিবিএস প্রদত্ত মূল্যস্ফীতির হিসাব বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত নয়। কারণ, বিবিএস ভোক্তা মূল্যসূচক হিসাব করে ১৭ বছরের আগের অর্থবছর ২০০৫-০৬-এর ভিত্তিতে। এই ১৭ বছরে মানুষের ভোগ কাঠামো ও পণ্যমূল্যের বাজারদর কাঠামোতে যে পরিবর্তন হয়েছে, বিবিএসের হিসাবে তা ধরা পড়ে না। এ ছাড়া অসুবিধাগ্রস্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেসব পণ্য ও সেবা ব্যবহার করে, তার অনেক কিছুর হিসাব এখানে যথাযথভাবে অনুমিত হয় না। অর্থাৎ বিভাজিতভাবে মূল্যস্ফীতি হিসাব করলে তা অনেক উচ্চ হবে।

এ ছাড়া উচ্চমূল্যে বর্তমানে পণ্য আমদানি করতে হচ্ছে। এটি পুরোদমে বাজারে এলে এ সময় সরকার যদি জ্বালানি তেল ও বিদ্যুতের দাম বাড়ায়, তাহলে মূল্যস্ফীতি আরও বাড়বে। তাই আগামী বাজেটে বিভিন্ন খাতে ভর্তুকি বাড়াতে হবে। সে লক্ষ্যে ভর্তুকি কাঠামো পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং প্রাধান্য দিতে হবে খাদ্য ও জ্বালানি মূল্যের স্থিতিশীলতার ওপর।

বাজেটের কেন্দ্রীয় সূচক

মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি, অন্যদিকে টাকার মূল্যমান কমে যাওয়া অর্থনীতিতে বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করছে। এ পরিস্থিতিতে সুদের হার একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়। যে কোনো দেশের

সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখার প্রয়োজনে সুদের হার, বিনিময় হার ও মূল্যস্ফীতি- এ তিনটি বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয়। টাকার মূল্যমান কমছে, মূল্যস্ফীতিও ঘটছে। কিন্তু সুদের হার একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আটকে রাখা হয়েছে— এটা বাস্তবসম্মত নয়। সুদের হার কম রেখে ব্যক্তি বিনিয়োগ বাড়ানো যাবে, এই অবস্থান বাংলাদেশের জন্য কার্যকর নয়। কারণ, দেশে বিনিয়োগ ও ব্যবসা করার ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তার মধ্যে সুদ একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সামান্য অংশ। দেশে সার্বিকভাবে ব্যবসাবান্ধব পরিস্থিতি নেই। বর্তমানে আমানতের সুদের গড়হার ৪ শতাংশের কিছুটা বেশি, যা মূল্যস্ফীতির হারের চেয়ে প্রায় ২ শতাংশ কম। এতে ব্যাংকে টাকা রাখলে তার প্রকৃত মূল্য প্রতি বছর ২ শতাংশ কমে যাচ্ছে। কাজেই সুদের হারকে আটকে রাখা এক ধরনের সঞ্চয়বিরোধী নীতি। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে মূল্যস্ফীতিকে কেন্দ্রীয় সূচক হিসেবে বিবেচনা করে সুদের হার বাড়াতে হবে।

মনে রাখতে হবে, সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা নষ্ট হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় গরিব ও সীমিত আয়ের মানুষ, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি; যাদের আয় সেই হারে বাড়েনা যে হারে বাজারে পণ্যমূল্য বাড়েনা। কাজেই আগামী বাজেটে যদি একটিমাত্র বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হয়, তাহলে সেটি হতে হবে মূল্যস্ফীতি এবং সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা।

বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

বিগত সময়ে আমরা দেখেছি, জিডিপির অনুপাতে মোট বিনিয়োগ হার কোনো অবস্থাতেই ৩০ শতাংশের বেশি বাড়ানো যাচ্ছে না। এর মধ্যে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ হার আটকে আছে ২০-২৪ শতাংশের মধ্যে, যা অতিমারির পূর্ব সালে ছিল ২৫ শতাংশের মতো। তবে প্রবৃদ্ধির হারের সঙ্গে বর্তমান বিনিয়োগ পরিস্থিতির সাযুজ্য নেই। সম্পদ ও বিনিয়োগের উৎপাদনশীলতাও অনেক কমে যাচ্ছে। সরকার ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির যে প্রাক্কলন দিয়েছে, তাতে দেখা যায়, বৃহৎ শিল্পে প্রবৃদ্ধি ১৩ শতাংশের কাছাকাছি; অন্যদিকে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পে এ হার ১১ শতাংশের নিচে। অর্থাৎ, যে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, তা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের তুলনায় বৃহৎ শিল্পকে বেশি সুযোগ দিচ্ছে। এটা কর্মসংস্থান বাড়ানোতে সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করছে। কাজেই আগামী দিনে বাজেট বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ বাজারমুখী ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে বেশি সমর্থন দিতে হবে।

অতিমারি চলাকালীন জাতীয় সঞ্চয়ের হার ছিল ৩১ শতাংশের ওপরে। এখন তা সাড়ে ২৫ শতাংশের নিচে নেমে গেছে। সঞ্চয় কমে যাওয়া অর্থাৎ প্রতি পরিবার ভোগের পণ্যের জন্য বেশি ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছে। নিম্ন আয়ের মানুষের সঞ্চয়ের পতন আর্থসামাজিক ভঙ্গুরতার আভাস দিচ্ছে। এই সময় যদি নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতে খরচযোগ্য অর্থ না দেওয়া হয়, তাহলে সঞ্চয়ের যে পতন ধারা দেখা যাচ্ছে, তা তাদের আরও আর্থিক কৃচ্ছের মধ্যে এমনকি দারিদ্র্যসীমার নিচে ঠেলে দেবে। এ জন্যই করমুক্ত আয়সীমা বর্তমান তিন লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে সাড়ে তিন লাখ টাকায় উন্নীত করা উচিত।

এক্ষেত্রে যুবসমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ নজর দিতে হবে। শিক্ষা-প্রশিক্ষণ-কর্মে নেই এমন যুবকদের এক হাজার টাকা মাসিক ভাতার প্রচলন করতে হবে। বছরে এক লাখ টাকা পর্যন্ত শিক্ষাঋণের জন্য ক্রেডিট কার্ড চালু করতে হবে। ব্যাপক ডিজিটাল বৈষম্য কাটিয়ে উঠতে বিদ্যালয় পর্যায়ে বিনামূল্যে গিগাবাইট দিতে হবে। তা না হলে দেশে উৎপাদনশীলতা এবং গুণমানসম্পন্ন শ্রমশক্তি গড়ে উঠবে না।

সামাজিক সুরক্ষা

জিডিপির অনুপাতে কয়েক বছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বেড়েছে, যদিও তা কার্যকরভাবে বিতরণ হয়নি। কিন্তু এ বরাদ্দের বড় অংশই ঋণ হিসাবে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা প্রান্তিক ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ব্যবহারের সুযোগ পায় না। মাথাপিছু জাতীয় আয় বাড়বে আর দুস্থ মানুষ তার হিস্যা পাবে না- তা হবে না। কাজেই অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রত্যক্ষ আর্থিক প্রণোদনা হিসেবে মাসিক ন্যূনতম এক হাজার টাকা ভাতা সরাসরি দিতে হবে। আর বিদ্যমান কর্মসূচির পাশাপাশি আগে উল্লিখিত যুব ভাতা চালু করতে হবে। টিসিবি এবং ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বিক্রির আরও সম্প্রসারণ করতে হবে। অতিমারির কারণে যেসব নেতিবাচক প্রভাব সমাজে দেখা গেছে, যেমন বাল্যবিয়ে, শিশুশ্রম ও স্কুল থেকে ঝরে পড়া, তা মোকাবিলায় বাজেটে বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে।

যেসব মেগা প্রকল্প এখন শেষের দিকে, সেগুলো থেকে আর্থিক সুবিধা কতটা পাওয়া যাবে, সেটিও বিবেচনাযোগ্য। ভর্তুকির টাকা যাতে এসব মেগা প্রকল্পের ব্যয় মেটাতে ব্যবহৃত না হয়, সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। যুক্তিহীনভাবে জ্বালানি খাতের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোকে এখনও কেন ভর্তুকি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে?

অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর একটি অভিন্ন, সংযুক্ত ও সম্পূর্ণ তথ্যভান্ডার প্রণয়ন করতে হবে। কারণ, এ তথ্যভান্ডার না থাকার ফলে সরকারের নীতি থাকা সত্ত্বেও সরকারি সমর্থন যাঁদের প্রাপ্য, তাঁরা পাচ্ছেন না।

পরিশেষে তিনটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। প্রথমত, বৈশ্বিক বাস্তবতার পাশাপাশি আর্থিক খাতে দুর্বলতার জন্য যথেষ্ট সংস্কারমূলক পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে ২০২২-২৩ অর্থবছর বেশ টানা হেঁচড়ার মধ্যে থাকবে। এমন বাস্তবতায় সঠিক ও সক্রিয় জাতীয় নীতি ব্যবস্থাপনা আগামী অর্থবছরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। কাজেই আগামীতে প্রাক-বিবেচনায় পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম এমন একটি আর্থিক ব্যবস্থাপনা দরকার, যাতে কোনো একটি ঘটনা ঘটানোর আগেই ব্যবস্থা নেওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, আমাদের তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি আছে। ফলে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ বিঘ্নিত হচ্ছে। তিন মাস পরপর সংসদে দেশের সার্বিক আর্থিক পরিস্থিতি তুলে ধরার বিষয়ে আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা পরিপালন করা হচ্ছে না। তাই স্বচ্ছ, সঠিক ও নিয়মিত পরিস্থিতি পরীক্ষণ জরুরি। তৃতীয়ত, মানুষের কণ্ঠস্বর যদি সোচ্চার

হতে না পারে তাহলে যত বরাদ্দই দেওয়া হোক না কেন, তার স্বচ্ছতা সঠিক ব্যবহার হয় না। তাই আগামী বাজেটের জনবান্ধব বাস্তবায়নে নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর জোরদার রাখতে হবে।

দৈনিক সমকাল

৭ জুন ২০২২

বাজেট ২০২২-২৩ ভাবনা: ব্যতিক্রমী সময়ের ভিন্নতর দাবি

মোস্তাফিজুর রহমান

ব্যতিক্রমী সময়ে প্রয়োজন ব্যতিক্রমী উদ্যোগ ও নীতি সিদ্ধান্ত। আর এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপিত হবে একটি ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে এবং একটি ভিন্নতর চাহিদাকে সামনে রেখে। বাংলাদেশের অর্থনীতির ধারাবাহিক শক্তি ও অর্জনের প্রতিফলন ছিল নিয়ন্ত্রিত মূল্যস্ফীতির সঙ্গে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির সংযোগ, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপনের প্রাক্কালে কিছুটা ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। কোভিডের নেতিবাচক অভিঘাত থেকে উত্তরণের ক্রান্তিকালে ভোক্তা ও উৎপাদক উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতার দুর্বলতা মোকাবিলার দ্বৈত চাপের মধ্যে রয়েছেন, যার প্রভাব পড়েছে জীবনযাত্রার মান ও বিনিয়োগে। মূল্যস্ফীতির মূল অনুঘটক হিসেবে কাজ করছে আন্তর্জাতিক বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য ও উৎপাদনের উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি, যা দেশের অর্থনীতিতে আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতির চাপ সৃষ্টি করছে। যেমন, চলমান ২০২১-২২ অর্থবছরে (জুলাই-এপ্রিল) আগের অর্থবছরের তুলনীয় সময়ের নিরিখে আন্তর্জাতিক বাজারে গমের মূল্য গড়ে মের্ট্রিক টন প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে ৫০.২ শতাংশ, কেজিপ্রতি চিনি ৩১.৩ শতাংশ, অপরিিশোধিত তেল ব্যারেলপ্রতি ৯১.০ শতাংশ, প্রাকৃতিক গ্যাস ১২৫.৬ শতাংশ এবং তুলার মূল্য কেজিপ্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৩.৭ শতাংশ।

স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় ও দামের ওপরেও আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সর্বসাপ্রতিকালো যোগ হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ‘মানেজড ফ্লোট থেকে ফ্রি ফ্লোট’-এ যাওয়ার সিদ্ধান্তের কারণে ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের অবমূল্যায়নের কারণে আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে বাড়তি বোঝা।

কোভিড থেকে ঘুরে দাঁড়াবার এ সময়ে বিশেষ করে নিম্ন ও স্থির আয়ের মানুষ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে উপান্তিক মানুষ ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জনগণও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি জনিত কারণে জীবনমানের অবনয়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। মাথাপিছু জাতীয় আয়

গড়ে ২৮২৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে শুনে উত্তরোত্তর আয় বৈষম্য, ভোগ বৈষম্য ও সম্পদ বৈষম্যের শিকার এসব মানুষ, যারা এখন আবার উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে বিপর্যস্ত, তারা স্বস্তি পাবেন না। তারা আসন্ন বাজেট থেকে প্রত্যাশা করবেন কিছুটা স্বস্তি ও ক্রয়ক্ষমতার সুরক্ষা।

সিপিডি'র সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকা শহরে এক রুমের বাসায় থাকা চার জনের একটি পরিবারের জীবনযাপনের ন্যূনতম মাসিক ব্যয় বর্তমান বাজার মূল্যে দাঁড়িয়েছে ৪২ হাজার পাঁচশত টাকার বেশি। এ ধরনের পরিবারের দু'জনও যদি সর্বোচ্চ ন্যূনতম মজুরিতে কাজ করেন তাহলেও সে আয় দিয়ে তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় সংকুলান সম্ভব নয়। সাম্প্রতিককালের পরিচালিত বিভিন্ন জরিপ থেকেও এ বাস্তবতার সমর্থন মেলে।

যারা উদ্যোক্তা ও উৎপাদক তাদের চড়া দামে উৎপাদনের উপকরণ ক্রয় করতে হচ্ছে। তেল-গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির কারণে তাদের বিনিয়োগ ও উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে, এবং স্থানীয় ও বৈদেশিক বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতার ওপর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। জানুয়ারি-জুন ২০২২-এর আর্থিক নীতি স্টেটমেন্ট- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্কলিত ব্যক্তি খাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৪.৮ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও বিগত সময়ে এ হারে কিছুটা বৃদ্ধি সত্ত্বেও তা ১২.৫ শতাংশের বেশি হয়নি।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে কোভিডের অভিঘাত ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির প্রকৃত প্রাপ্তির ওপর মূল্যস্ফীতির নেতিবাচক প্রভাব এখন নতুন বাস্তবতা, যা বাজেট ২০২২-২৩-এর প্রণয়ন ও অর্থ বরাদ্দের নিরিখে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবি রাখে।

একইসঙ্গে, সাম্প্রতিককালে বৈদেশিক ভারসাম্যের অবস্থার উল্লেখযোগ্য অবনতিও নীতি নির্ধারকদের জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে দ্রুতগতিতে, রফতানি বৃদ্ধি তার সাথে সমতুল্য হারে বাড়ছে না, রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক।

ফলশ্রুতিতে চলমান অর্থবছরের প্রথম এগার মাসে বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ২৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার; বিগত অর্থবছরের এ সময় যা ছিল ১৮.০ বিলিয়ন ডলার; চলতি হিসাবে ঘাটতি এ সময়ে ১৫.৩ বিলিয়ন ডলার, গত বছর যা ছিল ১.৬ বিলিয়ন ডলার; আর্থিক হিসাবের উদ্বৃত্ত নেমে এসেছে ১.২ বিলিয়ন ডলারে, যা গত বছর ছিল ৯.৬ বিলিয়ন ডলার। এর ফলে বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্য বর্তমান অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ঋণাত্মক ৩.৭ বিলিয়ন ডলারে, যেখানে গত অর্থবছরের তুলনীয় সময়ে উদ্বৃত্ত ছিল ৭.৫ বিলিয়ন ডলার। মনে রাখতে হবে, সাম্প্রতিক সময়ের রফতানি আয় বৃদ্ধি মূলত পরিমাণ-বৃদ্ধিনির্ভর, আর আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি প্রধানত মূল্য-বৃদ্ধিনির্ভর। নেতিবাচক বাণিজ্য ভারসাম্য ও বাণিজ্যের এ চরিত্র বাণিজ্য ভারসাম্য কাঠামোর দুর্বলতার দিকেই ইঙ্গিত করে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ গতবছরের শেষের ৪৮.০ বিলিয়ন ডলার থেকে হ্রাস পেয়েছে ৪২.০ বিলিয়ন ডলারে; নয় মাসের আমদানি সক্ষমতার রিজার্ভ এখন পাঁচ মাসের আমদানির সমপরিমাণ। বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে ডলারের চাহিদা সরবরাহের তারতম্যের

কারণে সৃষ্ট অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সাম্প্রতিক সময়ে টাকার মুদ্রামান প্রায় পাঁচ টাকা অবমূল্যায়িত করার পরও ‘মানেজড ফ্লোট’ থেকে ‘ফ্রি ফ্লোট’-এ যেতে হয়েছে। অর্থনীতিতে আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতির চাপ এর ফলে আরও বেড়েছে।

কোভিড থেকে উৎক্রান্তিকালীন এ সময়ে ব্যক্তি খাতে বিশেষ করে এসএমই খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, নতুন কর্মসৃজন, এবং মূল্যস্ফীতির চাপের মোকাবিলা—এ ত্রিবিধ চাহিদার নিরিখেই ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রণীত হতে হবে।

বাজেটের আকার নিয়ে প্রায়ই ‘বিশাল’ বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়। প্রকৃত পক্ষে যে বাজেটের আকার জিডিপি ১৫.০- ১৬.০ শতাংশেরও নিচে তা কোনও বিবেচনায়ই বিশাল নয়। বাংলাদেশে সরকারি ব্যয় জিডিপির অংশ হিসেবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের তুলনায়ও কম, মধ্য-আয়ের দেশে গড়ে-এর আকার জিডিপির ২৫.০ শতাংশের বেশি। এর পেছনে একটা বড় কারণ আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের দুর্বলতা। জিডিপি অংশ হিসেবে রাজস্বের অংশ এখনও আমরা ১০.০ শতাংশ পর্যন্তও নিতে পারিনি, অথচ সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাক্কলন করা হয়েছিল ২০২০ সাল নাগাদ জিডিপি অংশ হিসাবে এ হার ১৪.০ শতাংশে উন্নীত করার। বাজেটের ঘাটতি জিডিপি ৫.০ শতাংশের মধ্যে রাখতে হলে বাজেটের আকার তাই ১৫.০ শতাংশের বেশি করা সম্ভব হয় না। এটা একটা ধারাবাহিক কাঠামোগত দুর্বলতা।

বাংলাদেশে কর আয়ের দুই-তৃতীয়াংশই আসে ভ্যাটসহ অপ্রত্যক্ষ করের সূত্রে, আর এক-তৃতীয়াংশ মাত্র আসে প্রত্যক্ষ কর থেকে (যার দুই তৃতীয়াংশ কোম্পানি কর ও এক-তৃতীয়াংশ মাত্র ব্যক্তি আয় কর)। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অন্য অনেক দেশে করের উল্লেখযোগ্য অংশই আসে ব্যক্তি কর থেকে। বাংলাদেশের কর কাঠামো বণ্টনের ন্যায্যতার পরিপন্থী। বিনিয়োগ বান্ধব হতে হলে প্রণোদনা, কর ও বিনিয়োগ পরিবেশে বড় পরিবর্তন প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে যে, বাজেটের একটি মূল দর্শন হলো আয় ও সম্পদের পুনর্বণ্টন, যা কর-জিডিপি হার না বাড়িয়ে, আয়কর আরও সক্ষমতার সাথে আদায় না করে ও জনকল্যাণমুখী ব্যয় নিশ্চিত করা ব্যতিরেকে অর্জন করা সম্ভব নয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরের কর প্রস্তাবে সর্বোচ্চ ব্যক্তি কর যা কোভিডের সময়ে ৩০.০ শতাংশ থেকে ২৫.০ শতাংশে নামানো হয়েছিল তা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়াই যৌক্তিক হবে, অন্যদিকে ঠিক হবে কোম্পানি করের যে যৌক্তিককরণ চলমান রয়েছে তা অব্যাহত রাখা। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য উদ্যম উদ্যোগের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ রাখতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ডিজিটাল সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও মানবসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ও ট্রান্সফার প্রাইসিং সেল ও ইন্টেলিজেন্স সেলকে শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখলে তা ব্যয়িত অর্থের বহুগুণে সরকারের রাজস্ব আদায় প্রচেষ্টায় ইতিবাচক অবদান রাখবে।

সরকারের ব্যয়ের দুটি ভাগ—রাজস্ব ব্যয় ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয়। এগুলোর মধ্যে টানাপোড়েনের মধ্যেই ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রণীত হবে। রাজস্ব ব্যয়ের

চার-পঞ্চমাংশই যায় চলমান বেতন-ভাতা-পেনশন, ভর্তুকি ও ঋণ পরিসেবায়। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করতে পারলে অন্যান্য খাতে ব্যয়ের জন্য যেমন আরও বেশি অর্থ সংকুলান করা যাবে অন্যদিকে রাজস্ব বাজেটের উদ্বৃত্ত দিয়ে উন্নয়ন বাজেটেরও অর্থায়ন করা যাবে, ঘাটতি বাজেট হ্রাস করা যাবে, ঋণ, তা দেশীয় বা বৈদেশিক হোক, কম গ্রহণ করতে হবে। বাজেটে বরাদ্দের অগ্রাধিকার সঠিকভাবে নির্ধারণ ও সাশ্রয়ী ও সুশাসনভিত্তিক বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা আগামী অর্থবছরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।

উন্নয়ন বাজেটের চলমান ও সমাপ্য প্রকল্পের জন্য অর্থায়নকে গুরুত্ব দিয়ে নতুন প্রকল্পের ক্ষেত্রে হতে হবে সতর্ক, বিশেষত যেগুলিতে নিজস্ব অর্থায়নের অংশই বেশি।

খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণের সময়ে এবার প্রান্তিক জনগণের ওপর মূল্যস্ফীতির চাপের মোকাবিলায় সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা হবে অত্যন্ত জরুরি। আর এজন্য বরাদ্দের ভিত্তি ও মাথাপিছু প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে এবং বণ্টনে-বিতরণে, লক্ষ্য-নির্দিষ্টতার ওপর জোর দিতে হবে। সরকার ইতিমধ্যে খাদ্য ও নগদ সহায়তা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে; বাজেটে তার সম্প্রসারিত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে।

শিক্ষা খাতের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের এখনই সময়। সরকার প্রণীত ২০১৮ সালের ‘প্রস্ফুটিত শিশু’ প্রতিবেদনে শিশুদের জন্য বাজেট বরাদ্দ মোট সরকারি ব্যয়ের ১৫.০ শতাংশ থেকে ক্রমান্বয়ে ২০.০ শতাংশে উন্নীত করার অভীষ্ট রাখা হয়েছিল। এ বাজেটে তার প্রতিফলন অত্যন্ত জরুরি।

ভর্তুকির ব্যবস্থাপনা ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাজেটের নিরিখে একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেল, গ্যাস ও সারের মূল্য বৃদ্ধির কারণে ভর্তুকির জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। তবে বর্তমান অবস্থার বিবেচনায় মূল্য সমন্বয়ের মাধ্যমে ভর্তুকি সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতার প্রয়োজন হবে। ভোক্তা ও উৎপাদক স্বার্থ বিবেচনায় রেখে ও আন্তর্জাতিক পণ্যবাজারে মূল্যের প্রবণতার নিরিখে এখনই সিদ্ধান্ত না নিয়ে বাজেট বাস্তবায়নের পরবর্তী কোন পর্যায়ে এ মূল্য সমন্বয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে। শুষ্ক সমন্বয়, আমদানি পর্যায়ে থেকে ভোক্তা পর্যায়ে এবং আমদানি পর্যায়ে থেকে উৎপাদক পর্যায়ে বাজার ব্যবস্থাপনায় নজরদারি বাড়াতে হবে এবং বাজার কারসাজি ও দুর্নীতির মোকাবিলায় সরকার ঘোষিত শূন্য-সহিষ্ণুতা নীতির বাস্তবায়নের এখনই প্রকৃষ্ট সময়।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের গুরুত্বকে বিবেচনায় রেখে, সম্পদ আহরণে দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং অগ্রাধিকারভিত্তিক সম্পদ বিতরণের ওপর নির্ভর করে, সাশ্রয়ী, সুশাসনভিত্তিক ও দক্ষ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে আগামী ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটের প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

বাংলা ট্রিবিউন

৮ জুন ২০২২

কোনো প্রশ্ন ব্যতিরেকে অর্থ ফিরিয়ে আনা রাজনৈতিক প্রশ্নের জন্ম দেবে, এটা হঠকারী সিদ্ধান্ত

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সংযত বাজেটের লক্ষণ হলো— আগামী বছর মোট বিনিয়োগ গত বছরের সংশোধিত বাজেটে যে পরিমাণ ছিল তার থেকে কম; ৩২ দশমিক ৫ শতাংশ। এবং সরকারি বিনিয়োগও ১ শতাংশের মতো কমে যাবে। আমরা যদি রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা দেখি, গতবছরের তুলনায় এ বছরে জিডিপি'র প্রায় ৯.০৭ শতাংশ কোলন করা হয়েছে। ব্যয়ের দিকে দেখলে আমরা সামান্য বৃদ্ধি দেখি, যা ১৫.০২ শতাংশ। অর্থাৎ ঘাটতি বাড়বে। তার মূল কারণ হলো পরিচালন ব্যয় বাড়ার কারণে, উন্নয়ন ব্যয় না। আর ঘাটতি পূরণ করার জন্য অনেক ব্যাংক ঋণের প্রয়োজন মনে করবে এবং বিদেশি সাহায্যের প্রয়োজন মনে করবে। বিশ্বব্যাংক এবং এডিবি'র কাছ থেকে যে সমস্ত বাজেট সাপোর্ট বা বাজেটের খরচের জন্য টাকা আনা হচ্ছে, সময়মতো এটা পাওয়া এবং খরচ করা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অপরদিকে মনে করা হচ্ছে আগামী বছর ব্যক্তি খাতে ঋণ প্রবাহ যে খুব বেশি বাড়ার লক্ষ্য নেয়া হয়েছে তা না। গত বছর যদি ১৪.০৮ থাকে এবার ১৫ দেয়া হয়েছে। সেই অর্থে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে, ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগের নতুন কোনো বাড়তি সংকেত আসবে— এটা বাজেট প্রণেতারা মনে করছেন না।

আপনি যদি আমদানি-রপ্তানির দিকে যদি দেখেন, উনারা যে বছর গেল তার চেয়ে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ২০ শতাংশ কম করেছেন। আমদানিতে করেছেন ১২ শতাংশ। গতবারে যা ৩০ শতাংশ ছিল, এটা কীভাবে করে যখন বিশ্বব্যাপী পণ্য মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে। এটা বাস্তবসম্মত নয়। অর্থাৎ উনারা বৈদেশিক লেনদেনের যে ঘাটতি ধরেছেন সেটা আরও অনেক বেশি হবে এবং যার ফলে বিদেশি মুদ্রা মজুতের পরিমাণ যে উনারা লক্ষ্য করেছেন সাড়ে ৪৬ বিলিয়ন ডলার এটা তার চেয়ে কম থাকবে বলে আশঙ্কা করেন।

খরচের দিক থেকে এই ধরনের নতুন কোনো পরিবর্তন আসেনি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সুরক্ষা খাতে আগে ২ বা ১ শতাংশের নিচে থাকতো তাই আছে। কোনো পরিবর্তন নেই। ঘাটতির বড় কারণটাই হবে ভর্তুকি এবং সরকারি দায়দেনার সুদ। এটি একটি বড় বিষয়।

যে সমস্ত করসুলভ প্রস্তাব করা হয়েছে সেটা একদিক থেকে যৌক্তিক। সেটা হচ্ছে আরও বেশি প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে সরকার করের আওতায় নিয়ে আসতে চাচ্ছেন। ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার ভেতর দিয়ে করকে যুক্ত করতে চাচ্ছেন। কো-অপারেট করার জন্য যে সুবিধা দিলেন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের জন্য সে সুবিধা দিলেন না। তাদের করযোগ্য আয়ের সীমা বাড়ালো না। আর ওদিকে করপোরেটের নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত কোম্পানিগুলোর কর আড়াই শতাংশ করে কমালো।

আর সবচেয়ে খারাপ কাজ যেটা করলো। যেটা সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক প্রশ্নের জন্ম দেবে। যেটা আমার কাছে হটকারী সিদ্ধান্ত বলেই মনে হয়। অর্থমন্ত্রীর ভাষায় সেটা হলো—বিদেশি অর্জিত সম্পদ, আমাদের ভাষায় পাচারকৃত সম্পদ। সেটা ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন প্রকার সম্পদের এত কর সুবিধা দিচ্ছেন। টাকা যে বৈধভাবে সেখানে অর্জিত হয়েছে এর সনদটা কে দেবে। এবং কোনো প্রশ্ন ব্যতিরেকে এই দেশে যখন গ্রহণ করা হবে, তাহলে এদের বিরুদ্ধে কোনোদিন মানিলন্ডারিং বা পাচারের অভিযোগ আনার দরকার পড়বে না। পি কে হালদারকে আমাদের এখন তাহলে গলায় মালা দিয়ে নিয়ে আসা উচিত। এবং এটা নির্বাচনের আগের বছরে করা রাজনৈতিকভাবে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। একইভাবে এই টাকা বিদেশে বিভিন্ন লোকজন খুঁজছে, সে সময়টা হচ্ছে এটাও একটা প্রশ্নের সম্মুখীন করবে। এটা একটি হঠকারী প্রস্তাব একইসঙ্গে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে যুক্তিহীন।

বাজেটে মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য আমদানি নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা ভালো, কিন্তু এটা যথেষ্ট না। এটা দিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা পুরোটা যাবে না। কারণ আপনি যতটুকুই আনবেন সেটুকুই উচ্চমূল্যে আসবে। এটি মূলত আসবে জ্বালানি এবং সারের মাধ্যমে এবং আমরা যে খাদ্যশস্য আমদানি করি তার মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে তথাকথিত বিলাস পণ্য এটা অর্থনীতিতে আমদানিকৃত পণ্যভাণ্ডারে খুবই সামান্য। আর এটির জন্য দু'টি বিষয় দরকার। একটি হলো অভ্যন্তরীণ বাজারমুখী শিল্পকে আরও বেশি প্রণোদনা দেয়া, যাতে তারা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। দ্বিতীয়ত, সীমিত আয়ের মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক সহায়তা দেয়া এবং নির্ধারিত মূল্যে খাদ্যপণ্য সরবরাহ করা। এটি করে মূল্যস্ফীতি কমানো সম্ভব। কিন্তু আগামী অর্থ বছরে কীভাবে ৬ দশমিক ৩ শতাংশ, ৫ দশমিক ৬-এ নেমে আসবে, বাজেটে এর কোনো সুনির্দিষ্ট পথরেখা আমরা পাইনি। কারণ শুধু আমদানি নিয়ন্ত্রণ দিয়ে মূল্যস্ফীতি কমানো জটিল, সেই সুযোগ সীমিত। এখানে অভ্যন্তরীণ বাজারমুখী উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দুস্থ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা রক্ষা করাই হলো আসল কাজ।

বাজেটে আয়-ব্যয়ের ঘাটতি কিছুটা বাড়বে। কারণ হলো আয় এবং ব্যয় দুটো সংযত করা হলেও তারপরও ব্যয় বাড়ছে। ব্যয় বাড়ছে তার কারণ পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি। আর পরিচালন ব্যয় বাড়ছে তার কারণ হলো ভর্তুকি এবং অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদের কারণে। সে জন্য ঘাটতি

কিছুটা বাড়বে এবং ঘাটতি মেটানো হবে মূলত ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আর বিদেশি সাহায্য। আর বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে যে বাজেট সহায়তা চাওয়া হয়েছে সেগুলো যদি পায় তাহলে একটু সহজ হবে। তবে এক্ষেত্রে তাদের যে কৌশল, এখানে তারা ধরেই নিয়েছেন যে, এটা তুলনামূলকভাবে ধীর স্থির বছর হবে। বাস্তবতা হচ্ছে, কোনো উচ্ছ্বাস বা উল্লসনের বছর এটা না।

মানবজমিন

১০ জুন ২০২২

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের গুণগত মান না বাড়লে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়ার কোনো মানে হয় না

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

প্রণব সাহা: মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখাটাই চ্যালেঞ্জ ছিল এবং সাধারণ মানুষের জন্য দাম সহনীয় রাখার দরকার ছিল। আপনারা মূল্যস্ফীতি ৫.৬ এ রাখতে চান। আজকেও দাম বাড়ার খবর পেলাম। যে কয়টা জিনিসের দাম কমেছে তাতে সাধারণ মানুষের জন্য খুব বেশি উপকার হবে বলে মনে হয়না। এটা কীভাবে বলছেন এবং করোনার অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা এবং অনেকগুলো সতর্কতা থাকা আমাদের দরকার ছিল বিশেষ করে সারা পৃথিবীতে যে সংকট সেটা সমন্বয় করা গিয়েছে কিনা।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ আপনাকে। আমি প্রথমেই এমসিসিআইয়-এর মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের কয়েকটি পাদটীকা দিতে চাই। প্রথমেই উনি বললেন যে করোনার অভিঘাত থেকে বের হইনি আবার উত্তর পরিস্থিতিতে আছি এটা বলা যায়না। আমি উনার সাথে একমত। তবে অর্থমন্ত্রী একমত হবেন না। কারণ উনি উনার বক্তব্যে বলেছেন, আমরা অতিমারি অতিক্রম করিনি, একই অবস্থার মধ্যে আছি। সেহেতু এখানে মূল্যায়নের তফাত হয়েছে এবং আমি মনে করি অতিমারি স্বাস্থ্যগত বিবেচনায় যদি অতিক্রম করেও থাকি তবে আমাদের সব গবেষণায় বলছে অতিমারি এত গভীর এবং বহুমাত্রিক হয়েছে সাধারণ একটা পরিবারের তিন থেকে চার বছর সময় লাগবে এটাকে কাটিয়ে উঠতে। কারণ তাদের সঞ্চয় ভেঙেছে, পুষ্টিহীনতা এসেছে, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য অভিঘাত এসেছে। তাই এই বিষয়টি হঠাৎ করে আমাদের চিন্তার বাইরে চলে গেছে।

এই বাজেটের ভেতরে অতিমারি উত্তর বা অতিমারির ফলাফলকে মোকাবিলা করার জন্য যে মনোবল দরকার তা দেখি নাই।

আরো দেখি নাই যে এই অতিমারীর সময়ে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবার আক্রান্ত হয়েছে যেটাকে আমরা বলি, "নব্য দারিদ্র্য" সৃষ্টি হয়েছে, অর্থমন্ত্রী নব্য দারিদ্র্য শব্দটাকেই গ্রহণ করেন নি। সেহেতু এটার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাও কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে নাই।

আরেকটি বড় উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আপনারা একটু আগে কর্পোরেট ট্যাক্স নিয়ে আলোচনা করেছেন ওই কর্পোরেট ট্যাক্স এর মধ্যে যেটা দেওয়া হয়েছে এটাতে আমার সমর্থন আছে এবং কোন সমস্যা নাই। কিন্তু আপনারা দেখেন যে এর বিপরীতে করযোগ্য আয়ের যে মাত্রাটা ছিল তিন লক্ষ টাকা সেই তিন লক্ষ টাকাতে আপনারা ছাড় দিলেন না। আপনি কর্পোরেট ট্যাক্সে ছাড় দিলেন। আপনি মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত তার যে জীবনযাপন এই মূল্যস্ফীতিতে কষ্টকর তাকে আপনি বিন্দুমাত্রও বিবেচনা করলেন না।

প্রণব সাহা: তিনলক্ষ টাকা বাৎসরিক আয় হলে যে তাকে কর দিতে হতো এটা বাড়িয়ে সাড়ে তিনলক্ষ টাকা করা হলো।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা তো মনোভঙ্গির সমস্যা, আর্থিক সমস্যা না। চিন্তার ক্ষেত্রে সমস্যা, আপনি কোন গোষ্ঠী, কোন শ্রেণীর, কার কথা চিন্তা করে বাজেট তৈরি করেন তার আমি আরো উদাহরণ দিতে পারব।

আপনি মূল্যস্ফীতির কথা বলছেন সেটাকে আমি মোকাবিলা করি কথা দিয়ে, বাংলাদেশে এখন যে মূল্যস্ফীতি হচ্ছে সেটাকে মোকাবিলা করার জন্য সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু সরকার যে পদক্ষেপ নেয় তা ঘটনার পেছনে দৌড়ায়। ঘটনাকে প্রাক-অনুমান করে এটার জন্য ব্যবস্থা নেয় না। অর্থাৎ বাজারে যখন দাম বেড়ে যায় তখন তারা সে সময় শুষ্ক সংযোগ করে। যখন ইতিমধ্যে এটি বাজারে চলে গেছে এবং বাজার থেকে দাম নামানো যায় না। যখন বাজারে দাম বেড়ে গেছে তখন হয়তো এলসি খুলে খাদ্য আমদানি করতে বলেন। যখন বাজারকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে চান তখন আপনি এলসি মার্জিন বাড়ান। যখন ইতিমধ্যে যারা অনেকে আনার তারা সেখানে এনে ফেলছে।

প্রণব সাহা: আমদানি শুষ্কও তো কমানো হয়েছে, সয়াবিন তেল বিশেষ করে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: কিন্তু সবই ঘটনার পরে। বাজারকে কখনো ঘটনার পরে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। বাজারকে সবসময় সংকেত দিতে হয়। তাহলে বাজার সে অনুযায়ী চলে। উনারা আমার চেয়ে বড় বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী, তাই এটি আমার থেকে ভালো জানেন। আমি বলি আপনাকে এই মুহূর্তে যে মূল্যস্ফীতি আছে এটাকে মোকাবিলা করা দরকার, এই স্বীকৃতিটা অর্থমন্ত্রী করেছেন। কীভাবে করবেন সেটার কোন পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তিনি দেননি বাজেটের ভিতর। আমি বলছি কী করার দরকার বা প্রয়োজন ছিল, এই পর্যন্ত আমাদের বাণিজ্য-নীতি দিয়ে আমাদের বাজারকে প্রভাবিত করতে চেয়েছি, শুষ্ক কমিয়ে বাড়িয়ে ইত্যাদি। এটা করে বাংলাদেশে মূল যে পণ্য আসে তা হলো, জ্বালানি, সার আর খাদ্যশস্য এই তিনটা। এই তিনটাকে কিন্তু আপনি কোনভাবেই মূল্য শুষ্ক সমাহার করে কোনো ভাবেই বিনিয়োগ করতে পারবেন না। কারণ কেনা মূল্যই উহ্য হয়ে গেছে। তার মানে হলো বাণিজ্য-নীতি, শুষ্ক-নীতি দিয়ে এটি আপনি করতে পারেন। আর কীভাবে করা যায়, যদি আপনি বাজারে তারল্য বা অর্থ যে স্বপ্ণালন করেছেন সেগুলোকে যদি উঠিয়ে আনতে চান। সরকার সম্প্রসারণশীল অর্থনীতির কথা বলেছেন। কিন্তু কার্যত কোনদিনই সম্প্রসারণশীল করতে পারেন নাই। যে

টাকা খরচ করার কথা তা খরচ করতে পারেনি। সরকারের যে বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা সেটাতে পারেনি। যে ঋণ প্রবাহ দেওয়ার কথা, ব্যক্তিখাতেও সে ঋণ নেয়নি।

এটার ফলে, আপনি যে টাকা তুলে নিয়ে এসে সংকোচনমূলক নীতি দিয়ে দাম কে নিয়ন্ত্রণ করবেন সে সুযোগও নাই।

প্রণব সাহা: এগুলো ঠিক আছে, তার সাথে যদি এই পদক্ষেপগুলো মেলাতে বলি, যে ট্রিপল থ্রিতে কল দিলে...

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি ট্রিপল থ্রিতেই আসছি, এটাকে আপনাকে মোকাবিলা করতে হবে আর্থিক নীতি দিয়ে। আর্থিক নীতির দুটি জায়গায়, হয় আপনি কর সমন্বয় করবেন গরীব মানুষের জন্য, নিম্নবিত্তের জন্য যেটা আপনি করেননি। এখন তারা যদি এই করে সুযোগ পেয়ে বিনিয়োগ করে তাহলে কর্মসংস্থান হবে মানুষের হাতে টাকা আসবে।

এই আলোচনাটা হওয়া উচিত ছিল অর্থবিষয়ক কমিটিতে বাজেট পেশ হওয়ার আগে। উনারা হয়তো সবাই করেননি। এখন বিষয়টা হলো যে এক্ষেত্রে সরকারের সুযোগটা কোথায় ছিল, আর্থিক খাতের ব্যয় কাঠামো দিয়ে এটাকে মোকাবিলা করতে হয়। ব্যয় কাঠামো দিয়ে মোকাবিলা করার তরিকাটা হলো যে আপনি এখানে বড় পরিসরে ভর্তুকি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অর্থের সংস্থান করতে হবে। কিন্তু সমস্যাটা হলো যে আপনি যে ভর্তুকির সংস্থান করছেন ৬০/৭০/৮০ হাজার কোটি টাকা তার বড় একটা অংশ চলে যাচ্ছে পিডিবিতে। পিডিবিতে এটা যাচ্ছেনা আপনার আমার বিদ্যুৎ বিলের উপর। এটা যাচ্ছে অলস রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট যাদের কাছে আছে তাদেরকে বসিয়ে রেখে টাকা দিতে হচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র থাকে দুস্থ মানুষকে প্রত্যক্ষ আর্থিক সহযোগিতা করা, এটাকে আমরা বলি সামাজিক সুরক্ষা। আপনি কি জানেন যে সামাজিক সুরক্ষা জিডিপির অংশ হিসেবে কিছুই বাড়েনি, এক শতাংশের কম। ওই জিডিপির অংশ মাথাপিছু ২৫ হাজার করে ফেললেন কিন্তু সেই টাকার অংশ অনুযায়ী সে ৫০০ টাকা পায়। এটা তো ১০ বছর আগে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এটাকে আমরা ১০০০ টাকাও করতে পারলাম না। এবং অনেক বড় বড় অংশ আছে যাদের কাছে এটা যাচ্ছে না। তথ্য উপাত্তের সমস্যা রয়েছে ইত্যাদি।

এই বাজেট, সমস্যাকে হয়তো শনাক্ত করেছে কিন্তু সমাধানের পথ দেখায়নি। যে বাজেটে আপনি আমি সহ সবাই কর দেই ২৫ শতাংশ বা এটা বেড়ে কারো জন্য ৪২ শতাংশতে চলে যায় আর সেখানে দেশের ভিতরের টাকা চুরি করে বিদেশে নিয়ে গেছে আবার সেই টাকা দেশে নিয়ে আসতে চাচ্ছে সেটাতে আপনি ৭ শতাংশ করে দিতে চাচ্ছেন। আপনি চিন্তা করে দেখেন আমাদের প্রতি, নাগরিকদের প্রতি কত বড় অন্যায্য কাজ হচ্ছে।

প্রণব সাহা: যদি বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে থাকে, প্রবৃদ্ধি হতে থাকে, মাথাপিছু আয় বাড়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ে, মানুষের চাকরির সুযোগ যদি হয়, মানুষের সুরক্ষা যদি হয়। মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যতগুলো প্রকল্প ব্যবস্থা হাতে নিয়েছেন, সেগুলোতে মানুষের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছেন। কোভিডকালীন সময়েও কিন্তু আমাদের এলাকায় সবকিছু সুন্দরভাবে হয়েছে। দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদে সবখানেই সুন্দরভাবে মানুষকে সাহায্য করা হয়েছে, রিলিফ দেয়া হয়েছে। আমি অবশ্যই বলবো, মানুষ সরকারের সাথে খুশি আছে, শেখ হাসিনার সাথে খুশি আছে। আমরা এখন যে পরিস্থিতির মুখোমুখি, তা আমাদের জন্যও চ্যালেঞ্জিং, বিশ্বের সকলের জন্যই চ্যালেঞ্জিং।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেখুন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ও রাজনৈতিক চেতনার থেকে একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের চিন্তা করে। আমার ব্যক্তিগতভাবে অভিজ্ঞতা হয়েছে, এই যে আপনারা সামাজিক সুরক্ষার কথা বলছেন, প্রথম যে ভাতা প্রদান করা হয়, তার সাথে আমার সংযুক্ততা ছিল। আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য বলেছেন, আমরা সবসময় বলেছি, আমরা পিছিয়ে গেছি, আসলে মানুষ এগিয়ে গেছে। প্রশ্ন তা না। প্রশ্ন হলো, কেউ বেশি এগিয়েছে, কেউ কম। দেখুন, ২৫০০ ডলার যদি মাথাপিছু আয় হয়, তাহলে চারজনের পরিবারে ১০,০০০ ডলার আয় হয়। এর মানে আট লক্ষ টাকার মত। আপনি মানুষকে জিজ্ঞেস করে দেখেন, আট লাখ টাকা তাদের আয় হচ্ছে কিনা। হয় না তো। আপনার আমার হয়তো হয়, তাদের তো হয় না। বাংলাদেশের সরকার এত সামাজিক সুরক্ষা দেয়ার পরও বাংলাদেশে আয় বৈষম্য ও ভোগ বৈষম্য রয়ে গেছে। তারা আমাদের সমান পুষ্টি পায় না। করোনাকালে সে শহর থেকে গ্রামে গেছে, এরপর খাট বিক্রি করে মাটিতে গুয়েছে। আপনার উপলব্ধি করতে হবে, পরিস্থিতি কোথায় আছে।

আমি উনাদের কথায় ফিরে আসি। এই যে আপনারা ডাবল চুরির টাকা ফেরত আনতে বললেন, এটা এত বড় একটা হঠকারি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, নির্বাচনের আগের বছর নেত্রীর অন্য সকল কিছুকে স্নান করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এটার জন্য কোনো রাজনৈতিক আলাপ হয়েছে কিনা, আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে জিজ্ঞেস করতে চাই। যে দল এটা করলো, তার চেতনার সাথে ও রাজনৈতিক ইশতেহারের সাথে এটা সঙ্গতিপূর্ণ কিনা জানতে হবে। আমি যদি বলি, কতিপয় ক্ষমতাবান মানুষ আজকে এই বাজেটকে হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছে। যে মানুষগুলোকে এগুলো দেয়ার কথা, তাদেরকে না দিয়ে বিদেশে নিয়ে গেছেন। এটা কোনোভাবে বাংলাদেশ সরকার, আওয়ামীলীগ সরকারের জন্য উপকারী হয় নি।

প্রণব সাহা: কিন্তু কিছু টাকা যে আসছে, তাতে কি উপকার হচ্ছে না?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা কখনো আসবে না। কারণ, যারা এই দেশ থেকে টাকা নিয়ে গেছে, তারা এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা রেখে টাকা ফেরত নিয়ে আসবে? আজকে প্রশ্ন হবে না, আগামী দিনে কোন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এটা নিয়ে প্রশ্ন হবে না, কে বলেছে? আপনি যদি সুপ্রীম কোর্টের কাছে একটি রিট পেশ করেন, এটা আমার নাগরিক অধিকারের সরাসরি লঙ্ঘন। একটা সৎ করদাতার সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ। এমন ধরনের একটা অনৈতিক সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক আলোচনা ব্যতিরেকে বাজেটে ঢুকলো কেমন করে? আমি সেই রাজনৈতিক প্রশ্ন আপনার কাছে দিতে চাই।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: রেমিট্যান্সের উপর কেন ইন্সটিভ দেয়া যাবে না, আমি বলছি আপনাকে। আপনি কৃত্রিমভাবে যদি টাকার মান ধরে রাখেন, তখন এটা ফ্ল্যাটিং হবে। এই কথাটাই গত ছয় মাস ধরে আমরা বলেছি।

প্রণব সাহা: টাকা যখন স্ট্রং থাকে, তখন আমাদের ইনফ্লেশন একটু ভালো থাকে। ফ্ল্যাটিং করতে গেলেই ইনফ্লেশন বেড়ে যাচ্ছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেখুন, আমরা বুঝি যে অর্থনীতির একটা সিদ্ধান্তে অন্যান্য সমস্যা হয়। এক মাস ধরে আমরা বলছি, যেহেতু মজুদের হার কমে যাচ্ছে, আপনারা আস্তে আস্তে বিনিময়ের হার বাজারমুখী করেন। কৃত্রিমভাবে আপনি একজনকে ১ পয়সা, দুইজনকে ২ পয়সা দিবেন, এটা আশির দশকে হতো। এখন তো সবাইকে করতে গিয়ে বাঁধের মুখে বাঁধ হয়ে বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। এটা ভালো না, কিন্তু হয়েছে।

প্রণব সাহা: আমরা সেটি আলোচনা করছিলাম তার সাথে আমি আরও যুক্ত করতে চাই যে এই যে করোনা পেরিয়ে এসেছে কি না কিন্তু এর মধ্যে আলোচনা হচ্ছে প্রবৃদ্ধি ৭.৫ সেইটার একটি লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি কথাটি তুললেন তাইলে এইটা নিয়ে কথা বলি। বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির শাখা তা হচ্ছে সুতা কাটা ঘুড়ির মতন এর সাথে বাস্তবতার কোন মিল নেই। বিনিয়োগ যখন হয় ৩৩.১ শতাংশ তখন আপনি ৭.৫ শতাংশ করেন। আবার বিনিয়োগ যখন ৩৩.২১ শতাংশ হয় তখন আপনি ৭.৫ করে বিনিয়োগ ব্যতিরেকে মানে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ ব্যতিরেকে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি কীভাবে হয়? কিছু ক্ষেত্রে হয় যদি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটে এবং উৎপাদন বেড়ে যায়। তবে এক বছরে এইটা কখনো বাড়ে না, এইটা প্রবণতার অংশ। সেই অর্থে, এখন যেটা হয়েছে মধ্যম মেয়াদী যে কাঠামো হয়েছে এবং যে বাজেট হয়েছে তার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই। এই বাজেটটিকে আমি সংযত বাজেট বলেছি এবং তা আমি ঠিক বলেছি। কারণ হচ্ছে এই সময়ে উনারা এই বাজেটকে বড় বাজেট বললেও এইটা বড় বাজেট হয়নি তা আসলে ছোট হয়েছে। কারণ প্রথম করের আয়তন কমে গেছে। আগে কর ছিল ৯.৬ % যা এখন করা হয়েছে ৯.৩%।

গতবছর আপনি ব্যয় করেতেন ১৫% এর বেশি এইটা এইবছর ১৩% তে নেমে এসেছে জিডিপির অংশ হিসাবে। অথচ মধ্যম মেয়াদী উন্নতি কাঠামোগুলোতে উন্নতি করা হয়নি। আপনি দেখাচ্ছেন ওইখানে রপ্তানি বাড়বে ২০ শতাংশ এবং আমদানি বাড়বে ১২%। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমদানি ৪০% এর উপরে এবং সেইটার কারণে মজুদের চলতি হিসাবের সাথে আপনার কোনো মিল নাই। এইটার কারণ হচ্ছে, সমন্বয় করে অর্থনীতি, মুদ্রানীতি এবং অন্যান্য গড় নীতিকে মিলিয়ে যেটা করা এবং বৈশিক পরিস্থিতিকে মেলানো হয়নি। এটা হচ্ছে দুঃখের ব্যাপার। পরিস্থিতির সম্পর্কে উপলব্ধির কথা অর্থমন্ত্রী আগেই বলেছেন, কিন্তু সেই উপলব্ধির প্রকাশ যে নীতিতে হয় তা উল্লেখ করা হয়নি। আমি আপনাকে ছোট্ট করা একটা কথাই বলি উনাদের কথায়, যে নীতির কথা উনারা বলছেন, পৃথিবীব্যাপী এখন প্রবৃদ্ধি

কমবে, বাংলাদেশেও কমবে যদি সঠিকভাবে হিসাব করা হয়। এখানে কোনো অন্যায ছিল না। প্রবৃদ্ধিকে আমরা বেহুদা জিনিস বানিয়ে ফেলেছি। প্রবৃদ্ধির প্রয়োজন আছে, কিন্তু একটি মধ্যম আয়ের দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য গুণগত মান উন্নয়ন না হলে তার কোনো মানে হয় না। আমি এই লিস্ট থেকে বের হবো কিন্তু মানুষ আমার এই শিক্ষা পেয়ে বাজারে চাকরি করতে পারবে না। উনারা চাকরিতে নিবেন না কারণ উচ্চশিক্ষার মান নেই দেখে আর বিদেশ থেকে লোক নিয়ে আসতে হবে যা গ্রহণযোগ্য না। এই জায়গায় আপনাকে যা মনে রাখতে হবে, এইবারেও শিক্ষাখাতে দুই শতাংশের নিচে বরাদ্দ এবং স্বাস্থ্যখাতে এক শতাংশের নিচে বরাদ্দ, সামাজিক সুরক্ষাও ১০০% এর নিচে। সামাজিক সুরক্ষা থেকে আপনি যদি সরকারি পেনশন বের করে দেন তাহলে বেশি বাড়ে নাই। আর আমি আগেও বলেছি যে ৫০০ টাকা দেওয়া হয় এইটা ৭-৮-১০ বছর আগের থেকে দেওয়া হয় তাহলে জনগণের মাথাপিছু আয় যেহেতু বেড়েছে ২৫০০ ডলার যদি হয়ে থাকে তাহলে এই ৫০০ টাকা আগে কত ছিল এবং এখন কত হয়েছে জনগণ তার হিসাব চাইবে না? এইটা কেমন কথা। এই রকম বৈষম্য হবে সমাজে? আমরা যদি আদর্শের কথা বলে থাকি তাহলে এইটা কি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সাথে কি সঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছে? আমি এক মুখের কথা বলি তা তো আমাদের বাজেট দিয়ে প্রমাণ করতে হবে।

নেত্রী বলছেন জনকল্যাণমূলক কাজের কথা, আশ্রয়ণ প্রকল্প প্রত্যেককে একটি বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার থেকে শুরু করে দুস্থ মানুষদেরকে ভাতা দেওয়া এই ব্যাপারে চিন্তার অভাব কোথাও নেই কিন্তু সেই চিন্তার গুণগত মানকে তো পরিমানগততে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে তো বাজেট একটি বড় হাতিয়ার, সেই বাজেটের চেতনাগত বিষয়টা আপনি দেখেন, এখানে কে কী পেলো আপনি তা দেখেন। আমরা যেখানে প্রয়োজনীয় যে সুবিধাগুলো দিচ্ছি ওই পিছিয়ে পড়া মানুষগুলো সেই সুবিধাগুলো কেন পেল না। তার বড় কারণ হলো তার কঠিন স্বর খুব দুর্বল। উনাদের কঠিন স্বর আপনার এই টক-শো পর্যন্ত আসে না। সেই জন্য তাদের সঠিক মূল্যায়ন হয় না।

প্রণব সাহা: আমি শুধু শেষ করতে চাই, ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আপনি কি মনে করেন পদ্মা সেতু হওয়াতে আমাদের উন্নয়ন হবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের কাঠামোগত রূপান্তরের জন্য এইটা একটি অনুঘটক হিসাবে কাজ করবে। যে মানুষগুলো দুই পারে আছে তাদের মধ্যে এক নতুন ধরনের সম্পর্ক স্থাপন হবে এবং একটি অখন্ড অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ হবে। তবে যে বাজেটটা নিয়ে আজকে আলোচনা হচ্ছে তা একটা দূর্যোগপূর্ণ সময়ে আসছে এবং এই সময় মোকাবিলা করা গুরুত্বপূর্ণ আর যদি তা না করি তাহলে ১০-১২ বছরের যে অর্জন আছে তা হুমকির মুখে পড়ে যাবে।

ডিবিসি স্টুডিও “সমৃদ্ধির জন্য সতর্কতার বাজেট”-এ প্রচারিত

১০ জুন ২০২২

সংযত উচ্চাশার বাজেট

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

করোনার মধ্যেও আগের দুটি অর্থবছরে বাজেটের লক্ষ্যমাত্রাগুলোতে যে ধরনের উচ্চাশা ছিল, এবারের বাজেট সে তুলনায় সংযত কিংবা অবদমিত। সরকারের আয় ও ব্যয় এবং সামগ্রিক বিনিয়োগ প্রাক্কলনের তুলনামূলক বিশ্লেষণে তেমনটাই মনে হচ্ছে।

আগামী অর্থবছরে জিডিপির ৯ দশমিক ৭ শতাংশ রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের মূল বাজেটে যা ছিল ১১ দশমিক ৩ শতাংশ। সংশোধিত বাজেটে যা কমিয়ে ৯ দশমিক ৮ শতাংশ করা হয়েছে। সুতরাং আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্থনীতির আকারের বিবেচনায় কমানো হয়েছে। অন্যদিকে চলতি অর্থবছরে জিডিপির ১৭ দশমিক ৫ শতাংশ ব্যয়ের পরিকল্পনা ছিল। সংশোধিত বাজেটে যা ১৪ দশমিক ৯ শতাংশ ধরা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা জিডিপির ১৫ দশমিক ২ শতাংশ।

একইভাবে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়নি। জিডিপির অনুপাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ, যা আগের চেয়ে কম। ব্যক্তি বিনিয়োগের প্রাক্কলনও আগের মতো। সরকারি বিনিয়োগ হবে জিডিপির ৬ দশমিক ৬৯ শতাংশ, যা গত কয়েকটি অর্থবছরের চেয়ে কম। মোট বিনিয়োগ কম হবে অথচ জিডিপি প্রবৃদ্ধি বেড়ে সাড়ে ৭ শতাংশ হবে। ফলে জিডিপি অনুমিতের সঠিকতা নিয়ে আগের সংশয় আরও জোরদার হলো।

অবশ্য অর্থনীতিতে যে সংকট চলছে, অর্থমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে মেনে নিয়েছেন। তবে করোনার প্রভাব কেটে গেছে এরকম অতিশয়োক্তি আছে। আর বর্তমান সংকটের উৎসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী আন্তর্জাতিক বিরূপ পরিস্থিতির ওপর পুরো দায় চাপিয়েছেন। অভ্যন্তরীণ কারণের কথা সেভাবে উল্লেখ করেননি। আবার অর্থনীতির চলমান সমস্যার স্বীকৃতি থাকলেও সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেই। বরাদ্দের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন নেই। আগের মতোই স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ জিডিপির ১ শতাংশের কম। শিক্ষা খাতে ২ শতাংশের কম। সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রেও তেমন পরিবর্তন নেই। ফলে অর্থমন্ত্রীর উপলব্ধির সঙ্গে কার্যক্রম মেলে না। আবার কার্যক্রমের সঙ্গে বরাদ্দের হিসাবও মেলে না।

এদিকে সরকারের ভর্তুকির বড় অংশ চলে যাচ্ছে বিদ্যুৎ খাতে। খাদ্য খাতে যা দেওয়া হচ্ছে, তার তিনগুণ নগদ সহায়তা যাচ্ছে পিডিবিতে। এর মধ্যে আইপিপি ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ কতটুকু, সেই তথ্য নেই। গরিব মানুষের জন্য সহায়তা না বাড়িয়ে এ ধরনের ভর্তুকি দেওয়া অর্থনৈতিকভাবে যৌক্তিক নয়।

সমাপ্য বছরের সংশোধিত বাজেট বিশ্লেষণে দেখা যায়, তুলনামূলকভাবে আয় বাড়ছে না, বরং ব্যয় বাড়ছে। এর ফলে উচ্চমাত্রার ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে। সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি ধরা হয়েছে ৫ দশমিক ১ শতাংশ। নতুন অর্থবছরে ধরা হয়েছে ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। এত বড় ঘাটতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির কারণে হবে তা নয়। সরকারের পরিচালন ব্যয় বেড়ে যাওয়ার কারণেই তা হবে। ফলে বাজেটের ব্যয়বৃদ্ধি মূলত উন্নয়ন ব্যয়ের কারণে নয়।

বাজেট ঘাটতি মেটানোর দুটি উৎসের মধ্যে বৈদেশিক উৎস থেকে আসবে ৪০ শতাংশ। অন্যদিকে দেশি উৎসের মধ্যে ব্যাংক থেকে আসবে ৪৪ শতাংশ। ব্যাংক থেকে এত টাকা নিলে তা ব্যক্তি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে কিনা তাও চিন্তার বিষয়।

এবারের বাজেটে কর পদক্ষেপে সবচেয়ে অস্বস্তির জায়গা হলো— বিদেশে অর্জিত সম্পদ যা কিনা দেশ থেকে পাচার করা অর্থে সৃষ্ট, তাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ব্যাপক কর রেয়াত দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে এরকম অনৈতিক সুবিধা দেওয়া অবশ্যই প্রশ্নের উদ্বেক করবে। বিশেষত প্রবাসীদের অবৈধ অর্থে সৃষ্ট সম্পদের বিষয়ে অনেক দেশ এখন খোঁজ-খবর নিচ্ছে।

অন্যদিকে করপোরেট কর কমানোর পদক্ষেপ ব্যবসায়ীদের খুশি করবে। তবে সীমিত আয়ের মানুষদের সুবিধা দিতে করমুক্ত আয়সীমা বাড়ানোর প্রস্তাব নেই। মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের প্রকৃত আয় কমে গেছে। এ অবস্থায় করমুক্ত আয়সীমা কিছুটা বাড়ানো উচিত ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের এমন পদক্ষেপ কর ন্যায্যতার পরিপন্থী। অবশ্য করের ক্ষেত্রে কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ আছে। যেমন-প্রতিবন্ধীদের নিয়োগ দিলে কর ছাড় দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শ্রবণপ্রতিবন্ধীদের জন্য সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে বাজেট প্রস্তাবে বড় ধরনের উদ্ভাবনী চিন্তা নেই। মূল্যস্ফীতি বর্তমানের ৬ দশমিক ৩ শতাংশ থেকে ৫ দশমিক ৬ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এ নিয়ে সমন্বিত কার্যকর পরিকল্পনা লক্ষ্য করছি না। যে সমস্ত বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে, তা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যথোপযুক্ত ও যথেষ্ট নয়।

সমকাল

১০ জুন ২০২২

রাজনৈতিক উদ্দীপনার পরিসংখ্যান

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

প্রস্তাবিত বাজেটে অর্থনৈতিক সংকটের স্বীকৃতি আছে। তবে সমস্যার মূল উৎস হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে বৈশ্বিক খাত। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বড় ধরনের প্রত্যাশা নেই। এছাড়াও সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক নিম্নমুখী থাকলেও মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির (জিডিপি) লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ। আর মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা ৫ দশমিক ৬ শতাংশ। এসব লক্ষ্যমাত্রা রাজনৈতিক উদ্দীপনার পরিসংখ্যান মনে হয়েছে। ব্যয়ের কাঠামোতে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন আসেনি। তবে কর কাঠামোতে যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছে, তার বেশিরভাগই সমর্থনযোগ্য।

অর্থনৈতিক বিবেচনায়, বাজেট বিশ্লেষণে যে বিষয়টি সামনে আসে তা হলো, এবার অর্থমন্ত্রী স্বীকার করলেন, অর্থনীতিতে সমস্যা আছে। তবে তিনি সমস্যার মূল উৎস দেখছেন বিশ্ব-অর্থনীতিতে। এর মধ্যে মূল্যস্ফীতির পুরোটাই বিদেশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখছেন। তবে কর আদায় কম, সঞ্চয় কমে যাচ্ছে— এগুলোতে তিনি তত গুরুত্ব দেননি। এর ফলে এবারের বাজেটে সমন্বিত কার্যক্রম দেখিনি।

সবচেয়ে বড় বিষয় হলো আর্থিক কাঠামোর ভেতরে বিনিয়োগের হার ধরা হয়েছে ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ। এটি আগের বছরের চেয়েও কম বা কাছাকাছি। অর্থাৎ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি বড় কোনো প্রত্যাশা করছেন না। লক্ষণীয় বিষয় হলো বিনিয়োগের ভেতরে মূল স্তম্ভ বা চালিকাশক্তি ছিল সরকারি বিনিয়োগ। কিন্তু অর্থবছরে সেটি কমে যাচ্ছে।

চলতি অর্থবছরে সরকারি বিনিয়োগ জিডিপির ৭ দশমিক ৬ শতাংশ। কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেটে তা কমিয়ে ৬ দশমিক ৬ শতাংশ করা হয়েছে। এখানে আরও কয়েকটি সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। এর মধ্যে বর্তমানে মূল্যস্ফীতি ৬ দশমিক ২৯ শতাংশ আছে। সেখানে ৫ দশমিক ৬ শতাংশ নিয়ে আসবে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো মূল্যস্ফীতির পুরোটাই যদি আমদানিকৃত বৈদেশিক পণ্যের কারণে হয়ে থাকে, তাহলে এটা কীভাবে কমবে, তা পরিষ্কার নয়। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

অন্যদিকে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসাবে বিবেচনা করলে দেখা যাচ্ছে, রফতানির প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ২০ শতাংশ। কিন্তু আমদানি প্রবৃদ্ধি ১২ শতাংশ। অথচ আমরা জানি পণ্যমূল্য বাড়লে আমদানি বাড়বে। একইভাবে চলতি বছরে প্রবাসী আয় সামান্য বাড়লেও আগামী অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৬ শতাংশ। এই হিসাবগুলো অনেক প্রশ্নের জন্ম দেবে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো বিনিয়োগ সংযত অবস্থায় এবং সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকগুলো নিম্নমুখী। এরপরও জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার সাড়ে ৭ শতাংশ ধরা হয়েছে।

প্রশ্ন হলো এসব সব সমস্যা মোকাবিলা করার পরও এই হারে প্রবৃদ্ধি থাকে কীভাবে। ফলে এতদিন জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে যে সংশয় ছিল, তা আবার জোরদার হয়েছে। এ কারণে আমি মনে করছি, এটি বাজেটীয় লক্ষ্যমাত্রা নয়, রাজনৈতিক উদ্দীপনার পরিসংখ্যান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে কর আহরণ ও প্রত্যক্ষ কর বাড়ানোর চেষ্টা রয়েছে। এরপরও ভ্যাটের ওপর নির্ভরশীলতা থাকবে। এক্ষেত্রে ইতিবাচক হলো যেহেতু আমদানি পণ্যের দাম বেশি। তাই আমদানি শুদ্ধ কিছুটা বাড়বে। এ ছাড়া ভর্তুকি বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে ভালো-খারাপ দুদিকেই ভর্তুকি হয়। যেমন ভালো ভর্তুকি হলো প্রত্যক্ষভাবে মানুষকে আর্থিক ও খাদ্য সাহায্য দেওয়া। খারাপ হলো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোকে বসিয়ে বসিয়ে লক্ষ কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া।

কিন্তু খাদ্য খাতে ভর্তুকি বাড়ানোর কোনো পদক্ষেপ চোখে পড়েনি। অপরদিকে সামাজিক সুরক্ষা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে আগে যা বরাদ্দ ছিল, জিডিপির অনুপাতে বরাদ্দ সেখানেই আছে। স্বাস্থ্য খাতে এবার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে জিডিপির অনুপাতে শূন্য দশমিক ৮৩, শিক্ষায় ১ দশমিক ৮৩ এবং সামাজিক সুরক্ষায় শূন্য দশমিক ৮৪ শতাংশ। ফলে ব্যয় কাঠামোয় বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন আসেনি।

কর কাঠামোতে যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছে, তার অনেকগুলোই সমর্থনযোগ্য। এর মধ্যে প্রতিবন্ধীদের কাজ দিলে ওই প্রতিষ্ঠানকে কর সুবিধা দেওয়া অন্যতম। এ ছাড়াও করপোরেট কর কমানো সঠিক পদক্ষেপ। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত, তালিকাভুক্তির বাইরে এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কর কমানো হয়েছে। কিন্তু নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্তদের জন্য করমুক্ত আয় সীমা আগের জায়গাতেই রয়েছে। ফলে এটি ন্যায্য পদক্ষেপ হলো না।

আরেকটি বিষয় হলো অর্থমন্ত্রী বিদেশে অর্জিত সম্পদ ফিরিয়ে আনার কথা বলেছেন। আমরা সহজ বাংলায় একে পাচার করা টাকা বলি। এই টাকা ফিরিয়ে আনতে চান তিনি। এটি নিতান্তই হঠকারী সিদ্ধান্ত। এ ধরনের সিদ্ধান্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

আন্তর্জাতিকভাবে যখন বৈধ সম্পদের খোঁজখবর হচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে নির্বাচনের আগের বছরে এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত বড় ধরনের রাজনৈতিক প্রশ্নের জন্ম দেবে। এতে বর্তমান সরকারের অনেক জনকল্যাণমূলক কাজকে ম্লান করে দেবে। আগে আমরা দেশের কালো

টাকা নিয়ে বলতাম। এখন আমরা বিদেশের কালো টাকায় হাত দিয়েছি। এটি সরকারের রাজনৈতিক কর্মসূচি ও কর ন্যায্যতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

যুগান্তর

১০ জুন ২০২২

কার স্বার্থে এসব পদক্ষেপ

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

তিনটি জিনিস বলতে চাই। প্রথমত, অবশেষে এবারের বাজেট বক্তৃতায় অর্থনীতিতে বিদ্যমান সমস্যার একধরনের স্বীকৃতি আছে; দ্বিতীয় এসব সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সমন্বিত মধ্যমেয়াদি কর্মসূচি অনুপস্থিত। তৃতীয়ত, বাজেটের সঙ্গে আয়-ব্যয়ের কাঠামোতে সংগতিপূর্ণ পরিবর্তন নেই, আয় কাঠামোতে যা-ও আছে, ব্যয় কাঠামোতে তা-ও নেই।

দেখা যাচ্ছে, আগে যেসব খাত বা কর্মকাণ্ড করের আওতার বাইরে ছিল বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত ছিল, এবার সেখানে করারোপ করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে করহার সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। পদ্ধতিগত সংস্কারের চেষ্টা আছে সরকারের। উৎপাদন ও ব্যবসা পর্যায়ে করের সাযুজ্য আনার চেষ্টা আছে।

সমন্বয়ের প্রসঙ্গে বলতে হয়, অভ্যন্তরীণ শিল্পের কর-সুবিধা কিছুটা অনুকূল। কিন্তু ব্যয়কাঠামোর ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখছি না। শিক্ষা খাতে এখনো জিডিপির ১ দশমিক ৮৩ শতাংশ—২ শতাংশের নিচে; স্বাস্থ্য খাতে শূন্য দশমিক ৮৩ শতাংশ—জিডিপির ১ শতাংশের নিচে এবং সামাজিক নিরাপত্তা খাতে শূন্য দশমিক ৮৪ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

আমাদের প্রস্তাব ছিল, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বরাদ্দের হার বৃদ্ধি করার, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ভর্তুকি বেড়েছে; কিন্তু এর সিংহভাগ চলে যাবে পিডিবি-তে; তার মধ্যে আছে ব্যক্তি খাতের অলস কিছু বিদ্যুৎকেন্দ্রকে দেওয়া অন্যান্য সুবিধা।

তবে সরকার সংযতভাবে বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে জিডিপির ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ। তবে এই প্রথম সরকারি ব্যয় জিডিপির অনুপাতে হ্রাস করা হয়েছে। অন্যদিকে জিডিপির প্রাক্কলন অপরিবর্তিত রয়েছে সাড়ে ৭ শতাংশ। ফলে জিডিপির হিসাব যা বাস্তব অর্থনৈতিক সূচক নয়; বরং তা যেন রাজনৈতিক সূচকে পরিণত হয়েছে। প্রবৃদ্ধির হারকে যে সূতাকাটা ঘুড়ির সঙ্গে তুলনা করেছিলাম, তার যৌক্তিকতা আরও একবার প্রমাণিত হলো।

এ ছাড়া মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ দশমিক ৬ শতাংশ, কিন্তু ৬ দশমিক ৩ শতাংশ থেকে তা কীভাবে ৫ দশমিক ৬ শতাংশে যাবে, তার পথরেখা নেই। বিলাসদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ করে সীমিত ফল পাওয়া যাবে। আর ব্যয়প্রবাহ সংকোচনের সুযোগও কম।

পরিশেষে বলব, বিভিন্ন ধরনের করহারের মধ্যে সাযুজ্য আনার চেষ্টা করা হলেও তা শেষমেশ মনে হয় কর-ন্যায্যতার পরিপন্থী বাজেট হয়ে গেল। করপোরেট করহার কমানো হলো, কিন্তু ব্যক্তিশ্রেণির করমুক্ত আয়সীমা বৃদ্ধি করা হলো না, এখানেই সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পায়।

আবার পাচার হওয়া সম্পদ বৈধ করার সুযোগ দেওয়া হলো। যদিও বলা হয়েছে, বিদেশি অর্জিত সম্পদ; আদতে তা পাচার হওয়া সম্পদ। নির্বাচনমুখী বছরে এ ধরনের সিদ্ধান্ত প্রশ্নের জন্ম দেবে, বিশেষ করে বিদেশে যখন প্রবাসীদের অবৈধ সম্পদের খোঁজ হচ্ছে। এ সময় এমন পদক্ষেপের তাৎপর্য আরও বেশি।

আবার এতে আদৌ অর্থ দেশে আসবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কেউ বিশ্বাস করবেন কি না, তা-ও নিশ্চিত নয়। প্রস্তাবিত এই পদক্ষেপ প্রমাণ করে যে এই সরকারের ভেতরে সবচেয়ে প্রভাবশালী গোষ্ঠী কারা। গরিব মানুষ যেখানে সামাজিক সুরক্ষা ভাতায় জিডিপি ১ শতাংশের বেশি পাবেন না, সেখানে প্রভাবশালী ব্যক্তির পাচার হওয়া অর্থ ফেরতের সুবিধা পাবেন। বলা বাহুল্য, এটা শাসক দলের জন্য অর্থনৈতিক সংকটকালে অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসেবে আসবে।

প্রথম আলো

১০ জুন ২০২২

বড় কথার ছোট বাজেট

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

দেরিতে হলেও অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেছেন অর্থনীতি একটি সংকটময় সময় অতিবাহিত করছে। তবে তিনি এ সমস্যার সংকটের মূল উৎস দেখেন বাইরে, আন্তর্জাতিক বাজার পরিস্থিতিতে। দেশের ভিতরে কাঠামোগত সমস্যাগুলো উঠে আসেনি কথায়।

দেশের সংকটপূর্ণ সমস্যার মূল বিষয় যে মূল্যস্ফীতি, তা এখন সবাই একমত হচ্ছেন। এই মূল্যস্ফীতি ৬ দশমিক ৩ শতাংশ থেকে আগামী বছরে ৫ দশমিক ৬ শতাংশে কীভাবে নেমে আসবে, সে পথরেখা স্পষ্ট হয়নি। তবে মনে হচ্ছে, তুলনামূলকভাবে একটি সীমিত সরকারি আয়-ব্যয় ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এগোতে চাচ্ছেন অর্থমন্ত্রী। ফলে দেখা যাচ্ছে, দেশের জিডিপি়র অংশ হিসেবে আগামী বছরে সরকারি ব্যয় কমবে। এখন বর্তমানে যেটি ৭ দশমিক ৬ বলা হচ্ছে সেটি ৬ দশমিক ৭ এ আসবে। অর্থাৎ আগামী বছর সামগ্রিকভাবে বিনিয়োগ জিডিপি়র অংশ হিসেবে সাড়ে ৩১ শতাংশ, যা সমাপ্য বছরের চেয়ে কম। অর্থাৎ বিনিয়োগের যে উচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তব্য আগে শুনতাম তা এ বছর অনেক সংযত।

আর সরকারের ব্যয় আয়ের তুলনায় কিছুটা বাড়বে। কারণ, আয়কে ৯ দশমিক ৭ শতাংশ জিডিপি়র অংশ হিসেবে স্থির করা হয়েছে। অর্থাৎ আয় কিন্তু জিডিপি়র অংশ হিসেবে বাড়ছে না। বাড়বে ব্যয়। ব্যয় বৃদ্ধিটা উন্নয়ন ব্যয় নয়, পরিচালন ব্যয়। অর্থাৎ উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য সরকারের যে পরিমাণ খরচ করতে হয় তার পরিমাণ বাড়বে। এর ফলে বাজেট ঘাটতি বাড়বে।

এর মূল কারণ হচ্ছে, আগামী বছর অবশ্যই সরকারকে পরিস্থিতি সামাল দিতে ভর্তুকির পরিমাণ বাড়তে হবে। সমস্যা হচ্ছে ভালো ভর্তুকিও হয়, খারাপ ভর্তুকিও হয়। ভালো ভর্তুকি হচ্ছে- যখন প্রত্যক্ষভাবে সরকারি টাকা দিয়ে গরিব, দুস্থ মানুষকে আর্থিক সহায়তা বা প্রণোদনা দেওয়া হয়। আর খারাপ ভর্তুকি হচ্ছে— যখন বিভিন্ন কায়মি স্বার্থে বিভিন্ন কাজে অযৌক্তিকভাবে সরকারি ব্যয় করি। এ বছরের চেয়ে ঘাটতি বেশি সাড়ে ৩১ শতাংশ, সেটার বড় অংশ পূরণ হবে বিদেশি বাজেট সহায়তা, বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে

সহায়তা নিয়ে। এ ছাড়াও সরকার ব্যাংক থেকে ঋণ নেবে। বাজেট ঘাটতির প্রায় ৪৪ শতাংশ সরকার মেটাবে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে। যেটি অবশ্যই ব্যক্তি বিনিয়োগের ওপর প্রভাব ফেলবে। যেসব আর্থিক পদক্ষেপ রয়েছে তার ভালো দিক হচ্ছে- যেসব অর্থনৈতিক কাজকর্ম অপ্রয়োজনীয় করের আওতার বাইরে ছিল সেসব খাতকে করের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। সঠিকভাবে বিভিন্ন করহার সমন্বয় করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে অযৌক্তিক কর রেয়াতও তুলে নেওয়া হচ্ছে। সেটাও ঠিক আছে। এ ছাড়াও বেশ কিছু উপকারী পদক্ষেপ রয়েছে যেমন প্রতিবন্ধীদের কাজ দিলে কর সুবিধা দেওয়া। কিন্তু যে দু-একটি বিষয় চোখে লাগবে, মনে প্রশ্নের সৃষ্টি করবে সেটি হলো— করপোরেট কর কমানো হয়েছে। কিন্তু নিম্ন আয়ের মানুষ যে ৩ লাখ টাকা করমুক্ত আয়ের সীমা ছিল, সেটি মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে বাড়ানো হলো না। এটা নিঃসন্দেহে অবিবেচক অবস্থান। তার চেয়ে বড় সমস্যা হবে, বিদেশে পাচারকৃত অর্থকে বিশেষ সুবিধা দিয়ে দেশে আনার ঘোষণা। অর্থমন্ত্রীর ভাষায় এগুলো বিদেশে অর্জিত সম্পদ। অথচ আমরা জানি, এগুলো অবৈধ উপায়ে দেশের ভিতরে অর্জিত সম্পদ। আবার অবৈধ উপায়ে বিদেশে গেছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে এমন পদক্ষেপ বড় ধরনের প্রশ্নের জন্ম দেবে। এটি বর্তমান শাসক দলের সামাজিক প্রতিশ্রুতির সঙ্গে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ সে প্রশ্নও উঠবে। আরও উঠবে এ কারণে যে, বিভিন্ন দেশে প্রবাসীদের অবৈধ সম্পদ খোঁজখবর নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সে সময়ে এমন একটি পদক্ষেপ বাংলাদেশে পাচারকৃত অর্থকে বৈধতা দেওয়া, বিশেষ করে যারা সৎ করদাতা তাদের এক-পঞ্চমাংশ করে সুবিধা করে দেওয়া, এটি কোনোভাবেই অর্থনৈতিকভাবে যুক্তিযুক্ত নয়, রাজনৈতিকভাবেও হঠকারী বটে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

১০ জুন ২০২২

মূল্যস্ফীতি কমানোর চেষ্টা পর্যাণ্ত নয়

মোস্তাফিজুর রহমান

২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট একটি ব্যতিক্রমধর্মী সময়ে দেওয়া হলো, যখন আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির একটি চাপ আছে। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বাজারে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ওপরে এর একটা প্রভাব আছে। আবার আমাদের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য বিনিয়োগকে চাঙ্গা করার একটা তাগিদ এর মধ্যে আছে। মূল্যস্ফীতির একটা বড় চাপ আছে।

তবে প্রস্তাবিত বাজেটে প্রয়োজন অনুযায়ী মূল্যস্ফীতি কমানোর পদক্ষেপ পর্যাণ্ত পরিমাণে নেওয়া হয়নি। যে ধরনের শুষ্ক কমানোর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার ছিল, তা হয়নি। তবে খেয়াল রাখতে হবে, মূল্যস্ফীতি মোকাবেলা করার বড় পদক্ষেপ হলো আয়বর্ধক কর্মসৃজন পরিবেশ। এই আয়বর্ধক কর্মসৃজন নির্ভর করবে বাজেট কিভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে, তার ওপর।

মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য পদক্ষেপগুলোর মধ্যে দরকার ছিল নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের শুষ্ক কমানো। দ্বিতীয়ত, বাজার ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ করে, দক্ষতা বাড়িয়ে আমদানি স্তর থেকে ভোক্তা স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের যে ব্যত্যয় আছে সেগুলো মোকাবেলা করা। কিন্তু সেগুলো সম্পর্কে খুব বেশি আলোচনা দেখিনি। মূল্যস্ফীতির নিরিখে সামাজিক সুরক্ষা খাত নিয়ে বড়ভাবে চিন্তা করা দরকার। এই খাতে বাজেটে বরাদ্দ কিছুটা বাড়ানো হয়েছে, কিন্তু যতটা প্রয়োজন ছিল দেওয়া হয়নি।

বাজেটে আমরা আমদানি প্রতিস্থাপক শিল্পগুলোকে যেসব সুরক্ষা দিলাম, সেগুলো যাতে ভালোভাবে কাজ করতে পারে। তাদের জন্য যাতে ঋণের লভ্যতা থেকে শুরু করে ব্যবসা পরিবেশ ভালো থাকে। এগুলো করতে পারলে তখন আমাদের আয় বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি কিছুটা মোকাবেলা করতে পারব।

তবে খেয়াল রাখতে হবে, বাজেটে মূল্যস্ফীতির মোকাবেলা করা একদিকে দুরূহ কাজ। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বেড়েছে, অন্যদিকে সরকারকে রেভিনিউ কালেকশন করতে হবে। সরকারকে সাবসিডি দেওয়াও বিবেচনা করতে হবে। তবে সব কিছু ছাপিয়ে কিভাবে আয়বর্ধক

কর্মসৃজন সৃষ্টি করে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা রক্ষা করা যাবে, সেদিকে বাড়তি পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন আছে। বিনিয়োগ পরিবেশকে উন্নত করে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি আমাদের কিছু আইনের সংস্কার করতে হবে।

তবে এবারের বাজেট এমন কোনো উচ্চাভিলাষী বাজেট নয় যে বাস্তবায়ন করা চ্যালেঞ্জিং হবে। কারণ এনবিআরের রাজস্ব আহরণ যতটুকু বৃদ্ধি করা হয়েছে তা খুব বেশি নয়। বাজেটে আমাদের আমদানি প্রতিস্থাপন শিল্পকে কিছু সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। যার ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা সুবিধা পাবেন। এটা ঠিক আছে। এই বাজেট বাস্তবায়নযোগ্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে যে বাড়তি লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, সেটাও চ্যালেঞ্জিং মনে হয়নি। তবে সরকারের যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলোর সক্ষমতা বাড়তে হবে।

মূল্যস্ফীতির হার কমাতে গেলে এবারের বাজেটের চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে আবার ডলারের সঙ্গে টাকার বিনিময় হারের কারণে এখানে নতুন আরেকটি উপাদান যোগ হচ্ছে। সুতরাং মূল্যস্ফীতির একটা প্রভাব রয়েছে, যেটা বাজেটের মাধ্যমে কিছুটা অ্যাড্রেস করা হয়েছে, তবে তা পুরোপুরি নয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর থাকা শুল্ক কিছুটা হ্রাস করা, ভর্তুকি আগের মতো বজায় রাখা এবং বাজার ব্যবস্থাপনার কথা বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছে। কিন্তু বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নত করা, মনিটর করা— এসব করার জন্য যে ধরনের উদ্যোগ নেওয়া দরকার, সে রকম ঘোষণা বাজেটের রোড ম্যাপে নেই।

পাশাপাশি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার বিভিন্ন ধরনের যেসব চাপের মধ্যে আছে, তাদের কিছুটা সামাজিক সুরক্ষা দিয়ে স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে বাজেটে। সরাসরি খাদ্য সহায়তা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু দেশে আরো বেশি মানুষের এটা পাওয়া উচিত।

সাধারণ মানুষের দিক থেকে বাজেট বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে মানুষের কর্মসংস্থানের যে প্রয়োজনীয়তা তা বাড়ানোর তেমন কোনো চেষ্টা করা হয়নি। বিশেষ করে করোনাকালে নিম্ন আয়ের পরিবারের শিশুদের ৯০ শতাংশ ইন্টারনেটের সুযোগ পায়নি। যারা গ্রামে আছে, তাদের শিক্ষায় একটা ক্ষতি হয়েছে। এই ক্ষতি পূরণের জন্য কী প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, সেটা পরে আমাদের দেখতে হবে। বাজেট পেশের ক্ষেত্রে ২০১৫-১৬ সাল থেকে চাইল্ড বাজেট আলাদাভাবে দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আমরা সেটা দেখিনি।

কালের কণ্ঠ

১০ জুন ২০২২

মূল্যস্ফীতির অভিঘাত মোকাবিলায় বাজেটে উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে

ফাহিমদা খাতুন

ড. ফাহিমদা খাতুন প্রস্তাবিত বাজেটের নানা দিক নিয়ে বণিক বার্তার সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি।
সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এম এম মুসা।

করোনা ভালোভাবে মোকাবেলা করেছে। এবারে মূল্যস্ফীতি ও ডলার সংকটের মতো সমস্যা এসেছে। এবারের বাজেটে এগুলো কতটা গুরুত্ব পেল?

প্রথম কথা হলো, কোভিড নেই—এ কথা আমরা পুরোপুরি বলতে পারব না। যদিও বাজেটে মনে করা হচ্ছে আমরা কোভিড থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গেছি। যেখানে বাজেটটির নামই দেয়া হচ্ছে কোভিড-পরবর্তী বাজেট। গণমাধ্যমের খবরে আসছে কোভিড সংক্রমণ আবারো বাড়ছে। কোভিডবিষয়ক স্বাস্থ্যবিধি ও সব ধরনের সতর্কতা পালন করতে হচ্ছে। সুতরাং আমরা একেবারে নিশ্চিত হতে পারছি না। কোভিড থেকে কিছুটা পরিত্রাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু পুরোপুরি নয়।

এদিকে কোভিড পার হতে না হতেই নতুন অনেক সমস্যা এল। যেমন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের আগেই যখন বিশ্বের সর্বত্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কিছুটা বাড়তে শুরু করে তখন সরবরাহ ব্যবস্থায় একটা বাধা সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে পণ্য চলাচলের খরচ বেড়ে যায়। এর ওপর যুদ্ধের কারণে জ্বালানি তেল থেকে শুরু করে সবকিছুরই দাম অসম্ভব রকম বেড়ে গেল। এর অভিঘাত আমাদের দেশেও পড়েছে। আমাদের দেশে জ্বালানি তেল শতভাগ আমদানির ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক পণ্যও আমদানি করি আমরা। এর পরিত্রাণে আমাদের ওপর মূল্যস্ফীতির চাপ অসম্ভব রকম হারে বেড়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ওপর এর চাপ আরো অসমভাবে পড়েছে। কারণ কোভিডে যারা চাকরি হারিয়েছেন, তারা কিছুটা ঘুরে দাঁড়ালেও আগের মতো তাদের অনেকেরই আয় নেই কিংবা সঞ্চয় যা ছিল তাও শেষ হয়েছে। সব মিলিয়ে তাদের অবস্থা সঙ্গিন। আর দরিদ্রের অবস্থা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না।

মূল চ্যালেঞ্জগুলো কী?

চ্যালেঞ্জের মধ্যে অন্যতম হলো মূল্যক্ষীতি নিয়ন্ত্রণ, ডলারের বাজার স্থিতিশীল করা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ধরে রাখা। প্রথম বিষয় হলো মূল্যক্ষীতি। এটিই এখন সবচেয়ে বড় উদ্বেগ। আগামী অর্থবছরে মূল্যক্ষীতি ধরা হয়েছে ৫ দশমিক ৬ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে এটি ৭ শতাংশ ছাড়িয়েছে। যদিও সংখ্যা নিয়ে একটা বিতর্ক আছে। বাজারে যে পণ্যের মূল্য পরিস্থিতি, তার সঙ্গে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। টিসিবির দৈনিক পণ্যমূল্যের তালিকা দেখলে দেখা যায়, কোনো কোনো নিত্যপণ্যের দাম ৩০-৪০ শতাংশ বেড়ে গেছে। সুতরাং মূল্যক্ষীতির সরকারি হিসাবের সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। সবচেয়ে বড় বিষয়, এখনকার সমস্যাটা বিশ্বে কতদিন চলবে তা অনেকটা অনিশ্চিত। তবে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে, এটা চলবে আরো কিছুদিন। বিশ্বের অনেক দেশই এখন মন্দার দিকে যাচ্ছে। একটা স্ট্যাগফ্লেশন হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। অর্থাৎ একদিকে মূল্যক্ষীতি বাড়বে, অন্যদিকে প্রবৃদ্ধি কমবে। বলা চলে, একটা কঠিন অবস্থা তৈরি হতে পারে, যা বিশ্ব সত্তরের দশকের পরে দেখেনি। আশঙ্কা করা হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের মতো বড় অর্থনীতিও ২০২৩ সাল জুড়েই চ্যালেঞ্জের মধ্যে থাকবে। এখান থেকে আমরা কবে মুক্তি পাব তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

আইএমএফ তাদের বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন ৬ দশমিক ১ শতাংশ থেকে ৩ দশমিক ৫ শতাংশে নামিয়েছে। বিশ্বব্যাংকও তার প্রাক্কলন কমিয়েছে। তাহলে আমরা যে ৫ দশমিক ৬ শতাংশের মূল্যক্ষীতি বা ৭ দশমিক ৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির হিসাব করছি তা কিসের ভিত্তিতে করছি। আমরা যদি বলেই থাকি আমদানি মূল্যক্ষীতিই এখানে মূল, তাহলে সেটিই তো মূল্যক্ষীতির অনেকখানি নির্ধারণ করবে। আবার দেখুন, শুধু আমদানি মূল্যক্ষীতি নয়, দেশে উৎপাদিত পণ্যেরও দাম বেড়েছে। আমাদের বাজার ব্যবস্থাপনার এত দুর্বলতা এবং কিছু বাজারে একটা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এমন অন্যায্যভাবে দাম বাড়িয়ে দেয়, সেটা ভোক্তাদের ওপর ব্যাপক আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে। আমদানি করা পণ্যের দাম বাড়লে তারা সেটির দাম বাড়িয়ে দেন। আবার দেশীয় পণ্যেরও দাম আরেক দফা বাড়ে। এর কারণ হলো বাজারে সুশাসন নেই। আমদানীকৃত পণ্যের দাম কমার কোনো লক্ষণ নেই। সুতরাং বাজারে মূল্যক্ষীতির চাপ থাকবেই। অর্থমন্ত্রী ৫ দশমিক ৬ শতাংশ মূল্যক্ষীতি কীভাবে নির্ধারণ করেছেন তা একেবারে বোধগম্য নয়।

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথেষ্ট পদক্ষেপ আছে কি?

যদি মনে করা হয়, সারা বিশ্বে যা-ই হোক না কেন আমরা প্রবৃদ্ধি চালিয়ে যাব, এটা একেবারেই অমূলক। কারণ আমাদের অর্থনীতি এখন বিশ্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা তো বলছি, বিশ্বের সঙ্গিন অবস্থার কারণে আমাদের এখানেও তার প্রভাব পড়বে। দ্বিতীয় বিষয় হলো, মূল্যক্ষীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কী কী পদক্ষেপ নেয়া হলো। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমরা যদি মূল্যক্ষীতি নিয়ন্ত্রণ করতে চাই তাহলে প্রথম কাজ হলো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানি শুল্ক কমানো। এক্ষেত্রে কিছুটা করছাড় দেয়া গেলে মূল্যক্ষীতি একটু নিয়ন্ত্রণ

করা যেত। সেখানে সম্পূর্ণ করছাড় দিচ্ছি না আমরা। মাত্র দু'একটা পণ্যের ওপর করছাড় দেয়া হচ্ছে। ভোজ্যতেলের ওপর আগে কিছুটা কর কমানো হয়েছিল। কিন্তু খুব একটা সুবিধা হয়নি। আরেকটা বিষয় হলো, ভোজ্যতেলের মধ্যে সয়াবিনের দাম বাড়ার ফলে অনেকে কিন্তু পাম তেল ব্যবহার করছে। এর ওপর করছাড় হয়নি। তাই বাজেটের মধ্যে মোকাবেলার যে আর্থিক পদক্ষেপ তা দেখা যাচ্ছে না। ফলে আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতির চাপটা থাকবে।

দ্বিতীয়ত, সরাসরি কিছু সহায়তার জন্য আর্থিক বরাদ্দ দেয়া যেত। শুধু দরিদ্র নয়, মধ্যবিত্তের জন্যও পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি অসহনীয় হয়ে উঠছে। তাদের জন্য স্বল্পমূল্যে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা, খোলাবাজারে পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা বাড়ানো দরকার। খোলাবাজারের আওতা বাড়তে হবে, যাতে অনেক মানুষ এর সুফল পায় এবং এতে আরো অধিক পণ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

একই সঙ্গে নিরাপত্তাবেষ্টনীর সুফলভোগীদের সংখ্যা বাড়তে হবে। তাদের ভাতা বাড়তে হবে। দুঃখজনকভাবে সামাজিক নিরাপত্তার বাজেট জিডিপির তুলনায় এখনো অনেক কম। এ বছরে এ খাতে বরাদ্দ বেড়েছে মাত্র ১ দশমিক ৮৯ শতাংশ। কিন্তু এর মধ্যে আবার সরকারি কর্মচারীদের পেনশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পুরো সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ এত কম বাড়লেও পেনশনের অংশটা বেড়েছে ২১ দশমিক ৮ শতাংশ। আবার যদি ভাগ করে দেখি, অনেক কর্মসূচির বরাদ্দ কমে গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হলো, খোলাবাজারে পণ্য বিক্রির জন্য বরাদ্দ ১১ দশমিক ৫ শতাংশ কমে গেছে।

এদিকে তিন বছর ধরে করমুক্ত আয়ের সীমা ৩ লাখ টাকা রাখা হয়েছে। এটা চাইলেই সাড়ে ৩ লাখ করা যেত, এমনকি ৪ লাখও করা যেত। তাতে এমন কিছু হত না। বরং মানুষের উপকার হত। সত্য যে রাজস্ব কিছুটা কমত। কিন্তু সরকার তো অনেককে নানাভাবে রাজস্ব সহায়তা দিচ্ছে। সেখান থেকেও তো কর আদায় কমে যাবে। মূল বেতনের বাইরে যে ভাতা থাকে, যেমন বাড়ি ভাড়া, যাতায়াত, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ভাতার করমুক্ত সীমাটা সাড়ে ৫ লাখ থেকে ১০ লাখ টাকা করা হয়েছে। সেখান থেকেও সরকার কিছুটা করবঞ্চিত হবে। আবার বিভিন্ন বিনিয়োগে মানুষ যে কর রেয়াত পায়, সেটাও ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। সেখানে তো একটা স্বস্তি দেয়া হলো। সব মিলিয়ে স্বস্তির জায়গাটা হলো যারা ভালো অবস্থায় আছে তাদের জন্য। কিন্তু এটা তো দরিদ্র, নিম্নমধ্যবিত্তদের জন্য কোনো কাজে আসছে না। যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তারা তো পাচ্ছে না।

আমাদের দেশে কর্পোরেট কর বেশি। এ কারণে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়ছে না, বিদেশী বিনিয়োগ আসছে না। কাজেই করপোরেট কর কমানোর জন্য দাবি রয়েছে। কিন্তু এতে দরিদ্র জনগণ সরাসরি উপকৃত হবে না। একটা প্রবৃদ্ধিমুখী পদক্ষেপ এবং এর ফল পেতে কিছুটা সময় লাগবে। তাছাড়া এ মুহূর্তে কে বিনিয়োগ করবে এবং ফলাফল কতদিনে দেখবে? তার চেয়ে বরং আগামী এক বছরের জন্য জরুরি ব্যবস্থাপনা দরকার।

তাই আমি মনে করছি না মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য আসলে যথেষ্ট আর্থিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে মনিটরিং ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে। মুদ্রানীতির মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা

হবে। আমাদের দেশে তো মুদ্রানীতি খুব একটা কাজ করে না। বর্তমানে শুধু আমদানি ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য যদি মুদ্রানীতি ঠিক করি তাহলে সেটি একপক্ষীয় হয়ে যাচ্ছে। বরং কোন পণ্য আমদানি করা এখন দরকার এবং কোনগুলো এখন দরকার নেই, সেগুলো চিহ্নিত করে নিষেধাজ্ঞা দিতে পারি। চলতি অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধির হার ১৬ শতাংশ কমে গেছে। তাহলে কীভাবে আমরা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্থিতিশীলতা বজায় রাখব। বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে অনেক, বেড়েছে চলতি হিসাবের ঘাটতি। এসব ঘাটতি মিলে বহিঃখাতের ওপর প্রচণ্ড চাপ দেখা যাচ্ছে।

সরকার কি খাদ্যপণ্য বা জ্বালানি তেল মজুদে সঠিক পথে রয়েছে?

আমরা শুধু বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ে চিন্তা করছি। সরকারিভাবে খাদ্যের মজুদ বা ভোজ্যতেলের মজুদ নিয়ে চিন্তা করছি না। এসব মজুদ বাড়তে অন্য সরকারগুলো কী করছে, সেটা দেখছি না। কেবল বলছি, আমাদের প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, মূল্যস্ফীতি কমবে, বিনিয়োগ বাড়বে ইত্যাদি। সেগুলো নিয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে আছি। কিন্তু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি পর্যাণ্ড নয়। এখানে সংবেদনশীল চিন্তাভাবনার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আমাদের রিজার্ভের পরিমাণ কিছুটা কমেছে। কিন্তু তার পরও এখনো ভালো অবস্থায় আছে। সেটা দিয়েই আমাদের খাদ্যদ্রব্য ও জ্বালানিপণ্য আনার প্রস্তুতি নিতে হবে। দ্বিতীয় বিষয় হলো ব্যবস্থাপনা। এটা সামগ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা, ব্যবস্থাপনা ও সুশাসনের ওপর নির্ভরশীল। যাতে আমরা দুর্নীতিমুক্তভাবে খাদ্য ও পণ্যের মজুদ ব্যবস্থাপনা করতে পারি। তার জন্য যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের আরো সক্রিয় হতে হবে। শুধু বাজার তদারক করলে, হঠাৎ হঠাৎ কোথাও গিয়ে পরিদর্শন কার্যক্রম চালিয়ে তেমন সুফল পাওয়া যায় না। বাজার কারা কারা নিয়ন্ত্রণ করছে—এটা ক্ষুদ্র একটা গোষ্ঠী—সেটি সরকার জানে। তাদের বিরুদ্ধে তো কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না। বাজারে ঘুরে ঘুরে দেখার দরকার নেই। অনিয়ম করতে গিয়ে কেউ যদি ধরা পড়ে, তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিলে অন্যরাও সতর্ক হবে। বাজারে চলমান অব্যবস্থাপনা বন্ধ করতে না পারলে সুফলটা পাওয়া যাবে না। তবে হ্যাঁ, পাশাপাশি যথেষ্ট সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এটিই সরকারের প্রাধিকার হওয়া উচিত।

শিক্ষা-স্বাস্থ্যে বরাদ্দ সম্পর্কে আপনার মত কী?

শিক্ষা-স্বাস্থ্য বাজেটে কোনো উন্নতি নেই। কোভিডে স্বাস্থ্য খাতের ভঙ্গুরতা প্রকাশ পেয়েছে। সেটি যথাযথভাবে গুরুত্ব পায়নি। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ এখনো জিডিপির ১ শতাংশের নিচে। আর শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ জিডিপির মাত্র ২ শতাংশের মতো। শিক্ষা একটি জটিল সময় পার করছে। কোভিড শিক্ষার মানটা অনেক কমিয়ে দিয়েছে। অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। শিক্ষার ক্ষতি পোষানোর জন্য এ খাতে আরো অর্থ ও উদ্যোগ প্রয়োজন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত হলো গুণগত অবকাঠামো, যা মানবসম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত। সেখানে যদি সম্পদ বরাদ্দ বাড়ানো না যায় এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার না করা যায় তাহলে জাতি কীভাবে এগোবে। মানবসম্পদের অবক্ষয় রোধে এ দুটি খাতকে আর উপেক্ষা করা যাবে না। তাহলে আমাদের উন্নয়ন টেকসই হবে না।

রাজস্ব ব্যয়ের একটি বড় অংশ চলে যাচ্ছে জনপ্রশাসনের জন্য। এক্ষেত্রে আপনার অভিমত কী?

এখন প্রয়োজন মূল্যস্ফীতির চাপ কমানো, চাহিদা বৃদ্ধি এবং ব্যয়ের মধ্যে একটা রাশ টানা। সুচারুভাবে ব্যয় করা। সরকারি ব্যয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দরকার, যাতে সামষ্টিক চাহিদা একেবারে পড়ে না যায়। পণ্য আছে চাহিদা নেই, মানুষের হাতে টাকা নেই, সেটি হলে আবার অর্থনীতিতে তেজি ভাব আসবে না। চাহিদা বাড়ানোর অন্যতম উপায় হলো সরকারি ব্যয়। তবে সরকারি ব্যয় অনেক চিন্তাভাবনাপূর্বক করতে হবে। উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, সেসব ব্যয় কমিয়ে ফেলতে হবে। এবারের বাজেটে দেখবেন জনপ্রশাসনের বরাদ্দ সবচেয়ে বেশি। এখানে কোথায় কোথায় ব্যয় হচ্ছে তা দেখতে হবে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন তো আর কমানো যাবে না। কারণ মূল্যস্ফীতির চাপ তাদের ওপরও পড়বে। কিন্তু যেখানে কমানো সম্ভব যেমন গাড়ি, বিদ্যুৎ খরচ, বিদেশ ভ্রমণ, বিনোদন খরচ প্রভৃতি কমাতে হবে। আমরা দেখেছি গাড়ির অপারেশনাল ব্যয় অনেক জায়গায় শ্বেতহস্তীর মতো। এটা বন্ধ করতে দৃঢ় ঘোষণা আসা এবং তার সত্যিকার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। আর প্রকল্পের ক্ষেত্রেও সতর্ক হতে হবে। কম প্রয়োজনীয় প্রকল্প হলে, চলমান না থাকলে কিংবা মানুষের আয় ও কর্মসংস্থানের ওপর তেমন প্রভাব না পড়লে ওই ধরনের প্রকল্প স্থগিত রাখতে হবে।

শ্রুতলিখন: হুমায়ুন কবির

বণিক বার্তা

২৯ জুন, ২০২২

সামষ্টিক অর্থনীতি কিছুটা হলেও ঝুঁকিতে পড়েছে

মোস্তাফিজুর রহমান

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় স্বস্তিদায়ক অবস্থান থেকে বের হয়ে গেছে বাংলাদেশ। সামষ্টিক অর্থনীতি কিছুটা হলেও ঝুঁকিতে পড়েছে। টাকার অবমূল্যায়ন, সরকারের কৃচ্ছসাধন, আমদানি নিরুৎসাহিত করা—এসব উদ্যোগ অর্থনীতির ঝুঁকির বার্তা দেয়। সাধারণত একটি অর্থনীতির সক্ষমতার সূচকগুলো দুর্বল হলে ধীরে ধীরে ঝুঁকিতে পড়ে যায়।

শুধু বাংলাদেশ নয়; বৈশ্বিক বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি ঝুঁকিতে আছে। তবে এটা সাময়িক। সঠিকভাবে সামাল দিতে হবে যেন এই ঝুঁকি গভীর না হয়। গভীর হলে অর্থনৈতিক সংকট দীর্ঘায়িত হবে, যা সার্বিকভাবে উন্নয়ন ব্যাহত করবে।

শুধু বাংলাদেশ নয়; বৈশ্বিক বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি ঝুঁকিতে আছে। তবে এটা সাময়িক। সঠিকভাবে সামাল দিতে হবে যেন এই ঝুঁকি গভীর না হয়।

অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবিলার পাশাপাশি মধ্যমেয়াদি সংস্কার পদক্ষেপও নিতে হবে। এসব সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার কথা যেন ভুলে না যাই। বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) আকার বাড়ছে। কিন্তু কর-জিডিপির অনুপাতে বাংলাদেশ খুবই নিচের দিকের একটি দেশ। আবার এ দেশে প্রকল্প যথাসময়ে শেষ করা যায় না। এতে খরচ বাড়ে। ফলে প্রকল্পের সুবিধা নেওয়া যাচ্ছে না, যা সার্বিকভাবে অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তাই উন্নয়ন প্রকল্প সাশ্রয়ীভাবে সুশাসনের সঙ্গে বাস্তবায়ন করার তাগিদ থাকতে হবে। অন্যদিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, কিন্তু সম্পদ ও আয়ের বৈষম্য বাড়ছে। ধনী-গরিবের মধ্যে ব্যবধান আরও বাড়ছে। এতে অভ্যন্তরীণ চাহিদায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

এই মুহূর্তে সরকারের উচিত, অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প (যা এই মুহূর্তে বাস্তবায়ন না করলে তেমন ক্ষতি হবে না) বাস্তবায়ন স্তব্ধ করা। তবে যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন মাঝামাঝি বা

শেষের দিকে আছে, তা অব্যাহত রেখে দ্রুত শেষ করা উচিত। কারণ, ওই সব প্রকল্প পিছিয়ে পরবর্তীকালে আবার বাস্তবায়ন করতে গেলে খরচ আরও বাড়বে। তাই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তালিকা করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা উচিত।

সার্বিকভাবে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এখন চ্যালেঞ্জের মুখে আছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকারের নানা উদ্যোগের কারণে অর্থনীতি বা জিডিপি প্রবৃদ্ধি যদি শ্লথও হয়, তা উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে মেনে নেওয়া উচিত।

প্রথম আলো

১৯ জুলাই ২০২২

আইএমএফ-এর কাছে ঋণ সহায়তা চাইল সরকার, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সরকার যে সকল দ্বিধা কাটিয়ে আইএমএফ-এর কাছে গেছে সেটাকে আমি সঠিক বলে মনে করি। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি বড় পরিমাণে রয়েছে এবং একই রকম ভাবে আমাদের চলতি হিসাবে যেখানে রেমিট্যান্স আয়ের হিসাব হয় সেটিও একটি বড় ঘাটতির মধ্যে রয়েছে। একই সাথে টাকার বিনিয়োগের ভেতরে বড় ধরনের চাপ রয়েছে এবং আমরা প্রয়োজনীয় আমদানি করতে পারছি না বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে। এরকম একটি সময়ে যে সরকার গেছে আইএমএফ-এর কাছে এটা সঠিক ব্যবস্থা।

শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞতা বলে যে, সময়মত আমাদের বৈদেশিক ঘাটতি মেটানোর জন্য আইএমএফ-এর কাছে যাওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। শ্রীলঙ্কা এ করতে দেবী করাতে তাদের বড় ক্ষতি হয়েছে। সেহেতু আমি মনে করি এটি সঠিক কাজ হয়েছে। সরকারের তো এই টাকা ব্যবহার হবে তার বৈদেশিক যে একটি বড় ঘাটতি আছে সেটা মেটানোর জন্য। টাকাকে স্থিতিশীল করার জন্য ডলার বিক্রির মাধ্যমে। কিন্তু সবচেয়ে বড় যে পদক্ষেপে সরকারকে যেতে হবে সেটা হলো এ টাকা পাওয়ার আগে সরকারকে তার আস্থা তৈরি করার জন্য আইএমএফ-এর দৃষ্টিতে দায়িত্ববান দেখানোর জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। আমরা যাকে বলি প্রাক পদক্ষেপ কিছু হবে এবং একই রকম ভাবে কিস্তি ছাড় করার ক্ষেত্রে তাকে কতগুলো আস্থাপ্রবর্তক পদক্ষেপ নিতে হবে। সেগুলো হলো এ মুহূর্তে টাকার বিনিয়োগ হারকে বাজারভিত্তিক করতে হবে, টাকার বিনিয়োগ হারের ক্ষেত্রে আমরা যে একাধিক প্রণোদনা দিয়ে থাকি সেগুলোকে হয়ত সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে, আমাদের মুদ্রানীতির সাথে আর্থিক নীতির সামঞ্জস্য আনতে হবে, ভর্তুকির ক্ষেত্রে হয়ত মাত্রা নির্দিষ্ট করতে হবে যাতে ব্যায়ের ক্ষেত্রে একটা নিয়ন্ত্রণ আসে এবং এছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকাকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে এবং প্রয়োজনে হবে কিনা আমি জানিনা খেলাপি ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রেও শর্ত আসতে পারে।

আইএমএফ যে সমস্ত শর্তের কথা বলছে তার মধ্যে অনেকগুলোই স্বাধীন পেশাজীবীরা, অর্থনীতিবিদরা বলে আসছে। দুঃখের বিষয় হলো সরকারের দিক থেকে সেগুলো ওভাবে

আমলে নেয়া হচ্ছেনা। নেয়া হচ্ছেনা বলেই বর্তমান পরিস্থিতির কিছুটা তার জন্য দায়ী। সেক্ষেত্রে এখন যদি আইএমএফ-এর শর্তের ভিত্তিতেও সঠিক পদক্ষেপগুলো নেয়া হয়, সংস্কারমুক্তভাবে নেয়া হয় তাহলে আমাদের এটা ভারাক্রান্ত চিন্তেই মেনে নিতে হচ্ছে যে এছাড়া বোধহয় অন্য কোনো সুযোগ ছিলনা। আর্থ-সামাজিক অভিঘাত কিন্তু এ সমস্ত শর্ত পূরণ করলে অবশ্যই থাকবে। যেমন হলো সরকারের পক্ষ থেকে এখন মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় করার জন্য বড় ধরনের ভর্তুকিমূলক কার্যক্রম চলছে। সেগুলোকে হয়ত তাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। একই ক্ষেত্রে হয়ত তারা জ্বালানির ক্ষেত্রে যতটুকু ভর্তুকি দিচ্ছে অতখানি হয়ত আগামী দিনে দিতে পারবেনা। এর একটি বড় কারণ হলো আইএমএফ থেকে বলা হবে সরকারি যেগুলো দেয়ার সামর্থ্য নাই কারণ তার রাজস্ব আদায় কম। সেহেতু এ সমস্ত মোকাবিলা করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সংগতি এবং রাজস্ব আদায়ের পরিমাণকে বৃদ্ধি করার কথাটা আরো বেড়ে যাবে আগামী দিনগুলোতে। তবে সাধারণভাবে সরকারের ব্যয় সংকোচন, আমদানি নিয়ন্ত্রণ এগুলো এখন প্রধান পদক্ষেপ এবং রাজস্ব আদায় এগুলোর আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য সেভাবে আসবে। বলা বাহুল্য নির্বাচনের প্রাক্কালের একটি বছরে সরকারকে যখন এ ধরনের পদক্ষেপে যেতে হয় সেটা রাজনৈতিকভাবে খুব সুখকর হবেনা।

চ্যানেল আই নিউজ-এ প্রচারিত

২৬ জুলাই ২০২২

বাংলাদেশের দায়দেনা নিয়ে কেন চিন্তিত হবো

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি দায়দেনা নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে। শ্রীলঙ্কায় বৈদেশিক দায়দেনা পরিস্থিতির জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে এ আলোচনা জোরালো হয়েছে। শুধু শ্রীলঙ্কাতে নয়; এরূপ আর্থিক সংকট ঘানা, জিম্বাবুয়ে, পাকিস্তান এমনকি নেপালেও চলছে। এসব দেশে দায়দেনা মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যাওয়ায় অর্থনৈতিক সংকট এখন রাজনৈতিক সংকটে রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলাদেশে দায়দেনা এখনও স্বস্তিদায়ক অবস্থায় থাকলেও নিকট আগামীতে এ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার মতো বেশ কিছু কারণ রয়েছে।

সব দেশের সরকারি দায়দেনা পরিস্থিতি জটিল হওয়ার সাধারণত তিনটি কারণ দেখা যায়। প্রথমত, যথেষ্ট পরিমাণে অভ্যন্তরীণ সম্পদ না থাকলে অর্থাৎ কর আহরণ ব্যবস্থা খুব দুর্বল থাকলে সরকার প্রয়োজনীয় পরিমাণে ব্যয় করতে পারে না। ফলে উন্নয়ন ব্যয় মেটাতে বড় ধরনের ঘাটতি থেকে যায়। দ্বিতীয়ত, বহির্বিশ্বের সঙ্গে লেনদেনের ক্ষেত্রে যদি দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। যেমন রেমিট্যান্স, রপ্তানি আয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ হ্রাস এবং বিদেশে থাকা দেশের সম্পদ থেকে আয় বন্ধ হয়ে যাওয়া। তৃতীয়ত, সাশ্রয়ী উৎসের বদলে অনেক বেশি ব্যয়বহুল উৎস থেকে ঋণ নিলে দায়দেনা পরিস্থিতি জটিল হয়। এসব কারণে নিজস্ব মুদ্রার বিনিময় হারের পতন ঘটে। জাতীয় মুদ্রার মূল্যমান কমে যেতে থাকলে সরকারি ঋণ পরিশোধে আরও বেশি নিজস্ব মুদ্রা ব্যয় হয়। অপরদিকে দায়দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রবৃদ্ধির হার কমে যায়। মূল্যস্ফীতি বেড়ে যায় ও বৈদেশিক মুদ্রার মজুত কমতে থাকে। প্রতিযোগিতা সক্ষমতা এবং ক্রেডিট রেটিংও কমে যায়। শ্রীলঙ্কাতে সাম্প্রতিককালে তাই ঘটেছিল।

সরকার যখন দায়দেনা মেটাতে পারে না অথবা সুদ-আসল মেটানোর জন্য আবার ঋণ নিতে হয়, তখন সেই দায়দেনা টেকসই নয় বলে প্রতিভাত হয়। অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়, মোট দেশজ আয়ের (জিডিপি) নির্দিষ্ট শতাংশের ওপর হলে দায়দেনা পরিস্থিতি খুবই বিপজ্জনক বা এর নিচে থাকলে খুব ভালো। অর্থনীতি শাস্ত্রে এই শতাংশের হিসাব খুব যৌক্তিকভাবে স্থাপন করা যায়নি। যেমন জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্রের দায়দেনা তাদের জিডিপি যথাক্রমে ২৬৬ শতাংশ এবং ১২৫ শতাংশের ওপরে। কিন্তু এ দুই দেশ কোনো সময়ে খেলাপি হয়নি। আবার

এমনও দেখা গেছে, অনেক দেশের দায়দেনা দেশজ আয়ের ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ, কিন্তু তাদের কেউ কেউ অভ্যন্তরীণ বা অন্য উৎস থেকে দায়দেনা মেটানোর জন্য অর্থ জোগাড় করতে পারেনি। সাধারণভাবে অর্থনীতি শাস্ত্রে ঐকমত্য আছে- 'ফিসক্যাল কনসোলিডেশন' অর্থাৎ আর্থিক খাতকে সংহতকরণের ভিত্তিতে সরকারি দায়দেনা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে। আর্থিক খাত সংহতকরণ করার মানে হলো, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কর আহরণ বাড়ানো। উপরন্তু বাজেট ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে এবং আর্থিক পরিণামদর্শিতার ভিত্তিতে তার অর্থায়ন করতে হবে।

বর্তমান দায়দেনা পরিস্থিতি

আইএমএফ-এর হিসাবে বাংলাদেশের সরকারি দায়দেনা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে তুলনামূলক কম, যা দেশজ আয়ের প্রায় ৩৫ শতাংশ। সরকারি হিসাবে ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দায়দেনা ১৩১ বিলিয়ন ডলার, যা গত তিন বছরে প্রতি বছর দেশজ আয়ের প্রায় আড়াই শতাংশ বেড়েছে। অর্থাৎ গত তিন বছর সরকারি দায়দেনাতে বছরে মোট গড়ে ৭ বিলিয়ন ডলার করে বেড়েছে। দায়দেনা বাড়ার হার সাম্প্রতিককালে খুবই বেশি। তবে বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ উৎসের প্রাধান্য রয়েছে। কারণ তা মোটের প্রায় ৫৬ শতাংশ।

অনেক বিষয় থাকে, যেগুলো দায়দেনার সরকারি হিসাবের ভেতরে প্রকাশিত বা বিবেচিত হয় না। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব দায়দেনা আছে। সেগুলো অভ্যন্তরীণ দায়দেনার ভেতরে বিবেচিত হয় না। সরকারের কিছু সংযুক্ত দায় আছে। অর্থাৎ সরকার যেসব ঋণ অধিগ্রহণ করেছে বা দায়িত্ব নিয়েছে বা গ্যারান্টি দিয়েছে সেগুলোও হিসাবের ভেতরে নেই। সরকার অনেক সময় বাজেটবহির্ভূত অর্থায়ন করে। অর্থাৎ বাজেটের বাইরে রেখে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক লেনদেনে যুক্ত হয়। আবার সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একে অপরের কাছে যে দায়দেনা সেগুলোও অনেক সময় হিসাবে আসে না।

উপরন্তু কিছু ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠান বিদেশ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঋণ নিচ্ছে। সে ক্ষেত্রে অনেক সময় সরকার ফেরত দেওয়ার গ্যারান্টি দিচ্ছে। এটিও দায়দেনার হিসাবের মধ্যে প্রকাশিত হয় না। উপরন্তু, অনেক সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ হচ্ছে। সেখানে সরকারের অংশের জন্য বা তার সহযোগীর জন্য অনেক সময় গ্যারান্টি দেওয়া হয়। সেগুলোও যদি খেলাপি হয় তাহলে এর দায় সরকারের ওপর আসবে। ফলে সরকারি দায়দেনার হিসাব পূর্ণাঙ্গ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তাই দেশের প্রকৃত দায়দেনার পরিমাণ বা মাত্রা সরকারি হিসাবের চেয়ে বেশি। আমরা হিসাব করে দেখেছি, সরকারের সংযুক্ত দায়, আন্তঃসরকারি প্রতিষ্ঠানের দায় এবং বেসরকারি খাতের বিদেশি ঋণ যদি যোগ করা হয় তবে ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রকৃত দায়দেনা হবে দেশজ আয়ের প্রায় ৩৬ দশমিক ৪ শতাংশ। এই সংখ্যা সরকারের হিসাবের চেয়ে দেশজ আয়ের অংশ হিসাবে প্রায় ৩ শতাংশ বেশি। দেশের বৃহৎ ২০টি মেগা প্রকল্পের সর্ববৃহৎ তিন ঋণদাতা যথাক্রমে রাশিয়ান ফেডারেশন (৩৬ দশমিক ৬ শতাংশ), জাপান (৩৪ দশমিক ৯

শতাংশ) এবং এক্সিম ব্যাংক অব চায়না (২১ দশমিক ২ শতাংশ)। আর এ ২০টি প্রকল্পের ঋণের ধরনের মধ্যে রেয়াতি ঋণ ৭৩ দশমিক ৩ শতাংশ, আধা-সাশ্রয়ী ঋণ ৪ দশমিক ৪ শতাংশ, অসাশ্রয়ী ঋণ ১১ দশমিক ১ শতাংশ এবং অনুদান ১১ দশমিক ১ শতাংশ।

স্বস্তিদায়ক অবস্থা থাকবে?

বাংলাদেশের দায়দেনা পরিস্থিতির শুধু পরিমাণগত নয়, গুণগত পরিবর্তনও হচ্ছে। পরিমাণগত পরিবর্তন আগামী ২০২৪ ও '২৫ সালের দিকে ক্রমশ দেখা যাবে। সে সময়ে সম্ভবত বাংলাদেশ তার 'সবুজ' অবস্থান অর্থাৎ স্বস্তিদায়ক অবস্থান অতিক্রম করে একটি অস্বস্তির বা 'হলুদ' অবস্থানের দিকে যাবে। কেননা, আমরা ক্রমাগত বহুপক্ষীয় উৎসের বদলে অনেক বেশি উচ্চমূল্যে দ্বিপক্ষীয় উৎস থেকে মেগা প্রকল্পগুলো, অবকাঠামো প্রকল্পগুলোতে অর্থায়ন যাচ্ছি। সংক্ষিপ্ত রেয়াতি কাল (অনেক ক্ষেত্রে ৫ বছর) এবং পরিশোধ কাল (অনেক ক্ষেত্রে ১৫ বছর) থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন 'সম্মানবর্ধক' প্রকল্পের জন্য চীন ও রাশিয়া থেকে ব্যয়বহুল ঋণ নেওয়া হচ্ছে। ঋণগুলো তখনই নিচ্ছি, যখন আমাদের অব্যবহৃত সাশ্রয়ী বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার। সেই অনুদান বা সামান্য সুদের অর্থ আমরা ব্যবহার করতে পারছি না।

আগামী দিনে আরও বড়ভাবে দায়দেনার পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আসবে। কিছু উচ্চমূল্যের সাপ্লায়ারস ক্রেডিট বা ঠিকাদারদের ঋণ রয়েছে। যেমন পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প। রেল সেতুর জন্য ২ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার চীন থেকে সাপ্লায়ারস ক্রেডিট নেওয়া হচ্ছে। সাপ্লায়ারস ক্রেডিট হলো, কাজটা যে করে সে অর্থের জোগান দেয়। সেখানে অনেক সময় আমদানিকৃত পণ্যমূল্য প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্ধারিত হয় না। সবচেয়ে বড় সাপ্লায়ারস ক্রেডিট চীনের; ৫ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন ডলার। তার ভেতর ২ বিলিয়ন ডলার ছাড় হয়েছে। সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে সাড়ে ১০ বিলিয়ন ডলারের সাপ্লায়ারস ক্রেডিট বা উচ্চমূল্যের ঋণ রয়েছে। এসব ঋণ পরিশোধের সময় যত ঘনিয়ে আসবে, দায়দেনা নিয়ে উদ্বেগ তত বাড়বে।

আমাদের জাতীয় দায়দেনা বৃদ্ধির হার জিডিপি বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে আগামী দিনে অবশ্যই আমাদের জিডিপির অংশ দায়দেনা হিসেবে বাড়বে। দায় পরিশোধের ক্ষেত্রে বৈদেশিক উৎসের চাপ ক্রমাগত বাড়বে। বিশেষ করে উচ্চমূল্যের ঋণের রেয়াতি সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে।

তবে এ পরিস্থিতির অন্যতম দুর্বল জায়গা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ ঋণ। অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রায়শ আমাদের দায়দেনা পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে আলোচনা করা হয় না। বলা বাহুল্য, যত বেশি অভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধে অর্থ খরচ হবে, তত বেশি উন্নয়নের জন্য অর্থের লভ্যতা কমবে।

পাঁচ ঝুঁকি এবং তিন বার্তা

শ্রীলঙ্কার সঙ্গে বাংলাদেশের তুলনাটা অযৌক্তিক। কারণ একেকটি দেশ একেকভাবে বিকশিত হয়। বিবেচনার বিষয় হলো, শ্রীলঙ্কা থেকে কী শেখার আছে? শ্রীলঙ্কায়ে ধারটা নিয়েছে, তার অনেকটাই ব্যক্তি খাতের ধার এবং সরকার বন্ড ছেড়ে ঋণ নিয়েছে। এক সময় আমাদের এখানে অনেক বেশি বৈদেশিক মুদ্রার মজুতের কথা বলে 'সভরেন বন্ড' ছাড়ার কথা বলা হয়েছিল। আমরা এর সমালোচনা করেছিলাম এবং এ বিষয়ে অনেক বেশি রক্ষণশীল ছিলাম। শ্রীলঙ্কাতেও এমন রক্ষণশীল পক্ষ ছিল, যারা হাওয়ানটোটা বন্দর নির্মাণের বিপক্ষে ছিল। তারা বিদেশে বন্ড দিয়ে টাকা তোলার বিরোধী ছিল। কিন্তু সরকার তাদের কথা শোনেনি।

বর্তমানে দায়দেনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পাঁচ ধরনের ঝুঁকি রয়েছে। বিনিময় হারের ঝুঁকি, অর্থাৎ যে বিনিময় হারে ঋণ নেওয়া হয়েছিল, তার চেয়ে টাকার মূল্য অবনমন হয়ে গেলে বেশি টাকা দিতে হবে ধার পরিশোধের জন্য। অপরদিকে আমাদের অভ্যন্তরীণ উৎসের ঋণের সুদের হার আগামীতে বাড়বে। বৈদেশিক ঋণের সুদের হারের ঝুঁকিও কিছুটা বাড়ছে, তবে অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থায় আছে। অন্যদিকে কোনো কোনো প্রকল্পে অর্থায়ন উচ্চমূল্যে হচ্ছে, যা প্রকল্পে ব্যয় বৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়চ্ছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার পর আয় দিয়ে ঋণ শোধ করা যাবে কিনা, সে ঝুঁকিও রয়েছে।

সবশেষে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিতে চাই। প্রথমত, বাংলাদেশের সরকারি দায়দেনা পরিস্থিতিতে রাজস্ব আয় বাড়ানোর মাধ্যমে আর্থিক খাতের সুসংহতকরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দেশি-বিদেশি ঋণ পরিশোধের জন্যও রাজস্ব আয় বাড়াতে হবে। বাজেট ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে রাখতেও এটা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্যের সূচকগুলোয় সুরক্ষা দিতে হবে। যেমন, রেমিট্যান্সে উচ্চ প্রবাহ ঠিক রাখতে হবে। রপ্তানি বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হবে। বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। তৃতীয়ত, অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গ, স্বচ্ছভাবে এবং নিয়মিত দায়দেনা পরিস্থিতি নজরদারিতে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমস্যাকে অস্বীকার করার মনোভাব থেকে সরে আসতে হবে।

সমকাল

৩১ জুলাই ২০২২

সমস্বয় দরকার ছিল, ধাপে ধাপে হলে ভালো হত

মোস্তাফিজুর রহমান

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি কতটা যৌক্তিক, বিকল্প ছিল কি না, অর্থনীতিতে এর প্রভাব নিয়ে কথা বলেছেন সিপিডি'র সম্মাননীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তামজিদ হাসান তুরাগ।

কালের কণ্ঠ: এই সময় জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো কি যৌক্তিক?

মোস্তাফিজুর রহমান: সরকার জ্বালানি তেলের দাম ৪০ থেকে ৫১ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়েছে। এটা ঠিক যে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বেড়েছিল। আমাদের এখানে এত বড় সমস্বয়ের প্রয়োজন পড়ল, কারণ—একই সঙ্গে আমাদের টাকারও অবমূল্যায়ন হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সমস্বয়ের দরকার ছিল।

তবে তা বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধাপে ধাপে করলে ভালো হতো। এর বাইরে আমদানি শুদ্ধ কিছুটা সমস্বয়ের মাধ্যমেও এই ভর্তুকি সামাল দেওয়া যেত। পাশাপাশি জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি আরেকটু সহনীয়ভাবে করা গেলে ভোক্তা, উৎপাদক ও উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সমস্বয় করাটা সহজ হতো।

কালের কণ্ঠ: মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব কোথায় কোথায় পড়বে?

মোস্তাফিজুর রহমান: জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর ফলে গণপরিবহন মালিকরা ভাড়া বাড়বেন। একইভাবে পণ্য পরিবহনের খরচও বাড়বে। এর ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যাঁরা রয়েছেন তাঁদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এমনিতেই আমাদের ওপর মূল্যস্ফীতির চাপ রয়েছে, এখন আরেকটি চাপ সৃষ্টি হতে পারে। এসবের প্রভাব পড়বে নিতাপণ্যের বাজারে। খাদ্যপণ্য থেকে শুরু করে সেবারও দাম বাড়বে। দেখা যাবে নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই পণ্য এবং সেবার দাম বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কালের কণ্ঠ: জ্বালানি তেলের দাম না বাড়িয়ে সরকারের বিকল্প কিছু করার কি ছিল?

মোস্তাফিজুর রহমান: আমরা যদি রাজস্ব জিডিপি হার বাড়িয়ে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণটা বাড়াতে পারতাম, তাহলে ভর্তুকি মেটানোর সক্ষমতাটা আরো বেশি থাকত। এখানে স্বল্পকালীন একটা বিষয় আছে এবং সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনারও একটা বিষয় আছে। জ্বালানি তেলের দাম ক্রমান্বয়ে বাড়ানো গেলে শুদ্ধ সমন্বয় করে এই ধাক্কাটা সামাল দেওয়া যেত।

কালের কণ্ঠ: সরকার কি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ভর্তুকি কমানোর শর্তে জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়েছে?

মোস্তাফিজুর রহমান: হ্যাঁ, সেটা হতে পারে। তবে সরকারের ওপর ভর্তুকি কমানোর চাপ আছে, যা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে সরকার এটাকে ধীরে ধীরে বাজারের সঙ্গে সসম্বয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারত।

কালের কণ্ঠ: জনজীবনে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব কিভাবে সহনীয় রাখা যায়?

মোস্তাফিজুর রহমান: আমাদের নজরদারির অভাব রয়েছে। জ্বালানি খরচ কতটুকু বেড়েছে, সে অনুপাতে পণ্য ও সেবার দাম বাড়াতে হবে। আমাদের দেশে দেখা যায় জ্বালানির দাম ৫০ শতাংশ বাড়লে পণ্য বা সেবার দামও ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এটা অযৌক্তিক। ফলে যেখানে নজরদারির দুর্বলতা রয়েছে সেখানে নজরদারি আরো বাড়াতে হবে।

কালের কণ্ঠ: জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় কারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আপনি মনে করেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: সবচেয়ে বড় অভিঘাত আসবে নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোয়। এমনিতেই তাদের ওপর মূল্যস্ফীতির চাপ, তার ওপর এখন আবার জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি নতুন করে তাদের ওপর আরেকটি চাপ সৃষ্টি করবে।

কালের কণ্ঠ: সামনে জ্বালানি তেলের দাম আরো বাড়ার আশঙ্কা আছে কি?

মোস্তাফিজুর রহমান: বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম কিছুটা কমতির দিকে, সামনে সেটা আরো কমতে পারে। আমাদের উচিত হবে কমলে সমন্বয় করা।

কালের কণ্ঠ: বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের কী করণীয় বলে মনে করছেন আপনি?

মোস্তাফিজুর রহমান: আমরা যদি আমাদের বিনিময় মূল্য আরেকটু স্থিতিশীল পর্যায়ে নিতে পারি তাহলে স্থানীয় বাজারে আমদানি পণ্যের যে মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

আরেকটা বিষয় হলো, সরকারের রাজস্ব আয় বাড়িয়ে ভর্তুকি দেওয়ার সক্ষমতা বাড়াতে হবে। আর ধীরে ধীরে এলএনজিভিভিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে সরকারকে সরে আসার চিন্তা করতে হবে।

কালের কণ্ঠ

৭ আগস্ট ২০২২

অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় প্রয়োজন উত্তরণকালীন নীতি সমঝোতা

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

২০২২-২৩ অর্থবছর যে ৬ টি চ্যালেঞ্জ নিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী শুরু করেছিলেন, তার বর্তমান পরিস্থিতি এখন বেশ গুরুতর। তবে দেরিতে হলেও সরকার অর্থনীতির ব্যর্থতাগুলো স্বীকার করে যে পদক্ষেপগুলো নিচ্ছে সেটি ইতিবাচক। সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় একটি অন্তর্বর্তীকালীন উত্তরণ সমঝোতা নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অর্থনীতির বর্তমান চাপ থেকে উত্তরণ করতে জাতীয়ভাবে অংশগ্রহণমূলক ও পরামর্শমূলক একটি নীতি সমঝোতার সুপারিশ করা হয়।

একটি বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী ৬টি চ্যালেঞ্জের কথা বলেছিলেন। বাজেট পরবর্তী দুই মাসে সে ছয়টি চ্যালেঞ্জ কি অবস্থায় আছে তা বিবেচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি

বাজেট পরবর্তী দুই মাসে মূল্যস্ফীতি আরও বেড়েছে। মুদ্রাস্ফীতির হার মে মাসে যেখানে ৫.৪ শতাংশ ছিলো তা জুলাই তে বেড়ে ৭.৫ শতাংশে উপনীত হয়েছে। এছাড়াও গ্রামীণ মুদ্রাস্ফীতির হার নগরের মুদ্রাস্ফীতির হারের চেয়ে ১.৫ শতাংশ বেশি। সাম্প্রতিক জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি এবং টাকার অবমূল্যায়ন মুদ্রাস্ফীতির হারকে ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি করতে পারে।

২। ভর্তুকির জন্য বাড়তি অর্থ বরাদ্দ

ভর্তুকির জন্য বাড়তি অর্থ বরাদ্দের কথা বলা হয়েছিল এবং ২০২৩ সালের জন্য ভর্তুকি ৫৪ শতাংশ বেড়েছে। ভর্তুকি কাঠামো পুনর্বিবেচনা করা দরকার। সার, বিদ্যুৎ কিংবা গ্যাসে ভর্তুকি দরকার। কিন্তু ক্যাপাসিটি চার্জের নামে যে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে সেটা খারাপ ভর্তুকি। জ্বালানি তেলের ভর্তুকি কমিয়ে বড় অংকের ক্যাপাসিটি চার্জ দেওয়া ভুল পদক্ষেপ।

৩। বৈদেশিক সহায়তা বৃদ্ধি এবং অগ্রাধিকার প্রকল্পগুলো নির্ধারিত সময়ে শেষ করা

এক্ষেত্রে যদিও বৈদেশিক সহায়তার ব্যবহার বাড়েনি। অপরদিকে ৮টি মেগা প্রকল্পের কাজ ৫০ শতাংশও হয়নি, যেগুলো ২০২৪ সালে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। যে ৫টি মেগা প্রকল্প দ্রুততার সাথে করার কথা ছিলো সেগুলোতেও অনেকটা অনীহা দেখা গিয়েছে। অর্থাৎ মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের দিক থেকে খুবই শ্লথ অবস্থায় আছে এবং এখানে অর্থের অভাব নাকি ব্যবহারের দক্ষতা কম কোনটি মুখ্য অবস্থায় আছে তা এখনো পরিষ্কার নয়।

৪। শিক্ষা-স্বাস্থ্য খাতের প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শেষ করা

এ খাতে বরাদ্দ ও ব্যয় দুটি কম। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতের প্রকল্পগুলো ৩৬ শতাংশের বেশি আগাচ্ছেনা। শিক্ষাখাতের প্রকল্পগুলো বরং গড়ের নিচে রয়েছে। দেশের সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান ভৌত অবকাঠামোতে জোর দেওয়া হচ্ছে। ২০টি মেগা প্রকল্পে ব্যয় করা হচ্ছে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১ শতাংশ।

৫। ভ্যাট এবং কর

৭৪ লক্ষ টিন নাস্তার থাকার পরেও মাত্র ২৩ লক্ষ জনগণ কর দিচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভ্যাটের পরিমাণ নির্ধারণ করেছে। গত কয়েক দশকের চেয়ে বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। করের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক দিক হলো প্রত্যক্ষ কর অর্থাৎ আয়কর বৃদ্ধি।

৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও মুদ্রা বিনিময়ের হারের চ্যালেঞ্জ

ঐতিহাসিক ভাবে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার জায়গাটা একটা শক্তির জায়গা ছিলো যেখানে একটি বড় ধরনের ভাঙন এসেছে। ২ মাসে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৫.৫ শতাংশ কমেছে। যদিও, পূর্বের তুলনায় প্রত্যক্ষ কর আহরণ বৃদ্ধি চলমান পরিস্থিতির একমাত্র ইতিবাচক পরিবর্তন।

অর্থাৎ বাজেট ঘোষণার পর গত ২ মাসে ৬টি চ্যালেঞ্জের ৫টি আরও বড় আকার ধারণ করেছে। প্রতিবছরই বাজেট ঘাটতি মোকাবিলায় ৬০ শতাংশ বৈদেশিক সহায়তা ব্যবহারের কথা বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে হয় উল্টো। বছর শেষে ব্যাংক খাতের ওপর নির্ভর করতে হয়। এক্ষেত্রে সরকার যে ঋণ নেয়, তা বেসরকারি খাতের চেয়ে বেশি। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট-পরবর্তী বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, অর্থনীতির অতিমারি উত্তর পুনরুজ্জীবন এখনো সম্ভব হয়নি। সামষ্টিক অর্থনীতি একটি চাপে রয়েছে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিও তেমন ভালো অবস্থানে নেই। মূল্যস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ, ভর্তুকির জন্য বাড়তি অর্থায়ন, বৈদেশিক অর্থায়নে চলমান প্রকল্পগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন, দৃশ্যমান উন্নয়নের ফলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে অবহেলা, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারের পার্থক্য বৃদ্ধি প্রভৃতি সূচকগুলোরও অবনতি হয়েছে।

যে কোন বিষয় মোকাবিলা করার ক্ষমতা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। বর্তমান সংকট রোগের উপসর্গ মাত্র। রোগ ভিন্ন জায়গায়। সেটি হলো সংস্কার না হওয়ায়। আর্থিক খাতের সংকট মোকাবিলায় সরকারকে ভতুর্কি কমাতে হচ্ছে। অথচ এখন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে গরিব মানুষকে সুরক্ষা দিতে ভতুর্কি দেওয়া বেশি প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে রিজার্ভের প্রায় ২০ শতাংশই দায়-দেনা পরিশোধে চলে যাচ্ছে যার ফলে আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রণেলের সম্মুখীন হচ্ছে।

বাংলাদেশের আর্থিক কাঠামো এখনো উচ্চ প্রবৃদ্ধির পথে সমর্থন দেওয়ার মত নয়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাচ্ছে, টাকার মান দুর্বল হয়েছে, যেগুলো রোগের উপসর্গ। আমাদের রাজস্ব আয় এখনো ১০ শতাংশের নিচে। যদি কর-জিডিপি অনুপাত ১৫ শতাংশ থাকতো তাহলে বর্তমানে এতো চাপ তৈরি হতো না। এক্ষেত্রে, চলমান পরিস্থিতি সাপেক্ষে সরকারের তিনটি করণীয় আছে বলে তিনি মনে করেন। অংশগ্রহণমূলক নীতি সমঝোতার জন্য বিরোধী দল, সরকারে রাজনৈতিক সহযোগী, সুশীল সমাজ, অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ সহ বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা করে ২-৩ বছরের একটি স্বল্প মেয়াদি কৌশল প্রণয়ন করা উচিত। এই সমঝোতায় নীতি বিষয়কেই প্রাধান্য দিতে হবে। এক্ষেত্রে সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখা, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান অব্যাহত রাখা এবং গরিব মানুষকে সুরক্ষা দেওয়ার ওপর জোর দিতে হবে। এছাড়াও নীতি প্রণয়নে ঐকমত্য থাকা অত্যন্ত জরুরী, যাতে আগামী দিনে রাজনৈতিক টানাপোড়েন হলেও আর্থিক খাতকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন অর্থনৈতিক নীতি সমঝোতা

বর্তমান আর্থিক খাতের সংকট মোকাবিলায় দুই থেকে তিন বছরের জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন অর্থনৈতিক নীতি সমঝোতা প্রয়োজন। এই নীতি সমঝোতায় নীতি বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হবে। সেগুলো হলো সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখা; উৎপাদন ও কর্মসংস্থান অব্যাহত রাখা এবং গরিব মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া। এই নীতি প্রণয়ন ঐকমত্যের ভিত্তিতে হওয়া উচিত। তাহলে আগামীতে যদি রাজনৈতিক টানাপোড়েন হয়, তখনো আর্থিক খাতকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে।

উচ্চ প্রবৃদ্ধির দেশে দরিদ্র সরকার বিগত দশকে নিজের আর্থিক সংস্থান নিশ্চিত না করায় এর করুণ পরিণতি ভোগ করছে দেশ। সাম্প্রতিককালে অর্থনীতি নিয়ে সকলেই সচেতন। এখনই সময় আগামী অভিক্ষেপ বিবেচনা করে, সমস্ত চিন্তাগুলো একত্রিত করে একটি সামগ্রিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার। কেননা অর্থনৈতিক ঝুঁকির কারণ যাই হোক, ২০২৪ সাল শেষ হওয়ার আগে এই দুর্যোগ কাটবে না বলে মত প্রকাশ করেন তিনি। আর্থিক খাতই হলো অর্থনীতির ফুসফুস; যার সাথে জড়িত ব্যাংকিং খাত ও ব্যাংক বহির্ভূত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে আর্থিক ঝুঁকি মোকাবিলায় আর্থিক পদক্ষেপ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। আর্থিক খাতের প্রতি অঘণ্টার কারণে আজ আর্থিক সম্পদ খুঁজতে যেয়ে ভতুর্কি কমাতে হচ্ছে যা এ মুহূর্তে মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় রাখা এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য ছিলো। বৈশ্বিক পরিস্থিতি নয়, আর্থিক খাতের দুর্বলতাই মূল খলনায়ক।

২০২২/২৩ অর্থবছরে বাজেট এবং মধ্যমেয়াদি কাঠামোর প্রাক্কলিত সংখ্যাগুলো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হচ্ছে যার ফলে স্বল্পমেয়াদি (২-৩ বছর) অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ও সংহতি রক্ষার জন্য নীতি সমঝোতা প্রয়োজন। এ অন্তর্বর্তীকালীন নীতি সমঝোতা অংশগ্রহণমূলক এবং পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করতে হবে এবং তা দক্ষতার সাথে অন্তর্ভুক্তিমূলক নেতৃত্বে বাস্তবায়ন করতে হবে। এছাড়াও যে অন্তর্বর্তীকালীন অর্থনৈতিক নীতি সমঝোতার সাথে তথ্যভিত্তিক জবাবদিহিতার কাঠামো প্রয়োজন হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন অর্থনৈতিক নীতি সমঝোতার উদ্দেশ্য

অন্তর্বর্তীকালীন অর্থনৈতিক নীতি সমঝোতার তিনটি মূল উদ্দেশ্য রয়েছে যা একে অপরের সাথে সংযুক্ত। এ উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১। সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখা

সামষ্টিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখার জন্য যোগান এবং চাহিদার মধ্যে সমন্বয় করার গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়াও যে, সামষ্টিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে সুদের হারকে মুক্ত করতে হবে এবং বিনিয়ন্ত্রণ করতে হবে যেনো ক্ষুদ্রসঞ্চয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

সরকারকে বর্তমান পরিস্থিতিতে অবশ্যই ভর্তুকির বর্তমান কাঠামো পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং ভর্তুকির ক্ষেত্রে নিম্নআয়ের মানুষদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। এছাড়াও মানুষের ব্যয় করার সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নজর দিতে হবে।

২০২১ সালে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা এসেছে প্রায় ৭ বিলিয়ন এবং তা ২০২২ সালে এসেছে প্রায় ১০ বিলিয়ন। সরকারকে দ্রুততার সাথে বৈদেশিক সাহায্যের সমন্বয় করতে হবে। সরকার যে আমদানি নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ নিয়েছে তা খুবই প্রশংসনীয় এবং এই নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখা এ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত জরুরী। এছাড়াও উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার যে ক, খ, গ ইত্যাদি করেছে তার সঠিক বাস্তবায়নের দিকে যেতে হবে এবং সাধারণ মানুষের চাহিদার ভিত্তিতে মেগাপ্রকল্পের বাস্তবায়নকে প্রাধান্য দিতে হবে।

সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে সরকারকে এরূপ পরিস্থিতিতে আইএমএফ-এর কাছে যেতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ঘাটতি মেটানোর ক্ষেত্রে আইএমএফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

২। উৎপাদন ও কর্মসংস্থান অব্যাহত রাখা

দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করতে উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে আমন ধান উৎপাদনের দিকে নজর দিতে হবে। আমন ধান

শুধুমাত্র খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্যেই নয়, গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্যে এবং গ্রামীণ চাহিদা পূরণেও গুরুত্বপূর্ণ। শস্যের বাইরে শস্য বহির্ভূত খাত যেমন মাছ, গবাদি পশু ইত্যাদিও জরুরি। এ সকল খাত সংকট বাড়তে না দেয়া ছাড়াও পুষ্টিহীনতা রোধে ভূমিকা পালন করবে। সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে কৃষিখাতের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও বৈদেশিক কর্মসংস্থানে এবং অনাবাসি শ্রমিকদের প্রতি নজরদারি করতে হবে। বিশেষ করে গার্মেন্টস ক্ষেত্রে শ্রমিকদের মজুরি সেভাবে বাড়ছেন। বিনিময় হারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে সেখানে গার্মেন্টস মালিকরা লাভবান হবে এবং সেক্ষেত্রে তার ভাগ শ্রমিকদেরকেও মজুরি বৃদ্ধির মাধ্যমে দিতে হবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে থাকা শ্রমিকদের দিকেও নজর দিতে হবে। তাদের এককালীন আর্থিক সমর্থন দিতে হবে এবং ভাসমান মানুষদেরও আর্থিক সমর্থন দিতে হবে। সেক্ষেত্রে সঠিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

৩। অসুবিধাগ্রস্থ মানুষদের সুরক্ষা দেয়া

সরকারের পক্ষ থেকে অসুবিধাগ্রস্থ বা দুস্থ মানুষদের সহায়তা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার ফ্যামিলি কার্ডের জন্যে যে ব্যবস্থা চালু করতে চেয়েছিলেন তা স্বচ্ছতার সাথে করতে হবে এবং টিসিবিকে জেলা পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রয়োজনে সরকারকে আমদানিতে যেতে হবে। অতিমারি উত্তর অবস্থায় যুব বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। সেক্ষেত্রে যুবকদের আত্মনিবন্ধনের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

বর্তমানে নাগরিকরা একটি অনিশ্চিত এবং দুশ্চিন্তামূলক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে নীতি প্রণেতারা বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য প্রদান করছে। অর্থাৎ জনগণ এবং নীতিপ্রণেতাদের মধ্যে এক ধরনের মতবিরোধের সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়াও নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখা যাচ্ছেনা। নীতি প্রণয়ণ বর্তমানে শুধুই আমলাতান্ত্রিক অবস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে সরকারকে জাতীয়ভাবে সমর্থিত নীতি-সমঝোতায় আসতে হবে। সাম্প্রতিক সময়ে সামষ্টিক অর্থনীতির যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে তা মোকাবিলা করতে সরকারকে সকলের অংশগ্রহণমূলক অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সাথে গণমাধ্যমকর্মীদের ভার্চুয়াল আলাপচারিতার অংশবিশেষ
১১ আগস্ট ২০২২

অর্থনীতি নিয়ে উত্তরণকালীন সমঝোতা প্রয়োজন

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

প্রথম আলো: বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে একধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে। কারও জন্য তা আতঙ্কের। এমন উদ্বেগজনক পরিস্থিতি থাকলে অর্থনীতির দুর্বলতা আরও ঘনীভূত হয়, সবল দিকগুলো দুর্বল হতে থাকে। অর্থনীতির নীতি বাস্তবায়ন অনেকটাই আস্থা ও নির্ভরযোগ্যতার ওপর নির্ভর করে। তাই আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনাই অর্থনীতির স্বল্পমেয়াদি ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করি।

২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য বাজেট এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ পর্যায়ের যে প্রাক্কলন, তা বৈশ্বিক পরিস্থিতি ও অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বাস্তবতায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। যেহেতু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে, সেহেতু নতুনভাবে দুই-তিন বছরের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন নীতি সমঝোতা বা উত্তরণকালীন কর্মসূচি প্রয়োজন। এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ছাড় দিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সংরক্ষণ।

বর্তমানে আমরা দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। কেউ কেউ মনে করেন, বৈদেশিক চাপের কারণে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এটি আংশিক সত্য। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটজনক পরিস্থিতি আমাদের চাপে ফেলেছে। কর-জিডিপি অনুপাত এখন মাত্র ৯ শতাংশের মতো। এটি যদি ১৪-১৫ শতাংশ হতো, তাহলে সরকারের আরও বেশি খরচ করার সামর্থ্য থাকত, যা অর্থনীতিকে একধরনের স্বস্তি দিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি বলব, উচ্চ প্রবৃদ্ধির অর্থনীতির গরিব সরকার। সরকার তার জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনতে পারছে না। ভতুর্কি দিতে পারছে না। এত দিন ধরে যে উন্নয়ন-আলেখ্য রচনা করা হয়েছে, তাতে দৃশ্যমান ভৌত অবকাঠামোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে বেশি বিনিয়োগ করা হয়নি। ফলে এখন যে উৎপাদনশীল দক্ষ

শ্রমশক্তি দরকার ছিল, তা পাচ্ছি না। সরকারের বর্তমান উন্নয়ননীতিতে একধরনের দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য আছে।

প্রথম আলো: অন্তর্বর্তীকালীন নীতি সমঝোতা কীভাবে হবে? কোন কোন বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া উচিত?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এই অন্তর্বর্তীকালীন অর্থনৈতিক নীতি সমঝোতায় তিনটি বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হবে। এই এগুলো হলো সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীল রাখা; উৎপাদন ও কর্মসংস্থানে সমর্থন দেওয়া; বিপন্ন মানুষকে সুরক্ষা দেওয়া। এই নীতি সমঝোতা প্রণয়ন ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণমূলক হতে হবে।

এই নীতি সমঝোতা করতে সরকারকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে হবে। যেমন মন্ত্রিপরিষদ; আর্থিক, মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হারসংক্রান্ত কো-অর্ডিনেশন কমিটি; অর্থ মন্ত্রণালয়সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি—এসব জায়গায় আলোচনা হতে পারে। এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে সরকারের নিজেদের রাজনৈতিক সহযোগী; এমনকি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গেও। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট শ্রেণিপেশার সঙ্গেও এ নিয়ে আলাপ আলোচনা দরকার।

সরকারের নিজেদের মধ্যে যেসব কমিটি আছে, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সেসব জায়গায় আলোচনার কথা শোনা যায় না। এর ফলে নীতি প্রণয়নে একধরনের স্বচ্ছতা ও সমন্বয়ের অভাব আছে। এসব করার জন্য নেতৃত্ব দরকার। এ ধরনের অর্থনৈতিক নীতিমালা পুনর্বিন্যাস করার জন্য যিনি নেতৃত্ব দেবেন, তিনি অদৃশ্য হয়ে আছেন।

বর্তমান পরিস্থিতির উত্তরণে দুই-তিন বছরের জন্য ব্যাপক অংশগ্রহণমূলক অর্থনৈতিক নীতি সমঝোতা হলে দুই ধরনের উপকার হবে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও বিশ্বব্যাংকের মতো সংস্থার কাছে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে দর-কষাকষি সহজ হবে। দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে রাজনৈতিক উত্তাপপূর্ণ কর্মকাণ্ডের সময়ে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্ট এই নীতি সমঝোতা অর্থনীতিকে সুরক্ষা দেবে।

প্রথম আলো: বর্তমান পরিস্থিতিতে সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো স্থিতিশীল রাখতে কী করা দরকার?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেরিতে হলেও সরকার অবশ্য কিছু কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে। যেমন আমদানি নিয়ন্ত্রণ, সরকারি ব্যয় সাশ্রয়, বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহি আনা। এসব পদক্ষেপ প্রয়োজনীয় হলেও যথেষ্ট নয়। এসব উদ্যোগ বিচ্ছিন্ন, অসম্পূর্ণ, অপরিপূর্ণ এবং ধারাবাহিকতা নেই। এত দিন অর্থনীতির এই সমস্যাগুলো অস্বীকারের প্রবণতা ছিল। এখন চাপে পড়ে সামান্য স্বীকার করা হচ্ছে।

প্রথম আলো: তাহলে কী করা উচিত?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: একটি সীমার মধ্যে রেখে সুদের হার ছেড়ে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এ ছাড়া নজরদারির মধ্যে রেখে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার বাজারভিত্তিক করা দরকার। এই দুটি নীতির বাইরে সরকারের অর্থের জোগানপ্রবাহ ঠিক রাখতে কর আহরণ অব্যাহত রাখতে হবে। বিশেষ করে করদাতার সংখ্যা বাড়িয়ে প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধি করতে হবে।

এ ছাড়া সরকার উন্নয়ন ব্যয় কাঠামোতে কিছু কিছু পরিবর্তন আনছে। যেমন সরকার প্রকল্প বাস্তবায়নে ক, খ ও গ শ্রেণিভুক্ত করেছে। ক শ্রেণিতে মনোযোগ দেওয়া; খ-তে বিবেচনাধীন রাখা এবং গ-তে পরিত্যাজ্য করা। এটি সঠিকভাবে করা উচিত।

এবার আসি, ভর্তুকির বিষয়ে। এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সরকারের ভর্তুকিকাঠামো পুনর্বিন্যাস করা। মোট ভর্তুকি কত দিচ্ছি, তা কম গুরুত্বপূর্ণ; কাকে ভর্তুকি দিচ্ছে, তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতির ভাষায় ভালো ভর্তুকি আছে, খারাপ ভর্তুকিও আছে। কৃষি খাতের ভর্তুকি ভালো ভর্তুকি। আবার বিদ্যুৎকেন্দ্রের অলস সক্ষমতার জন্য ক্যাপাসিটি চার্জ দেওয়া খারাপ ভর্তুকি। ভর্তুকি প্রদানের ক্ষেত্রে জ্বালানি ও খাদ্য উৎপাদনকে প্রাধান্য দিতে হবে। কারণ, জ্বালানি তেল সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে। আর খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সার ও বিদ্যুতে ভর্তুকি দরকার।

মুদ্রাপ্রবাহ কমিয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হচ্ছে। বিবেচনায় আনতে হবে, মুদ্রাপ্রবাহ সংকোচন করলে যদি প্রবৃদ্ধি না হয়, কর্মসংস্থান কম হয়, সরকারের আয় না হয়। তাহলে বিপন্ন জনগোষ্ঠীর যে ধরনের সাহায্য দরকার হয়, তা তারা পাবে না।

তাই মুদ্রানীতিকে যত কঠোর করা হবে, সেই অনুসারে আর্থিক নীতি বা খরচ করার সামর্থ্য বাড়তে হবে। খরচ করার সামর্থ্য বাড়তে কর আহরণের পাশাপাশি বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তার সঠিক ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ হবে। সামষ্টিক অর্থনীতিতে সুরক্ষা দিতে গ্রহণযোগ্য সমাধানে আসতে হবে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে বড় সংস্কার লাগবে। এ মুহূর্তে তা দেখছি না।

প্রথম আলো: উৎপাদন, কর্মসংস্থান—এসব বিষয়ে এখন কী করা উচিত?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে নীতিসহায়তা দিতে হবে। আমনের উৎপাদন এখন বড় ইস্যু হয়ে যাচ্ছে। দেরিতে বৃষ্টি, সার ও জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি—এসব কারণে আমন উৎপাদনের খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে। এ ছাড়া সারের লভ্যতার সংকটও আছে। আমন উৎপাদনের সরকারের মনোযোগ থাকলেও মাঠপর্যায়ে তা দেখা যায় না।

আবার নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পকারখানার শ্রমিকদের সুরক্ষা দিতে হবে। চা-শ্রমিকেরা আন্দোলন করেছেন। রপ্তানিমুখী শিল্পেও এ ধরনের অসন্তোষ সৃষ্টির শঙ্কা আছে। তৈরি পোশাকশ্রমিকদের বিদ্যমান ন্যূনতম মজুরিকাঠামোর মেয়াদ তিন বছরের বেশি হয়েছে।

টাকার বিনিময় হার ১০ শতাংশ বেড়েছে। পোশাক রপ্তানিকারকেরা এর সুফল পাচ্ছেন। এই সুফলের কিছুটা অংশ শ্রমিকদের দেওয়া উচিত। বর্তমানে যে বাজার পরিস্থিতি, তাতে তাদের মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। এ ছাড়া অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের সুরক্ষা দিতে নানা কর্মসূচি নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, অভ্যন্তরীণ বাজারমুখী শিল্পে কিছুটা স্বস্তি দিতে হবে।

প্রতিবছর ২০ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করেন। তাঁদের মধ্যে এক-চতুর্থাংশের কর্মসংস্থান হয় বিদেশে। প্রবাসে প্রচলিত বাজার, বিকাশমান বাজার ও অন্য কোনো দেশের বাজারে শ্রমিক পাঠানোর ব্যবস্থা মসৃণ রাখতে হবে। এর পাশাপাশি দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলার কর্মসূচি অব্যাহত যেন থাকে।

প্রথম আলো: বিপন্ন মানুষকে কীভাবে সুরক্ষা দেওয়া যাবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: পিছিয়ে পড়া বিপন্ন মানুষই দুর্দশার সবচেয়ে বড় ভাগীদার। এ মুহূর্তে নিম্নমধ্যবিত্ত ও সীমিত আয়ের মানুষের জীবনমান রক্ষা করা বড় অর্থনৈতিক দায়িত্ব। সরকারের ঘোষিত ‘ফ্যামিলি কার্ড’ ব্যবস্থাকে দ্রুততার সঙ্গে ও দুর্নীতিমুক্তভাবে চালু করা দরকার। টিসিবির মাধ্যমে চালসহ অন্যান্য নিত্যপণ্য জেলা পর্যায়ে বিক্রি করা দরকার।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ও সংখ্যা বাড়াতে হবে। যাঁরা এখন ভাতা পাচ্ছেন, তা বাড়িয়ে কমপক্ষে এক হাজার টাকা করা উচিত। আড়াই হাজার-তিন হাজার ডলারের মাথাপিছু আয়ের দেশে মাসিক ভাতার পরিমাণ ৪-৫ ডলার, এটি কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় একজন সুবিধাভোগীর বছরে মাত্র ৬০ ডলার ভাতা পান, এটি অনায়াস ও অর্থনৈতিক অবিচার।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে নানা ধরনের অসংগতি আছে। যেমন উপযুক্ত লোকেরা এ সুবিধা পাচ্ছেন না। উপযুক্ত লোক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বৈষম্যমূলকভাবে বাছাই করা হয়। আবার যাদের সুবিধাভোগীর আওতায় আনা হয়, তাঁরা অপরিপাক বা কম ভাতা ও পণ্য পাচ্ছেন।

কোভিডের পর যুব বেকারত্ব আরও প্রকট হয়েছে। বহু যুবক প্রচ্ছন্ন বেকার হয়ে গেছেন। স্বনিবন্ধনের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে তাঁদের এককালীন ভাতা দেওয়া উচিত। অথবা যুব ক্রেডিট কার্ড চালু করা যেতে পারে।

প্রথম আলো: পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার আইএমএফ-এর কাছে ঋণ চেয়েছে। আইএমএফ-এর কাছে ঋণ নেওয়া নিয়ে একধরনের আলোচনা-সমালোচনা আছে। আপনি কী মনে করেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: গত ১৯ মে আমি বলেছিলাম, আইএমএফ-এর কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার সময় এসেছে। আমি এখনো মনে করি, আইএমএফ-এর কাছ থেকে ঋণ নেওয়া উচিত। বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতি—এসব ক্ষেত্রে একধরনের আর্থিক সমর্থন প্রয়োজন। বাংলাদেশ ৪৫০ কোটি ডলার চেয়েছে, সেটা যৌক্তিক। কারণ, আইএমএফ-এর কাছে ঋণ নেওয়া শুধু টাকার জন্য নয়; সংস্কার ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলার জন্যও দরকার। আমরা যা বলে করাতে পারিনি, সেটা যদি আইএমএফ বললে হয়, সেটা ভালো। আইএমএফকে যদি আনতে হয়, তাহলে আগে আনাই ভালো। শ্রীলঙ্কা এটার শিকার হয়েছে।

আইএমএফ সম্পর্কে তাঁদের মনেই আতঙ্ক সৃষ্টি হয়, যাঁরা এত দিন অর্থনীতির উন্নয়নের উচ্ছ্বাস নিয়ে ছিলেন। এর ভেতরে যে কাঠামোগত দুর্বলতাগুলো রয়ে গেছে, তা অস্বীকার করে গেছেন। আমাদের মতো পেশাজীবীরা আইএমএফ নিয়ে এত চিন্তা করি না। আইএমএফ সৃষ্টিই করা হয়েছে এ ধরনের প্রতিকূল সময়ে সাহায্য করার জন্য। সমস্যা হয়েছে, তাঁরা (যাঁরা আতঙ্ক থাকেন) এখন কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন এত দিনের উচ্ছ্বাসপূর্ণ উন্নয়নের কাহিনি।

প্রথম আলো: রাশিয়া থেকে তেল কেনার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার মত কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ভূ-অর্থনীতি এখন ভূরাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আশঙ্কা হলো এই দ্বন্দ্বাত্মক সম্পর্ক ভবিষ্যতে বাড়বে, কমবে না। সরকার এখন সব দিক রক্ষা করে একটি বৈদেশিক নীতি পরিচালনার চেষ্টা করছে। দেখার বিষয়, মধ্য মেয়াদে এটি টিকবে কি না। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আছে। দেশের মানবাধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক নজরদারি এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে আগামী নির্বাচন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রত্যাশা সুস্পষ্ট হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে রাশিয়ার সঙ্গে নতুন বাণিজ্য সম্পর্ক, চলমান প্রকল্প শেষ করা, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা—এগুলো কীভাবে জাতীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে বিশেষ বিচক্ষণতা, কারিগরি সক্ষমতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা প্রয়োজন পড়বে। এখানেও একই সমস্যা। এ ধরনের সিদ্ধান্তের জন্য সব দেশে জাতীয় ঐকমত্য দরকার হয়। সেই উদ্যোগ ও প্রক্রিয়া দেখছি না।

প্রথম আলো

২৩ আগস্ট ২০২২

সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকে বড় ধরনের টানাপোড়েন লক্ষণীয়

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

করোনা সময়কালে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে অর্থাৎ অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের একটি চ্যালেঞ্জ ছিল এবং সেটি বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচকভাবেই প্রতিভাত মনে হচ্ছিল। যদিও সেই সময়কালে ধীরে ধীরে কাঁচামাল ও জ্বালানি তেলেরও মূল্যবৃদ্ধি হয়।

যেহেতু বিশ্বব্যাপী সবাই পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল এবং বিশ্বব্যাপী প্রবৃদ্ধির যে ফোকাস সেটিও উচ্চমাত্রায় ধরা হয়েছিল, সেই প্রেক্ষাপট সহজেই পরিবর্তিত হয়ে যায় ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে। শুরুতে যুদ্ধটিকে যতটা সাময়িক হিসেবেই মনে হয়, ক্রমান্বয়ে সেটি দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে। জটিল হচ্ছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যুদ্ধ শুরুর দিকে অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া যতটা ভাবা হচ্ছিল, স্থানীয় পর্যায়ে অর্থাৎ মনে করা হয়েছিল ইউক্রেন রাশিয়া পর্যায়েই সেটি হয়ত সীমিত থাকবে। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই সমস্যার গতি-প্রকৃতির প্রভাব উন্নত দেশগুলোকে প্রভাবিত করছে। সবচেয়ে বেশি যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তারা হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলো এবং বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

বাংলাদেশ যেহেতু আমদানি নির্ভর দেশ, বিশেষ করে জ্বালানিক্ষেত্রে ও খাদ্য শস্যের ক্ষেত্রেও আমরা আমদানি নির্ভর। দুটি ক্ষেত্রেই রাশিয়া যেহেতু অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বেশ টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, সবকিছু মিলে এ যুদ্ধের ভুক্তভোগী হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশ— তার ভেতরে বাংলাদেশ অন্যতম।

বাংলাদেশ সম্পর্কে যেসব ইতিবাচক প্রক্ষেপণ অথবা পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছিল, সে সমস্ত প্রক্ষেপণ ও পূর্বাভাসগুলো ধীরে ধীরে দুর্বল হতে শুরু করছে। আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতি কোভিডের পরে এত টানাপোড়েনের মধ্যেও মোটামুটি একটি স্থিতিশীল জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছিল। কিন্তু কোভিড পরবর্তী যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আমরা সামষ্টিক অর্থনীতির যে বড় বড়

সূচকগুলো সেই সূচকগুলোতে বড় ধরনের টানাপোড়েন হচ্ছে। এর ভেতরে মূল্যস্ফীতি, রিজার্ভের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এবং রিজার্ভ কমে আসা, ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান অব্যাহতভাবে হারানো, একইসঙ্গে শিল্পখাতে সরবরাহ সংকট, জ্বালানি সরবরাহ সংকট, আবাসিক ক্ষেত্রে গ্যাসের ও বিদ্যুতের সরবরাহ সংকট সবকিছু মিলিয়ে সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকের দিক থেকে উৎপাদন প্রবৃদ্ধি এবং মানুষের প্রকৃত আয় সবগুলোর ক্ষেত্রে একধরনের অবদমন দেখা যাচ্ছে। এরকম প্রেক্ষাপট শুধুমাত্র বাংলাদেশ কেন্দ্রিক তা কিন্তু নয়। এ ধরনের প্রেক্ষাপট অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও কম বেশি একই রকমের প্রক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

রিজার্ভের সংকটটি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রায় বড় আকারে আসছে। রিজার্ভের সংকটও অনেক দেশেই রয়েছে। একইসঙ্গে প্রতিটি দেশের মুদ্রামান অতিমাত্রায় শক্তিশালী হয়ে যাওয়ার কারণে দুর্বলতর হয়েছে। যেহেতু এই সংকটের বড় অংশই বহিঃস্থ উৎস থেকে উৎসারিত। এ ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে এই সংকট নিরসন সহজ নয়। বরং সরকারের অভ্যন্তরীণ ইন্সট্রুমেন্টগুলোকে কাজে লাগিয়ে সংকট সীমিত রাখার চেষ্টা করা যেতে পারে। সেদিক থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকারের বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ সাম্প্রতিক মাসগুলোতে সরকার নিয়েছে, এর ভেতরে জ্বালানি সংকটের বিপরীতে না গিয়ে জ্বালানির ব্যবহার কমানোর চেষ্টা করা হয়েছে, গ্যাসের সেশনগুলোর সময়কাল কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।

একইসঙ্গে ডলারের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ডলারের যেহেতু স্থিতিশীল পরিস্থিতি নেই বরং সংকট তৈরি হয়েছে। সেদিক থেকে সরকার ডলারের ব্যবহার কমানোর জন্য আমদানিকৃত যে সমস্ত বিলাসী পণ্য প্রায় একশর উপরে যেগুলোর উপরে বাড়তি রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ করেছেন। একইসঙ্গে সরকারি কর্মকর্তার বিদেশ ভ্রমণকে নিরুৎসাহিত করার বিষয়ে প্রথমে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল সেটি এখন সীমিত আকারে উন্মুক্ত করা হয়েছে।

ঢাকা প্রকাশ

১৩ অক্টোবর ২০২২

অর্থনৈতিক কাঠামোর সাশ্রয় আগামীর ভাবনা

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

সরকারি প্রকল্পগুলোকে তিন ধাপে ভাগ করা হয়েছে। বেশি গুরুত্বপূর্ণ, মধ্যমমানের গুরুত্বপূর্ণ, কম গুরুত্বপূর্ণ তিন ধাপে বাস্তবায়ন করে প্রকল্পের অর্থায়নকে সীমিত করা জরুরি। যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে, সেসব প্রকল্পের ক্ষেত্রে বৈদেশিক কারেন্সি ব্যবহার করে যেসমস্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে সেসব প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে গুণাগুণ বিচার করা কতটুকু যুক্তিসংগত অথবা কতটুকু প্রয়োজন রয়েছে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করার, সেটিও সরকার এখন বিবেচনা করছে। একই সঙ্গে ডলারের বিপরীতে টাকার মুদ্রামান স্থিতিশীল রাখার অংশ হিসেবে এসময়ের ভেতরে প্রায় ছাব্বিশবারের মতো কারেন্সি ডিভালু করা হয়েছে। টাকাকে বাজারের মানের সঙ্গে কিছুটা উঠানামার ভেতরে রাখার প্রচেষ্টা রয়েছে। যদিও সেটি পুরোপুরি এখনো করা যায়নি। বিদেশ থেকে ফরেন কারেন্সি আমদানিকে উৎসাহিত করার চেষ্টা রয়েছে।

এসমস্ত উদ্যোগগুলো স্বল্পমেয়াদে সুফল বয়ে আনবে এরকমই মনে করা হয়েছিল। এখন এসব উদ্যোগগুলো প্রকৃতপক্ষে কতটুকু কার্যকরী হচ্ছে, সেটি নিয়ে কিন্তু সন্দেহ তৈরি হচ্ছে। এমনকি অনেকগুলি উদ্যোগই হিতে বিপরীত হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। যা কিছু প্রত্যাশা করা হয়েছিল, সেটি না হয়ে ব্যয় বৃদ্ধির ঘটনা ঘটছে কি না। যেমন ডিজেলে সাশ্রয়ী করার উদ্যোগ হিসেবে বিদ্যুৎ কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে কি না। দেখা যাচ্ছে যে ডিজেলালিত জেনারেটর অন্যান্য যে সমস্ত মোটর আছে সেগুলি ব্যবহার সাম্প্রতিককালে বৃদ্ধি পেয়েছে। সেটিও এখানে একটি বিচার্য বিষয়।

মোট কথা হলো, এসব উদ্যোগগুলো সরকারের উচিত মূল্যায়ন করে দেখা। এই উদ্যোগগুলো কতটুকু কার্যকরী? এই উদ্যোগগুলো যদি কার্যকরী না হয় তাহলে বিকল্প কী ধরনের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে? মোট কথা একটি সাশ্রয়ী অর্থনীতির ব্যাপারটিকে সরকারের সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া দরকার। এখানে অনেক ক্ষেত্রেই হয়ত ব্যয় সংকোচনের দরকার হবে এবং এ মুহূর্তে উচ্চ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য থেকে সরে এসে মধ্যমমানের একটি প্রবৃদ্ধি সেটিকে মাথায় রেখে

ব্যয় সংকোচন করার চেষ্টা সেটিকে মাথায় রাখা দরকার হবে। পাশাপাশি মানুষের ভেতরে খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি নিরাপত্তা এবং দারিদ্র্যের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই সরকারের কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত। পাশাপাশি রিজার্ভ যেহেতু কমে আসছে ফলে সেই জায়গা থেকে বৈদেশিক মুদ্রার অংশ হিসেবে যে সমস্ত নেগোসিয়েশনগুলো চলছিল। বিশেষ করে আইএমএফ-এর সঙ্গে বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে ঋণের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ডলারের সংস্থান বৃদ্ধি করা দরকার। একইসঙ্গে বাজারে বিভিন্ন রকম অনিয়ম রয়েছে। এসময় ডলার কিনে জমিয়ে রাখছেন ফলে বাজারে ডলারের সংকট হচ্ছে। পাচারের সংখ্যা রয়েছে। যারা কিনা হুন্ডি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত অথবা অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত। এ ধরনের ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান যারা রয়েছে তাদের উপর নজরদারি বাড়ানো। এগুলি কিন্তু বর্তমান সময়ে দরকার রয়েছে।

মূল্যস্ফীতি যেহেতু বড় প্রকোপ কাজেই মূল্যস্ফীতিকে সীমিত রাখার স্বার্থে মূল্যস্ফীতি ব্যবস্থাপনার দিকে নজর দেওয়া দরকার। ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝাতে হলো, দেশের ভেতরে পণ্যসামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে রাখা। দরিদ্র মানুষ ও সীমিত আয়ের মানুষ যারা রয়েছে তাদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে সরকার যে এক কোটি পরিবারকে সহায়তা দান করছে সেটির সম্প্রসারণ করা যায় কি না।

সরকারি ও বেসরকারি খাতে কর্মরত যারা রয়েছেন, তাদের জন্য বিশেষ পরিস্থিতিতে বাড়তি ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থা করা দরকার। সরকার তার নিজস্ব অর্থ থেকে তা বিবেচনা করতে পারেন একটি নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের জন্য। বেসরকারি খাতকে অনুরোধ করতে পারেন, যেন নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের কথা মাথায় রেখে যদি তারা ইনক্রিমেন্ট তারা দিতে পারেন। সে ব্যাপারে অনুরোধ করতে পারেন চলমান মূল্যস্ফীতি অর্থাৎ বাজারের উর্ধ্বমূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি বিবেচনা করতে। এর পাশাপাশি উচিত হবে রপ্তানি বাজার যেন স্থিতিশীল থাকে। রপ্তানিমুখী কারখানাগুলোতে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সরবরাহ এগুলো যাতে স্থিতিশীল থাকে। এক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ হিসেবে গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া খুব জরুরি হয়ে পড়েছে।

মোট কথা সরকারের উচিত হবে এই মুহূর্তে চারটি বিষয়কে মাথায় রাখা। সামগ্রী অর্থনৈতিক কাঠামো আগামী দিনের জন্য মাথায় রাখতে হবে। বিশেষ করে যুদ্ধের পরিস্থিতি যেহেতু জটিল হচ্ছে এবং যেহেতু এটি দীর্ঘমেয়াদি হচ্ছে এর প্রভাব সহসা কমে আসবে সেটিও মনে হচ্ছে না। দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের যে অভিঘাতগুলো সেটিকে মাথায় রেখে অর্থনীতিকে সাজানো উচিত।

সেক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য গ্যাস উৎপাদনে গুরুত্ব দেওয়া, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ানো। অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থাপনায় যে সমস্ত ক্রটি রয়েছে, সেগুলি নিয়ন্ত্রণ করা। ডলারের বাজারকে স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে বৈদেশিক উৎস থেকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করা। টাকার মুদ্রামানকে স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব বাজারভিত্তিক একচেঞ্জ রেটের কাঠামোর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়ার দিকে সরকার তার নীতি কাঠামো বিবেচনা করতে পারে।

ঢাকা প্রকাশ

১৪ অক্টোবর ২০২২

অর্থনীতিতে ঝুঁকি বাড়ছেই

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

এই অর্থবছরের বাজেট ঘোষণার পর গেল সাড়ে তিন মাসে অর্থনীতির অবস্থা অনেক নাজুক হয়েছে। আগামীতে আরও দুর্বল হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। ফলে বাজেটের বিভিন্ন প্রাক্কলন অনেক ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সব প্রাক্কলন একমুখী ও নিম্নগামী। সাধারণ হিসাবে মন্দা এলে চাহিদা কমার কথা। যেহেতু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং অন্য কারণে সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হচ্ছে, তাই মূল্যস্ফীতি কমছে না। বিশ্ব অর্থনীতির প্রভাব সব দেশের ওপর আসছে। খেয়াল রাখতে হবে, একই রোগ একেকজনের ওপর ভিন্ন প্রভাব ফেলে। যার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো, সে পরিস্থিতিকে ভালোভাবে মোকাবিলা করতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনীতির দুর্বলতা অনেক জায়গায়। এখানে আর্থিক খাতে সংস্কারের ঘাটতি রয়েছে, সুশাসনের অভাব আছে। এক টাকার জিনিস ১০ টাকা দিয়ে কিনে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এখন নজরটা এসব জায়গাতেই বেশি করে দিতে হবে।

অর্থনীতির আলোচনায় এখন রাজনৈতিক দৃশ্যপটও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সাম্প্রতিক কিছু পরিস্থিতি এমনই বার্তা দিচ্ছে— দেশ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও সহিংসতার দিকে যাচ্ছে। রাজনৈতিক ঘটনা যাতে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত করতে না পারে, সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

বস্ত্র ও তৈরি পোশাকের মতো শিল্পে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সংকট চলছে। জ্বালানি সংকটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সংকট আরও বেশি। কারণ, তাদের বেশিরভাগেরই জেনারেটর দিয়ে কারখানা চালানোর সক্ষমতা নেই। সব মিলিয়ে শিল্পের উৎপাদনে নিম্নগতি দেখা দিয়েছে। কৃষির ক্ষেত্রেও চলছে নানা সংকট। গত আগস্টে ডিঙ্গেলের দাম ৫০ শতাংশ বাড়ানোর কারণে কৃষিতেও উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে গেছে। সব মিলিয়ে বাজারে জিনিসপত্রের দাম বাড়ার ঝুঁকিটাই এখন প্রধান হয়ে উঠেছে।

জ্বালানি শুধু গার্হস্থ্যের বিষয় নয়। শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে জ্বালানির প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। ফলে তেলের সঙ্গে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হলে তা হবে আত্মঘাতী। ড. আহসান মনসুর মনে করেন, পণ্য সরবরাহ পরিস্থিতি ঠিক করতে হলে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সরবরাহ ঠিক করতে হবে। বিদ্যুৎ দিতে না পারলে মন্দা ঠেকানো যাবে না।

কী করতে হবে?

এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে করণীয় হিসেবে এখন সময় হলো দেশে ও দেশের বাইরের বিবর্তন গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা এবং আগামী দুই থেকে তিন বছরের জন্য একটি 'নীতি প্যাকেজ' তৈরি ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন করা।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য এবার ভোগের দিকে নজর দিতে হবে। ধরে নিতে হবে, বিনিয়োগ কমবে। এ কারণে ভোগচালিত প্রবৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিয়ে কর্মসূচি নিতে হবে। উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং একই সঙ্গে অনেকের আয় কমে যাওয়ার কারণে সরকার নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ভোগ্যপণ্যের জোগান বাড়াতে হবে। যোগ্য মানুষের কাছে সরকারের সহায়তা ও ভর্তুকি মূল্যে পণ্য পৌঁছানোর জন্য বড় ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং সঠিক তথ্য-উপাত্ত লাগবে। যদি খাদ্য আমদানির প্রয়োজন হয়, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কম থাকলেও সেদিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

শুধু গরিব মানুষ নয়, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জন্যও সরকারের লক্ষ্য-নির্দিষ্ট খরচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথাগত বিপন্ন মানুষের সঙ্গে তাদেরও সুরক্ষা দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

শেষতক দেখতে হবে, সরকারের হাতে খরচযোগ্য সম্পদ কত আছে। কর আদায় গত অর্থবছরের চেয়ে এখন পর্যন্ত ভালো। এখানে আরও মনোযোগ দিতে হবে। বিদেশে শ্রমিক যাওয়া বাড়লেও রেমিট্যান্স সেভাবে আসছে না। এখানে হস্তক্ষেপ দরকার। বড় অঙ্কের বিদেশি সহায়তা পাইপলাইনে আছে, যা দ্রুত অবমুক্ত করতে হবে।

সমকাল

১৭ অক্টোবর ২০২২

সামষ্টিক অর্থনীতির সংস্কার জরুরি

মোস্তাফিজুর রহমান

গবেষণা সংস্থা সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, আইএমএফ-এর ঋণ পেতে যেসব শর্ত দেয়া হয়েছে তাতে অনুকূল এবং প্রতিকূল— দুই ধরনের বিষয়ই আছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, আমাদের অর্থনীতির স্বার্থে অনেকগুলো সংস্কার কর্মসূচি রয়েছে, যা এখনই করতে হবে। সাধারণভাবে বেশ কিছু সংস্কারের কথা বলছে আইএমএফ, যা আমাদের নিজেদেরই করা প্রয়োজন ছিল। গত রবিবার ভোরের কাগজকে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ব্যাংকিং খাতের সংস্কার, মুদ্রা বাজারের অস্থিরতা বা ডলার বাজার নিয়ন্ত্রণ, খেলাপি কমানো, ঋণের সুদহারের ক্যাপ তুলে নেয়া— এসব আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতি পরিচালনার জন্য নিজেদেরই করতে হবে।

তিনি বলেন, দেশের স্বার্থের অনুকূলে থাকে এমন শর্ত মানতে কোনো সমস্যা নেই। বিভিন্ন সময়ে আমরা রাজস্ব এবং ব্যাংকিং সংস্কার ও সরকারি ব্যয়ে সংস্কারের সুপারিশ করে আসছি। তবে শোনা যাচ্ছে, আইএমএফ সরকারের ভর্তুকি কমানোর বিষয়ে শর্ত দিতে পারে, আমাদের অর্থনীতির জন্য প্রতিকূলে যেতে পারে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সরকারকে সে বিষয়টি খুব গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে। কারণ এ মুহূর্তে ভর্তুকি কমালে সার্বিক অর্থনীতিতে চাপ তৈরি করবে।

তিনি বলেন, অতীতে আইএমএফ এ রকম অনেক শর্ত দিয়েছে, যা শতভাগ বাংলাদেশের অনুকূলে ছিল না। অনেক শর্তের কারণে বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত ঋণ নেয়া থেকে বিরত ছিল— এ রকম নজিরও আছে।

তিনি বলেন, আইএমএফ যেসব ক্ষেত্রে ভর্তুকি বন্ধের কথা বলছে, সেগুলো আমরা কোথায় দিব, আর কোথায় দিব না— তা তাদেরকে বোঝাতে হবে। আমরা কোনো কাজ করতে পারব

আর কোনো কাজ করতে পারব না— তা দলিল দস্তাবেজসহ তাদের সঙ্গে বসে কথা বলতে হবে। আমাদের অর্থনীতির স্বার্থে অনেকগুলো সংস্কার কর্মসূচি এখনই করতে হবে বলে মনে করেন এ গবেষক।

ভোরের কাগজ
৮ নভেম্বর ২০২২

তথ্য হালনাগাদ হলে নীতি নির্ধারণে সুবিধা

মোস্তাফিজুর রহমান

অনেক তথ্যের জন্য বিবিএসের ওপর নির্ভর করতে হয়। এর বড় কারণ হলো বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর প্রতিনিধিত্বমূলক তথ্য-উপাত্ত অন্য কেউ দেয় না। লেবার ফোর্স সার্ভে, ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিজ সার্ভে, জিডিপি, হাউজহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে এগুলো প্রতিনিধিত্বশীল তথ্য-উপাত্তের উৎস। এসব থাকে বিবিএসের কাছে।

আমাদের তাদের কাছেই যেতে হয়। আমরা সবসময় জাতীয়ভিত্তিক তথ্য দিতে পারি না। কারণ তা অনেক সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। তাই তাদের তথ্যের জন্য আমরা অপেক্ষা করি।

কিন্তু দেখা যায়, লেবার ফোর্স সার্ভে হয়েছে কয়েক বছর আগে, ২০১৭ সালে। খানা আয়-ব্যয় জরিপ হয়েছে ২০১৬ সালে। এতে সমস্যা হয়। হালনাগাদ তথ্য না পেলে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কী তা জানতে অসুবিধা হয়, এটা হচ্ছে প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, গবেষণা করতে গেলে বেশি অসুবিধা হয়। তৃতীয় কথা হচ্ছে, সবচেয়ে বড় সমস্যা সরকারের; তথ্য যদি হালনাগাদ না থাকে তাহলে তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।

আমি মনে করি, বিবিএসকে প্রযুক্তিগতভাবে, মানবসম্পদে বা অর্থায়ন করে শক্তিশালী করলে নীতিনির্ধারণকদের উপকার হবে; আর আমাদের মতো গবেষকদেরও কাজে লাগবে প্রতিষ্ঠানটি। আইএমএফ বলছে, ‘তোমরা কোয়ার্টারলি জিডিপি হিসাব করো।’ আমাদের দেশের বার্ষিক জিডিপির ফাইনাল তথ্য পেতেই অর্ধবছরের পাঁচ-ছয় মাস পার হয়ে যায়। প্রথমে একটি প্রাঙ্কলন করে, তারপর বাজেটের সময় একটি প্রভিশনাল রিপোর্ট দেয়। তারপর অক্টোবর-নভেম্বরে আমরা পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাই। এটা অবশ্যই, আমি বলব, আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থনৈতিক শুমারি ও হাউজহোল্ড বা খানা জরিপ অবশ্যই আমাদের বিশ্লেষণ ও গবেষণায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আমরা তখন অন্যান্য সূচকের ভিত্তিতে গবেষণা করি। অথবা অন্য

যেসব জরিপ আছে, সেগুলো হয়তো দেশভিত্তিক নয়, বা অন্য সংস্থা যদি কিছু করে সেগুলো ব্যবহার করি। সাধারণত আমরা এগুলোকে প্রক্সি ইন্ডিকেটর বলি। যেমন আমার যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথের হালনাগাদ তথ্য না থাকে তাহলে আমি দেখি টার্ম-লোন কত ডিসভার্স হয়েছে; বিদ্যুতের ব্যবহার কতটুকু হয়েছে। এগুলোর হালনাগাদ তথ্য পাওয়া যায়। তখন সেগুলো দিয়েই আমরা চেষ্টা করি আমাদের বিশ্লেষণ করতে। তবে বিবিএসের হালনাগাদ তথ্য থাকলে আমাদের তো উপকার হয়ই, সবচেয়ে উপকার হয় সরকারের নীতিনির্ধারকদের।

জিডিপি বিভিন্ন দেশে কোয়ার্টারলি হয়, আমাদেরও তা-ই করা দরকার। খানা জরিপ প্রতি বছরই করা উচিত। এতে করে সরকার জানতে পারবে দরিদ্রতা সূচক কোন দিকে যাচ্ছে, অসমতা কোন দিকে যাচ্ছে। লেবার ফোর্স সার্ভে কয়েক বছর পর না করে কোয়ার্টারলি করলে ভালো হবে। দেখা গেল, পর পর চারটি সার্ভে করে আর করা হলো না। ফলে হালনাগাদ তথ্য নেই। আরেকটি ব্যাপার হলো, দরিদ্রতার যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে সেই ডাটা ব্যবহার করার মতো নয়। এসব জায়গায় অবশ্যই আমাদের সংহত ভিত্তি তৈরি করার দরকার আছে।

দেশ রূপান্তর

৮ নভেম্বর ২০২২

স্বপ্রণোদিত হয়েই সংস্কার করা উচিত

ফাহিমদা খাতুন

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে টান পড়েছে এবং ক্রমান্বয়ে তা নিচের দিকে যাচ্ছে। এটি আসলে ভালো অবস্থা নয়, কান্ডিত নয়। এ অবস্থার কারণ, রপ্তানি আয় যতটুকু বাড়ছে, আমদানি ব্যয় তার চেয়ে অনেক বেশি হারে বাড়ছে। এর ওপর রেমিট্যান্স প্রবাহ নেতিবাচক। এর ফলে চলতি হিসাবে বড় ঘাটতি দেখা দিয়েছে, যা আমাদের জন্য উদ্বেগজনক বিষয়। আমাদের শিল্প উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল, জ্বালানি তেল, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য বিশ্ববাজার থেকে আমদানি করতে হয়। এ ছাড়া অন্যান্য ভোগ্যপণ্য ও বিলাসী পণ্য তো রয়েছেই। যে হারে আমদানি ব্যয় বাড়ছে, তাতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অবশ্যই একটা স্বস্তিকর অবস্থায় থাকা খুব প্রয়োজন। কিন্তু আমরা দেখলাম, গত এক বছরের মধ্যে রিজার্ভ খুব দ্রুত নেমে গেছে। সে পরিপ্রেক্ষিতেই সরকার আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছে ঋণ চেয়েছে। আগে থেকেই এ ঋণ চাওয়া হয়েছে, যা একটা ভালো দিক। সরকার বুঝতে পেরেছে, ঘাটতিটা আরও বেড়ে যেতে পারে। শ্রীলঙ্কা সংকটে পড়ে যাওয়ার পর আইএমএফ-এর কাছে ধরনা দিয়েছে। তাদের অর্থ পেতে অনেক সময় লেগেছে। আমাদের অবস্থা শ্রীলঙ্কার মতো নয়। তার পরও চিন্তা বা উদ্বেগের কিছু দিক তৈরি হয়েছে। বৈদেশিক খাত অনেকটাই বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত। কাজেই এখানে আমাদের প্রস্তুতি নেওয়ার বিষয় রয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, আইএমএফ কিছু শর্তসাপেক্ষে ঋণ দিয়ে থাকে। বিভিন্ন দেশ যখন তাদের কাছে ঋণের জন্য যায়, তখন তারা কিছু বিষয় দেখে থাকে। আইএমএফ নিশ্চিত করতে চায়, ঋণগ্রহীতা দেশ তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উন্নতি করবে এবং তারা ফেরত দিতে পারবে। এ জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন পড়ে। বাংলাদেশ বা যে কোনো স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, সুশাসন এবং অনুশাসন সবসময় ভালো থাকে, তা নয়। তাই তাদের ঋণে শর্ত থাকে। বাংলাদেশ আগেও যখন আইএমএফ-এর ঋণ নিয়েছে, তখনও শর্ত মেনেই ঋণ নিয়েছে। শর্তের মধ্যে মোটাদাগে কী কী থাকে, আমরা সবাই জানি। মূলত তারা কিছু সংস্কারের কথা বলে। অর্থনীতি সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। এবার তারা বলেছে, বাংলাদেশের জন্য আর্থিক খাত, রাজস্ব খাত, জ্বালানি খাত ইত্যাদিতে এক ধরনের সংস্কার আনতে হবে। সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা

রক্ষা করতে হবে। অর্থনীতিতে যে কোনো নাজুক অবস্থা মোকাবিলা করতে এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। উন্নয়ন যেন অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়, পরিবেশবান্ধব হয়- সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। আর্থিক খাত, বিশেষ করে ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ কমানো এবং বিভিন্ন দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতার কথা বলেছে তারা। এ ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় বলা হয়েছে, তা হচ্ছে মূল্যস্ফীতি কমানো এবং আধুনিক মুদ্রানীতি কাঠামো। এটি বলতে গিয়ে তারা সুশাসন নিশ্চিত করা, সুদের হারের সীমা তুলে দেওয়া এবং বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছে।

তারা বলেছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারা যাতে বজায় থাকে এবং সম্ভাবনা যাতে আরও এগিয়ে নেওয়া যায়, সে জন্য সহায়ক বাণিজ্য খাত তৈরি করতে হবে। বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের পদক্ষেপ নিতে হবে। আর্থিক খাত শক্তিশালী ও বৈচিত্র্যময় করা দরকার। মানবসম্পদ উন্নয়নে পদক্ষেপ নিতে হবে। সুশাসনের কথা তো তারা বারবারই বলেছে। এগুলোর মাধ্যমে যাতে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়- সে কথা তারা বলেছে।

আইএমএফ তিনটি উইন্ডোতে ঋণ দিচ্ছে। এক্সটেন্ডেড ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি (ইসিএফ), এক্সটেন্ডেড ফান্ড ফ্যাসিলিটি (ইইএফ) এবং রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি ফ্যাসিলিটি (আরএসএফ)। আরএসএফ নতুন একটা উইন্ডো, যা জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত। এতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ব্যবস্থা শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে এমন একটা অবস্থা থাকতে হবে, যাতে জলবায়ু সম্পর্কিত অনেক বিনিয়োগ হয়। জলবায়ু বা পরিবেশবান্ধব শিল্প-কারখানা করতে হবে। জীবাশ্ম জ্বালানি কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বাড়াতে হবে। শিল্প-কারখানা থেকে দূষণ বন্ধ করতে হবে।

গুরুতে আমি রাজস্ব খাতের কথা বলেছিলাম। কর-জিডিপির অনুপাত আমাদের ৯ শতাংশের কম। এত কম কর-জিডিপির অনুপাত থাকলে আমাদের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে কষ্ট হবে। এ ছাড়া দরিদ্র মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমস্যা হবে। এ জন্য আমাদের রাজস্ব বাড়াতে হবে। কিন্তু আমাদের তো সে অবস্থা নেই। সেই শক্তি কিন্তু আমরা এখনও অর্জন করতে পারিনি। সে জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বাড়ানো দরকার বলে আইএমএফ মনে করছে। আইএমএফ এসব শর্ত দিচ্ছে তাদের ম্যান্ডেটের অংশ হিসেবে। কিন্তু এগুলো তো আমাদের নিজেদেরই করার কথা। বাংলাদেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং অর্থনৈতিক ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করতে সংস্কার কার্যক্রম তো একটা চলমান বিষয় হওয়া উচিত। দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, এর আগে আমাদের যেসব প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার হয়েছে, সেগুলো দাতা সংস্থাগুলোর ঋণের শর্তের কারণে হয়েছে। আমরা স্বপ্রণোদিত হয়ে সেগুলো করতে পারিনি। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও যদি আমরা কারও শর্তের কারণে সংস্কার করি, তাহলে তো আমাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার যে সক্ষমতা রয়েছে, তা বোঝা যাবে না। আমরা কেন দাতা সংস্থার অপেক্ষায় থাকব? তাদের টাকা নেব, তার বিনিময়ে সংস্কার করব- এটো তো শোভনীয় নয়। আমরা যদি টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন করতে চাই, তাহলে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং সুশাসন নিশ্চিত করার কাজ নিজেদেরই করতে হবে। সেটা দুঃখজনকভাবে হয়নি। এখন মনে করা হচ্ছে, আইএমএফ ঋণের জন্য যেসব শর্ত দিয়েছে,

সেগুলো করতেই হবে। তাদের ঋণের অর্থ একবারে আসবে না। চার বছর ধরে আসবে সাতটা কিস্তিতে। একেকটা কিস্তির পর কোন বিষয়ে কী অর্জিত হলো দেখে পরের কিস্তি ছাড় করা হবে।

ভতুর্কির বিষয়ে আইএমএফ-এর বিবৃতিতে স্পষ্ট করা হয়নি। ভতুর্কি সার্বিকভাবে ভালো নয়। এতে সম্পদের অপচয় হয়। তবে আমাদের কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা খাতের জন্য কিছুদিন পর্যন্ত প্রয়োজন অনুসারে ভতুর্কি দিতেই হবে। এ ক্ষেত্রে ভতুর্কি বন্ধ করা ঠিক হবে না।

সব মিলিয়ে আশা করি, এখন যে ঋণটা দেওয়া হবে, তার মাধ্যমে অর্থনীতিতে আশ্বস্ত হওয়ার মতো একটা অবস্থা তৈরি হবে। ঋণের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে পারব— এটাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। সবশেষে আবারও বলব, বাংলাদেশকে নিজে থেকে স্বপ্রণোদিত হয়ে সংস্কার কর্মসূচি নেওয়া ও বাস্তবায়ন করা দরকার।

সমকাল

১০ নভেম্বর ২০২২

স্বস্তির খবর, সংস্কার নিজেদের গরজেই করতে হবে

মোস্তাফিজুর রহমান

আইএমএফ বাংলাদেশকে ঋণ দিতে সম্মত হয়েছে—এটা স্বস্তির খবর। অর্থের অঙ্কে এই ঋণ তেমন বড় কিছু নয়। এই অর্থ দিয়ে আমাদের সব সমস্যা মিটেবে না। এমনকি সব অর্থও আমরা একসঙ্গে পাব না, তারপরও বলব, এই ঋণ বাংলাদেশের লেনদেনের ভারসাম্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এ ছাড়া আইএমএফ-এর ঋণ দেওয়ার বিষয়ে সম্মত হওয়ার খবরের একধরনের বার্তা আছে। এটি বহুপক্ষীয় অন্য সংস্থাগুলোকে আশ্বস্ত করবে।

প্রথম কিস্তিতে বাংলাদেশ ৪৫ কোটি ডলার পাবে, এটি আমাদের রিজার্ভের সাপেক্ষে তেমন কিছু নয়। আইএমএফ-এর হিসাবে, আমাদের যে রিজার্ভ, তার সাপেক্ষেও এটি বড় কিছু নয়। কিন্তু এতে বিশ্বব্যাংক ও এডিবি'র মতো প্রতিষ্ঠান আমাদের বাজেট সহায়তা দিতে উৎসাহিত হবে। বাজেট সহায়তাও কিন্তু রিজার্ভে যোগ হয়, সেদিক থেকে এর গুরুত্ব আছে।

ঋণের সঙ্গে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, ব্যাংকিং খাতের সংস্কার, এনবিআরের সক্ষমতা বৃদ্ধি, জ্বালানি খাতের ক্যাপাসিটি চার্জ—এসব নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। সুশাসনের অভাবের কথাও অনেক বছর ধরে আলোচনা হচ্ছে। শুধু রিজার্ভ নয়, ব্যয় করার মতো অর্থের অভাব আছে আমাদের।

সুতরাং আমরা সংস্কার করে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারলে আমাদেরই লাভ। এসব করা গেলে আমাদের খেলাপি ঋণ কমবে বা রাজস্ব-জিডিপি'র অনুপাত বৃদ্ধি পাবে। আমি মনে করি, আইএমএফ-এর সঙ্গে আমাদের ঋণ আলোচনায় যেসব বিষয় উঠে এসেছে, সেগুলো আমাদের নিজেদের গরজেই করা উচিত। সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির জন্য এটি জরুরি।

আইএমএফ-এর আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল মুদ্রার বিনিময় হার বাজারমুখী করা। এটা নতুন কিছু নয়, দেশের অর্থনীতিবিদেরা অনেক দিন ধরেই এসব বলে আসছেন। এসব কিছু

শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসা জরুরি। আইএমএফ ভর্তুকি হ্রাসের কথা বলেছে। সেটা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক, তা বলব না। তবে কোন খাতে আমরা সমন্বয় করব, তা আমাদের নির্ধারণ করতে হবে। আমাদের খাদ্যনিরাপত্তা যেন হুমকির মুখে না পড়ে, তা বিবেচনায় নিয়ে আমাদের করতে হবে।

আরেকটি বিষয় হলো, আইএমএফ-এর এই ঋণের সুদহার ২ শতাংশের ওপরে। এটা যে একেবারে কম তা নয়, তবে বাণিজ্যিক ঋণের চেয়ে কম, যার হার ৪-৫ শতাংশ। এই ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে যেন আমরা অসুবিধার সম্মুখীন না হই, তা দেখতে হবে।

অর্থ কিস্তিতে আসবে। প্রথম কিস্তির পর দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ যখন আসবে, তখন কিস্তি মূল্যায়ন হবে, আমরা কতটা সংস্কার করতে পেরেছি। তার ভিত্তিতে ঋণের দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ আসবে। সুতরাং আমাদের অর্থনীতির দুর্বলতা, সুশাসনের অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা—এসব সার্বক্ষণিক আমাদের ভাবনায় থাকতে হবে।

মহামারির একটা ধাক্কা আমরা মোকাবিলা করেছি। তা শেষ হতে না হতে শুরু হলো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। সেই সঙ্গে যেকোনো সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসতে পারে। ফলে আমরা যদি অভ্যন্তরীণভাবে এসব মোকাবিলা করার মতো সক্ষমতা অর্জন করতে পারি, তাহলে ঝুঁকি কমে। এটা হলো অর্থনীতির প্রতিরক্ষণ সক্ষমতা। সে জন্য সংস্কার দরকার। তবে নিজেদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করে তা করতে হবে।

প্রথম আলো

১০ নভেম্বর ২০২২

সরকারের দৃঢ়চিত্ত মনোভাব দরকার

মোস্তাফিজুর রহমান

সামষ্টিক অর্থনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জ আমরা এখন মোকাবিলা করছি, সেই কারণগুলোর একটি বৈশ্বিক। একই সঙ্গে ব্যাংকিং খাতের বিশৃঙ্খলা ও সুশাসনের অভাবও এর জন্য দায়ী। ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ, অবলোপন—এমন নানা সুবিধা দেওয়ার পরও খেলাপি ঋণ বেড়েছে। এসব সুবিধা না থাকলে প্রকৃতপক্ষে খেলাপি ঋণ আরও বাড়ত।

অনেকে ইচ্ছা করেই ঋণখেলাপি হন। অর্থ পাচারও হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে শূন্যসহিষ্ণুতা দেখা যায় না। সমস্যা হচ্ছে এই বিপুল অঙ্কের খেলাপি ঋণের বিপরীতে ব্যাংকগুলোকে প্রভিশনিং করে রাখতে হচ্ছে। এতে ব্যাংকগুলোর ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। ব্যাংকের সুদহার, বিনিয়োগ—সবকিছুর ওপর এগুলোর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। খেলাপি ঋণের অর্থ অর্থনীতিতে এলে রিজার্ভ থেকে শুরু করে বৈদেশিক লেনদেন—সবকিছুতেই ইতিবাচক প্রভাব পড়ত।

আমি মনে করি, সরকারের আলোকিত স্বার্থপরতা থেকে ব্যাংকিং খাতের সুশাসন ও সংস্কারে নজর দেওয়া উচিত, তা না হওয়ায় সরকারই বিপদে পড়েছে। সেই সঙ্গে আইএমএফ ঋণের শর্ত হিসেবে আর্থিক খাতে সংস্কারের কথা বলেছে। বিষয়টি শুধু আইএমএফের শর্ত নয়, বরং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন থেকে আমাদের এসব করা উচিত। নিজেদের অনুধাবন থেকে রাজনৈতিক সদিচ্ছা নিয়ে সংস্কারে মনোযোগী হতে হবে।

এই বাস্তবতায় আমরা সাময়িক সময়ের জন্য ব্যাংকিং কমিশনের কথা বলেছি। বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এই কমিশন করা যেতে পারে। কিন্তু সে বিষয়ে তেমন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। পরিণতিতে অর্থনীতি ক্যানসারের মতো রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তাই শূন্যসহিষ্ণুতা দেখানোর সময় এসেছে। কাজটা সহজ হবে না। বিভিন্ন কায়মি গোষ্ঠী বাদ সাধবে। সে জন্য সরকারের দৃঢ়চিত্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও তার প্রয়োগ প্রয়োজন।

প্রথম আলো

১৫ নভেম্বর ২০২২

আর্থিক খাতে সংস্কার আমাদের গরজেই করতে হবে

মোস্তাফিজুর রহমান

সমকাল: শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ থেকে ৪৫০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। শক্তিশালী অর্থনীতি হিসেবে পরিচিতি পাওয়া একটি দেশের হঠাৎ আইএমএফের ঋণ প্রয়োজন হচ্ছে কেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ এবারই প্রথম আইএমএফ থেকে ঋণ নিচ্ছে না। এর আগেও বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন সময়ে ঋণ নিয়েছে। সম্ভবত এর আগে ১২ বার এ ঋণ নেওয়া হয়েছিল। আমি মনে করি, এবার ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হওয়ার দুটো দিক আছে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা উচ্চমূল্যের দিকে যাচ্ছি। তার চাপ এসে রিজার্ভের ওপর পড়েছে। এ জন্যই গত বছর আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি ৩০ বিলিয়ন ডলার দেখতে পেয়েছি। রেমিট্যান্স দিয়ে এসব ক্ষেত্রে আমরা চলতি বছরের ঘাটতি মেটাতে পারতাম। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সেখানেও লক্ষ্য পূরণ হচ্ছে না। রেমিট্যান্স কমে গেছে। এসবের ফলে অর্থনীতিতে সামগ্রিকভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। আমাদের রিজার্ভ কমে গেছে। দ্বিতীয়ত, একই সঙ্গে আর্থিক খাত বা প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বেশকিছু সংস্কার দরকার ছিল। এসব সময়মতো না করায় সমস্যা আরও গভীর হয়েছে।

সমকাল: যেমন?

মোস্তাফিজুর রহমান: কয়েকটি দিকের কথা বলি। আমাদের যে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার, সেখানে এখন টাকার অবমূল্যায়ন দেখতে পাচ্ছি। এর ফলে আমাদের রপ্তানিকারকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আমাদের রেমিট্যান্স যাঁরা নিয়ে আসছিলেন, তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এ ছাড়া বৈধ চ্যানেল, হুন্ডি, সরকারি অন্যান্য ব্যবস্থা- এসবের সঙ্গে মুদ্রার মূল্যগত যে ব্যবধান, এসব মিলিয়েও ইনফরমাল পথে অনেক টাকা চলে গেছে। এ ছাড়া আন্ডার ইনভয়েসিং, ওভার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে দেশ থেকে বিপুল টাকা বিদেশে চলে গেছে। এসব দিকে নজরদারি

বাড়াতে হবে। আমাদের যে দুর্নীতি দমন কমিশন রয়েছে; বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টেলিজেন্স ইউনিট রয়েছে; এগুলোর ক্ষমতা ও তদারকি আরও বাড়াতে হবে। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ হয়নি, এমনও ঘটেছে। এভাবে প্রকল্পে ব্যয় বেড়েছে।

সমকাল: এসব বিষয়ে অনেক বার বিভিন্ন পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা কিন্তু দেওয়া হয়েছিল।

মোস্তাফিজুর রহমান: আইএমএফ সে সতর্কবার্তা দিয়েছিল, আমরা নিইনি। আমরা ভেবেছিলাম, রিজার্ভ ৪০ বিলিয়ন ডলারের ওপরেই আছে। প্রকৃতপক্ষে রিজার্ভ থেকে ৮ বিলিয়ন ডলার খরচের বাইরে থাকবে। সেটি আলাদা করে হিসাব করা হয়নি।

সমকাল: আইএমএফের ঋণ কি আমাদের স্বস্তি দেবে?

মোস্তাফিজুর রহমান: আইএমএফ বাংলাদেশকে ঋণ দিতে সম্মত হয়েছে। এটা অবশ্যই স্বস্তির খবর। তবে অর্থের অঙ্কে এই ঋণ তেমন বড় কিছু নয়। এই ঋণের অর্থ দিয়ে আমাদের সব সমস্যা তো মিটবে না। আবার সব অর্থও আমরা একসঙ্গে পাব না। প্রথম কিস্তিতে বাংলাদেশ ৪৫ কোটি ডলার পাবে। এটি আমাদের রিজার্ভের সাপেক্ষে তেমন কিছু নয়। তারপরও এই ঋণ বাংলাদেশে লেনদেনের ভারসাম্যে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। তবে এই ঋণের যেটি গুরুত্ব আমার কাছে মনে হয়েছে, আইএমএফের ঋণ দেওয়ার বিষয়ে সম্মত হওয়ার খবরে এক ধরনের বার্তা আছে। এটি বহুপক্ষীয় অন্যান্য সংস্থা যেমন বিশ্বব্যাংক, এডিভিসহ বিভিন্ন সংস্থাকে আশ্বস্ত করবে। তাদের বাজেট সহায়তা দিতে উৎসাহিত করবে। বাজেট সহায়তাও কিন্তু রিজার্ভে যোগ হয়। সেদিক থেকে এর গুরুত্ব আছে।

সমকাল: বাজেট সহায়তা পেলেই কি সমস্যার সমাধান হবে?

মোস্তাফিজুর রহমান: ঋণের সঙ্গে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, ব্যাংকিং খাতের সংস্কার, এনবিআরের সক্ষমতা বৃদ্ধি, জ্বালানি খাতের ক্যাপাসিটি চার্জ- এসব নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে। সুশাসনের অভাবের কথাও অনেক বছর ধরে আলোচিত। শুধু রিজার্ভ নয়; ব্যয় করার মতো অর্থেরও অভাব আছে আমাদের। সংস্কারগুলো নিজেদেরই আগে থেকে করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা এত দিন করিনি। এখন আইএমএফ বলার পর যদি করা হয়, তাহলে এটাও ভালো দিক। আমরা সংস্কার করে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারলে আমাদেরই লাভ। আর্থিক খাতে সংস্কার আমাদের গরজেই করতে হবে। এসব করা গেলে আমাদের খেলাপি ঋণ কমবে বা রাজস্ব-জিডিপির অনুপাত বৃদ্ধি পাবে।

সমকাল: আইএমএফের ঋণের শর্ত নিয়ে নানা আলোচনা আছে। সহজ নাকি কঠিন- এসব নিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য শোনা গেছে। আপনি কীভাবে দেখছেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: কোনো প্রতিষ্ঠান ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত দেবে- এটাই স্বাভাবিক। সেখানে আইএমএফের শর্ত তো থাকবেই। আইএমএফের আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল মুদ্রার বিনিময় হার বাজারমুখী করা। এটি নতুন কিছু নয়। দেশের অর্থনীতিবিদরা অনেক দিন ধরেই এ কথা বলে আসছেন। আইএমএফ ভড়কি হ্রাসের কথা বলেছে। তবে কোন খাতে সমন্বয় করব, তা আমাদেরই নির্ধারণ করতে হবে। আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা যেন হুমকির মুখে না পড়ে, তা বিবেচনায় নিতে হবে। আরেকটি বিষয় হলো, আইএমএফের এই ঋণের সুদহার ২ শতাংশের ওপরে। এটা যে একেবারে কম, তা নয়। তবে বাণিজ্যিক ঋণের চেয়ে কম, যার হার ৪-৫ শতাংশ। এই ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে যেন আমরা অসুবিধার সম্মুখীন না হই, তা দেখতে হবে। এই ঋণের অর্থ কিস্তিতে আসবে। প্রথম কিস্তি আসার পর মূল্যায়ন হবে, আমরা কতটা সংস্কার করতে পেরেছি। তার ভিত্তিতে ঋণের দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ আসবে।

সমকাল: আর্থিক সংস্কার কেন অপরিহার্য হয়ে উঠল?

মোস্তাফিজুর রহমান: করোনা মহামারির ধাক্কা আমরা মোকাবিলা করেছি। তা শেষ হতে না হতে শুরু হলো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এসবের বাইরে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পরিশোধ না করা, খেলাপি হয়ে যাওয়া, মোটা দাগে দুর্নীতি, অর্থ পাচার তো রয়েছেই।

সমকাল: বিশেষত খেলাপি ঋণের মাত্রা নিয়ে অনেক দিন ধরেই সমালোচনা রয়েছে।

মোস্তাফিজুর রহমান: এ দেশে বৈধ পথে যাঁরা আয় করেন তাঁদের জন্য তেমন কোনো পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকে না, যেমনটা থাকে কালো টাকার মালিকদের ক্ষেত্রে। ঋণের ক্ষেত্রেও এ ধরনের পরিস্থিতি রয়েছে। ফলে অনেকে ইচ্ছা করেই ঋণখেলাপি হন। এসব ক্ষেত্রে শূন্য সহিষ্ণুতা দেখা যায় না। সমস্যা হচ্ছে, এই বিপুল অঙ্কের খেলাপি ঋণের বিপরীতে ব্যাংকগুলোকে প্রতিশ্রুতি করে রাখতে হচ্ছে। এতে আবার ব্যাংকগুলোর ব্যয়ও বেড়ে যাচ্ছে। ব্যাংকের সুদহার, বিনিয়োগ- সবকিছুর ওপর এগুলোর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। খেলাপি ঋণের অর্থ অর্থনীতিতে এলে রিজার্ভ থেকে শুরু করে বৈদেশিক লেনদেন- সবকিছুতেই ইতিবাচক প্রভাব পড়ত।

সমকাল: রূপণ অর্থনীতিকে সবল করতে কী করা উচিত?

মোস্তাফিজুর রহমান: আমি মনে করি, ব্যাংকিং খাতের সামগ্রিক সুশাসন ও সংস্কারে নজর দেওয়া উচিত। তা না হওয়ায় সরকারই বিপদে পড়েছে। আইএমএফের শর্তের কারণে নয়, বরং সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন থেকেই আমাদের আর্থিক খাতে সংস্কার করা উচিত। আর রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া আর্থিক খাতে বড় ধরনের সংস্কার আশা করা যায় না। বর্তমান বাস্তবতায় আমরা সাময়িক সময়ের জন্য ব্যাংকিং কমিশনের কথা বলেছি। কিন্তু সে বিষয়ে তেমন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এখন যে পরিস্থিতি, তাতে বলা যায়, দেশের অর্থনীতি

ক্যাসারের মতো রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এখন অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে তুলতে শূন্য সহিষ্ণুতা দেখাতে হবে। তবে কাজটা সহজ না। বিভিন্ন কায়মি গোষ্ঠী বাদ সাধবে। সে জন্যই বলেছি, সরকারকে দৃঢ় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার প্রয়োগ করতে হবে।

সমকাল: আপনাকে ধন্যবাদ।

মোস্তাফিজুর রহমান: সমকালকেও ধন্যবাদ জানাই।

সমকাল

১৮ নভেম্বর ২০২২

ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

দেশে আয় কমে যাওয়ার পাশাপাশি ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। ফলে গত কয়েক বছরে মানুষের জীবনমানের যে উন্নতি হয়েছিল, তার ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। দেশে এখন একধরনের ভয় বা ভীতির সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। কথা বলতে না-পারা অথবা কথা বলার ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার এবং রাজনীতিসহ সব ক্ষেত্রে এ কথা সত্য। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেও এ সংস্কৃতি সংক্রমিত হচ্ছে। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহি কমে যাচ্ছে, যা অত্যন্ত আশঙ্কার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশে ব্যাপক উন্নয়নের কথা বলা হলেও এ উন্নয়নের নিচে চোরাবালি রয়েছে।

তৃণমূলের মানুষের কাছ থেকে ছয়টি বার্তা পাওয়া গেছে। প্রথমত, দেশে যুবসমাজের শোভন কর্মসংস্থানের ঘাটতি। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। তাতে সীমিত আয়ের মধ্যবিত্তদের জন্য সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করেছে। দ্বিতীয়ত, দেশে বিভিন্ন কাজে নারীর সম্পৃক্ততা বাড়লেও তাদের প্রতি সহিংসতা ও তাদের অধিকারহরণ অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়েছে। এ ক্ষেত্রে আইনের শাসনের ব্যাপক ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। তৃতীয়ত, পরিবেশ বিপর্যয় একটি জাতীয় সমস্যায় রূপ নিয়েছে।

সব জায়গায় কোনো না কোনো ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা যাচ্ছে। চতুর্থত, সরকারি সেবার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মান কমেছে। এসব সেবার মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কর্মসূচি অন্যতম। পঞ্চমত, বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যে মূল্যবোধ ছিল, সেখানে বড় ধরনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। একই সঙ্গে দুর্বল জনগোষ্ঠী নানাভাবে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। আর তৃণমূলের মানুষের ষষ্ঠ বার্তাটি হচ্ছে, সব জায়গায় একটি ভয় বা ভীতির সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। ভয়ের সংস্কৃতির কারণে উন্নয়নের সুফল সবার কাছে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন পর্যায়ে জবাবদিহির ঘাটতি তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি সরকারি ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়েছে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণি ক্রমাগত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে নৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক হ্রস্বের সৃষ্টি হচ্ছে। একসময় মধ্যবিত্তরা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতি সহমর্মী ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তারা নিজেরাও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

তৃণমূলের মানুষের সঙ্গে কথা বলে খাতভিত্তিক কিছু বিষয় সামনে এসেছে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা অন্যতম। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তি ও সাক্ষরতার হার বেড়েছে। কিন্তু শিক্ষার গুণগত মানের বড় ধরনের পতন হয়েছে। ফলে এ ধরনের শিক্ষা কর্মসংস্থানে কোনো কাজে আসছে না। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ভবন থাকলেও চিকিৎসক নেই, আবার চিকিৎসক থাকলে ওষুধ নেই। সুপেয় পানি ও স্যানিটেশনের ক্ষেত্রেও বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। আয়বৈষম্যের কারণে মাথাপিছু ও সামগ্রিক বরাদ্দ খুবই কম। গ্রামগঞ্জে রাস্তাঘাটের উন্নতি হলেও নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। আবার নারীর সাইবার নিরাপত্তাঝুঁকিও বাড়ছে।

দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি দুর্বল হয়ে যাবার ফলে আগে নৈতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে মূল্যবোধ তৈরির যে জায়গায় মধ্যবিত্তরা ছিল, এখন আর সেখানে নেই। এটি বড় ধরনের সামাজিক ঘাটতি।

প্রথম আলো

২ ডিসেম্বর ২০২২

দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে

মোস্তাফিজুর রহমান

বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘ব্যাংকে টাকা নেই’-বলে যে গুজব ছড়িয়েছে তা ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন গবেষণা সংস্থা সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান। গতকাল ভোরের কাগজকে তিনি বলেন, ব্যাংকগুলো সঙ্কটে পড়লে বাংলাদেশ ব্যাংক অবশ্যই সহযোগিতা করবে। তাই কোনো ব্যাংক দেউলিয়া হলেও চিন্তার কিছু নেই। বিভ্রান্তিকর এসব তথ্য শুধু ব্যাংক খাত নয়, পুরো দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকারক।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরে এসেছে এবং তারা একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। যেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। তারা দায়িত্ব নিয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলেছে যে, ব্যাংক টাকা নেই, ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাবে—এসব গুজব, মিথ্যা এবং অপপ্রচার। সুতরাং এ নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ হওয়ার কিছু নেই। তবে সাধারণ মানুষের ভীতি দূর করতে, তাদের দোরগোড়ায় এ তথ্য পৌঁছে দিতে বিভিন্ন মাধ্যমে আরো বেশি প্রচার করা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, মধ্যমেয়াদি ব্যবস্থার মধ্যে, যারা ইচ্ছেকৃত ঋণখেলাপি, তাদের বিরুদ্ধে নজরদারি, খবরদারি বাড়াতে হবে। একইসঙ্গে এসব দুষ্টকারীদের বিরুদ্ধে যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় তবে মানুষের মধ্যে দ্রুত আস্থা ফিরে আসবে।

তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি ব্যাংকের কিছু ঘটনা সামনে আসতে মানুষের মধ্যে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। তাই এখন দৃশ্যমান কিছু পদক্ষেপ দেখালে বাংলাদেশ ব্যাংকের এ অভয়বাণী মানুষের কাছে আরো শক্তিশালীভাবে গ্রহণযোগ্য হবে।

ভোরের কাগজ

৬ ডিসেম্বর ২০২২

চাই সমঝোতাপূর্ণ রাজনীতি

মোস্তাফিজুর রহমান

গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান মনে করেন, শাসনের সঙ্গে সুশাসন নতুন বছরের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। গতকাল সোমবার ভোরের কাগজকে তিনি বলেন, সামগ্রিকভাবে সুশাসন বাড়াই হচ্ছে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ এ বছর কিছুটা রাজনৈতিক চাপও থাকবে। তবে তা যেন অর্থনীতির উপরে চাপ সৃষ্টি না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এজন্য সমঝোতাপূর্ণ রাজনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এ বছর। এ অর্থনীতিবিদ বলেন, মূল্যস্ফীতি সামাল দিয়ে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বজায় রাখাও চ্যালেঞ্জ। এটা করতে হলে বিনিয়োগকে চাঙা করে কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ব্যাপ্তি-প্রাপ্তি বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, রিজার্ভের উপরে যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে, তা কিছুটা কমবে বলে মনে হয়। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য কমতে শুরু করেছে। তবে অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারের এ সুফল সাধারণ মানুষকে দিতে হবে। এজন্য আর্থিক নীতি এবং রাজস্ব নীতি সমন্বয় করে মানুষের উপরে যে চাপ তা কমাতে হবে।

ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমদানি কমানোর কারণে এক ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। কিন্তু বৈদেশিক বিনিময়ে যে ভারসাম্য সেটা কিছুটা ইমপ্রুভ করবে বলে মনে হচ্ছে। আগামী বছরে কিছুটা নিম্নপর্যায়ের ভারসাম্যের দিকেই থাকতে হবে বলে মনে হয়। কারণ আমদানি, মূল্যস্ফীতিসহ অর্থনীতিতে যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে তাতে মনে হচ্ছে অর্থনীতি নতুন একটি ভারসাম্যে আসবে, ঝুঁকিও হয়তো কিছুটা কমবে। কিন্তু প্রবৃদ্ধির উপরে এর একটি বড় প্রভাব পড়বে।

এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কোন বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দিতে? এ প্রশ্নের জবাবে এই অর্থনীতিবিদ বলেন, মূল্যস্ফীতি ব্যবস্থাপনা করা, আমদানি পর্যায় থেকে ভোক্তা পর্যায়ের এবং উৎপাদক পর্যায় থেকে ভোক্তা পর্যায়ের বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নত করা, সামাজিক সুরক্ষা

শক্তিশালী করা, সব বিষয়ে সুশাসন জোরদার করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক সংস্কারের ক্ষেত্রে আরো নজর দিতে হবে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, মুদ্রা ব্যবস্থাপনা, সংস্কার কর্মসূচি ও সামাজিক সুরক্ষা শক্তিশালী করতে হবে। সেই সঙ্গে সুশাসনের জায়গাগুলোতে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ভোরের কাগজ

২৭ ডিসেম্বর ২০২২

অধ্যায় ২

গণতান্ত্রিক উত্তরণ এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতি

২০২২ হোক গণতান্ত্রিক উত্তরণের ভিত্তি বছর

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় ২০২২ সাল একটি ভিত্তি বছর হিসেবে দাঁড়াবে বলে ধারণা করি। ইংরেজিতে একে আমরা বলি 'বেঞ্চমার্ক ইয়ার' অর্থাৎ যে বছরের নিরিখে আমরা অনেক কিছু বিবেচনা করি। বাংলাদেশের ইতিহাসে মন্দ-ভালো মিলিয়ে কিছু ভিত্তি বছর আছে। যেমন ১৯৭৫ সালে সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যা ও ১৯৯০ সালে স্বৈরশাসকের পতন। আশা করা যায়, পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে ২০২২ সাল বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণের ভিত্তি বছর হবে।

২০২১ সাল ছিল বাংলাদেশের জন্য গৌরবের বছর। ৫০ বছরের অর্জন মূল্যায়নের বছর। উদাহরণস্বরূপ বলি, এই মুহূর্তে বাংলাদেশে আমরা ৭৩ বছর গড় আয়ু নিয়ে চলছি, যখন বিশ্বে গড় আয়ু হলো ৭২ বছর। বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন এ এলাকার মানুষের গড় আয়ু ছিল ৪৭ বছর। ৫০ বছরে আমরা দেড় গুণ জীবৎকাল পেয়েছি, কারণ শিশুমৃত্যু এবং মাতৃমৃত্যুর হারকে আমরা কমাতে পেরেছি, জীবনমানকে উন্নত করতে পেরেছি।

আরেকটি অর্জন হচ্ছে, যখন দেশ স্বাধীন হয়, ধারণা ছিল সাড়ে সাত কোটি মানুষ যারা একবেলা খেতে পায় না, তারা কীভাবে দেশ-রাষ্ট্র পরিচালনা করবে? গত ৫০ বছরে আমরা একবেলা নয়, তিনবেলা খাওয়ার শক্তি অর্জন করেছি, যখন জনসংখ্যা সাড়ে সাত কোটি থেকে ১৬ কোটিতে পৌঁছেছে। ৫০ বছরের অর্জনকে সামনে আনতে আরেকটা উদাহরণ, আমরা যখন স্বাধীনতা লাভ করি তখন আমরা প্রভূতভাবে বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর দেশ ছিলাম। আজ বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্যনির্ভর এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের আকাঙ্ক্ষার দেশে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশের এক কোটির বেশি মানুষ এখন বিদেশে অবস্থান করে এবং আমরা রেমিট্যান্স আয়ের দিক থেকে অষ্টম রাষ্ট্র হিসেবে জায়গা করে নিয়েছি। এই রেমিট্যান্স আয় রপ্তানির নিট হিসাবের চেয়ে বেশি। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের বড় অবদান হলো শান্তিরক্ষী বাহিনী। প্রায় ১০ হাজারের মতো শান্তিরক্ষী বাহিনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব পরিসরে অবদান রাখছে, তা একটি বড় বিষয়।

তবে প্রশ্ন হচ্ছে, আগামীতে বাংলাদেশ অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রেখে এসব অর্জনকে টেকসই করতে পারবে কিনা?

সুখম টেকসই উন্নয়ন

দেশের মূল্যায়নকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিককালে যত সমালোচনা হয়েছে, তার মধ্যে তিনটি সমালোচনামূলক বিষয় খুব পরিস্কারভাবে এসেছে। দেশের আর্থসামাজিক অর্জনের সুফল সবাই সমানভাবে ভোগ করতে পারছে না, বৈষম্যের চেহারাটি সবার সামনে উৎকটভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। বিশেষ করে অতিমারির সময়কালে তা আরও প্রকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে। উপরন্তু বৈষম্য একটি কাঠামোগত রূপ পেয়েছে। আগে ঘটনাক্রমে তা একটি উপসর্গ হিসেবে আসত, এখন বৈষম্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়ে গভীরতর হচ্ছে। অর্থাৎ যে কারণে বৈষম্য সৃষ্টি হয়— দায়বদ্ধতাহীনতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার সেই সুশাসনের অভাব বৈষম্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিচ্ছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিনিয়োগ যৌক্তিক ও সাশ্রয়ীভাবে হচ্ছে না। উন্নয়নের ফলাফল সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও লক্ষ্যনির্দিষ্ট মানুষের কাছে পূর্ণভাবে পৌঁছাচ্ছে না। লক্ষ্যীয়, বৈষম্যের তীব্রতা এবং সুশাসনের অভাব একে অপরকে যেন আরও জোরদার করে দিচ্ছে। কারণ যারা বৈষম্যের শিকার এবং যারা সরকারি পরিষেবার সুফল থেকে বঞ্চিত, তাদের কণ্ঠস্বরটি যেন খুবই স্তিমিত, দুর্বল। তাদের কণ্ঠস্বর প্রকাশ করার জন্য একটি বহুস্তরবিশিষ্ট প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দরকার। একটি আধুনিক মধ্য আয়ের সমাজের ভেতরে যেসব ক্রিয়া-প্রক্রিয়া হয়, যেসব চাহিদা অপূর্ণ থাকে, সেগুলো প্রকাশ ও সুরাহা করার মতো অনুকূল পরিবেশ ও কার্যকর প্রক্রিয়ার অভাব বোধ করছি। সুতরাং বড় বড় সাফল্যের পাশপাশি তিনটি অস্বস্তির জায়গা আছে— বৈষম্য বৃদ্ধি, সুশাসনের অভাব এবং জনমানুষের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর।

সাধারণ অর্জন এবং টেকসই অর্জন— এই দুটির ভেতর তফাৎ আছে। পৃথিবীর নতুন উপলব্ধি হলো, প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে যাওয়ার যোগসূত্র হচ্ছে বৈষম্য কমানো, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন বৃদ্ধি এবং গণমানুষের কণ্ঠস্বরের সোচ্চার প্রকাশের মাধ্যমে জবাবদিহিতা সৃষ্টি। এই উপলব্ধি থেকেই সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধানের পরিবর্তন হয়েছে। অন্যদিকে চীনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, গণতন্ত্রের কোনো চূড়ান্ত মডেল নেই। তবে সবাই একমত হবে যে, গণতন্ত্রের কতগুলো ন্যূনতম দৃশ্যমান চিহ্ন আছে। সর্বজনীন মানবাধিকার লঙ্ঘিত হতে পারবে না এবং জনগণ শঙ্কামুক্তভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারবে। এবং এই দুই-এর ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হতে হবে। এই জায়গাতে কোনো ছাড় দেওয়ার বা 'ট্রেড অফ'-এর সুযোগ নেই। এই দুই পূর্বশর্ত পূরণ না হলে রাষ্ট্রের কার্যকারিতা হ্রাস পেতে থাকে।

রাষ্ট্রের কার্যকারিতা

বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি, রাজনীতির জায়গায় প্রশাসন বড় ভূমিকায় এসেছে। প্রশাসনের ভেতরে দ্বন্দ্ব ক্রমান্বয়ে প্রকাশ্য হচ্ছে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি একটি অখণ্ড ও সংযুক্ত রাজনৈতিক সরকারের অধীনে আছে বলে প্রায়শই মনে হয় না। অন্যদিকে

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক দল তার অবস্থান হারাচ্ছে। রাজনীতি অনেক ক্ষেত্রেই জনমানুষের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের জায়গার বদলে বাণিজ্যিক সুবিধা আদায়ের স্থানে পরিণত হয়েছে। এরই অপর নাম বিরাজনীতিকরণ। জনমানুষের আস্থাহীনতার জায়গায় চলে গেছে। আগে আমরা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে দৌড়ে যেতাম সমস্যা সমাধানের আশায়, এখন জানি সমাধানের ক্ষমতা তাদের কাছে আর নেই। মনে হয় তারাও অপরিণত ও প্রচলিত দায়িত্বগুলোকে পরিত্যাগ করেছে। এর ফলে স্থানীয় সরকার, বিচার বিভাগ ইত্যাদি যে ক্রমাগত বিকল হয়ে পড়ছে।

আমি এখানে বিরাজনীতিকরণ প্রত্যয়টি প্রয়োগ করেছি বিভিন্ন কারণে। প্রশ্ন উঠছে, মানুষ শুধু রাজনীতি নয়, ভোট দিতে কেন আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে? ৪ শতাংশ ভোটের ভিত্তিতে কেন এমপি নির্বাচন হলো? ৯৬ শতাংশ মানুষ ওখানে ভোট দিতেই যায়নি। স্থানীয় সরকারের নির্বাচন নিয়ে যে মনোনিয়ন বাণিজ্য হলো, ভোটের আগে-পরে যে সহিংসতা হলো, তা তো রাজনীতি নয়। দেশ রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বে থাকার পরও রাজনীতির প্রতি যে নিষ্পৃহতা—এটাই বিরাজনীতিকরণ। এ অবস্থায় বাংলাদেশের ৫০ বছরের অর্জনকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, টেকসই করার জন্য মানুষের ওপর আস্থা রাখতে হবে। মানুষ যাকে যেভাবে ভোট দিতে চায়, সেই সুযোগটি করে দিতে হবে। আর ভোট পাওয়ার জন্য দলীয় আদর্শ ও কর্মসূচি নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন করতে হবে। তারপর বিনম্র চিন্তে, অবনত মস্তকে জনগণের রায় মেনে নিতে হবে। এটিই হলো সুখম টেকসই উন্নয়নের মূল ভিত্তি।

সম্প্রতি যে বিদেশি নিষেধাজ্ঞা আমাদের ওপর আরোপ করা হয়েছে, মনে রাখতে হবে এগুলো অনেক ক্ষেত্রে সংকেত, যা এখানেই শেষ হবে— এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। আগামী বছরগুলোতে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ প্রক্রিয়া বহুভাবে আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হবে। আগে নির্বাচন-পূর্বকালে ভারতের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হতো। এবার শুধু ভারত নয়, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও রাশিয়ার বিষয় আসবে। বলতে পারি, এটি আমাদের এক ধরনের সাফল্য, আমরা সবাইকে আকর্ষণ করতে পেরেছি। আমাদের অন্তর্স্থিত যে মূল্য, তাকে আমরা উন্মোচন করতে পেরেছি। কিন্তু জাতীয় স্বার্থের পরিপূরক করে এই মূল্যটি ধরে রাখা যেন সহজ কাজ নয়। এর অন্যতম পূর্বশর্ত হলো জনগণের ম্যাডেট নিয়ে বহির্বিশ্বের প্রতিকূল চাপকে মোকাবিলা করা।

২০২২ সালে এসে দেশে জাতীয় নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার কার্যকারিতার জন্য সহায়ক পরিবেশটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুক্ত মনে ও নির্ভীক চিন্তে মিডিয়া এবং নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ এটির পরিচায়ক। আমরা বলি, বাংলাদেশের ডিএনএর ভেতরে তর্কবিতর্ক আছে, নির্বাচন আছে, গণতন্ত্র আছে। এটিই হলো বাংলাদেশের অন্যতম আত্মশক্তি। এটিকে কার্যকর প্রকাশ করার সুযোগ করে দিতে হবে।

অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন

গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয়, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আমরা দেখলাম, সবাই এখন শাসক দলে যোগ দিতে চাইছে। সবাই এখন চৌবাচ্চা থেকে পানি নিতে চাইছে, যে পানি হচ্ছে রাষ্ট্রীয়

সম্পদ। এটি পেতে হলে যোগ্যতা, মেধা ও প্রতিযোগিতার চেয়ে ক্ষমতা ও সংযোগটাই বড় বিষয়। এ কারণে বিরোধী রাজনীতির সমর্থকরা সাময়িক সময়ের জন্য হলেও শাসক দলে ঢুকতে চাইছে। সবাই এখন সরকারি সম্পদে অভিজ্ঞতা চাইছে।

বর্তমানে দেশে একটি নিরপেক্ষ, দক্ষ ও সাহসী নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। মনে রাখা দরকার, নতুন নির্বাচন কমিশনকে জনমানুষের চোখে বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। তার চেয়েও বড় বিষয় হলো, তাকে কাজ করার সুযোগ করে দিতে হবে। তাই অবধারিতভাবে নির্বাচনকালীন সরকারের অবয়ব ও চরিত্র তথা কার্যপরিধি নিয়ে একটি জাতীয় ঐকমত্য প্রয়োজন হবে। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের হতাশাজনক অভিজ্ঞতা থেকে আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সুরক্ষা দিতে হবে।

বাংলাদেশে এখন বেশ কিছু নতুন টেনশনের জায়গা তৈরি হয়েছে। প্রথমত, রোহিঙ্গা সমস্যা যা ক্রমেই জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির ২০ বছর পরও আমরা ভূমি সমস্যার সমাধান করতে পারিনি। এখনও সেখানে গোলাগুলি হচ্ছে। তৃতীয়ত, এতদিন পর্যন্ত বলে এসেছি আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। হিন্দু, মুসলমান আমরা যুগ যুগ ধরে একত্রে বসবাস করেছি। এই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছে গত দুর্গাপূজার সময় ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক আক্রমণ। আগামী জাতীয় নির্বাচনের প্রেক্ষিতে এই বিষয়গুলোও থাকবে।

আমরা যদি টেকসইভাবে এলডিসি থেকে বের হতে চাই, নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ হতে চাই, তাহলে সর্বজনীন আর্থসামাজিক সুরক্ষা এবং কার্যকর মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে আমাদের যে ত্বরনটা আছে, সেটা শ্লথ হয়ে যাবে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিভিন্ন সময়ে আলোকিত চিন্তা নিয়ে এসেছে। তারা জনগণের কণ্ঠস্বর ধারণ করেছেন। সম্প্রতি একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করার দাবিটি উচ্চস্বরে আসছে। আশা করছি, ২০২২ ও ২০২৩-এ এই কণ্ঠস্বরকে সামনে এগিয়ে নিয়ে আমাদের ৫০ বছরের অর্জনকে টেকসই করব, বৈষম্য দূর করব এবং সুশাসন গভীর করব।

আমাদের বাংলাদেশের নাগরিকদের বেঁচে থাকার যে সক্ষমতা, যুদ্ধ করার যে স্পৃহা এবং অর্জনকে ধারণ করার যে উপলব্ধি— এটিই হলো ৫০ বছরের অন্যতম বড় অনুধাবন। একে পুঁজি করেই আগামীতে বাংলাদেশ নতুন অর্জন নিশ্চিত করবে। নিশ্চিত করবে গণতান্ত্রিক উত্তরণ।

সমকাল

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বিদেশে কণ্ঠ শোনাতে চাই আর দেশের ভেতরে শুনব না— তা হবে না

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

মতিউর রহমান চৌধুরী: আমি যদি ভুল না হয়ে থাকি, ২০২০ এর মে মাসে খুব সম্ভবত আপনি ঢাকার একটি পত্রিকার সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন করোনা পরিস্থিতি গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনবে। আপনি এটিও বলেছিলেন যে নট এবং পটের পরিবর্তন হবে এবং আমি ইদানীং লক্ষ করছি আপনার এ কথাটিই কার্যত দেখছি যে বাস্তবে হচ্ছে। পাকিস্তানের সরকার ইমরান খান রান আউট হয়ে বসে আছেন, শ্রীলঙ্কার কথা আপনি জানেন। এ মুহূর্তে আমি পড়লাম যে শ্রীলঙ্কার পথে হাটছে না বাংলাদেশ। এ ব্যাপারে আপনার অবজার্ভেশন কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ আমার পুরানো লেখা স্মরণ করার জন্য। এই যে অতিমারিটা আসলো, এর নেতিবাচক দিক তো আমরা জানি যেমন: স্বাস্থ্য, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি। কিন্তু যেকোনো সংকটের একটি ইতিবাচক দিক থাকে তা হলো আমাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক যে বিচ্যুতি আছে তা এ অতিমারির সময় প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং যে সমস্ত দেশে এই দ্বন্দ্বগুলো বের হচ্ছে সে দ্বন্দ্বগুলো নিরসনের জন্য যদি কার্যকর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া না থাকে, প্রতিষ্ঠান না থাকে যেমন: বিচারব্যবস্থা বা প্রশাসনের ভেতরে তা মোকাবিলা করার পরিস্থিতি না থাকে, রাজনৈতিক সংলাপের জায়গা যদি না থাকে, যদি সংসদ বা অন্যান্য জায়গায় কার্যকর না হয় সেসব জায়গাতে এগুলো প্রকটভাবে এবং ভঙ্গুরভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, এ জায়গাগুলোতেই আপনি এগুলো দেখবেন। এছাড়াও যে বাজার সৃষ্টি হয়েছে সে বাজারে উথাল-পাথাল কারণে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, এর সাথে ইউক্রেনের যুদ্ধ যুক্ত হয়েছে।

শুধু জ্বালানি মূল্যই নয়; খাদ্যদ্রব্য, সার এবং অন্যান্য পণ্যের দাম বেড়েছে যেমন: তুলা, ভোজ্য তেল। শুধু চিনির দাম কিছুটা কমেছে। এর সাথে যা হয়েছে আর্থিক সঞ্চালনের ক্ষেত্রে যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছিল, ব্যাংক ব্যবস্থা ছিল তাও একটি চাপের সম্মুখীন হয়েছে, বিট কয়েন এসেছে ইত্যাদি। এর পাশাপাশি যা হয়েছে, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন করে প্রযুক্তির কথা চিন্তা

করতে হচ্ছে। এটা যে শুধু অতিমারি মোকাবিলা করতে বা ভ্যাক্সিন এর ক্ষেত্রে হয় তা না, অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমরা দেখবো কারণ পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা এক ধরনের সমস্যার ভেতরে পড়েছে এবং আঞ্চলিক, সমুদ্র বা নৌ পরিবহনের ক্ষেত্রেও দাম এবং খরচ বেড়ে গেছে। এগুলোকে মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন দেশে টেকসই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে কিনা এটা এ মুহূর্তে সব জায়গায় পরীক্ষিত হচ্ছে। আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে দেখেন, ট্রাম্প সরকার যাবার পর এবং বাইডেন সরকার আসার পর তারা যে সমস্ত বিচার করার চেষ্টা করেছে, তাদের যে ক্যাপিটাল আক্রমণ হয়েছিল নতুন ভাবে কৃষ্ণঙ্গ মহিলা সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগপ্রাপ্ত হচ্ছে নতুন ধরনের বিভিন্ন জিনিস হচ্ছে। ইউরোপ ভেতরে এক ধরনের নতুন কিছু নির্বাচনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, যুক্তরাজ্যের ভেতরে জনসন সাহেবের দলের মধ্যে সমস্যা আছে। ম্যাক্রো আবার জিতে আসবেন কিনা, জার্মানিতে আবার সরকার বদল হচ্ছে। আপনি আমাদের এ অঞ্চলের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, এ অঞ্চল তো এর বাইরে না, এছাড়াও বিভিন্ন কারণে এ অঞ্চল অনেক সংবেদনশীল হয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান এর কথা বলতে পারেন যে, এর ভেতরে তাদের যে প্রাথমিক দ্বন্দ্ব, সেনাবাহিনীর সাথে রাজনৈতিক দলের দ্বন্দ্ব, সেটারই এটি প্রকাশ নাকি রাজনৈতিক দলের ভেতরেই এটা প্রকাশ নাকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে এ অঞ্চলের সম্পর্কের নতুন প্রকাশ; এটা নিয়ে অনেক ভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে।

শ্রীলঙ্কার পথে বাংলাদেশ হাটবে কি হাটবে না বিষয়টি এভাবে দেখি না, আমি দেখি শ্রীলঙ্কা থেকে কী শিখলাম। শ্রীলঙ্কা থেকে আমরা শিখলাম যে দৃশ্যমান অবকাঠামো করার জন্য আমরা যে রাজনৈতিক কাজ করি তা অনেক সময়েই অর্থনৈতিক যৌক্তিকতার সাথে মেলে না। আপনি যখন একটি সেতু তৈরি করেন, বিমানবন্দর তৈরি করেন, এক্সপ্রেস হাইওয়ে তৈরি করেন, নৌ বন্দর তৈরি করেন এগুলো সবই দরকার। কিন্তু এগুলোর যৌক্তিকতা বা আপনি এগুলো ব্যবহার করে এ টাকাটা দ্রুততম সময়ে তুলতে পারবেন কিনা, যে টাকাটা আপনি বিনিয়োগ করেছেন তা ঠিক সময়ে তুলতে পারবেন কিনা তা না জানলে এটা হয়না। ঘটনাটা হচ্ছে রাজনৈতিক সরকার আসে পাঁচ বছরের জন্য কিন্তু প্রকল্পগুলোর মেয়াদ বিশ বছর। কিন্তু যে টাকা যেখান থেকে ধার নেয়া, সেটা থাকে না কেন? আমরা যতই বলি নিজের টাকা কিন্তু কোথাও না কোথাও থেকে তো ধার এনেছি। নাহলে তো বিশ্বব্যাংক থেকে ৫০০ মিলিয়ন টাকা বাজেট সাপোর্ট আনতে হতো না। আনছি মানে আমার কুলাচ্ছেনা তাই আনছি। তাহলে এগুলোকে শোধ করতে হলে পাঁচ বছরের সরকার তা করে না, করে পরবর্তী দশ বছরের সরকার।

শ্রীলঙ্কার যে ঘটনা তা গতকালের না, আমি অনেক দিন ধরে বলে আসছি। এছাড়া আমরা শ্রীলঙ্কার বন্ধুরাও অনেক দিন থেকে বলে আসছেন যে অবিবেচকের মত বৈদেশিক ঋণ নেয়া দুর্যোগপূর্ণ এবং এতে ঝুঁকি আছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হাফান টোটার মত বন্দর, যা চায়নার পয়সার বানিয়ে আবার তাদের ২ বিলিয়ন টাকা বিল দিতে হয়েছে তা না হলেও আমাদের যে দায়-দেনার অংশ আছে তা দেশজ আয়ের অংশ হিসেবে ৪০ শতাংশ অতিক্রম করেছে এবং প্রতি বছর তা দেড় শতাংশ করে বাড়ছে। ২০২৪ এর পর এটি অনেক ক্রিটিকাল অবস্থার মধ্যে যাবে বলে আমরা মনে করি। দ্বিতীয়ত হলো, আমরা এমন উৎস থেকে টাকা নেব কোন অর্থে। আমরা যেমন বিশ্ব ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে পদ্মাসেতু করতে চেয়েছিলাম কারণ তা

সশরী হতো কিন্তু তা দুর্ভাগ্যজনকভাবে হয়নি। একই রকম ভাবে আপনার দেখতে হবে দায়-দেনা পরিস্থিতিতে আপনি কীভাবে নজর দিচ্ছেন।

মতিউর রহমান চৌধুরী: আপনার কী মনে হয়?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি মনে করি যে যথেষ্ট পরিমাণে নজর নাই, সুশাসনের অভাব রয়েছে। আপনারা জানেন, সর্বদাই বলা হচ্ছে তথ্য উপাত্তের সমস্যা রয়ে গেছে। আপনারা জানেন, রাজস্ব বাজেটের খরচ, আয় এগুলো কিছুই আমরা সমসাময়িক ভাবে পাই নাই। কারণ, প্রবৃত্তির যে আখ্যান আছে তার সাথে অন্য তথ্যগুলো মেলে না। এর জন্য সমস্যা হয়। বিশেষ করে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ এবং কর আদায়ের ক্ষেত্রে এই সমস্যা রয়েছে। এই জায়গাতে মনোযোগ দেয়ার বিষয় রয়েছে। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এর সাথে পৃথিবীব্যাপী যে পরিবর্তন এসেছে তা ট্রাম্প-উত্তর, কোভিড-উত্তর এবং ইউক্রেন-উত্তর পরিস্থিতিতে আসবে। সেটা হলে দেশের ভেতরে যদি গণতান্ত্রিক চর্চা না থাকে, দেশের মধ্যে জনমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার প্রতিষ্ঠান না থাকে মিডিয়াসহ, তাহলে এ দ্বন্দ্বগুলো অনেক ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে নিরসন হয়। অর্থাৎ, তখন সেটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় হয় না। রাশিয়ার ভেতরে যদি প্রচলিত অর্থে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থাকতো তাহলে পৃথিবীর ইতিহাসে এই ইউক্রেন-উত্তর পরিস্থিতি ভিন্ন রকমের হতে পারত। তাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের বিষয় সুশাসনের সাথে, উন্নয়নের সাথে জোরদার ভাবে ফেরত আসছে এবং মানবাধিকার, গণতন্ত্র, সুশাসন এগুলো উন্নয়ন থেকে আলাদা ভাবে দেখা হচ্ছে। অনেকেই এগুলোকে আলাদাভাবে দেখেন যা হলো অপরিসর মস্তিষ্কের একটি ক্ষুদ্র চিন্তা। আপনি যে নট এবং পটের পরিবর্তনের কথা বলছেন সে পরিস্থিতির জন্য তার একটি বড় আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট আছে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি পুনর্মূল্যায়ন পরিস্থিতি শুরু হয়েছে যা ইউক্রেন বা আফগানিস্তানের কারণে না, এটি সাধারণ ভাবে পৃথিবীর ভেতরে গণতান্ত্রিক বহুপাক্ষিক কাঠামো কার্যকর হচ্ছেনা। এটি গড়ে তুলতে কি দেশ থেকে গড়ে উঠবে যেখানে সব দেশ জাতিসংঘে ভোট দিচ্ছে, নাকি বৈশ্বিক কাঠামো জন্ম দেবে যেখানে মানুষের তার কথা বলার সুযোগ পাবে, আমাদের মত দুর্বল দেশগুলো কথা বলতে পারবে কিনা, বা আন্তর্জাতিক ভাবে নিজের কণ্ঠ ও কথা শুনতে চাইবে কিন্তু দেশের ভেতরে নিজের জনগণের কথা শুনবে না, এটা কিন্তু হবেনা। এটাই নট ও পটের পরিবর্তন।

মতিউর রহমান চৌধুরী: এ পর্যায়ে ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি জানেন নিশ্চয়ই আপনার গবেষণায় হয়ত ধরা পড়েছে যে মিডল ক্লাস বা মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা বদলে যাচ্ছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেখুন, বর্তমান বিশ্বে যেটা হয়েছে আগে আমরা করতাম কী উপরের ৫ বা ১ শতাংশ কেমন আছে বা নিচের সব চেয়ে গরিব ৫ শতাংশ কেমন আছে তা দেখতাম কিন্তু আমরা গবেষণায় দেখছি এতে অর্থনৈতিক বৈষম্য পুরোপুরি ধরা পড়ে না। তাই আমরা এখন উপরের সাথে নিচের ৪০ শতাংশ আনছি। যাদের জন্য নতুন অর্থনীতি গড়ে উঠেছে তারা নতুন শিক্ষিত যুব সমাজ, মধ্যবিত্ত সমাজের নতুন শিক্ষিত শহুরে জনগণ। আপনি যে নট ও

পটের পরিবর্তনের কথা বললেন এর একটি বড় অংশ হলো এই মধ্যবিত্ত, তারা সব থেকে বেশি আক্রান্ত হয়েছে। নিম্ন মধ্যবিত্ত সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে।

মতিউর রহমান চৌধুরী: সে তো টিসিবির ট্রাকের পেছনে দৌড়াচ্ছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এখন এই যে সে টিসিবির ট্রাকের পেছনে দৌড়াচ্ছে, তার একটি বড় কারণ হলো আপনি যে প্রবৃদ্ধির ছয় সাত শতাংশের কথা বলেছেন এই প্রবৃদ্ধির তারা কোনো ভাগীদার নয়।

মতিউর রহমান চৌধুরী: এ কেমন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এ হলো সেই প্রবৃদ্ধি যা বড় ধরনের কর্পোরেট শ্রেণি সৃষ্টি করেছে, যারা দেশ থেকে টাকা নিয়ে বিদেশে জমা করেছে। যারা নিম্ন মধ্যবিত্ত বা স্বল্প আয়ের, তাদের সাথে হয়নি। কিন্তু তাদের ব্যয়গুলো বেড়েছে এবং কোভিডের সময় আরো বেড়েছে। সে এখন এ মুহূর্তে ঢাকা শহরে পরিবার রেখে সংসার চালাতে পারছেন না, গ্রামে পরিবার রেখে আসছে তা কোভিডে হয়েছে আবার হচ্ছে। তাদের জন্য কোনো সর্বজনীন স্বাস্থ্যব্যবস্থা নেই। হাসপাতালে ঢুকলে চার-পাঁচ লাখ টাকা বিল আসছে। শিক্ষার জন্য দিবে কোথায় তেমন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাচ্ছেনা বা প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর গুণগত মান নিয়ে নিশ্চিত হতে পারছে না। সেখানের সার্টিফিকেট নিয়ে বের হয়ে চাকরি পাচ্ছে না। সাধারণভাবে যদি চার জন যুবকে একজন বেকার থাকে, শিক্ষিত যুবকে তিনজনে একজন বেকার। অর্থাৎ, যে যত শিক্ষিত সে তত বেকার। সে দেখছে সে গণপরিবহনে উঠতে পারছেন না, যানজটের জন্য ঢাকা শহর স্থবির হয়ে আছে। আবার দেখছে তার কোনো সামাজিক সুরক্ষা নেই।

সরকার বলছে সর্বজনীন সুরক্ষার কথা, আমরা বৈষম্য বিরোধী আইনের কথা বলছি, সরকার এগুলোর বিল এনেছে। কিন্তু এ প্রাতিষ্ঠানিক আইনগুলো কোনো সফল দিতে পারছে না। এটার একটা বড় কারণ যা আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে আপনি বাজার এবং রাষ্ট্রকে চালাবেন সেগুলো কাজ করছে না। অর্থাৎ, আপনি অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভেতর আছি যা ব্যাখ্যা করার দরকার পড়ছে না। সেটার যে অঙ্গপ্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলো স্বাভাবিক ভাবে কাজ করছে না। কারণ এগুলোর স্বাভাবিক কাজ করতে হলে যে জবাবদিহিতার কাঠামো দরকার সেটা বাংলাদেশে ভেঙ্গে গেছে সেহেতু আপনি সরকারের পক্ষ থেকে দেখবেন সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয় তারা সেটা কার্যকর করতে পারে না। কারণ সেটাকে কার্যকর করতে হলে যে ধরনের বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, মিডিয়া, নাগরিক সমাজ দরকার সেগুলোকে আমরা এ মুহূর্তে গড়ে তুলতে সাহায্য করছি না। এ গড়ে তোলার সাহায্য করার অন্যতম বড় উপাদান জনমানুষের কথা বলার অধিকার এবং তার কথার ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করা। এটা যদি আপনি না করে থাকেন তাহলে সেই যে পরিবর্তন তা অনেক বেশি ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে দিয়ে পরিবর্তন আসে। এ ব্যাপারে আমার মনে হয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের নজর দেয়া দরকার।

মতিউর রহমান চৌধুরী: আপনি তো অতীত বললেন, বর্তমান বললেন, ভবিষ্যৎ কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি-আমি যারা দেশে থাকি, আমরা ভবিষ্যতের ব্যাপারে নিঃসন্দেহে একটা প্রত্যাশার ভেতর থাকি, একটা আকাঙ্ক্ষার ভেতরে থাকি। আর যেহেতু বাংলাদেশে গত ৫০ বছরে একটি মূল্যায়ন করে আমরা দেখেছি আমাদের অর্জনও যথেষ্ট আছে। আমরা অনেক বেশি সময় বেঁচে থাকি এখন, মানুষ শিক্ষিত আছে, বিশ্বের সাথে যুক্ত হয়েছে, খাদ্য উৎপাদনে ভালো হয়েছে ইত্যাদি অর্জন যে কম আছে তা নয়। এ সব অর্জন যে শুধু সরকার করেছে তা নয়, ব্যক্তিগত, নাগরিক সমাজ সবাই মিলে করেছে এবং আমি এটিকে একটি জাতীয় অর্জন হিসেবেই দেখি। কিন্তু এ অর্জনকে টিকিয়ে রাখার জন্য, অব্যাহত রাখার জন্য, ক্রমবর্ধমান করার জন্য যেটি দরকার পরে সেটি হচ্ছে দেশের মধ্যে সাম্যপূর্ণ সুশাসনের ভিত্তিতে যদি একটি ব্যবস্থা তৈরি করতে না পারেন তাহলে পৃথিবীর ইতিহাস বলে যে এ ধরনের অর্জনও খুব দ্রুতই পেছনে চলে যায়। আপনি দেখছেন অর্থনীতির সুশাসন না থাকায় শ্রীলঙ্কার অবস্থা।

মতিউর রহমান চৌধুরী: তাহলে আমরা কেন বলছি যে আমরা শ্রীলঙ্কার পথে হাঁটছি না!

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমরা শ্রীলঙ্কার পথে হাঁটছি না, ঐ অভিমুখে আছে। কিন্তু এ পথে গভীরে চলে গিয়েছি, আর ফেরত আসা সম্ভব না সেটা মনে করছি না। আমি মনে করি এখনো ব্যবস্থা নিলে এর ভেতরে অনেক কিছু করা সম্ভব এবং অর্থনৈতিক নীতিমালা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যদি আপনি সমন্বয় করেন, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিনিয়োগ সিকিউরিটি এন্ড স্টক এক্সচেঞ্জ, ফাইন্যান্স ডিভিশন যদি সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করে তাহলে এটা করা সম্ভব যা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমি যে বার বার বলছি বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ভেতরে কোথাও একটা অচল অবস্থা আসছে, কোনো একটা সমন্বয়হীনতা দেখা যাচ্ছে। সব যখন সর্বোচ্চ পর্যায়ের উপর নির্ভরশীল এ প্রতিষ্ঠানগুলো নিজ নিজ জায়গা থেকে সক্রিয়ভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে না। দেখেন, আমরা বার বার বলেছে ভোজ্য তেল এবং বিভিন্ন ব্যবহার পণ্যে শুল্ক কমান, আমদানি করেন, বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য সরবরাহ বাড়ান ইত্যাদি। কিন্তু কিছুই করেনি, যখন করলো দেরী হয়ে গেল। এতে কেউ সুফল পেলো না। এটি প্রাতিষ্ঠানিক অদক্ষতার প্রকাশ। বাংলাদেশের যদি এ মুহূর্তে কোনো চ্যালেঞ্জ থাকে তাহলে বাজার এবং রাষ্ট্রকে সহযোগিতা দিতে পারে এমন কাঠামো দরকার যা ঠিকমত কাজ করতে পারছে না।

মতিউর রহমান চৌধুরী: কিন্তু সেটি তো অনুপস্থিত...

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: মানে এই অনুপস্থিতির বড় কারণ হলো, প্রতীকী অর্থে সবগুলোই আছে কিন্তু কেউ কারো কাজ করে না। এটার একটা বড় কারণ হলো আমি আপনাকে বার বার বলছি এ প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহি করার জায়গা নেই। জনমানুষের কাছে যে জবাবদিহি করবে সে অর্থে নেই। আর যে প্রতীকী অর্থে জনপ্রতিনিধিরা আছেন তারা জনমানুষের আকাঙ্ক্ষাকে ভালোমত ধারণ করতে পারছেন না এটাই একটা বড় রকমের সমস্যা। আগামী দিনের বাংলাদেশ যদি আপনি দেখেন তাহলে তা আরো বেশি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ হতে হবে,

আরো বেশি অংশগ্রহণের বাংলাদেশ হতে হবে, আরো বেশি সুশাসনের বাংলাদেশ হতে হবে। আগামী দিনের বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে যে গণতান্ত্রিক নীতিমালা আছে তার প্রতি কার্যকরভাবে নিষ্ঠাবান হতে হবে। শুধু মৌখিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিলে হবেনা, কাজের ভেতর দিয়ে তা প্রমাণ করতে হবে। এবং পৃথিবীর বুকে অন্যান্যদের কাছে আমরা যখন দাবি জানাই তখন নিজের দেশের মানুষের দাবির প্রতি যত্নবান হতে হবে।

চ্যানেল আই 'আজকের সংবাদপত্র'-এ প্রচারিত
৮ এপ্রিল ২০২২

সরকার এবং রাষ্ট্র দুটো ভিন্ন জিনিস, সরকারের বিরোধিতা করা মানেই রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা না

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

জিল্লুর রহমান: আমরা বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনের কথা বলছি কিন্তু স্মরণ করতে চাই আমরা ইংরেজি নববর্ষের শুরুতে আপনার সাথে কথা বলেছিলাম। হয়তো গত বছরের শেষ দিকে অথবা বছর শুরুর দিনের প্রথম সময়টাতে এবং আপনি বলেছিলেন ২০২২ ইংরেজি বছর হবে বাংলাদেশের জন্য ভিত্তি বছর। তো ইতিমধ্যে আমরা তিনমাসের বেশি সময় পার করেছি। আপনার সে কথার সাথে কতটা মিল খুঁজে পান যা কথিত বাংলাদেশে হচ্ছে। আপনি নিজে মিলিয়ে দেখছেন কিনা।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি মিলিয়ে দেখবেন। আপনি বড় বিশ্লেষক, আমার থেকে বেশি। আপনাকে আমি ২০২২ সালের ক্রান্তিলগ্নে, মাহেহুদুদেগে বলেছিলাম যে ২০২২-২৩ গণতন্ত্রের উত্তরণের জন্য একটি ভিত্তি বছর হবে এবং আগামী জাতীয় নির্বাচন বাংলাদেশের জাতিগঠন প্রক্রিয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। গত দুই-তিনমাসে যদি আপনি দেখেন এটার মধ্যে অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলী দেশে, অঞ্চলে এবং পৃথিবীতে হয়েছে যা আমার ওইদিনের ওই মন্তব্যকে আরো শক্তিশালী করেছে বলে আমি মনে করি। আমার কাছে এ তথ্য-উপাত্ত ছিল না। আমি শুধুমাত্র ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যতের আলোচনা করেছিলাম।

এখন আমাদের কাছে সমসাময়িক অভিজ্ঞতা সাথে আছে যেটার ভিত্তিতে আপনি দেখতে পারেন এবং আপনি যদি দেখেন এটা যে তিন মাসের ভেতরে দেশে, এ অঞ্চলে এবং বিশ্বে কী পরিবর্তনগুলো হয়েছে। আপনি বিশ্ব দিয়ে শুরু করেন। বিশ্বের সবচেয়ে বড় পরিবর্তনগুলোর মধ্যে অবশ্যই ইউক্রেনের যুদ্ধ, ইউরোপের শান্তির এলাকা এখন কীরকমভাবে বিঘ্নিত হয়ে গেছে, উৎকর্ষের জায়গা হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। একটি চরম মানবিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্য দিয়ে তাদের সামাজিক যে শক্তি তা পরীক্ষা হচ্ছে এবং একই সাথে বিশ্বে আমাদের বহুপাক্ষিক যে শাসন ব্যবস্থা গভর্নেন্স আমরা বলি যাকে এটার যে কাঠামোটা আছে সেটার যুক্তিযুক্ততা, জাতিসংঘ যে আছে সে অর্থে নিরাপত্তা পরিষদ

আছে কিনা, এগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে এক ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে যে আমরা এটা দিয়ে চলতে পারবো কি পারবো না। তো আপনি পৃথিবীর দিকে তাকান, তাহলে এ রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হবার আগেও যেটা হয়েছে অর্থনৈতিক বিভিন্ন জায়গাতে অতিমারি-উত্তর পরিস্থিতিতে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছিল বিভিন্ন জায়গাতে মূল্যস্ফীতি বিভিন্ন দেশে আসছিল সেক্ষেত্রে তারা যে ধরনের সমর্থন দিচ্ছিলো সেগুলো দ্রুততার সাথে আবার ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে বাজার স্থিতিশীল করতে চাচ্ছে, কিন্তু সেটা করতে পারছে না। কারণ তেলের দাম বাড়ছে, সারের দাম বাড়ছে এবং এর সাথে ভোজ্যতেলের দাম বাড়ছে, এবং সরবরাহ ব্যবস্থা মাইক্রোচিপস এর সরবরাহ বন্ধ হওয়াতে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও একটি বড় ধরনের পরিবর্তন সেখানে হয়েছে।

রাজনীতির অন্যান্য যেসব পরিবর্তন আমরা দেখেছি এ সময়কালে দেখুন সবে তো ফ্রান্সের নির্বাচনের প্রথম ধাপ গেল, দ্বিতীয় ধাপে কী হবে বলা মুশকিল। দক্ষিণপন্থীদের সমস্ত ভোট কিন্তু ৫২ শতাংশের উপরে। জনসন সাহেব যুক্তরাজ্যে তার নিজের দলের ভেতরে সংকটের ভেতরে আছে, জার্মানিতে পরিবর্তন হয়েছে সরকারের ভেতরে। অন্যান্য জায়গাতেও আমরা দেখছি একই সাথে দুটো ঘটনা ঘটছে। উগ্র দক্ষিণপন্থীদের উত্থান এবং বৈশ্বায়নের প্রতি তাদের মনোভাব, ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতি মনোভাব আরো কঠোর হচ্ছে। এর পাশাপাশি আপনি দেখবেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন করে ট্রাম্প-উত্তর পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিকতার প্রতি মানবাধিকার আইনের শাসনের ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের বিষয় আসছে যেটা তাদের বৈদেশিক নীতির মূল প্রেক্ষাপট হিসেবে আসছে। পৃথিবীর বুকে আপনি যদি দেখেন এর পাশাপাশি চীন আছে, আপনার ওখানে তাইওয়ান আছে, এগুলো বিভিন্ন ঘটনা ঘটছে এবং জাপানও এর বাইরে না। অস্ট্রেলিয়াতেও একই ঘটনা ঘটছে। আপনি দেখবেন পৃথিবীতে ৫-১০ বছর আগেও যে একটা আপাত স্থিতিশীলতা ছিল এবং এটাকে ব্যবস্থাপনাগত যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিল সেটা একটু নড়বড়ে হয়ে গেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এটাতে অর্থনীতি, রাজনীতি এবং নিরাপত্তা তিনটি বিষয় একসাথে যুক্ত হয়ে গেছে। আপনি যদি অঞ্চলের দিকে তাকান, অঞ্চলের ভেতরে পাকিস্তানের গল্প আর আমরা নতুন করে কী বলবো, পাকিস্তান নতুন করে আপনাকে দেখিয়েছে যে এ কাঠামোর ভেতরে এখনো পাকিস্তানের ভেতরে তার সামরিক বাহিনীর সাথে তাদের রাজনৈতিক শক্তির যে দ্বন্দ্ব এটিই মৌলিক দ্বন্দ্ব হয়ে দাঁড়াচ্ছে, জনগণের সাথে না। আর জনগণের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে সেখানে জনগণের মন পাওয়ার জন্য আপনি জানেন যে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভঙ্গুর অবস্থায় আছে চীনের সাহায্য ইত্যাদি থাকার পরেও। সেখানে তাদের দলের ভেতরে এখন আদর্শিক বিভেদ অতিক্রম করে ক্ষমতার জন্য বিভিন্ন ধরনের নতুন ধরনের জোট এবং ইত্যাদি হচ্ছে আমরা সবই তো দেখেছি।

জিল্লুর রহমান: একেবারে রাইভাল দু'টি রাজনৈতিক দল মিলে জোট করলো ...

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা আপনাকে অনেকটা এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেবে। এটার সাথে আমরা আরো দেখলাম যে নতুনভাবে যেটা লক্ষণীয় সেটা হলো একটি বিদেশি শক্তিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে।

জিল্লুর রহমান: সরাসরিই বলেছে। অঙ্গুলি নির্দেশ বললে কী হবে। নামই বলেছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: হ্যাঁ, নামই বলেছে। তো সেক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা, আফগান-উত্তর পরিস্থিতিতে এটার সম্পর্ক এবং আজকেই নাকি গতকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছেন যে পাকিস্তানের গণতন্ত্রের বিষয়টা মার্কিন স্বার্থের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই যে আমি বলতে চাচ্ছিলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন ভাবে তাদের বৈদেশিক নীতিতে এটি এনেছে। অনেকে হয়তো এটা নিয়ে তীর্থক মন্তব্য করতে পারবেন যে তাদের কী অভিজ্ঞতা, তাদের কী ব্যবহার তা আমরা অনেক ইতিহাস থেকে বলতে পারি। কিন্তু ইতিহাস সব সময় শুরু হয় আজকে থেকে। তো আজকে থেকে যে ইতিহাসটা হবে সেটাতে কী দাঁড়াবে? শ্রীলঙ্কার ঘটনায় আসার আগে আমি নেপালের প্রসঙ্গ বলে নেই।

নেপালে দেখেন এই যে গত সময়কালে তাদের বামপন্থী, এখনো রাজপন্থী এবং প্রজাতন্ত্রপন্থীদের তিন রকম ভাবে এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি ইস্যুতে বড় ধরনের ঝামেলা চলছে। ভারত এবং চীনের প্রতিযোগিতার লীলাক্ষেত্র হিসেবে এখন নেপাল বলে। যদিও বাংলাদেশকে অনেকে বলে কিন্তু ওটাও হয়তো নেপাল অনেক বেশি এবং তাদের ওখানেও স্থিতিশীলতা একটি বড় ধরনের সমস্যায় আছে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। শ্রীলঙ্কার কথা আর কী বলবো আমরা, শ্রীলঙ্কার তো আলোচনা অনেকই হয়েছে। অনেকেই বলতে চান যে শ্রীলঙ্কার পথে আমরা হাঁটছি কিনা, শ্রীলঙ্কার মত বাংলাদেশ হবে কি হবে না। আমি মনে করি, এটার থেকে বড় বিষয় হলো শ্রীলঙ্কার থেকে কী শিখলাম।

জিল্লুর রহমান: আপনার কাছে আমার প্রশ্ন, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার থেকে আমরা কী শিখলাম?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি যদি দেখেন প্রথমে আমি যেটা বলবো সেটা হলো যে, যদি নির্বাচিত একনায়কতন্ত্র বলেন, সীমিত গণতান্ত্রিক সরকার বলেন, তার এক ধরনের সুবিধাও থাকে, অসুবিধাও থাকে এবং এর সুবিধাটা দ্রুত হ্রাস পেয়ে অসুবিধাতে পড়ে যায়। শ্রীলঙ্কাতে রাজাপাকসে সরকার তার রাজনৈতিক বৈধতার জন্য বিভিন্ন ধরনের দৃশ্যমান উন্নয়ন প্রকল্প করার চেষ্টা করেছে, যার কোনো অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা ছিল না এবং এর জন্য যে অর্থায়ন করা হয়েছে সেটাও শাস্যীয়ভাবে হয়নি এবং এ অর্থায়নের যে তাৎপর্য অর্থনীতির জন্য সেটাও স্বচ্ছভাবে বিশ্লেষিত এবং আলোচিত হয়নি। যারা এটাকে বলেছে আলোচনার জন্য— আমরা প্রচুর বন্ধু শ্রীলঙ্কাতে, তারা স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করে— তারা যখন এগুলো বলেছেন, উনাদের তখন দেশদ্রোহী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আমি কোনো সমান্তরাল টানছি না এ মুহূর্তে। শ্রীলঙ্কার এটা একটা বড় বিষয় এবং এটার সাথে যেটা যুক্ত হয়েছে, যখন আপনি ওই ধরনের ক্ষমতাবান থাকেন, নির্বাচিত ক্ষমতা হয়ে আপনার যদি এ ধরনের সে অর্থে যদি খুবই কেন্দ্রীভূত, পরিবারভিত্তিক শাসন আপনি পরিচালনা করেন তাহলে আপনার দেশের মানুষের থেকে, এমনকি আপনার প্রশাসনের থেকেও আপনি এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার ভেতরে চলে আসেন। শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতিকে যদি জিজ্ঞেস করতেন আপনি যে

কারফিউ দিচ্ছেন আজকে রাতে দশ হাজার লোক এসে আপনার বাড়ি ঘেরাও দিবে কারফিউ ভেঙ্গে, উনি তার আটচল্লিশ ঘণ্টা আগেও তা বিশ্বাস করতেন না।

এটা হলো রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার লক্ষণ এবং শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য আরেকটা যেটা আসে সেটা হলো এ শ্রীলঙ্কাগত দুই দশক ধরে এই এলাকার ভেতরে উন্নয়নের মধ্যমণি হয়ে ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদিতে। অমর্ত্য সেন তো এর প্রশংসা করতে করতে আমাদের অনেক দূর নিয়ে গেছেন। কিন্তু পড়তে দু'বছর কিন্তু লাগে নাই। দুই দশকে যেখানে নিয়ে গেছে, দুই বছরের চেষ্টায় সে কোথায় চলে গেছে এবং গতকাল সে তার সমস্ত বৈদেশিক দেনাদারদের জানিয়েছে যে আমরা টাকা দিতে পারব না এবং সে খেলাপী হয়ে গেছে। অনেকে বলেন আমাদের তো ঋণ পরিশোধের রেকর্ড খুব ভালো, শ্রীলঙ্কারও ভালো ছিল। শ্রীলঙ্কার কি খারাপ ছিল? আমরা যখন বিদেশ থেকে অনুদানের টাকা আনি শ্রীলঙ্কা তখন সার্বভৌম বন্ড ইস্যু করে ব্যক্তিবাজার থেকে টাকা তুলেছে। অর্থাৎ, তার শক্তি এতখানি ছিল যে সে সরকারি বিদেশি সাহায্য নেয়নি। সে ব্যক্তিখাতের টাকা তুলেছে বন্ড ইস্যু করে যেটাতে ডলারে পেমেন্ট দিত হয়। সে শ্রীলঙ্কা এখন খেলাপি হয়ে গেছে। অর্থনীতি এমন একটা জিনিস যা প্রতিনিয়ত নতুন ভারসাম্যের মধ্যে থাকে এবং বাংলাদেশের জন্য এটি আসলে দেখার বিষয় আমি বলব। শুধু শ্রীলঙ্কা, আপনি মালদ্বীপের কথা বলছেন না কেন? মালদ্বীপের ভেতর একই ভাবে সাম্প্রতিককালে আমাদের সরকারপ্রধান ওখানে যাওয়ার পর তো এটা আরেক ধরনের আলোচনার ভেতরে এসেছে, নতুন ধরনের সম্পর্ক এবং এখানে সামরিক সম্পর্কের ভেতরে ভারত, চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিলিয়ে আছে। কিন্তু একই সাথে লক্ষ করুন তারাও নির্বাচনের দিকে যাবে, তাদের ওখানে নতুন ধরনের বিভক্তি সৃষ্টি হচ্ছে। ভারত বিরোধিতা নাকি চীন বিরোধিতা সেটা তাদের জন্য একটি বড় বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে যেরকম ভাবে শ্রীলঙ্কাতে হচ্ছে। এই ভারত বিরোধিতা নাকি চীন বিরোধিতা এটা আপনি মালদ্বীপে দেখছেন, শ্রীলঙ্কাতে দেখছেন, নেপালে দেখছেন, পাকিস্তানেও এসে ঢুকছে।

আমি কিন্তু বলিনি বাংলাদেশের কথা। কিন্তু এর আঁচ বাংলাদেশে পড়বে না এটা মনে করাটা বোকামি হবে। দেশের ভেতরে আপনি দেখেন গত দুই তিন মাসের মধ্যে বিভিন্ন ঘটনা। গত তিন মাসের ভেতরে একটা তো বড় ঘটনা হলো যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমাদের যে আত্মতৃপ্তির ভেতরে আমরা থাকতাম সেটা আমি মনে করি গত তিন মাসে এমনকি ইতিবাচকভাবেও যারা দেখেন তারাও কিছুটা দৃষ্টিভ্রান্ত হয়েছেন। এর সবচেয়ে বড় কারণ হলো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি যেভাবে হয়েছে, সাধারণ মানুষকে যেভাবে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে এবং সে দ্রব্যমূল্যকে শুধুমাত্র বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের দাম বেড়েছে বলে ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। আমরা অর্থনীতিবিদরা সেটা মনে করিনা। একইরকমভাবে অন্যান্য দেশে যখন আমদানিকৃত মূল্যস্ফীতি এটা কতখানি এটা নিয়ে বিষয় আছে। দ্বিতীয়ত এটা কতখানি সম্প্রসারণশীল অর্থনীতি, অর্থাৎ দেশের বাজারের ভেতর যদি আপনি টাকা বেশি টানেন সেটার কারণে মূল্যস্ফীতি হতে পারে। বিদেশে যেমন এখন এটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে।

কিন্তু বাংলাদেশের জন্য এটা সত্য না কারণ বাংলাদেশ তো টাকাই খরচ করতে পারে নাই। জিডিপির তের শতাংশের বেশি আমরা খরচ করতে পারি না। বাজেট দেয়া হয় ১৫/১৬

শতাংশ। আসলে তো বাজেটের সময় যেটা শোনে ওটা তো ঘোষণা। আমি এটাকে বলি এক ধরনের একটা ফিস্কাল ইলুশন অর্থাৎ আর্থিক ভাবে আপনি এক ধরনের ভেক্টর মধ্যে থাকেন। আসলে বাস্তবায়ন অনেক নিচে। তৃতীয়ত যেটা হয়েছে সেটা হলো এ সময়কালে আমরা যত রপ্তানিই করিনা কেন, অনেক বেশি আমদানি করছি। কারণ রপ্তানির চাহিদা মেটানোর জন্য তুলা থেকে শুরু করে অন্যান্য জিনিসের দাম অনেক বেড়ে গেছে। যদিও রপ্তানির পরিমাণকে দেখে অনেকে উচ্ছ্বসিত বোধ করেন। উনি ভালো করে জানেন না যে ওটার পেছনে আপনার বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি কীভাবে বাড়ছে, চলতি হিসাবের ঘাটতি কীভাবে বাড়ছে... সেহেতু আপনার এটার কারণে টাকা দুর্বল হয়ে গেছে। তো টাকা দুর্বল হয়ে যাওয়াতে আপনার আমদানিকৃত পণ্যের দামও সেভাবে বাড়ছে সে হিসেবে। তাহলে একদিকে হলো আপনার সম্প্রসারণশীল অর্থনীতির বিষয়, আরেক দিকে টাকা দুর্বল হয়ে গেছে। তো টাকা দুর্বল হয়ে যাওয়াতে আপনার আমদানিকৃত পণ্যের দামও সেভাবে বাড়ছে।

তাহলে একদিকে হলো সম্প্রসারণশীল অর্থনীতির বিষয়, আরেক দিকে টাকা দুর্বল হয়েছে, এখনো আমদানিকৃত পণ্যের দামের চাপটা এসে পড়ে নাই তেল ইত্যাদির ক্ষেত্রে। এই সময় আপনার জিনিসপত্রের দাম এত কী করে? আমার ধারণা সরকারের মূল্যব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার হাতে যে সমস্ত তথ্য-উপাত্ত থাকা দরকার সেগুলোও তার নাই এবং যেসমস্ত প্রতিষ্ঠান দিয়ে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বা প্রভাবিত করার কথা সেগুলোও কার্যকরভাবে কাজ করে না— অর্থাৎ এটা ভোক্তা সংরক্ষণ অধিকার সংরক্ষণ বলেন বা পণ্যমান নিয়ন্ত্রণই বলেন অথবা আপনার কত আলু আছে, কত পেঁয়াজ আছে, কত চাল আছে এগুলোর যে প্রাক্কলন করা হয়। আপনি তো জানেন চালের প্রাক্কলন কীভাবে করেছিল বাংলাদেশ এর একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। যার ফলে সরকারকে বিপদে ফেলে দিয়েছিল। তারা মনে করেছে অনেক চাল আছে আসলে তো চাল নাই। এবং এর একটা বড় কারণ হলো যে এ প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা থাকার জন্য যে সকল জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং তথ্য উপাত্ত প্রয়োজন তার অভাব, একই রকম ভাবে তাদের জবাবদিহি করার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি শক্তি বলেন, নাগরিক শক্তি বলেন বা জনমানুষের এমপি সাহেব যারা আছেন তাদের শক্তি বলেন খুবই দুর্বল। যার ফলে আপনি লক্ষ করে দেখবেন যে এ সময়কালে সরকার যে শুধু বাজার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারছে না তা নয়, সরকার রাষ্ট্রের হাতে যে ক্ষমতাটা আছে সেটাও ব্যবহার করতে পারছেন না। দেখুন আপনি চাল কতটুকু আমদানি করতে হবে তা সময়মত করতে পারছেন না, সেটাকে গোড়াউন থেকে টিসিবির কাছে পৌঁছাতে সময় যাচ্ছে কত বেশি। যে টিসিবিতে যতগুলো ট্রাক দরকার সে ততগুলো ট্রাক জোগাড় করতে পারছে না, এইগুলো তো সামান্য জিনিস।

জিল্লুর রহমান: অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এখানে মন্ত্রীত্বই ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন...

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: তাহলে দেখুন আমি আপনাকে কী বলবো! আমি আপনাকে বলেছিলাম ভিত্তি বছর। এই বিগত বছরগুলোতে স্বচ্ছতার অভাবের কারণে, জবাবদিহিতার অভাবের কারণে, অস্বীকৃতির অভাবের কারণে আজকে এ পরিণতি হয়েছে। কারণ আমরা যখন ৫-৬ বছর আগে ধরে এ সমস্যাগুলো বলেছি যে দেখুন আপনার কিন্তু কর আহরণ হচ্ছে না, আপনার জিডিপি

প্রবৃদ্ধি দেখাচ্ছেন ৫/৭ শতাংশ, অথচ আপনার ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ গত তিন বছর ধরে বাড়েনি। তাহলে বিনিয়োগহীন এবং করহীন প্রবৃদ্ধি কার উপকারে আসলো? আদৌ কি প্রবৃদ্ধিটা হয়েছিল কিনা? এ প্রশ্ন তাহলে আবার ফিরে আসবে। এ কথাগুলো যেহেতু মনোযোগ দেয়া হয়নাই, সংস্কার করা হয়নাই, আমরা আমাদের পরিস্থিতি নিয়ে এমন আত্মতুষ্টির মধ্যে থেকেছি এবং শুধুমাত্র বিদেশীদের প্রশংসার মাধ্যমে এর যৌক্তিকতা খোঁজার চেষ্টা করেছি। দেশের ভেতরে সুস্থ কর্তৃপক্ষগুলোকে আমরা আমলে নিতে চাইনি, এটার পরিণতি এটা। শ্রীলঙ্কাতে ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে। পাকিস্তানেও আপনি একই রকম দেখবেন।

জিল্লুর রহমান: পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কাকে যদি মিলিয়ে বলি এখান থেকে আসলে কী শিক্ষণীয়, এক দুই তিন করে যদি আপনার থেকে শুন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সাধারণভাবে এখানে দুটো শিক্ষণীয় জায়গা আছে। একটা হলো আপনি অর্থনৈতিক সুশাসন এমন একটা জিনিস, এটাকে যদি আপনি ঠিকমত প্রতিনিয়ত যদি এর প্রতি নজর না দেন, একে যদি লালন না করেন তাহলে আপনার যে অর্জন সে অর্জন খুব দ্রুততার সাথে মিলিয়ে যেতে পারে। প্রতিমুহূর্তে আপনার এ অর্জনকে টেকসই করা, সম্প্রসারণশীল করা, বিকাশমান রাখা এটা একটা অন্তর্নিহিত ব্যাপার এবং এটার জন্য আপনার প্রতিনিয়ত চেষ্টা করতে হয়। এখানে অস্বীকৃতির মনোভাব খুব উপকারী না। সবচেয়ে গতিশীল, সবচেয়ে উন্নত অর্থনীতিতেও এ জিনিসটা করতে হয়। এর ভেতরে দোষের কিছু নাই। এটিই স্বাভাবিক। তো সেক্ষেত্রে এই শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানের উভয়ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সুশাসনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ঘাটতি রয়েছে।

এখন অপরদিকে এই দুটো দেশেই আপনি দেখবেন রাজনৈতিক সুশাসনের ক্ষেত্রেও বড় ধরনের ভ্যাকুয়াম (শূন্যতা) সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ভেতরে দুই ক্ষেত্রেই হয় আপনার নির্বাচনের ভেতর দিয়ে এক ধরনের উগ্র একনায়কতা বলেন বা স্বৈরাচার বলেন বা উগ্রবাদী এক মনোভাবে এসেছিল। পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও অনেক ক্ষেত্রে এ নির্বাচনের ভেতরেও সাজানো নির্বাচনের কথা অনেকে বলেছিল যেটার ভেতর দিয়ে আপনার জবাবদিহিতার জায়গাটা জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়নি। সেহেতু রাজনৈতিক সুশাসন ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং আমি যেটা বলে শেষ করবো সেটা হলো একটি অপরকে পুষ্ট করে। আপনি যদি অর্থনৈতিক সুশাসন চান কিন্তু রাজনৈতিক সুশাসন দিবেন না এই অর্থনীতি টিকবে না। যদি আপনি রাজনৈতিক সুশাসন চান তাহলে যদি আপনি অর্থনৈতিক সুশাসনের মধ্য দিয়ে জনমানুষের চাহিদা পূরণ করতে না পারেন তাহলে আপনার এ অর্থনৈতিক সুশাসন বা রাজনৈতিক সুশাসন টিকবে না।

এই যে একটার সাথে আরেকটার পরিপূরকতা, সেহেতু আপনার এ অনুষ্ঠানে বসে যারা যারা বলেছেন যে আগে উন্নয়ন পরে গণতন্ত্র আপনি সে ব্যক্তিদের আরেকবার নিয়ে আসেন। আমি আপনাকে বলেছিলাম এখানে বসে যে তারা হলো অপরিপক্ক মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র চিন্তা থেকে এ কথাগুলো বলেন। তারা ইতিহাসকে অস্বীকার করে, তথ্য উপাত্তকে অস্বীকার করে। পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কা এবং কিছুটা নেপাল আপনাকে দেখাবে সেটা হলো অর্থনৈতিক সুশাসন না

থাকলে এখানে কোনো অবস্থাতেই আপনি রাজনৈতিক সুশাসন দিতে পারবেন না। আর রাজনৈতিক সুশাসন যদি না দিতে পারেন তাহলে অর্থনীতি আপনি টেকসই করতে পারবেন না। এটিই বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

জিহ্মুর রহমান: এ দু'টি দেশের সাথে ভূ-রাজনীতির সম্পর্কটি কীভাবে যুক্ত? এবং বাংলাদেশও বিভিন্ন ভাবে ভূ-রাজনৈতিক ইস্যুতে যুক্ত হয়ে পড়ছে কি মনে করেন? বাংলাদেশ চাক বা না চাক তার স্ট্র্যাটেজিক লোকেশনের কারণে বাংলাদেশ এর বাইরে যেতে পারছে না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশের ভূ-রাজনীতির সাথে এখন বিশ্ব রাজনীতিও যুক্ত হয়ে গেছে তাই না? অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এ ভূ-রাজনীতির বিষয়টি আরো বেশি গুরুত্ব পেয়েছে সেটা হলো যে ওই অর্থনৈতিক সুশাসন এবং রাজনৈতিক সুশাসনের উপাদান হিসেবে আমাদের আঞ্চলিক এবং অতি-আঞ্চলিক দেশগুলোর ভূমিকা বড় হয়ে দেখা যাচ্ছে। এটা আপনাকে আগের বারও আমি বলেছিলাম যে ২০২২-২৩ ভিত্তি বছর হবার একটি বড় বিষয় হলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ভূ-রাজনীতি। এবার বাংলাদেশে এটা বড় ভাবে আসবে এবং আগামী নির্বাচনে তো আরো বড় ভাবে আসবে আর এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের জন্য বা টেকসই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ ভূ-রাজনীতিকে ব্যবহার করার ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভূ-রাজনীতি বলতে আমরা শুধু ভারত আর চীনের কথা বলছি না। এর মধ্যে যে ভারত মহাসাগর আছে এবং ভারত প্যাসিফিক মহাসাগরের যে ভূ-রাজনীতি তাও এর মধ্যে আসবে। বাংলাদেশের ঐ যে অস্বীকারের মনোভাবটা বললাম না? যদিও এ ব্যাপারে আমার জ্ঞান সীমিত। কিন্তু বাংলাদেশের যে অস্বীকারের মনোভাব জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি এখানেও দেখতে পাবেন আপনি। আমরা মনে করি এ বিষয়টা আমরা দূরে রাখতে পারব এবং সময় নেয়াটাই বোধহয় ভালো কূটনৈতিকতা। কিন্তু এ সময়ের ভেতরে আমি কী ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছি বা কী ধরনের কার্যকলাপ করছি সেটা তো পরবর্তী সময়কে প্রভাবিত করছে। দেখুন আপনি ঘটনা, আমরা প্রথম জাতিসংঘের ভোটে পক্ষে দিলাম না নিরপেক্ষ ছিলাম ভালো কথা কিন্তু পরের বার আমরা ভোট দিলাম এটাকে মানবিক সমস্যা বলে।

এরপর আপনি দেখেন মানবাধিকারের জন্য যখন ভোটের ভেতরে গেল তখন আবার আমরা ভোট দিলাম। এই যে উঠানামা এটা আমাদের বৈশ্বিক পরিস্থিতির সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ বা আমাদের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেটা বলা মুশকিল। আপনাকে আবাবো বলছি যে পরিস্থিতি আমরা দেখছি সেখানে ক্রমান্বয়ে একটি ত্বরণ সৃষ্টি হচ্ছে এবং এ ত্বরণকে আমরা যেভাবে মোকাবিলা করতে চাচ্ছি সে মোকাবিলার পথগুলো খুব যুক্তিযুক্ত হচ্ছেনা। আমি আরেকটা উদাহরণ দেই আপনাকে এই যে জিনিসপত্রের দাম বাড়লো এ উপলক্ষে পাঁচ মন্ত্রীর সভা হলো আমি খুশি হলাম যে এটা নিয়ে সভা হচ্ছে এবং সভার সভাপতিত্ব করলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার মানে জিনিসের দাম বাড়টা একটি আইন-শৃঙ্খলার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো এবং সেখানে অর্থমন্ত্রী ছিলনা। সেটা একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেল। আপনি দেখেন

অতিমারির সময় স্কুল খোলা থেকে শুরু করে, স্বাস্থ্যসেবা দেয়া, প্রণোদনা দেয়া, সরকার খাদ্য সাহায্য দিতে চাচ্ছে ১ কোটি মানুষকে, আবার খাদ্য মন্ত্রণালয় আরো ৫০ লাখ মানুষকে দিবে এদের তালিকা, তথ্য এগুলোর কোনো ঠিক নেই। কেউ তিনবার পাবে কেউ হয়ত একবারও পাবেনা। এগুলো নিয়ে কিন্তু সংসদে কোনো আলোচনা নেই। আপনি রাজনৈতিক সুশাসনের কথা বলবেন কিন্তু বিরাজনীতির এর থেকে বেশি কী হবে যে সংসদের স্থায়ী কমিটিদের এগুলোর কোনো এজেন্ডাই নেই। কেউ এটা নিয়ে প্রশ্নই তুললো না বা প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নের সময়েও তেমন ভাবে আসলো না। সেহেতু আমি আপনাকে বলতে পারবো যে আমি আপনাকে যা বলে গেছিলাম গত তিন মাসে পরিস্থিতি সে অর্থে জটিল হচ্ছে।

জিল্লুর রহমান: একটা বড় বিষয় কি নির্বাচনে হয়ে উঠবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ওটা হলো ফাইনাল সল্যুশন। ওটা হলো চূড়ান্ত সমাধান। আমি তো নতুন নির্বাচন কমিশনারের আহ্বানে উনার ব্যক্তিগত আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম আলোচনা করার জন্য এবং সেখানে এ কথাটাই বলে এসেছি। এই যে বাংলাদেশের দশ বছরের যে অর্জন এবং এর যে বিপর্যয় এর সমাধানের জন্য দেশের ভেতরে যদি একটি জনমানুষের সাথে সম্পৃক্ত ব্যবস্থা না থাকে তাহলে এগুলোকে রক্ষা করা সম্ভব না ওই অর্থনৈতিক সুশাসন এবং রাজনৈতিক সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে। আর আমার ধারণা এ উপলব্ধিটা শাসক দলের মধ্যেও ক্রমান্বয়ে আসছে বলে আমার মনে হয়। বিশেষ করে ইউনিয়ন নির্বাচনে বিভিন্ন ঘটনার পর এটা আসছে। সেহেতু উনাদের কাছে আমার যেটা বলার ছিল যে, নির্বাচনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় এটা একটা মাইলফলক হিসেবে থাকবে এবং সেটা থাকবে শুধুমাত্র জনমানুষ চাচ্ছে তাই বলেনা, বিদেশীরাও এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে যেটা আগে তারা সেভাবে করেনি। অর্থাৎ তারাও মনে করছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি জনপ্রতিনিধিত্বমূলক এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দরকার। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে আমি নির্বাচন কমিশনারকে বলেছি যে আপনার কাছে যে ধরনের ক্ষমতা দেয়া আছে সেটা আপনি তো ব্যবহার করতে পারবেন না। আপনি কি পারবেন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর ডিসিদের পরিবর্তন করতে? আপনি কি পারবেন এসপিকে পরিবর্তন করতে? আপনি কি পারবেন ইভিএমকে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতে কারণ এটাতে বিতর্ক হবে। আপনি সবচেয়ে ভালো নির্বাচনও যদি ইভিএম দিয়ে করেন মানুষ এটাতে বিশ্বাস করবেনা। আপনি কি বিদেশি পর্যবেক্ষকদের আসতে দিবেন? আপনি কি জনমানুষকে তাদের বিষয়গুলোকে ঘাটে মাঠে গিয়ে ব্যাখ্যা করার সুযোগ দিবেন?

জিল্লুর রহমান: অথবা কিছু না করতে পারলে কি ‘পদত্যাগ করবেন?’— আমি যোগ করে দিচ্ছি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সেটিও আমরা বলেছি যে পদত্যাগ করার মত আপনি নাগরিক মানসিকতা রাখতে পারেন কিনা। কিন্তু এটি করতে গেলেও আপনার সমস্যা হবে যেটা অভিজ্ঞতা বলে ১৪ এবং ১৮ এর যে যদি এমন একটি সরকার না থাকে নির্বাচনকালীন সরকার। দেখুন আমি কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারও বলছি না, জাতীয় সরকারও বলছি না আবার নিরপেক্ষ সরকারও

বলছি না। আমি বলছি এমন একটি নির্বাচনকালীন সরকার থাকবে যে ভোটের ফলাফলের ব্যাপারে নিষ্পৃহ থাকবে এবং যে ফলাফলটা হবে সে গণতান্ত্রিক চেতনা থেকে বিনয়ের সাথে সেটি মেনে নিবে এবং নির্বাচন-উত্তর পরিস্থিতিতে সামাল দেয়ার জন্য সে প্রস্তুত থাকবে যে মানুষের রায়কে আমি রক্ষা করবো। ওটা যদি না থাকে, ইংরেজিতে বলে নেসেসারি কন্ডিশন এবং সাফিশিয়েন্ট কন্ডিশন আপনার প্রয়োজনীয় শর্ত হলো আপনার এমন একটি সরকার দরকার পড়বে নির্বাচনকালীন সময় যেটা নিষ্পৃহ থাকবে, জনমানুষ যা বলবে মেনে নিবে এবং যে নির্বাচন কমিশন আছে সেটা সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে একদম আগ্রাসী ভাবে এগিয়ে যাবে এবং প্রয়োজনে সে পদত্যাগ করবে যদি দায়িত্ব পালন না করতে পারে এ দুটোর ভেতরে। সেহেতু আপনি যদি এক কথার মধ্যে আজকে সন্ধ্যায় আমি বলি যে বাংলা নববর্ষের জন্য আমরা আগাছি, এ বর্ষে বাংলাদেশের জন্য আমরা শান্তিপূর্ণ চাই, আমরা বিকাশপূর্ণ চাই, প্রতিটি ব্যক্তি জীবনে এবং পরিবার জীবনে এটি যেন থাকে, দেশে শুধু না। কিন্তু এ বিকাশ এ শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি এর অনেকখানি নির্ভর করবে আগামী বছরে যে এ দেশের ভেতর আমরা কতখানি অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সুশাসন দিতে পারি এবং এ উত্তরণের একটি বড় জায়গা হবে গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। যে নির্বাচনের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশ জাতি হিসেবে এ নির্বাচনের পরবর্তীতে আরেকটি নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করবে।

জিহ্মুর রহমান: যে বিষয়গুলো আপনি বললেন সে বিষয়গুলো নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ থাকে একটি গণতান্ত্রিক সমাজে এবং রাষ্ট্রে। বাংলাদেশের জুডিশিয়ারি প্রতিষ্ঠানের কথা না হয় আমি নাই আলাপ করলাম, কারণ প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠছে না বা শক্তিশালী হচ্ছে না। কিন্তু সিভিল সোসাইটি এবং মিডিয়া যে আকাজক্ষা আপনি ব্যক্ত করলেন এতক্ষণ ধরে নানা সমালোচনা এবং দুর্বলতার কথা বলে সে আকাজক্ষা পূরণ করার ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যম আপনি কি মনে করেন যথাযথ ভূমিকা রাখছে এবং রাখতে পারছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এসব আকাজক্ষা সুপ্তভাবে। আপনি যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কথা বলছেন তারা সুপ্তভাবে খুবই আছে। যেকোনো ব্যক্তি আলোচনার ভেতরে আপনি তা বুঝবেন যে উনাদের দেশের ব্যাপারে যে আগ্রহ বা দেশপ্রেমিকতা সেটা অন্য কারো চেয়ে কম না কিন্তু সাধারণভাবে যদি সব জায়গায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিরাজ না করে তাহলে তারা বিভিন্নভাবে গুটিয়ে যায় বিশেষ করে যারা বৈদেশিক সাহায্যের ভেতরে চলে। কারণ তাদের কাজকে যেমন এটা কিছুটা মিডিয়ার ক্ষেত্রেও সত্য তারা নিজেদের সংযত রাখে। এর সাথে তৃতীয় যেটা আছে সেটা হলো রাজনৈতিক শক্তি। আমি তিনটি জায়গা দেখি সেগুলো হলো রাজনৈতিক দল, মিডিয়া, নাগরিক। এক্ষেত্রে আমি যেটা লক্ষ করছি যে পরিবেশটা যদি পরিবর্তিত না হয় সেক্ষেত্রে এদেরও ভূমিকা রাখার সুযোগ থাকে না।

সমস্যা হয়ে গেছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে কাজ করার ক্ষেত্রে এটিই হলো বড় সমস্যা সেটা হলো সরকার এবং রাষ্ট্র দুটো যে ভিন্ন জিনিস, সরকারের বিরোধিতা করা মানেই রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা না। আপনি যদি এ সরকারকে পছন্দ নাও করেন তার মানে এই না আপনার ভেতর দেশপ্রেম আর কারো চেয়ে কম আছে। এই জায়গাটাতে আমরা যখন দেখি

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে হয় পুতিনের রাশিয়া সম্ভবত তার ভালো প্রমাণ যে এখন পুতিন সাহেব যাই করেননা কেন রাশিয়ার সমস্ত দায়-দায়িত্ব তার উপরে গিয়ে বর্তাচ্ছে। এখানে নাগরিকদের কণ্ঠস্বর যদি বিচ্ছিন্নভাবে বলেও যে আমি যুদ্ধকে সমর্থন করি না তার এই বলার জায়গাটাও কিন্তু কতগুলো জায়গাতে কমে গেছে। সে জায়গাটা যদি না থাকে তাহলে পুতিন সাহেবই কিন্তু শেষ বিচারে গিয়ে একদিন পড়বেন। আমি আপনাকে আরো উদাহরণ বলি যেহেতু রাশিয়ার প্রশ্ন তুললাম। দেখুন তিনি মনে করেছিলেন তাকে বলেছিল রাশিয়ার সমস্ত সেনাবাহিনীর প্রধানরা আপনি তো দুইদিনে কিয়েভে যেয়ে পৌঁছাবেন। উনি বিশ দিনেও ওখানে পৌঁছাতে পারেননি। উনাকে বলেছিল পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো অস্ত্রসস্ত্র আমাদের আছে অথচ উনার সেই অস্ত্রসস্ত্র কোনো কাজে ব্যবহার হচ্ছে না। উনাকে বলেছিল আমাদের বাহিনীর পদাতিকরা হলো সবচেয়ে বেশি শিল্প শিক্ষিত তারাও ওখানে ফেলে অনেক সময় যাচ্ছে।

এই যে দেখেন উনি যে আকাজ্জা করেছিলেন এবং তার ভেতর যে পার্থক্য এখানে যে, তিনি যুদ্ধের সমরাস্ত্রনে যেয়ে এর মধ্যে বিধ্বস্ত হয়ে গেলেন। নেতাদের এটিই মনে রাখার ব্যাপার যে আমরা যখন কেন্দ্রীয়ভাবে এটা করি এর জন্য এক সময় বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয় এবং তথ্য-উপাত্তে আমরা মিথ্যা তথ্য বা ভেজাল তথ্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত নেই। এই তথ্য-উপাত্তের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ওই তিনটি জায়গা অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। নাগরিক সমাজ, মিডিয়া এবং ওই রাজনৈতিক দল, নিজের দল এবং বিরোধী দল। এই তিনটাকে যদি আপনি ঠিকমত কাজ করতে না দেন, তাহলে ঐ তিনটির জায়গায় অন্য কোনো শক্তি কিন্তু বিকল্প হিসেবে আসে, বিদেশিরাও তখন বিকল্প হিসেবে আসে। তখন বিদেশি হস্তক্ষেপের জন্য আপনি অনেক বেশি ভঙ্গুর অবস্থার ভেতরে থাকেন এবং আপনাকে ওটা গ্রহণ করতে হয়। পাকিস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখুন তখন কী দাঁড়ায় এটার ভেতরে, এখন শ্রীলঙ্কার কী হবে, এখন নেপালের ক্ষেত্রে কী দাঁড়াবে। সেহেতু আমার বিশ্বাস হলো বাঙালি তো আসলে বুদ্ধিমানের জাতি, স্ব-প্রতিভার জাতি, অনেক বেশি উদ্ভাবনের জাতি। তাই আজকে নববর্ষে আমার আকাজ্জা হলো তার এই স্বপ্রতিভা বৈশিষ্ট্য, বিচক্ষণতা, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি দিয়ে আগামী বছর বড় ধরনের উন্নয়নের সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে।

জিল্লুর রহমান: অনেক ধন্যবাদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যকে। ইংরেজি নববর্ষের শুরুতে তিনি বলেছিলেন ২০২২-২৩ হবে বাংলাদেশের জন্য ভিত্তি বছর এবং বাংলা নববর্ষের শুরুতে তিনি বললেন সেটি এখন পর্যন্ত সে ধারাতেই এগোচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তিনি আরো যা বলেছেন যে সবার লক্ষ্য এখন আগামী নির্বাচন এবং নির্বাচনই যথেষ্ট নয়, এর আগে পরে অনেক কাজ করার আছে।

চ্যানেল আই ‘তৃতীয় মাত্রা’-এ প্রচারিত

১২ এপ্রিল, ২০২২

প্রস্তুতির জায়গা হলো দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর জনসম্পৃক্ততা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

জহিরুল আলম: আমরা কোর ইকোনমিক যে ম্যানেজমেন্ট আছে সেগুলো নিয়ে গুনবো। কিন্তু সব মিলিয়ে এ সময়টা আপনি কীভাবে দেখছেন। এই যে ২০২২ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি এসে যে কোভিড-পরবর্তী আমরা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ দেখছি, যুদ্ধ দেখছি এবং আন্তর্জাতিক নানারকম পোলারাইজেশন দেখছি সেখানে বাংলাদেশ কোথায় আছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশ সমস্যায় আছে। কারণ পরিস্থিতি জটিল হয়েছে এবং আমাদের মত বিকাশমান অর্থনীতি তুলনামূলকভাবে ছোট অর্থনীতি, পৃথিবীর যারা নিয়ম-নীতি ঠিক করেন তারা কীভাবে পৃথিবী চলবে তারা যখন নিজেদের ভেতর বাকবিতণ্ডা বা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যান তখন যারা নিয়ম-নীতির উপকারভোগী আমাদের মত দেশগুলো তারা তখন সবচেয়ে বেশি সমস্যার মধ্যে পড়ে এবং এটিই এ মুহূর্তের বাস্তবতা। এ মুহূর্তে ইউক্রেনের যুদ্ধ সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছে সেটা হলো যে পৃথিবীতে এ মুহূর্তে একটি দক্ষ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক কোনো বৈশ্বিক শাসন ব্যবস্থা নাই। যে জাতিসংঘকে আমরা এত পছন্দ করি বা সম্মান করি সে জাতিসংঘের ভেতরে যে নিরাপত্তা পরিষদ আছে, এ পরিষদের যে পাঁচটি স্থায়ী সদস্য আছে তাদের একজন যখন যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তাদের তিনজন যদি একজনের সাথে দাঁড়ায় এবং আরেকজন যদি আরেকজনের সাথে যায় তখন পুরো পৃথিবীর ভেতরে শান্তি, স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন ইত্যাদি ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়, জিম্মি হয়ে যায় এবং সেটিই হয়েছে। ইউক্রেনের যুদ্ধে আমি বিন্দুর ভেতর সিদ্ধ দেখি।

আমি যেভাবে দেখি এটা সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর বুকে বৈশ্বিক যে ব্যবস্থা আমাদের আছে তার এক ধরনের দেউলিয়াত্ব কঠিন শব্দ হয়তোবা হবে কিন্তু নিঃসন্দেহে তার দুর্বলতা এবং অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে এবং এটার সাথে যেটা হয়েছে যে রাজনৈতিক, ভৌগোলিক বা ক্ষমতার যে প্রতিফলন আমরা জাতিসংঘে দেখি এটা হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের পৃথিবী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জাপান হেরে গেছে, জার্মানি হেরে গেছে, তারা স্থায়ী সদস্য হয়নি। কিন্তু হয়েছে যারা জিতেছে, যেমন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, চায়না ইত্যাদি। এখন

আপনি দেখেছেন যেটা সেটার ভেতর জাপান নাই, সে অর্থে জার্মানি নাই। সেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যে প্রতিফলন এই জাপান এবং জার্মানির যে উত্থান সেটার কিন্তু কোনো পরিবেশ বা প্রতিফলন নেই। দ্বিতীয় যেটা হয়েছে এটা যে শুধু ৪৫ সালের পরবর্তী পৃথিবীরই প্রতিফলন তা না, আবার এটা ১৯৯০ এর পরের পৃথিবীর প্রতিফলনও না। ১৯৯০-৯১ এ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেছে, সমাজতন্ত্র একটা অবস্থান থেকে বের হয়ে গেছে। চীন বা ভিয়েতনামের আলোচনা নাই করলাম। কিন্তু সোভিয়েত-উত্তর পরিস্থিতির কোনো প্রতিফলন এটার ভেতরে নাই। এর ভেতরে ন্যাটো দাঁড়িয়ে আছে যেটা অনেক ক্ষেত্রেই কমিউনিজমের পরবর্তী স্নায়ুযুদ্ধের প্রতিফলন হিসেবে। তাহলে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান পৃথিবীতে আছে এখন, ইউক্রেনের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর শক্তির যে ব্যবস্থাপনা এর ব্যাপারে একটি বড় ধরনের চিন্তা আসছে।

যেটা আমি আপনাকে বলতে চাচ্ছি তা হলো এ যুদ্ধ কীভাবে শেষ হবে এবং এটা শেষ হবার পর কী হবে এটা বাংলাদেশের মত দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ যুদ্ধ কে জিতবে বা কে হারবে অথবা যদি কোনো সমঝোতা বা শান্তিচুক্তি হয় এর উপর ভিত্তি করে বিশ্বে কী হবে এটাও একটা বড় বিষয়। আমি দুটো উদাহরণ দিই আপনাকে। একটা তো দেখলেন পণ্যমূল্যের দাম কী হচ্ছে যে বাড়ছে। যুদ্ধটা এমন সময়ে শুরু হয়েছে যখন সবমাত্র অতিমারি উত্তরণ করে বাজার আবার চাপা হচ্ছিলো, চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে তেলের চাহিদা বাড়ছিল এবং তেলের দাম বাড়ার শুরু করলো। এমন একটা সময়ে আসলো যখন তেল এবং গ্যাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হলো। তাহলে এটা একটা বড় বিষয় যে আগামী দিনে জ্বালানির ক্ষেত্রে কী ধরনের ব্যবস্থাপনা আসবে। রাশিয়ার গ্যাসই বলেন বা মধ্যপ্রাচ্যের তেলই বলেন বা ভেনিজুয়েলার তেলই বলেন।

আর আপনারা দেখেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে ভেনিজুয়েলার কাছে চলে গেছে এ ঘটনার ভেতর দিয়ে। সেহেতু দ্বিতীয় যেটা আসছে সেটা হলো আপনার সরবরাহ ব্যবস্থা। এ সময়টায় সবচেয়ে বড় সমস্যা যে পণ্যটিকে নিয়ে চিন্তায় সকলে সেটা হলো মাইক্রোচিপস। যে চিপসের ব্যতিরেকে আপনি কম্পিউটার তো নাই, যেকোনো আধুনিক যন্ত্রপাতি আপনি এটা ছাড়া তৈরি করতে পারেন না। এটার সরবরাহের ক্ষেত্রে চীন বলেন বা অন্য কোথাও বলেন এটা ভেঙে পড়েছে। এটার ফলে চীন যদি এখন রাশিয়ার সাথে থাকে এখন এটার নিষেধাজ্ঞা এখন কার উপরে কোথায় গিয়ে পড়ে এটা বলা যাচ্ছে না।

তৃতীয় যে জিনিসটা আসছে, যেহেতু যোগাযোগ ব্যবস্থা আক্রান্ত হয়েছে অতিমারির সময় এবং পরবর্তীতে এটা থেকে যখনই বের হবে তখনই জ্বালানির দাম বাড়ছে, পণ্যমূল্য বাড়ছে, সারের দাম বাড়ছে, ভোজ্য তেলের দাম বাড়ছে। একমাত্র চিনির দাম কিছুটা কমেছে। তখন অনেকে মনে করছেন যে নৌ চলাচলের মাধ্যমে, যেহেতু প্লেন বন্ধ তাই এটার উপর চাপ পড়ছে। এটাকে ম্যারিটাইম রুট বলে। এটাতেও পণ্যমূল্য নেয়ার ক্ষেত্রে অসম্ভব রকমের দাম বেড়ে গেছে, বাণিজ্য লজিস্টিকস যেটা এটাও বেড়ে গেছে। অর্থাৎ আগামী যুদ্ধ-উত্তর পরিস্থিতিতে, কোভিড-উত্তর পরিস্থিতিতে, ট্রাম্প-উত্তর পরিস্থিতিতে পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক, বৈশ্বিক শাসন ব্যবস্থা কী হবে এটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, অর্থনীতির পণ্য সরবরাহ, বিভিন্ন চলাচলের ব্যবস্থা বা

যে সরবরাহ কাঠামো আছে এগুলো নতুনভাবে আসবে। পৃথিবীতে দেখা যায় যে, যখনই কোনো সংকট হয় তখনই প্রযুক্তিগত উন্নয়ন অনেক বড় হয়। ইতিবাচক দিক যদি থাকে তাহলে এটা যে, উন্নতি হবে। কিন্তু বাংলাদেশের মত দেশের কথা যদি বলেন এ সবগুলো যেগুলো বললাম এগুলো মোকাবিলা করতে বাংলাদেশের আরো বেশি তৎপরতা এবং সক্ষমতার প্রয়োজন পড়বে।

জহিরুল আলম: এই যে নতুন বিশ্বের কথা আপনি বলছেন। এর অন্তর্দর্শনশীলতা বা দুর্বলতা এবং প্রতিষ্ঠানগতভাবে যে অসামঞ্জস্যতা সেটার সাথে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যুদ্ধের বাইরেও, যেমন: পাকিস্তানে একটা সরকারের পতন হয়ে গেল, শ্রীলঙ্কাতে একটা সরকার বাউ টু কলাপস সেখানের অর্থনীতি সাংঘাতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশেও আপনি যেমন বললেন ভেনিজুয়েলা যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি চলে এসেছে বা যুক্তরাষ্ট্র ভেনিজুয়েলার কাছাকাছি চলে এসেছে আবার আমরা দেখলাম যুক্তরাষ্ট্রের ভোটাভোটের সময় বাংলাদেশ রাশিয়ার কাছাকাছি বা এখন বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি অনেকটা এংগেজমেন্টের দিক থেকে। এ ব্যাপারে আপনি কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেখুন বিশ্ব ব্যবস্থার এ সংকটকে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের মত দেশে সবচেয়ে বেশি যে প্রস্তুতি দরকার পরে সে প্রস্তুতির জায়গা হলো আমাদের মত দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এর সাথে জনসম্পৃক্ততা, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ইত্যাদি বিষয়গুলো। আপনি যে পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার কথা বললেন, আমি কিন্তু নেপাল এবং মালদ্বীপ ও এটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারবো। আর মিয়ানমার তো আলোচনার প্রশ্নই আসে না। তারা আরো চরম অবস্থায় আছে। এ সব জায়গাতেই দেখবেন হয় তাদের অর্থনৈতিক সুশাসন বিঘ্নিত হয়েছে অথবা তাদের রাজনৈতিক সুশাসন বিঘ্নিত হয়েছে। অর্থনৈতিক সুশাসন বিঘ্নিত হবার কারণে রাজনীতি নষ্ট হয়েছে এবং রাজনীতি নষ্ট হবার কারণে রাজনীতি নষ্ট হয়েছে। শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানের উদাহরণ এর প্রমাণ। অর্থাৎ কী দেখেন যে আপনি এরকম একটি নির্বাচিত পরিবারভিত্তিক একনায়কের মত একটি রাজাপাকসের পরিবার ছিল। সে তার বৈধতার জন্য এমন সমস্ত প্রকল্প করেছে যার কোনো অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা নেই যে দায়-দেনা করেছে তা পরিশোধ করার মত তার সক্ষমতা নেই।

কোভিড আসার কারণে তার পর্যটনের আয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে, রপ্তানিতে অসুবিধা হয়েছে, চায়ের দামের ক্ষেত্রে ওঠা-নামা আছে। এরপর তার ভ্রান্তনীতিতে যে একবারে তার কৃষিতে জৈবসার ব্যবহার করার ক্ষেত্রে। এসব কিছু মিলিয়ে এমন একটা অবস্থা হয়েছে যে তারা একটা এমন জনপ্রিয় সরকার সেখানে একমাসের মধ্যে কীরকম করে ঘটে গেল। যে শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশের মত দেশের কাছে আশি-নব্বই দশকে বাংলাদেশের মত দেশের কাছে আদর্শের একটা জায়গা ছিল। সে দুই দশকে যা করেছে, দুই বছরে তা ক্ষয়ে ফেললো। পাকিস্তানে আপনি দেখেন সে তো আরো খারাপ অবস্থা। কারণ তার অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সুশাসনের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর ভূমিকা আমরা জানি, পাকিস্তানের কারণে তাদের অন্যান্য ঘটনা আমরা জানি, ভারতের সাথে কাশ্মীর নিয়ে আমরা জানি এবং সর্বোপরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে

টানাপোড়ন এবং চীনের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি হয়েছে। ইমরান খান দেশে ইউক্রেন আক্রমণ হয়েছে তারপর দিন তিনি ক্রেমলিনে গিয়ে হাজির হয়েছেন। এটা তো আরো জটিল পরিস্থিতির ভেতরে আছে। কিন্তু উনারা যদি রাজনৈতিকভাবে সুশাসনকে নিশ্চিত করতে পারতেন তাহলে এ সমস্ত পরিস্থিতি মোকাবিলা করা উনাদের জন্য সহজ হতো। ইমরান খানও চীন থেকে অনেক টাকা নিয়ে এসেছে আপনারা জানেন। আমি আপনার সাথে মিলিয়ে এটা বলতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশের মত দেশকে আগামী দিনের সমস্যাকে মোকাবিলা করতে হবে তার সবচেয়ে বড় সুরক্ষার জায়গা হলো রাজনৈতিক সুশাসন এবং অর্থনৈতিক সুশাসন। এ দুটো যদি না থাকে তাহলে আমাদের যে অর্জনগুলো হয়েছে গত দশক বা কয়েক বছরে এগুলোকে টিকানো কষ্টকর হবে।

জহিরুল আলম: এখানে আসলে কানেকশন/রিলেশনও জরুরি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এখন দেখুন আন্তর্জাতিক সংযোগ আপনি যেটা বলছেন সেখানে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন আমরা ট্রান্স-উত্তর যুগে দেখেছি এবং এখন পুতিন সম্পর্কিত ইউরোপেও এ উপলব্ধি খুব জোরদার। সেটা হলো গণতান্ত্র্যনের বিষয়টি, মানবাধিকারের বিষয়টি, আইনের শাসনের বিষয়টি এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং এটা শুধুমাত্র ভূ-রাজনৈতিক বা নিরাপত্তাজনিত বিষয় নয়। এটাকে এখন বাণিজ্যের সাথে যুক্ত করা হচ্ছে, বিনিয়োগের সাথে যুক্ত করা হচ্ছে, পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে যুক্ত করা আছে। আর তাছাড়া সংখ্যালঘুদের অধিকার, নারী অধিকার ইত্যাদি তো আছেই। এ জায়গায় বাংলাদেশের অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

জহিরুল আলম: আপনি গভর্নেন্সের কথা বললেন পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন রূপে। তো এখানে বাংলাদেশ কোথায় আছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এই যে কোভিড-পরবর্তী যে পরিস্থিতি, এখানে রাষ্ট্রের যে সর্বাঙ্গিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখানে আসলে সুশাসনের ব্যতিরেকে আর কোনো সমাধান নেই। বাংলাদেশের দিকে আপনি তাকিয়ে দেখেন যে বিগত সময়কালে কয়েকমাস ধরে আপনার বাজারের পরিস্থিতি তো অত্যন্ত সংকটজনক। কারণ পণ্যমূল্যের যে দাম বাড়ছে এটিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র এবং বাজার ব্যবস্থাপনা এ দুটোকেই করার ক্ষেত্রে আমরা কোনো সুফলের মধ্যে পাইনি। নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত যেভাবে তাদের আয় বেড়েছিল ব্যয় এর চেয়ে অনেক বেশি হওয়ার জন্য তার জীবনমানের যে শুধু অনেক ক্ষয় হচ্ছে তা না, তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রকটভাবে আসছে। বাংলাদেশের গত দশ-বারো বছরের সবচেয়ে বড় শক্তির একটা জায়গা ছিল এ সরকারের আমলে একটি নব্য মধ্যবিত্ত গড়ে উঠেছে এবং এ নব্য মধ্যবিত্ত বিভিন্ন বিনিয়োগ, সরকারী প্রতিষ্ঠানে এবং বিশেষ করে ব্যক্তিগত তারা কর্মরত হয়েছে। এর একটি বড় অংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতেও আছে। কিন্তু বাজারে এই যে দ্রব্যমূল্য এবং খাদ্যপণ্যমূল্যের বাজারে যে বৃদ্ধি হয়েছে এটা তাদের যারা এগিয়েছিল গত দশ-বারো বছরে তাদের অনেক পিছিয়ে ঠেলে দিবে এবং এ পিছনে ঠেলে দেয়ার সাথে কোভিড যুক্ত হয়ে তাদের পুষ্টি, তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয় প্রভাবিত

হবে। তাদের অনেকের ক্ষেত্রেই আমরা জানি, আমাদের গবেষণার পরিসংখ্যান দিয়ে আপনাকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। তাদের যেটুকু সঞ্চয় ছিল তাদের অনেকেই সে সঞ্চয় ভেঙেছে, বিভিন্ন জায়গা বা প্রভিডেন্ট ফান্ড যেখানে সুযোগ আছে সেখান থেকে তারা ঋণ নিচ্ছে। আমরা একটা গবেষণা করেছি যেখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক পরিবারের দায়-দেনা এরকম দাঁড়িয়েছে তারা অনেকেই নিজের স্বর্ণালংকার থেকে আরম্ভ করে তাদের জমিজমা অনেক কিছু বিক্রি করেছে। ঢাকাতে থাকতে পারছেন না, বাইরে চলে যাচ্ছে। দেখা গেছে যে অন্তত তিন থেকে পাঁচ বছর লাগবে যদি স্বাভাবিক জীবনে থাকে এই দায়দেনা তার শোধ করতে হবে। সে পিছিয়ে গেছে অন্তত তিন থেকে পাঁচ বছর। এখানে আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন বাজারের যে অবস্থা এটাকে মোকাবিলার জন্য অর্থনৈতিক যে কতগুলো পদ্ধতি আছে সে পদ্ধতিগুলো সরকার যদিও বা নেয় তা অনেক দেরী করে নেয় এবং অপর্যাণ্ডভাবে নেয়।

জহিরুল আলম: আপনি কী বলেন, এই যে শুষ্ক স্বল্প করেছে, আমদানি সহজ করেছে, ভর্তুকি বাড়িয়েছে, টিসিবির পণ্য বিক্রি করছে, এগুলো কি পর্যাণ্ড?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনার শীতের গীত তো বসন্তে গাইলে হবে না। আপনি বসন্ত পার করে এসে যদি শীতকালের কথা বলে কয়ল দেন তাহলে তো এটা কোনো কাজে দিবে না। আপনাকে আমি উদাহরণ হিসেবে বলি, এ কাজটা যদি সে তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে, সমস্যা একটা হতে পারে তা নিয়ে অস্বীকারের মনোভাবের মধ্যে না থেকে যদি পদক্ষেপ নিতো। তাহলে বাজারে অনেক আগেই পণ্যমূল্য আসতো, ভোজ্য তেলের দামকে সে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করতে পারতো। এত লোককে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্যপণ্য দিতে হবে এই বিবেচনায় কারণ দেখেন সরকার কিন্তু গত বছরের আগের বছর আমরা যখন বলছি নতুন দরিদ্র সৃষ্টি হয়েছে, সরকার কিন্তু বলছে কিছুই হয়নি, অস্বীকার করলো। এই নতুন দরিদ্রই আজকে টিসিবির লাইনের সামনে দাঁড়াচ্ছে এবং টিসিবির ট্রাক যে একটা নয় একশোটা লাগবে এই মূল্যায়নটাও সরকার ঠিক ভাবে করছে না।

জহিরুল আলম: তাহলে যে স্বীকৃতিটা এসেছে যে এক কোটি লোককে খাদ্য সাহায্য দিবে...?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আচ্ছা আমি আবার ফিরে আসি আপনি যেহেতু এক কোটি লোকের কথা বললেন। দেখুন এই এক কোটি লোককে খাদ্যদ্রব্য ৩৩০ টাকা করে প্যাকেট বানিয়ে দেয়ার কথা এটা করার কথা রোজার ১৫ দিন আগে। এর মধ্যে রোজা পার হয়ে গেছে ১০ দিন এখন পর্যন্ত তো পুরোটা করতে পারেনি। স্মরণ করে দেখেন, নেত্রী অতিমারির সময় দিতে চেয়েছিলেন পঞ্চাশ লক্ষ মানুষকে। উনারা পয়ত্রিশ লক্ষের বেশি মানুষের নাম ঠিকানা ঠিক করতে পারেনি। চিন্তা করেন বাংলাদেশে দুই কোটির উপরে দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষ আপনি দিতে চাইছেন তাদের কিন্তু দিতে পারছেন না খাওয়া-দাওয়া। আপনি বুঝছেন সক্ষমতার জায়গাটা কোথায়? এটিই আমি বলতে চাচ্ছি যে সরকারের আকাজক্ষা থাকলেও সক্ষমতার অভাবে এটাকে বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এখন দেখুন এই যে এক কোটি পরিবারকে আপনি দিবেন এরা কি আগের সে পঞ্চাশ লক্ষ থাকবে? আসলে ওটা সাড়ে আটত্রিশ হয়েছিল কারণ ওটা পঁয়ত্রিশ এরপর তার সাথে নন-এমপিওর শিক্ষকদের আনা

হয়েছিল, বরিশাল এবং ঢাকার নগর দরিদ্র আনা হয়েছিল, পরিবহন শ্রমিকদের আনা হয়েছিল। এখন কথা হলো এদের তো কোনো তথ্য ভান্ডার নাই। এরা কে কোথায় আরো ৩৭টা যে বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা কাঠামো আছে অথবা বিভিন্ন ভাতা আছে তার ভেতরে আছে কি না আছে, তারা কি পাবে কি পাবেনা এটার ব্যাপারে কোনো সমস্বয় নাই। খাদ্য মন্ত্রণালয় একরকম করে চলছেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আরেক মত করে চলছেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় আরেকভাবে চলছেন। এদের মধ্যে সমস্বয় করে যে একীভূত কর্মসূচি দাঁড়া করানো এটার তো কোনো উদ্যোগ নেই। এটাই সুশাসনের অভাব। যেটা হলো যে সুশাসন কী? সুশাসন হলো আপনার যে স্বল্প সঙ্গতি আছে তার সর্বোচ্চ ব্যবহার করার জন্য একটা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো।

জহিরুল আলম: সুশাসনের কথা যদি বলেন, আমার এ ব্যাপারে একটা বিভ্রান্তি আছে। এই যে খাদ্যপণ্য মূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি এ ব্যাপারে অস্বীকার করার কিছু নেই। কিন্তু আমাদের যে মূল্যস্ফীতির পরিসংখ্যান সেটা তো নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই আছে বলা হচ্ছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনারা কি জানেন যে মূল্যস্ফীতির হিসাব দেয়া হয়, মূল্যস্ফীতি তো হয় একেকটা থানাতে কী কী পণ্য যে ভোগ করে সেটির কাঠামোর উপর ভিত্তি করে সেটির দাম ঠিক করে তারপরে বের করা হয়। এখন যেটা হচ্ছে সেটা ২০০৫ সালের ভোগ কাঠামোর উপর করা হচ্ছে। সুতরাং আপনি যদি ২০০৫ সাল অনুযায়ী করেন তাহলে গত ১৭ বছরে ভোগের ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন হয়েছে, কী কী নতুন পণ্য এর ভেতর এসেছে এবং পুরানো পণ্য আপনি যা কম ভোগ করছেন সেটার কোনো প্রতিফলন এর ভেতর নেই, মূল্যস্তরের প্রতিফলনও নেই। এটা দিয়ে সরকার আত্মবিভ্রান্তি তৈরি করছে। আমি আপনাকে উদাহরণ হিসেবে বলি, আপনার স্মরণ আছে গত বছর চালের ঘাটতি না চালের উদ্ভূত এ বিতর্ক হয়েছিল। এর উৎস ছিল একজন দেশপ্রেমিক পেশাজীবী সরকারকে খুশি করার জন্য সম্ভবত চালের উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়ে বলেছিলেন। সে চাল বাজারে খুঁজে পাওয়া গেল না। কৃষিমন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রী বললেন কই সেই চাল তো বাজারে কোথাও দেখছি না এত যদি উৎপাদন হয়ে থাকে। এটা একটা অসত্য পরিসংখ্যান ছিল যার ভেতরে সরকার বিভ্রান্ত হয়ে যখন চাল আমদানি করতে চাইলো তখন আর পারলো না। এটিই সমস্যা, সুশাসনের অভাবটা হলো এটাই যে আপনার কাছে তথ্য-উপাত্ত ঠিকভাবে সঞ্চালন হচ্ছে কিনা এবং আপনি-আমি আলাদা আলাদাভাবে সিদ্ধান্ত না নিয়ে যৌথভাবে সমাজের জন্য যেটা ভালো সে সিদ্ধান্তটা নিতে পারছি কিনা এক্ষেত্রেই সমস্যা আমি দেখছি।

জহিরুল আলম: এখন যে অবস্থার মধ্যে আমরা আছি সেটাকে কি পাকিস্তানের কথা বাদ শ্রীলঙ্কার সাথে যদি আপনি তুলনা করেন? ওখানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চরম একটি দুর্বলতা ফুটে উঠেছে। আমাদের এখানে তো আমরা মোটামুটি নিশ্চিত হচ্ছি, আপনি কী মনে করেন অর্থনীতিবিদ হিসেবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: শ্রীলঙ্কাতে আমার প্রচুর বন্ধুবান্ধব আছেন, স্বাধীন বিশ্লেষক আছেন তারা তিন বছর আগে কী বলেছেন আপনি একবার খুলে দেখেন। তখন তাদেরও একইরকম ভাবে

অস্বীকার করা হয়েছে, তাদেরও দেশদ্রোহী আখ্যা দেয়া হয়েছে, তারা দেশপ্রেমিক না, দেশের উন্নয়ন চায় না ইত্যাদি বলা হচ্ছে বা আপনি তারপরে বাংলাদেশের সাথেও মিলিয়ে দেখেন। আজ থেকে আমি না থাকলেও আপনি তো থাকবেন, আপনি তরুণ মানুষ। আমি তো বললাম শ্রীলঙ্কাকে উঠতে দুই দশক লেগেছিল। পতন হতে লেগেছে দুই বছর। আমার ২০-২২ শতাংশ ছিল বৈদেশিক দায়দেনা পরিস্থিতি তাও আমরা আত্মতৃপ্তিতে থাকি। প্রত্যেক বছর দেড় শতাংশ করে বাড়ছে। আপনি দেখেন ২০২৬-২৭ সালে এটা একটা ক্রিটিকাল অবস্থার মধ্য দিয়ে যাবে। আগে আমরা বিদেশী সাহায্য নিতাম ২০০ কোটি ডলার, এখন নেই ৭০০ কোটি ডলার। আপনার পুরোটাই আসে সাশয়ী আসেনা, অনুদান ও আসেনা, রেয়তি ও আসেনা। আপনি ধার করছেন সেই ধার শোধ করবেন। আপনি প্রকল্প করেছেন, ধার নিয়েছেন পাঁচ বছরের জন্য এবং আপনার প্রকল্প চলবে ১৫-২০ বছরের জন্য। আমরা এটাকে ইংরেজিতে বলি 'ফ্লো অফ বেনিফিট'। আপনার যে সুবিধাটা আসবে সেটা আসবে অনেক বড় সময় ধরে এবং টাকা শোধ করতে হবে ছোট সময় ধরে যেটার ভেতর সময়ের বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়। এই শ্রীলঙ্কা দুই-তিন বছর, পাঁচ বছর আগে শুধু যে বৈদেশিক সাহায্য তা না, তাদের যে সভরেন বন্ড বিক্রি করে ডলার তুলেছে যেটাতে তার দিতে হবে, যেটাতে সে খেলাপি হয়ে গেল এবং আমাদের তখন বলা হলো আমরা কেনো শ্রীলঙ্কার মত করছি না, শ্রীলঙ্কা আমাদের থেকে ছোট দেশ। আমরা তখন বার বার সাবধান করেছি এটার ভেতরে ঢুকেননা এখনই। তারা তখন বলেছে তাদের বিদেশি মুদ্রা মজুত অনেক ভালো আছে, দেখুন তাদের বিদেশি মুদ্রা মজুত কতটুকু আছে।

আপনার এ মুহূর্তে যে মজুত আছে আর টাকার দর পতন হচ্ছে, লক্ষ করে দেখেন আপনার ক্রমশঃ টাকা খোলা বাজারের সাথে দুই টাকা, তিন টাকা, চার টাকা করে পার্থক্য বাড়বে এখন আর টাকার আপনি অবনমন করাতে চাচ্ছেন না কারণ হয়ত মনে করছেন এর ফলে আমার আমদানিকৃত পণ্যের দাম বাড়বে এবং মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাবে। আবার এটাকে আটকানোর জন্য যারা রপ্তানি করে তারা মনে করছে পারছেন। রেমিট্যান্স এবং রপ্তানির জন্য আপনি তাদের ভর্তুকি দিচ্ছেন। ভর্তুকির টাকা কিন্তু বিরাট টাকা যদি সুযোগ দেন তাহলে আলাপ করবো। এ অর্থ বছরের ভূত হলো ভর্তুকি। সেটাতে যেটা হচ্ছে যে তার তো এত ডলার আছে তাহলে সে স্টেরিলাইজেশন করে না কেন? অর্থনীতির টামটা হচ্ছে স্টেরিলাইজেশন। অর্থাৎ আপনি এটাকে শোধন করবেন। কীভাবে এই শোধন করবেন? আপনি যদি প্রভূত পরিমাণে ডলার বাজারে ছাড়তেন ওই রিজার্ভ থেকে তাহলে টাকার সাথে ডলারের মূল্যমান আপনার স্থিতিশীল হতো। কিন্তু এত টাকার পরে আপনি তো সাহস করছেন না। গত বছর বোধহয় মাত্র দুই বিলিয়ন ডলারের মত বাজারে ছেড়েছিল। এ বছর আমরা এখনো এ সময়কালে দেখছি না। তাহলে এত মজুত কেন কাজে দিচ্ছে না? তার মানে মজুদের ভেতরেও সাম্প্রতিককালে পতন ঘটছে এটা দেখেন একটা। আর আপনি যে সরকার যে এরপরে যে ভর্তুকি দিবে।

জহিরুল আলম: ভর্তুকিতে আসার আগে আপনি ডেট সার্ভিসিং এর কথা যেটা বললেন, রিপেমেন্ট এর কথাটা। আমরা লম্বা সময় ধরে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবো কিন্তু সময়টা এত দীর্ঘ নয়। তখন আরেকটা শুরু হয়ে যাবে, তখন কিন্তু আমাদের বার্ডেনটা ইকোনমিতে পড়বে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা তো শুরু হচ্ছে আস্তে আস্তে; আর এ বোঝাটা আমাদের ইকোনমিতে আসছে। এই দায়-দেনার পরিস্থিতি এখন ক্রমান্বয়ে আপনার বলা হয় যে ৫২ শতাংশ পর্যন্ত যদি দেশজ আয়ে না যায়। আপনি ইতিমধ্যে ৪০ পার করেছেন। আপনি শুধু দেখবেন গত দশ বছরে কেমন করে দিগুণ হয়ে গিয়েছে। দশ-বারো বছর আগে যা ছিল ১৫/১৬ শতাংশ থেকে এটা চলে এসেছে কততে। আপনি বলছেন এখনো অনেক বাকি আছে আর আমি বলছি আপনি কত থেকে কততে চলে আসলেন লক্ষ করে দেখেন।

জহিরুল আলম: শ্রীলঙ্কাতে তো ১০০ বিলিয়নের উপরে বৈদেশিক ঋণ আছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: শ্রীলঙ্কাতে তিনটা সমস্যা হয়েছে। একটা হচ্ছে ওদের বৈদেশিক ঋণ পাঁচ-ছয় মাস আগেও ছিল তাদের জিডিপি ৯৬ শতাংশ, এখন এটা বেড়ে ১২০-১৩০ এর মত হয়েছে। ওদের আরো বড় সমস্যা ছিল।

জহিরুল আলম: আমাদের ১০/১৫ এর মত আছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: না, আমাদের এখন ৪০ এর উপর হয়ে গেছে। এখানেও তথ্য-উপাত্তের ক্ষেত্রে আমাদের বড় ধরনের সংশয় আছে।

জহিরুল আলম: যেটাকে আপনি তথ্য নৈরাজ্য বলেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি তথ্য নৈরাজ্য বলি, তথ্যের অন্ধত্ব বলি। এটা তো আমি আপনাকে চালের হিসেব দিয়ে বোঝালাম মূল্যস্ফীতিতে। আমি যেটা বলছি যে আপনার হিসাব কিতাবের ভেতরে সাপ্লায়ারস ক্রেডিট যেগুলো আছে এগুলোকে অনেক সময় আমরা বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে দেখি। অনেক সময় অফ বাজেট ফাইন্যান্সিং বলে। অর্থাৎ, অনেক সময় বাজেটের বাইরে থেকে যেটা বাজেটের ভেতর দেখা যায়না এগুলোর ভেতরেও ফাইন্যান্সিং হয়। আপনাকে আমি ভর্তিকির কথা বলি। দেখুন ভর্তুকি এবং সুদ-আসলে এ বছর রাজস্ব বাজেটের প্রায় ৫৫ শতাংশ চলে যাবে। আর যদি এর সাথে বেতন-ভাতা ধরেন তাহলে এর সাথে ৯০ শতাংশের উপরে। খুব সামান্যই টাকা থাকবে যেটা দিয়ে আপনি উন্নয়ন প্রকল্প করতে পারবেন।

জহিরুল আলম: ধার নিবো সঞ্চয়পত্র থেকে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি তো ইতিমধ্যে বাজেটের সাপোর্টে ৫০ কোটির বেশি ডলার বিশ্বব্যাংক থেকে নিয়েছেন। এছাড়া আপনি দেখেন কী হয়েছে। যেহেতু গত সময়কালে প্রবৃদ্ধি হয়েছে এবং আমি বলেছি সাম্প্রতিককালেও। এখানে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে অর্থাৎ আয় বেড়েছে কিন্তু কর আদায় বাড়েনি। আয় যদি বেড়ে থাকে তাহলে করে বাড়েনি কেনো? আবার যদি প্রবৃদ্ধি হয়ে থাকে তাহলে বিনিয়োগ বাড়েনি কেন? বিনিয়োগ ছাড়া প্রবৃদ্ধি হয় কেমন করে? এটা আবার আরেক বিতর্ক আর কী। তথ্য নৈরাজ্যের আরেক উদাহরণ। তো আপনি দেখেন যেহেতু আপনি কর আদায় করতে পারেননি অর্থাৎ যে লোকগুলোর আয় হলো যদি ধরি ওই

আয় তারা আপনার কর দেয় না, তারা কানাডাতে বাড়ি কেনে, তারা দুবাইতে বাড়ি কিনছে। দুবাইতে এখন বাংলাদেশীরা সব থেকে বড় বিনিয়োগকারী। তারা এমন টাকা কানাডাতে পাঠাচ্ছে যে কানাডার সরকার এতদিন এটাকে ভালো মনে করত। এখন তাদের আবাসন আয় এত বেড়ে গেছে যে তাদের নিজেদের লোক কিনতে পারছে না তাই তারা দুই বছরের জন্য বিদেশিদের কেনা বন্ধ রেখেছে। বাংলাদেশিরা এর জন্য কিছুটা দায়ী। এখন শুরু হয়েছে টার্কিতে কেনা। আয়টা যেটা হয়েও থাকে সেটা সাধারণ মানুষের কাছে যাচ্ছে না। বৈষম্যটা এমন ভাবে বেড়েছে প্রবৃদ্ধি হলেও।

কর আদায় না হওয়াতে আজকে যখন আপনার ভর্তুকি দেয়ার প্রশ্ন উঠছে আপনি ভর্তুকি দিতে পারছেন না। এ মুহূর্তে মুদ্রাস্ফীতিকে আটকানোর জন্য ভর্তুকি, প্রত্যক্ষ আর্থিক সহায়তা টিসিবির মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে জিনিসপত্র বিক্রি করা এটা অর্থনীতির অ আ ক খ। আমি বলতে চাচ্ছি, বিগত সময়কালে অর্থনৈতিক সুশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো না করাতে এখন এটার ফাঁদে সরকার নিজে পড়েছে।

আমি এখনো বলছি গত কয়েক মাস আমরা আত্মতুষ্টিতে ছিলাম। এখনো আছি আপনি মানুষের সাথে কথা বলে দেখেন। মানুষ তার জীবন দিয়ে, অভিজ্ঞতা দিয়ে এগুলোকে উপলব্ধি করছে যে তার যেটুকুই হয়েছিল সেটা এখন ছমকির মুখে এসেছে। বিশেষ করে মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে। মধ্যবিত্ত স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ভোগ যেগুলো করত শিক্ষার ক্ষেত্রে, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, বিনোদনের ক্ষেত্রে, বাড়িতে কেনাকাটা এগুলো অনেক কমে গেছে।

জহিরুল আলম: ড. দেবপ্রিয়, তাহলে এগুলো মেরামতের সুযোগ কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেখুন শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেপাল এগুলো থেকে আমরা যা শিখি তা হলো অর্থনৈতিক সুশাসন গুরুত্বপূর্ণ, রাজনৈতিক সুশাসন ও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অর্থনৈতিক সুশাসন আপনি দিতে পারবেন না যদি না তাদের পূর্বশর্ত রাজনৈতিক সুশাসন না থাকে। রাজনৈতিক সুশাসনের অর্থটা কী? রাজনৈতিক সুশাসনের অর্থ হলো যে দেশ পরিচালনা করবেন জনমানুষের আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে আর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে। আর সেটা একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভেতরে সুশাসনের মাধ্যমে আপনি করবেন। অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন, জনমানুষকে সাথে নিয়ে নির্বাচন করবে। তাদের কথা শোনার দরকার আছে, অস্বীকার করার দরকার নাই। এটার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হচ্ছে শ্রীলঙ্কা। রাজাপাকসের পরিবার নির্বাচন করেই এসেছিল। কিন্তু তার বিচ্ছিন্নতাকে কিন্তু আপনি আটকাতে পারেননি তাদের মনোভঙ্গের কারণে। কারণ তারা নিজেদের এত বড় মনে করেছিল যে তারা সব জানে, সব বোঝে এবং তারা রাজকীয় পরিবার হিসেবে দেশ চালাবে।

জহিরুল আলম: প্রেসিডেন্ট পুতিনও কি খুব জনসম্পৃক্ত?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: রাশিয়া এবং পুতিন নিঃসন্দেহে দুটি ভিন্ন বিষয়। পুতিন যা করেন তা রাশিয়ার জনগণের ব্যাপক মানুষের সমর্থনে করেন এটা তো বলতে পারবো না... উনি যদি

নিয়মের পূর্ণ সত্যতার উপর অবস্থান করতেন তাহলে উনি দুইদিনে কীভাবে যাবেন মনে করেছিলেন। এত মাস পার করে গেল কিন্তু উনি ওখানে পৌঁছাননি। তার মানে উনিও তথ্য-উপাত্ত ঠিকমত পাননি। কারণ বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। এ বিচ্ছিন্নতা রাজা পাকসের তৈরি হয়েছে, এ বিচ্ছিন্নতা ইমরান খানেরও তৈরি হয়েছে, এ বিচ্ছিন্নতা আমাদের নেপালেরও বামপন্থী নেতা এবং অন্যান্যদের হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনার বিষয়টি হলো আপনি এমন একটা অংশগ্রহণমূলক পরিস্থিতি রাখবেন যেখানে আপনার গণতান্ত্রিক কাঠামোগুলো কাজ করবে। উদাহরণ হিসেবে বলি, এই যে আমার দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়ছে, এই যে কোভিড অতিমারি-উত্তর পরিস্থিতি লাগবে, এই যে জাতিসংঘে বৈদেশিক অবস্থান নিচ্ছে; কোনোটা কি সংসদে আলোচনা হয়েছে? কোনো স্থায়ী পরিষদে আলোচনা হয়েছে? বা কোনো কেবিনেট মিটিং এ আলোচনা হয়েছে এগুলো তো আমরা জানি না। তাহলে এগুলো কীভাবে হবে।

জহিরুল আলম: কেবিনেট মিটিং-এ আলোচনা হয়েছে তবে যদি অনুমোদন বহাল থাকে তাহলে রাশিয়ার সাথে লেনদেন কীভাবে হবে সেটার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নীতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে যে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা তা সরকারের মধ্যে আছে কিনা, সরকারি দলের মধ্যে আছে কিনা এগুলো আমরা তো বুঝি, এটা তো দৃশ্যমান হয় না। এই যে আপনি বলছেন যে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আপনি ভালো করে খবর নিয়ে দেখেন এই তিন বছরের ভেতরে আমাদের যে অর্থ মন্ত্রণালয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটি আছে সেটা কয়বার মিটিং করেছে? মাসে তো অন্তত একবার করার কথা। দেখেন দুই বছরে হয়তো দুইদিন বা তিনদিনের বেশি ওরা বসেনি। এই যে অকার্যকর জনপ্রতিনিধিরা হয়ে যান, আমলাতন্ত্রের উপর আপনারা ক্ষুব্ধ হন এটাই হলো সমস্যা। এটার একটা বড় কারণ হলো এটার পুরো প্রতিষ্ঠানটার যে অকার্যকারিতা, কাঠামোটা বিঘ্নিত হয়ে গেছে। এ জবাবদিহি কাঠামোর সৃষ্টিই হলো অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। এখন তো আর কেউ রাখ-ঢাক করে বলে না, সকলে খোলামেলা ভাবে বলে ২০১৪-এর নির্বাচন, ২০১৮-এর নির্বাচন কোনোটাই জনমানুষকে তুষ্ট দিতে পারেনি। সেহেতু এই যে রাজনৈতিক ঘাটতিটা রয়ে গেছে আমার এই রাজনৈতিক ঘাটতিটা আমার অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রে দুর্বলতা সৃষ্টি করছে এবং এটাকে মোকাবিলা করার মত সাহস দিচ্ছে না।

এমনকি বিদেশের সাথেও এরকম জটিল পরিস্থিতিতে আমরা যেরকম আচরণ করছি সেটাতেও আমরা ঠিক নীতিভিত্তিক অবস্থানে থাকতে পারছি না। আপনি দেখুন বলছিলেন জাতিসংঘ ভোট ইত্যাদি মার্কিনের সাথে না কার সাথে। প্রথম ভোটটায় আমরা নিরপেক্ষ দিয়েছি যেসব দেশ ছিল তাদের সাথে মিলে। পুরা সাউথ এশিয়া দুই ভাগ হয়ে গেল। প্রথমবারের মত ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কা একসাথে আছে। নেপাল এবং ভুটান যারা মনে করা হয় ভারতের ছত্রছায়ায় থাকে তারা প্রথমবারের মত ভোট দিয়ে দিলো স্বাধীনভাবে। দ্বিতীয়বার আমার যখন আসলো আমরা যখন সাজলাম মানবিকতার কারণে। অথচ দেখুন ওটা তো আমরা বলেছিলাম কোনো রাষ্ট্রকে দায়ী করতে চাই না, অথচ দ্বিতীয়টায় রাশিয়ার নাম ধরে বলা হলো। তারপরে যখন মানবিকতার উপরে সব থেকে বড় ভোটটা হলো হিউম্যান রাইটস কাউন্সিলে।

আপনাকে আমি এটাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে এই ভোটের হাত ধরে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আসলো বাংলাদেশ। এই দুটোর পরে তো তৃতীয় ভোট গেল। তৃতীয়টায় তো আমি আবার অন্যদের সাথে মিলে বিরত থেকেছি। প্রথমে বিরত থাকলাম, এরপর পক্ষে দিলাম, আবার বিরত থাকলাম। তাহলে আপনি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যাওয়া বা না যাওয়ার বিষয়টি বলছেন সেটার ভেতরে এ মুহূর্তে কিন্তু কোনো বিকল্প কিছু হয়েছে অথবা মত বদলানো হয়েছে কিনা এটা এখনো বলতে পারছি না। সময় হয়তো নিচ্ছি কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তটা জটিল, এর কোনো সহজ সিদ্ধান্ত নেই। এটা নির্ভর করে সমগ্র বিশ্ব পরিস্থিতিতে আমি কীভাবে মূল্যায়ন করি। এটা শুধু ইউক্রেন দিয়ে হবেনা। আমি আপনাকে বলি যে বিশ্বকাঠামোতে কী দাঁড়াচ্ছে প্রতিষ্ঠানগুলোতে এবং এই যুদ্ধ-উত্তর পরিস্থিতিতে আমাদের মত দুর্বল দেশগুলো কীভাবে ঢুকবে কি ঢুকবে না, সেও কি তার কথা বলার সুযোগ পাবে সেটা একটা বড় বিষয় হিসেবে থাকবে।

জহিরুল আলম: আমাদের যে নেতৃত্ব এ চ্যালেঞ্জগুলো মাথায় রেখে আপনি নির্বাচনের উপর ভিত্তি করেছেন এবং একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক ব্যবস্থা যদি গড়ে উঠে তাহলে আমাদের জন্য মোকাবিলা করা সহজ হবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি আপনাকে বলছি, দেখুন যদি আপনার বৈধতা, জনসম্পৃক্ততা একজন রাজনীতিবিদের যেটা হয় সেটা যদি শক্তিশালী থাকে তাহলে সে কিন্তু বিদেশের চাপও মোকাবিলা করতে পারে। যদি সেটা না পারে তাহলে সে আত্মসমর্পণ করে। পাকিস্তান তার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ। যদি সত্যিকারের বৈধতা ইমরান খানের থাকতো, কারণ তার নির্বাচনটার পেছনেও কলকাঠি নাড়া হয়েছে। সুতরাং সেও কিন্তু দুর্বল। সেনাবাহিনী তার পেছনে ছিল, এখন হয়তো সমর্থন সরিয়ে নিয়েছে। সেহেতু বাংলাদেশের জন্য একটি বড় জিনিস হলো এরকম পরিস্থিতিতে মোকাবিলা করতে হলে আত্মশক্তিকে বলীয়ান হতে হবে। আত্মশক্তির সৃষ্টি হয় জনগণের শক্তি থেকে। আমার সংবিধান তাই বলে... আমার স্বাধীনতার সংগ্রাম তাই বলে... বঙ্গবন্ধু তাই বলেছেন। তো সে পথ থেকে আমি বলি বাংলাদেশের জন্য ঐ পথ থেকে আপনি যদি বলেন সুশাসনের ব্যাপারে, অর্থনৈতিক সুশাসনের পূর্বশর্ত হিসেবে রাজনৈতিক সুশাসন দরকার। আর এই দায়িত্ব দেশের সবার, এ দায়িত্ব নাগরিক সমাজ যারা করেন তাদের, মিডিয়া যারা করেন তাদের, যারা রাজনৈতিক দল করেন তাদের, যারা ভোটের আছে তাদেরও। সকলকে সচেতন হতে হবে এই গণতান্ত্রিক শক্তির উত্তরণে। এখানে আমাদের সকলেরই একটা লভ্যাংশ আছে সেটা বুঝে নিতে হবে।

এনটিভি 'এই সময়'-এ প্রচারিত

১২ এপ্রিল ২০২২

দেশের সাফল্যগুলোকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমুন্নত রাখতে যোগ্য কূটনৈতিক উদ্যোগ দরকার

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

মতিউর রহমান চৌধুরী: আপনি জানেন যে ঈদযাত্রার খবর সবই আছে একটু নির্বিঘ্নে হচ্ছে, এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যা হয়নি এ খবরটাও আছে। তো আজকের দিনের খবরের মধ্যে এটা আছে একটা। আরেকটা আছে যে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকা সফর করে গেলেন। আমি জয়শংকরের কথা বলছি। আর বাংলাদেশের ফরেন মিনিস্টার এ ব্যাপারে একটা মন্তব্য করেছিলেন, বিশেষ করে RAB-এর উপর যে নিষেধাজ্ঞা আছে সেটা নিয়ে। তো কি আলোচনা হলো, কী কথা হলো এ নিয়ে আমরা একটু আলোকপাত করবো আর কী।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রথমেই, সম্ভবত যা বুঝি ঈদের আগে আমার এ অনুষ্ঠানে আর আসা হবে না। তাই ঈদের শুভেচ্ছা আপনাকে, আপনার পরিবারকে, চ্যানেল আই এর কর্মকর্তা যারা আছেন এবং যারা দেখছেন সবাই যেন ঈদের আনন্দ পরিবারের সাথে উৎসব করতে পারেন।

আপনি উল্লেখ করলেন যে তুলনামূলকভাবে স্বস্তিদায়ক পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত চলছে। আমি আমার বাড়িতে দুইদিন আগে গিয়েছিলাম টাঙ্গাইলে। দু'টি ফ্লাইওভার খুলে দেয়া হয়েছে তাতে বেশ উপকার হয়েছে, আশঙ্কা থেকে তুলনামূলক সমস্যা কম। তবে আরেকটি বিষয় ঈদের সাথে যুক্ত থাকে, তা হলো দ্রব্যমূল্য। এবার সে অর্থে বাড়েনি কিন্তু দ্রব্যমূল্যের দাম আগে থেকেই উচ্চ দামে অবস্থান করছিল। সেহেতু, মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এবং স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য অতিমারি-উত্তর পরিস্থিতিতে এই ইদ উদযাপনের ক্ষেত্রে কিছু ক্লেশ রয়ে গেছে, গ্লানি না থাকুক ক্লেশ আছে।

আপনি যে শিরোনামগুলো পড়েছেন তার মধ্যে একটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আপনি যুব বেকারত্ব সম্পর্কে যে পড়েছেন এই যুব বেকারত্বের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। আমাদের ১৫-১৬ এর পর বেকারত্বের সেভাবে সরকারের কোনো হিসাব নেই তবে অতিমারির কারণে দুটি ক্ষেত্রে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এক হলো যারা চাকরি করতেন তাদের চাকরি অতিমারি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। যেমন: যারা টিউশন করত বা অপ্রাতিষ্ঠানিক

খাতে যারা আয় করত সে সমস্ত যারা ব্যবসায়ী, রাস্তাঘাটে ব্যবসা করা থেকে আরম্ভ করে যারা নির্মাণ কাজে যুক্ত ছিল, নির্মাণ কাজও বন্ধ ছিল যেখানে তরুণরা ছিল। তরুণ বলতে তো আপনারা ঢাকা শহরের ইংরেজি বলা স্যুট-টাই পড়া উচ্চবিত্ত যুবকদের বুঝেন। কিন্তু যারা প্রবাসী শ্রমিক তারাও যুবক, যারা নির্মাণ কাজে কাজ করেন তারাও যুবক এবং মহিলারা যারা আছেন। এ যুব শব্দটির বিশাল ব্যাপ্তি রয়েছে। এছাড়া যারা ২০ লক্ষ প্রতি বছর ঢুকছেন শ্রমবাজারে তাদের সে অর্থে জায়গা হচ্ছে না। শিক্ষিত যুব বেকারত্বের হার গড় সাধারণ যুবকদের বেকারত্বের হারের চেয়ে বেশি। ওখানে যদি চারজনে একজন বেকার থাকে, এখানে তিনজনে একজন বেকার থাকে এবং বিশেষ করে যারা কলেজ শেষ করেছেন তাদের মধ্যে বেকারত্ব সবচেয়ে বেশি।

এবার বাজেটের ক্ষেত্রে আমি দুটি বিষয় মনে করি একটি দ্রব্যমূল্যের বিষয়টি, মূল্যস্ফীতি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে। পণ্যমূল্যের দাম ২০২২-২৩ সালে অতিমারি এবং বিভিন্ন প্রভাবে বাড়বে এবং বাংলাদেশে তা আরো বাড়বে কারণ সরকারের ঋণ নেয়ার প্রবণতা বাড়ছে যা মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। তো সেটির নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজেটে একটি বড় বিষয় থাকতে হবে। আর দ্বিতীয় যেটি করতে হবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে একটি দৃশ্যমান সূচকে পরিণত করতে হবে। সরকার, ব্যক্তিখাত, স্বনিয়োজিত যে কতগুলো আছে এবং তা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। সুতরাং, আমি প্রথমেই সুযোগের কথা বললাম। ঈদের শুভেচ্ছার সাথে সাথে বাজেটের কথাও মাথায় রাখতে হবে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ আগামী বছরের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, কর্মসংস্থান থাকবে।

আপনি জিজ্ঞাসা করছিলেন ড. জয়শংকর এর ব্যাপারে এখন ড. জয়শংকরের এবারের আসাটা তো আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ভারত সফরের জন্য। ভারতের দুজন প্রতিমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি আমাদের দেশে ঘুরে গেছেন সাম্প্রতিককালে সুতরাং ফিরতি যাত্রাটা আমাদের দিক থেকে আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপারে পড়ে। সেটির হয়ত সময়টি ঠিক হবে, বছরের মাঝামাঝি কোনো সময়। কিন্তু যে জিনিসটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, জয়শংকরের আসার আগের দিন আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে সাহায্য চেয়েছেন RAB-এর উপর যে নিষেধাজ্ঞা আছে সেগুলো তুলে নেয়ার ক্ষেত্রে ভারত আমাদের হয়ে তদবির করবে এবং ভারতের অনাবাসিক যারা আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, তারাও আমাদের হয়ে তদবির করবে। আমাদের বাংলাদেশের কথা তিনি বলেননি, তিনি বলেছেন ভারতের অনাবাসিকদের কথা। দেখুন ভারতের সাথে সম্পর্কটা বাংলাদেশের জন্য স্পর্শকাতর বিষয়। অন্যদিকে, ভারত আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বড় ভূমিকা পালন করেছে এবং মিত্র দেশ হিসেবে স্বাধীনতা সংগ্রামে পেয়েছি কিন্তু এটাও সত্য যে ভারতের সাথে অনেক কিছু আমাদের এখনো অমীমাংসিত রয়েছে। আবার এটাও সত্য যে, ভারতের সাথে একটি নতুন এজেন্ডাও আমাদের সামনে কিন্তু উন্মোচিত হয়েছে। যোগাযোগ, বিদ্যুৎ অন্যান্য বিষয় এবং সাম্প্রতিককালে সম্পর্কটা দ্বন্দ্বিক সম্পর্ক, এর সাথে আপনি আমাদের RAB-এর উপর যে নিষেধাজ্ঞা দেখেন আমাদের সরকারের মনোভাবের ক্ষেত্রে দু'তিনটি স্তর পার হয়েছে। প্রথম যখন এটি হয়েছে এটিকে অবজ্ঞা করার একটি মনোভাব ছিল, তারপর হয়েছে তীব্র তিক্ত প্রতিক্রিয়া যে এটি ঠিক হয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি। তৃতীয়ত

আমরা দেখেছি যে পরে গিয়ে কিছুটা তোষামোদ পর্যায়ে গিয়েছে। এখন আমরা কিছুটা তদবির সম্পর্কের দিকে যাচ্ছি।

কিন্তু বার বার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থেকে যে কথাগুলো বলা হয়েছে অর্থাৎ, যে কারণে হয়েছে সেগুলো যদি না সরে অর্থাৎ আপনার মানবাধিকারের ক্ষেত্রে যে ধরনের স্বচ্ছতা আশা করা হচ্ছে বাংলাদেশের মত দেশ থেকে। কারণ বাংলাদেশ নিয়ে আমরা এখন গর্ব করি, বাংলাদেশে এখন জনগণের আন্তর্জাতিক সমাজের দৃষ্টিতে কেন্দ্রে আছে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে। তাহলে তাদের কাছে যে ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করা হয় তা তদবির দিয়ে হবে না। আমরা অনেক সময় মনে করি কথা দিয়েই আমরা পার পেয়ে যাবো, আমাদের একটি অদ্ভুত মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে যে তদবির করলেই আমরা পার পেয়ে যাব। সেও মনে করে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। কিন্তু বিষয়ের গভীরে ঢুকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে আমরা কেউই আগ্রহী নই এবং দেখুন ভারতের সাথে এ সমস্ত ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কেউ সাহায্য চাইলেও কেউ এভাবে বলে না। সরাসরি বলে না।

মতিউর রহমান চৌধুরী: এটা কতটুকু কূটনৈতিক?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা একেবারেই শিষ্টাচারসম্মত না এবং সেটা যে কতখানি শিষ্টাচারযুক্ত না এটা দিল্লীতে ভারতের পররাষ্ট্র মুখপাত্রের জবাবের মধ্যে দিয়ে এসেছে, জয়শংকরের জবাবের মধ্যেও এসেছে। আমাদের মন্ত্রীকে পাশে দাঁড়া করিয়ে দেখেছেন। এভাবে হয় না। আপনি যদি অনুমতি দেন আমি একটু বলি আপনাকে। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে যিনি আছেন তিনি প্রায়ই এমন বক্তব্য দেন যা একেবারেই দেশের স্বার্থের পক্ষে যায় না এবং সেটায় আরো পরিস্থিতি ঘোলা হয়। তিনি একবার বললেন আমাদের যারা ভূমধ্যসাগরে মারা গেলেন তাদের কথা যে গুমে যারা মারা গেছেন তারা ওখানে থাকলেই বোধহয় হিসাবের মধ্যে আসবেন। হাস্যকর বক্তব্য। ভারত সম্পর্কেও তিনি বলেছেন। দুর্গাপূজার সময় যখন আক্রমণ হলো গত বছর যেখানে নেত্রী বলছেন ব্যবস্থা নেয়া দরকার সেখানে তিনি বলছেন কিছুই হয়নি। মানে আজকালকাল যুগে তথ্য সম্প্রচার যেখানে এত উন্মুক্ত সেখানে এ সমস্ত কথা বলাটা একেবারে উচিত না। সেহেতু আপনার ভালো করে চিন্তা করে দেখতে হবে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা যোগ্য নেতৃত্ব দিচ্ছি কিনা।

মতিউর রহমান চৌধুরী: একবার বিজ্ঞানীর সাথে দেখা করার সময় তিনি বললেন যে আমি রাষ্ট্র।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এবং দেখুন তাহলে তো তিনি একটি বড় বিষয় বলেছেন। একে তো তিনি বিএনপিকে নির্বাচনে আনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তদবির করতে বলেন যেখান থেকে তিনি পরে পিছিয়ে আসেন। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকেন এবং তার যদি সেখানের নাগরিকত্ব থেকে থাকে তাহলে কিন্তু আরেক ধরনের সমস্যা এর ভেতরে আসে।

মতিউর রহমান চৌধুরী: সমালোচকরা তাই বলছেন আসলে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: হ্যাঁ। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভেতরে তো আপনার আনুগত্যটা একাধিক জায়গায় হতে পারে না। রাষ্ট্র তো যেটার আপনি প্রতিনিধিত্ব করেন। সার্বিকভাবে যদি আপনি প্রতিনিধিত্ব না করতে পারেন তাহলে রাষ্ট্রের অধিকার, স্বার্থ এগুলো রক্ষিতপূর্ণভাবে হয় কিনা তা বড়ভাবে চিন্তা করার ব্যাপার আছে। বাংলাদেশ এখন অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে সাফল্য, আমাদের ক্রটিগুলোও আমরা বলি। কিন্তু তারপরেও সাফল্যগুলোকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমুন্নত রাখার যে কূটনৈতিক উদ্যোগ যোগ্যতার সাথে করা দরকার সেটা আমরা যোগ্য ভাবে করছি কিনা সেটি কিন্তু আগামী দিনে বড়ভাবে পরীক্ষিত হবে। এটা কারো বড় ভাবে পরীক্ষিত হবে কারণ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বা দ্বিপাক্ষিক যে সম্পর্কগুলো আছে এগুলোর ভেতরে মানবাধিকারের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে এসেছে, সুশাসনের বিষয়টি এসেছে এবং আগামী দিনে গণতান্ত্রিক উত্তরণের বিষয়টিও আরো বড়ভাবে উত্তরিত হবে। আমি আপনাকে আগেই বলেছি যে আগামী নির্বাচনে সম্ভবত প্রথমবারের মত আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী আমাদের নির্বাচনের অংশ হয়ে যাবে।

মতিউর রহমান চৌধুরী: সেটা কীরকম?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আগে যেমন শুধু ভারত নিয়ে আলোচনা হতো যেমন ভারতের ভূমিকা, ভারতের পক্ষে না বিপক্ষে। এবার এর সাথে অবশ্যই চীনের ভূমিকা আসবে। এর সাথে আমরা ভারত মহাসাগর এর বিষয়টি আছে, কোয়াড এবং কাওয়াস এগুলোর সাথে মিলিয়ে আসবে এবং প্রশান্ত এবং ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তার কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদিরা বলছে সে বিষয়টি আসবে। এর ভেতরে ভারত, জাপান যুক্ত হয়েছে। এ বিষয়তে আমাদের অবস্থানকে বার বার চাপ আসছে পরিষ্কার করার ব্যাপারে। কিন্তু তার চেয়ে বড় জিনিস যেটা উনারা অনুধাবন করছেন তা হলো বাংলাদেশের যে উন্নতি একে টেকসই করা, গণতান্ত্রিক ধারাকে অব্যাহত রাখা এবং নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা একই সূত্রে গাঁথা হচ্ছে।

সুতরাং এ অর্জনকে, স্থিতিশীলতাকে রক্ষা করার জন্য গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার জায়গা রাখতে হবে। যেমন দেখুন সবচেয়ে নিরীহ যে সমস্ত বিদেশী রাষ্ট্র আছে সেদিন আপনি ও ছিলেন আমিও ছিলাম নরওয়ের যে বৈদেশিক মন্ত্রী এসেছিলেন। তিনি তার সব বক্তব্যে একটাই লাইন বললেন যে বাংলাদেশ নির্বাচনে যাচ্ছে, এ নির্বাচনকে আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে যোগ্য হতে হবে তাহলেই বাংলাদেশের জন্য বিশ্বের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে অনুধাবনের বিষয় আছে। আপনি ২০১৪ বা ১৮ তে যে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে যে বড় বিষয় ছিল তা হলো ধর্মীয় উগ্রবাদ উত্তরণ এবং আমরা সেখানে প্রশংসনীয়ভাবে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছি। আমরা দেশের ভেতরে এখন শান্তির ভেতরে আছি। আন্তর্জাতিকভাবেও এ শান্তিটা এসেছে যদিও বিচ্ছিন্নভাবে কিছুটা রয়ে গেছে। এ জায়গাটা যদি না থাকে তাহলে আন্তর্জাতিক বিশ্বের, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মূল মনোযোগের জায়গাটা হবে যে গণতন্ত্র, সুশাসন, নাগরিক নিরাপত্তা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এ ব্যাপারে ট্রাম্প-উত্তর যুগে বাইডেন সহ এবং যে বিভক্তিটা রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে পরিষ্কার হয়ে গেছে এটা বড়

ভূমিকার ভেতরে আসবে। বাংলাদেশকে এ রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক চয়নের ভেতরে যেতে হবে।

মতিউর রহমান চৌধুরী: আপনি জানেন যে তেঁতুলতলা নিয়ে মাঝে যে শিরোনাম হয়ে গেল। আজকে শিরোনাম অন্যরকম যে, তেঁতুলতলা শিশুদের খেলার মাঠ।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা খুবই খুশির ব্যাপার। এর যে একটি যোগ্য সমাধান হয়েছে এর জন্য তিনপক্ষকে আমি অভিনন্দন জানাতে চাই। প্রথমত আমি ধন্যবাদ জানাই প্রধানমন্ত্রীকে। যিনি একটি নাগরিক সংবেদনশীল ব্যাপার যা ছোট কিন্তু বড় হয়ে গিয়েছে একে তিনি বিবেচনায় নিয়ে ব্যবস্থা নিয়েছেন তাই জন্য ধন্যবাদ। দ্বিতীয়ত আমি সবচেয়ে বড় অভিনন্দন দিতে চাই যিনি এটি শুরু করলেন সে মা কে এবং সেখানকার বাসিন্দাকে। তিনি এবং তার সন্তান যেভাবে এটাকে নিয়ে কাজ করলেন, নাগরিক প্রতিবাদের জায়গা তৈরি করলেন এটা না করলে আপনি আমি আজকে এখানে এ আলোচনা করতে পারতাম না। আর তৃতীয়ত আমাদের নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ যারা এটাকে ধরে সুন্দর ভাবে ফলোআপ করেছেন তারাও আমার মনে হয় খুবই অভিনন্দনের যোগ্য। এই তিনটি শক্তির জায়গা আমাদের সমাজের গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক নেতৃত্ব, নাগরিক ব্যক্তিত্ব এবং নাগরিক সংগঠিত শক্তি। তিনটির বাইরে আমার যা বলার আছে তা হলো এই জিনিসটি এরকম হলো কেনো? এ জিনিসটি এরকম হলো এটা সকলেই বুঝছি আমরা যে পুলিশদের জন্য একটি স্থায়ী জায়গা ওখানে করা দরকার।

কিন্তু ঐ জায়গাটাতে যখন দেয়া হয় তখন বিদেশে কী হয়। বিদেশে হয় যে যারা জনগণের প্রতিনিধি থাকেন, ওখানে মেয়র আছেন, সংসদ সদস্য আছেন তারা একবারও কি কোন জায়গাটা দিচ্ছি এবং জনগণ এটা কি মনে করে অন্য দেশে হলে তো গণশুনানি হতো যে জায়গাটা দিব এটা দেয়া উচিত কিনা। আমাদের দেশে এটা কেন হলো না? আমার যে বক্তব্য জনপ্রতিনিধিরা কেন জনবিচ্ছিন্ন থাকেন? আমি এ জায়গায় আপনাকে বলেছি যে রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ স্বাধীনভাবে কাজ করছে কিনা এবং এর মধ্যে যৌথতা এবং জবাবদিহিতার জায়গা আছে কিনা বা যারা জনপ্রতিনিধি হয়েছেন সেটা ১৪ই হোক বা ১৮ই হোক বা ইলেকশনেই হোক তারা কি জনগণের কাছে কখনো জানতে চেয়েছেন কিনা। বা জনগণ ও তাদের কাছে যেতে পেরেছেন কিনা।

মতিউর রহমান চৌধুরী: তো এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধির ভূমিকা কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: উনারা তো সম্মতি দিয়েছিলেন। সম্মতি দেয়ার আগে কি উনারা জনগণের সাথে কথা বলেছিলেন? দেখেন পুরো আলোচনার ভেতর পুলিশকেন্দ্রিক আলোচনা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো জনপ্রতিনিধিরা কোথায় ছিলেন? উনারা তো একবার বের হয়ে এসেও সম্মতি জানান নাই। কথাও বলেন নাই যে আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে এ কথাটা নিয়ে যাবো। প্রধানমন্ত্রীর কাছে কথাটা নিয়ে গেছেন আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আমরা তো সেভাবে দেখছি। কিন্তু জনপ্রতিনিধিরা কাজ করেনা কেন? আমার সেটিই প্রশ্ন থাকলো। জনপ্রতিনিধিরা যদি

সত্যিকার অর্থে জনপ্রতিনিধি না হয় তাহলে তারা এ চাপটাও অনুভব করেন না বলে আমার মনে হয়। আমার কাছে এ জায়গাটাই আক্ষেপের সবচেয়ে বড় জায়গা যা আলোচনায় সেরকম ভাবে আসে নাই। গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার সব চেয়ে বড় জায়গা হলো ভালো হোক খারাপ হোক ওরা আমার জনপ্রতিনিধি। ভালো হোক খারাপ হোক আমার মেয়র। তো সে জায়গাটায় একটু ঘাটতি দেখলাম।

মতিউর রহমান চৌধুরী: ধন্যবাদ। আমি একটু দূরে এবং কাছে আমাদের হাতে মাত্র দু’মিনিট সময় আছে তো সে জায়গায় আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে নেপালে বড় ধরনের সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং সর্বশেষ যে হলো গাড়ি এবং মদ আমদানি করা যাবে না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটা হলো যখনই দেশে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি হবে, আপনাকে আমি এ অনুষ্ঠানেই বলে গিয়েছিলাম যে পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার সাথে নেপালকে মিলিয়ে দেখবেন, মনে আছে আপনার? বার বার নেপালের কথা আপনাকে বলেছিলাম। দেখেন দুই না তিন সপ্তাহ পরে আসলাম এর মধ্যে নেপালের পরিস্থিতি। এখন উনাদের বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতির কারণে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করছেন। বাংলাদেশেও কিন্তু আমদানি নিয়ন্ত্রণের কিছু কিছু সূচনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। কারণ আপনার চলতি খাত যেটাকে বলি কারেন্ট একাউন্ট ইংরেজিতে বলি আমাদের অর্থনীতিতে এখানে আপনার সব ধরনের মূলধনী আয়, সেবামূলক এবং বাণিজ্য ইত্যাদি মিলিয়ে আপনার যে ঘাটতি তা এখন দশ বিলিয়ন ডলার। গত বছর তা ইতিবাচক ছিল। দশ বিলিয়ন ডলার হওয়া মানেই হলো আপনার টাকার উপর চাপ পড়া, আপনি দুই বিলিয়ন ডলার খরচ করেও টাকাকে স্থিতিশীল করতে পারছেন না। এখন কালোবাজারের অর্থাৎ অনানুষ্ঠানিক বাজারের সাথে আপনার পাঁচ টাকার মাত্র পার্থক্য রয়ে গেছে ডলার প্রতি। সুতরাং বাংলাদেশের জন্য এটাও অনেক বড় শিক্ষার জায়গা যে আগামী দিনে দেশে কীভাবে বিলাসীপণ্য নিয়ন্ত্রণ করার কথা কিন্তু আমদানি নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি আগামীদিনে পুরো বাজেটের সাথে আসবে সুতরাং আবার আপনি পটের পরিবর্তনের কিছু কিছু চিহ্ন আপনি এখানে দেখতে পারছেন।

চ্যানেল আই ‘আজকের সংবাদপত্র’-এ প্রচারিত

৩০ এপ্রিল, ২০২২

রাজনৈতিক নেতৃত্ব, নীতি প্রণয়নের দক্ষতা এবং সামাজিক জবাবদিহিতা— এই তিনটি এক জায়গায় আনতে হবে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

মতিউর রহমান চৌধুরী: আপনি গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে দুটো জিনিস বলেছেন। একটি বলেছেন যে মধ্যবিভূে ত্রিমুখী আক্রমণের সৃষ্টি হয়েছে এবং বাজেট ছিনতাই হয়েছে। মোটা দাগে যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি পুরো বিষয়টা একটু বিশ্লেষণ করবেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলের মানুষই এখন পানিবন্দী অবস্থায় আছেন অথবা তারা এমন ভাবে জলমগ্ন হয়েছেন যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারছেন না। বিদ্যুৎ নেই, সুপেয় পানি নেই আবার তাদের গবাদি পশু বন্যায় ভেসে গেছে, তারা নিয়ে আসতে পারছে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে আশ্রয়কেন্দ্রও যথাযথ ভাবে নেই এবং শুকনো খাদ্যদ্রব্য ত্রাণের ক্ষেত্রে বা বোতলজাত পানির ক্ষেত্রে অভাব রয়েছে। স্থানীয়ভাবে প্রশাসন নিঃসন্দেহে প্রাথমিক চেষ্টা করছে। কিন্তু ঘটনাদৃষ্টে মনে হচ্ছে সমস্যার যে ভয়াবহতা তাকে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের এ মুহূর্তে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়।

তো আমি যে বলেছি মধ্যবিভূে ত্রিমুখী আক্রমণের স্বীকার হয়েছে। আমি যে ত্রিমুখী সংকটের কথা বলেছি এর মধ্যে একটি হলো এই দুর্যোগ। এটি এখন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আছে, এরপর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যেতে পারে আবার মধ্যাঞ্চল দিয়ে নামতে পারে যমুনা অববাহিকা দিয়ে সেটা অনেকেই আশঙ্কা করেছে। মনে করা হচ্ছে দশক ঘুরে ঘুরে যেরকম দুর্যোগ হয় এ বন্যার মাধ্যমে তেমনই একটি দুর্যোগ অতিবাহিত করতে যাচ্ছে। এটি একটি বড় দুর্যোগ যাতে শুধু মানুষের রুটি-রুজি যায়না, সঞ্চয় চলে যায়, গবাদি পশু চলে যায়। আপনি জানেন সিলেটে এখন ধানের গোলা ভেসে যাচ্ছে। এর আগে হাওরে একটি বন্যা এসেছিল, এখন এটি আসছে যা জাতীয়ভাবে হাওরে আক্রমণ করছে। এরপরেও যেটা থাকে ঝুঁকি যে রোগব্যাদি হচ্ছে কিনা। আপনি দেখছেন যে এখন করোনার আরেকটি ধাক্কার আংশিক সংকেত আমরা চারপাশে দেখতে পাচ্ছি। আবার স্বাস্থ্যবিধি মানার একটি নির্দেশনা আসছে। এটি একটি বড়

ধাক্কা অবশ্যই যা অভাবিতভাবে এসেছে। কিন্তু এর আগে আরো দুটো বিষয় এসেছে। একটা হলো বিশ্বব্যাপী যে পণ্যমূল্য বাড়ছে, খাদ্যপণ্য মূল্য এবং জ্বালানি মূল্য বিশেষ করে। এর সাথে পরিবহন খরচ যেভাবে বাড়ছে এতে আমদানি করা যেমন কষ্টকর, রপ্তানি করাও কষ্টকর হয়ে পড়ছে বা অনেক বেশি খরচ সাপেক্ষ হয়ে উঠছে এবং এটা যে ২০২৩-২৪ এ খুব একটা নামবে সেরকম মনে হচ্ছে না। সাধারণভাবে একটু নিচের দিকে আছে সে অবস্থা, তেলের দাম অথবা খাদ্যশস্য। কিন্তু এটা যে আগামী দিনে নামবে এর নিশ্চয়তা নেই।

খাদ্যশস্যের ভেতরে ভোজ্যতেলের দাম হয়তো কিছুটা কমেছে সাম্প্রতিককালে। কিন্তু এটা নিয়েই বসবাস করতে হবে এবং বাংলাদেশের আমদানির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হলো খাদ্যশস্য, সার এবং জ্বালানি। সরকারের পক্ষ থেকে ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে যে উনারা জ্বালানির দাম বাড়াবেন, বিদ্যুতের দাম বাড়াবেন এবং এটা বাড়ালে মধ্যবিত্তের জীবন আরো দুর্বিষহ হবে। আপনারা জানেন যে জ্বালানির মাধ্যমে পুরো অর্থনীতির খরচ বেড়ে যায়। আরেকটা যেটা তৃতীয় আমি বলেছি সেটা হলো এবারের বন্যা। এবারের বাজেটে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত বা নিম্ন আয়ের মানুষের প্রতি সুবিচার করা হয়নি। আপনি লক্ষ করে দেখবেন আমি একটা উদাহরণ আপনাকে সাধারণভাবে বলি যে, সাধারণভাবেই করের হার কমানো হয়েছে, কর্পোরেট করের হার। যারা বিনিয়োগকারী আছেন, ব্যবসায়ী আছেন বা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা আছেন। যারা ১০ শতাংশ পর্যন্ত স্টক এক্সচেঞ্জে পুঁজিবাজারে নিবন্ধিত তারা রেয়াত পেয়েছেন, যারা দশ শতাংশের কম তারা হয়তো কিছুটা আরেকটু কম রেয়াত পেয়েছেন। যারা নিবন্ধিত না, এরকম প্রতিষ্ঠানকেও দেয়া হয়েছে। আবার একই রকম ভাবে একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকেও দেয়া হয়েছে। দেখুন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর্পোরেট ঋণের ক্ষেত্রে যে সুবিধাটা দেয়া হলো সেটা নিয়ে আমার কোনো অভিযোগ নেই। কিন্তু এর পরিপূরকভাবে যারা আয়কর দেন করদাতা হিসেবে, তাদের বিশেষ করে যারা নিম্নবিত্ত মানুষেরা আছেন তাদের তিন লক্ষ টাকা আয় হলে পরেই করের আওতায় তাদের যে বাধ্যতামূলক অবস্থান সেটার জায়গায় গত দু'বছরে কিছু বাড়ানো হয়নি। ওটা আরেকটু বাড়ানো যেতো। পাঁচ লক্ষ হতে পারতো বা সাড়ে তিন লক্ষ হতে পারত।

সুতরাং আপনি তার হাতে কিন্তু এই মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে কোনো বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ দিলেন না। বলা হচ্ছে ভর্তুকি দেয়া হবে। ভর্তুকি বাড়িয়েছে ৫৫ শতাংশ, যেটুকু বাড়িয়েছে ভালো করেছে। আনার চেষ্টা করেছে সরকার। কিন্তু ওই ভর্তুকির ভেতরে প্রাধান্য দেয়া আছে কিন্তু পিডিবি এবং সে ভর্তুকিতে যে জ্বালানি খরচটা দেয়া হচ্ছে আমরা অর্থনীতিতে বলি ভালো ভর্তুকিও থাকে, খারাপ ভর্তুকিও থাকে। ভালো ভর্তুকি হলো সেটা যা জনমানুষের কল্যাণকে বাড়ায়, যেমন: আপনি যদি খাদ্যে ভর্তুকি দেন, কৃষিতে ভর্তুকি দেন ইত্যাদি। কিন্তু আপনি যদি বসিয়ে বসিয়ে অলস বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ভর্তুকি দেন, সেটা খারাপ ভর্তুকি হয়। সুতরাং খারাপ ভর্তুকিও আছে যেগুলোতে নজর দেয়া দরকার। এটা যদি না দিত তাহলে প্রধানমন্ত্রী খাদ্য, টিসিবি বা এক কোটি মানুষকে যে খাদ্য দিবেন সেসব জায়গায় নিতে পারতেন।

আরেকটা যেটা, দুস্থ মানুষদের জন্য যে টাকা দেয়ার কথা সেটা আসলে টাকার অংকেও বাড়েনি আমি হিসাব করে আপনাকে দেখাতে পারব আবার জিডিপির অংশ হিসেবেও

বাড়েনি। টাকার অংকে হয়ত কিছুটা বাড়েনি কারণ ওটার ভেতরে পেনশন আছে এবং আরো অনেক কিছু আছে যা আলাদা করে সুরক্ষা খাতের ভেতর নেয়া যায় না। সেহেতু এটা জিডিপির এক শতাংশ নিচে। সুতরাং এখন আপনি যে ভাতা দেন ৫০০ টাকা করে তা আরো দশ বছর আগেও ৫০০ টাকা ছিল। এর মধ্যে আপনার জাতীয় আয় বেড়ে ৩০০০ টাকা হয়ে গেল অথচ সে বেচারা ৫ ডলারের ভেতর রয়ে গেল এটা কেমন করে সম্ভব? এর জন্যে বলেছি যে ত্রিমুখী আক্রমণ। একটা হলো প্রাকৃতিক, বৈশ্বিক এবং আরেকটা হলো বৈষম্যমূলক অর্থনীতির এবারে যে বাজেটটা হলো।

মতিউর রহমান চৌধুরী: ধন্যবাদ। যেটা বলছিলেন ‘The Business Standard’ এর শিরোনামটা আপনি দেখেছেন যে ৬ হাজার কোটি টাকা স্টক থেকে চলে গেছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: একটা তো একটু আগে আমি বলেছি যে বাজেট ছিনতাই হয়ে গেছে। বাজেট ছিনতাই হয়েছে এভাবে যে, সরকারের কিন্তু এ বাজেটের ভেতরে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ভালো পদক্ষেপ ছিল যেমন যারা শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী তাদের ছইল চেয়ার কেনার ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে একটা সশ্রয় দেয়া হয়েছে, শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য কানের ব্যাটারিতে সশ্রয় দেয়া হয়েছে, যুবকদের স্টার্ট-আপের ক্ষেত্রে যারা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে কাজ করে তাদের সশ্রয় দেয়া হয়েছে, আবার যারা শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কাজ দিবে তাদের সুবিধা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এগুলো কি আলোচনায় আছে?

আলোচনায় আছে যে লোকগুলো বাংলাদেশের ভবিষ্যতে বিশ্বাস করেনা, দেশে দুর্নীতি করেছে, আর্থিক ক্ষতি করেছে, দেশে দুর্নীতি করে সে টাকা বিদেশে পাঠিয়েছে আবার সেই টাকাকে নাম মাত্র করে বিদেশ থেকে আনতে চাচ্ছে আমরা বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমরা যারা কর দেই তারা ২৫-৩২ শতাংশ দিয়ে থাকি। সেখানে আপনি দ্বিগুণ চুরির টাকাকে ৭ শতাংশ নিয়ে আসতে চাচ্ছেন এবং যেটা বাস্তব হবে না। কেউ কি আর ঘোষণা দিয়ে এই জিনিস নিয়ে আসে তারিখ দিয়ে? পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার এটার আইনি মোকাবিলা হতে পারে না? এ পরিস্থিতি তো আমরা জানি, এ অভিজ্ঞতা তো আমাদের পেছনে আছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে এরকম একটা কারণ দেয়া হলো, সকলের কাছে মনে হতে পারে যে এটা নির্বাচনের কৌশলের অংশ কিনা। আবার এখানে লক্ষ করে দেখেন, এমন একটা সময় করা হলো যখন বিদেশে বেনামি অর্থের খোঁজ করে বেড়াচ্ছে উন্নত রাষ্ট্রগুলো। এটা আমেরিকা বলেন, ইউরোপ বলেন বিভিন্ন জায়গাতে হচ্ছে। তখন কি আপনি এখান থেকে নিয়ে যাওয়া অনুপার্জিত আয়কে বৈধতা দিচ্ছেন কিনা। আর যেটা বললেন আপনি একটু আগে টাকার ক্ষেত্রে যেটা বললেন যে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা টাকা নিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রেক্ষিত হলো আগামী দিনে টাকা আরো দুর্বল হবে। এটা ১০০ টাকা ডলার হয়ে যেতে পারে, তার বাইরেও যেতে পারে। যদি তা যায় তাহলে তার যে বিনিয়োগটা আছে তা ডলার মূল্যে কমে যাবে। তাই ভবিষ্যতের চিন্তা করে এখনই সে বের হয়ে যেতে চাচ্ছে। এটা বিভিন্ন দেশে হয়েছে।

যখনই মজুদের টান পড়ে, জাতীয় মুদ্রা টান পড়ে সেসব দেশ থেকে বৈধ পুঁজিও পাচার হয়ে যায়। এটা আমাদের দেশেও আগামী দিনে হবে। এ প্রেক্ষিতে আমি আজকে বলেছিলাম এবং

প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে বাজেট সমর্থনের জন্য দেড় বিলিয়ন ডলার তিনি বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ থেকে যতটুকু বুঝি নিবেন। আমাদের ৫০০ মিলিয়ন এবং ৫০০ মিলিয়ন করে চুক্তি হয়ে গেছে। তার থেকে ২৫০ মিলিয়ন এবং ২৫০ মিলিয়ন করে ছাড়ারও কথা হয়েছে। কিন্তু আরো ৫০০ মিলিয়ন লাগবে যা আপনার বাজেট সমর্থন দিবে কিন্তু বৈদেশিক লেনদেনে সমর্থন দিবে না।

আবার ফিরে আসি— আপনার এখানেই বসে আলাপ করেছি— শ্রীলঙ্কা থেকে কী শিক্ষা নিলাম? শ্রীলঙ্কা থেকে শিক্ষা হলো, সময় থাকতে বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতি মেটানোর জন্য আইএমএফ-এর পরামর্শ নেয়া উচিত। আইএমএফ আমার জন্য খুব প্রীতিকর প্রতিষ্ঠান না বিভিন্ন কারণে। আমাদের চিন্তা চেতনায় পার্থক্য আছে। কিন্তু তথাপি এ সমস্ত ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানগুলোর পরামর্শ গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং বাংলাদেশ যদি এখন ১ বিলিয়ন ডলার আইএমএফ-এর কাছ থেকে নিয়ে এসে যুক্ত করতে পারে তাহলে এটা পরিমাণের চেয়ে গুণগত ভাবে আস্থা সৃষ্টি করতে পারবে অনেক ক্ষেত্রে। যদিও আইএমএফ-এর কাছে যাওয়াটা যেকোনো সরকারের কাছে ক্যান্সারের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সমান যে এটা দুরারোগ্য ব্যাধি। কিন্তু এটা ঠিক না কারণ আইএমএফ-এর সাথে বেশ কিছু বিধি-বিধান আনে যা অর্থনীতিকে শৃঙ্খলার ভেতর নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং সে জায়গাটাতেও বাংলাদেশের এখন চিন্তা করাটার সময় এসেছে।

মতিউর রহমান চৌধুরী: আরেকটি বিষয়, সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশীদের টাকা হাট্য করে বেড়ে গেল কেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটার পেছনে আমাদের অন্য গবেষণা আছে যেটাতে দেখেছি যে নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশ থেকে টাকা বের হয়ে যাবার প্রবণতা বাড়ে। কারণ যারা অর্থবিশ্বাশীল তারা বাংলাদেশের উত্তরণের সময় কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে চায় না। দেখেন এগুলো এক সূত্রের সাথে আরেক সূত্রে গাঁথা। আপনি একদিকে বৈধতা দিতে চাচ্ছেন, আবার অন্যদিকে অবৈধ অর্থ, কিছু বৈধ থাকতে পারে পরিমাণে বাড়ছে। আগে আমরা দেখতাম যেসমস্ত টাকা যাচ্ছে সেগুলো বাণিজ্য পুঁজির মাধ্যমে যাচ্ছে। অর্থাৎ আপনি রপ্তানি করেছেন কিন্তু পুরো টাকা দেশে আনেননি, কিছু টাকা দেশে রেখে দিয়েছেন ‘ওভার ইনভয়েসিং’ করে বা ‘আন্ডার ইনভয়েসিং’ করে। এখন আমরা দেখছি ট্রেড ক্যাপিটালের সাথে ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপিটাল যুক্ত হচ্ছে এবং এটা একটা পূর্ণ আন্তর্জাতিকীকরণ চক্রের মধ্যে ঢুকে গেছে। এখন থেকে টাকা আপনি বাইরে নিলেন, বাইরে নিয়ে ব্যাংকে রাখলেন, কিছু টাকা আপনি আবার বৈধ করে দেশে আনলেন, ওই দেশের টাকা আবার নিয়ে গেলেন। অর্থাৎ, বাংলাদেশে এখন এমন একটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে তারা বাংলাদেশে অবস্থান করেও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক চক্রের সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতি যা উৎপাদনশীল না তাকে যুক্ত করছে।

আর এর বাইরে আরেক বাংলাদেশ আছে যেখানের মানুষ পরিশ্রম করছে, পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তারা কর দিচ্ছে, তারা এ জীবনযাত্রাকে মোকাবিলা করছে, তারা আজকে বন্যা মোকাবিলা করছে। তাদের একটা বড় অংশ বিদেশে শ্রম দিচ্ছে, সেই শ্রমের টাকা

দেশে এনে কোনোরকমে জীবনযাপন করছে, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে তাদের আগানোর চেষ্টা করছে। একদিকে এই সংগ্রামের বাংলাদেশ, অন্যদিকে লুটপাটের বাংলাদেশ। এই দুই বাংলাদেশের ভেতরে আমরা অবস্থান করছি। এখন যে বলেছি বাজেটটা ছিনতাই হয়ে গেছে, এটা হচ্ছে হঠাৎ করে আমরা দেখলাম এই যে সংগ্রামী, কর্মঠ, দেশপ্রেমী বাংলাদেশের বদলে ঐ ক্ষুদ্র গোষ্ঠী কোথা থেকে এসে যেন উড়ে এসে জুড়ে বসলো। যার ফলে বাংলাদেশের বাজেটটা এরকম একটা দুর্যোগপূর্ণ বছরে যখন পুরো দেশের মিলে এ বাজেটটা মোকাবিলা করা দরকার তখন কোথা থেকে যেন তারা আমাদের মনকে অন্যদিকে নিয়ে গেল এবং কী করে যে এই সুবিধাটা তারা ওখানে নিতে পারলো এটা ভাবলে আমার কাছে আশ্চর্য লাগে। সত্যি বলতে এটা নিয়ে আমার অনেক খারাপ লাগা আছে সেটা হলো, যে দলটি দেশকে শাসন করছে— বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ— তার যে রাজনৈতিক ভিত্তি সেটা কিন্তু এই মধ্যবিত্তের ভিত্তি।

আপনি যদি স্বাধীনতার আগের সংগ্রাম দেখেন ছয় দফা বলেন, এগারো দফা বলেন বা মুক্তিযুদ্ধ বলেন, এর ভেতর দিয়ে তার পরবর্তী সময়কালে এবং গত দশকে এই সরকারের যদি একটা বড় অবদানের জায়গা দেখে থাকেন তাহলে তারা মধ্যবিত্ত সমাজকে আজকে বিকাশ করার সুযোগ দিয়েছে। অথচ এই সরকারই এখন এই মধ্যবিত্তের প্রতি কী ধরনের দুরাচার করছে। এটা আমি রাজনৈতিক— অর্থনৈতিক বিবেচনায় বুঝতেই পারিনা যে এটা কী করে সম্ভব। বঙ্গবন্ধুর দলে বা প্রধানমন্ত্রী যে কথাগুলো বলেন তার সাথে এটা কোনোভাবে মিলে না।

মতিউর রহমান চৌধুরী: আপনি তো এতক্ষণ সংকটের কথা বললেন। সমাধান কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সমাধান হলো সরকারকে এখানে একত্রিতভাবে কাজ করতে হবে। বাজেটে যে ছয়টি চ্যালেঞ্জ এর কথা অর্থনীতি মন্ত্রী বলেছেন এটা সঠিকভাবে বলেছেন কিন্তু সমাধানের রাস্তা সঠিকভাবে দেননি। এখন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করাটা হলো একটা বড় কাজ এবং সেটার জন্য আপনি যদি মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন তাহলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে আপনার আটকে রাখতে হবে যেন মূল্যস্ফীতির সাথে সে কিছুটা সমন্বয় করতে পারে। আজকেও মূল্যস্ফীতির হিসাব এসেছে যে ৭.৪ এর উপর উঠে গেছে, ১ শতাংশ বেড়ে গেছে ১ মাসে। খাদ্যপণ্যের ও এক শতাংশ বেড়েছে, খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের ও এক শতাংশ বেড়েছে। সেহেতু যদি আপনি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন এবং পারবেনও না তাহলে আপনি মানুষকে ওই যে কর রেয়াত দেয়ার সুযোগ ছিল সেটা আপনি দিলেন না। এই মানুষগুলোকে এই যে আপনি খাদ্য টিসিবির মাধ্যমে দিচ্ছেন এটার সম্প্রসারণ করেন, অন্য পণ্য এটায় যুক্ত করেন, ঢাকার বাইরে একে নিয়ে যান, মফস্বল শহরে মহকুমা প্রধান জায়গাগুলোতে এদের নিয়ে যান। তৃতীয়ত হলো যে মানুষগুলোর আর্থিক সুবিধা প্রত্যক্ষভাবে নিতে হবে। ঋণ সুবিধা না, এখানে আপনাকে আর্থিক সুবিধা দিতে হবে। অর্থাৎ বিদেশের সামর্থ্য থাকলে ওরা কী করে?

সোজা কথা হলো বিকাশ, রকেট, নগদ ইত্যাদি দিয়ে আপনার একাউন্টে ১০ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিলো। এটা হলো সরকারের পক্ষ থেকে আপনাকে সমর্থন। আমার দেশ এতটা পারবে না কিন্তু ১ হাজার, ২ হাজার, ৫ হাজার টাকা তো পাঠাতে পারতো। এই মধ্যবিত্ত

কারা? বিশেষ করে বাজারে দাম বাড়লে যার রুজি বাড়ে না ঐ মানুষগুলোর কথা (বলছি)। অর্থাৎ একজন শ্রমিকের যদি ৫০০ টাকা দিনমজুরী থাকে, সেখানে যদি চালের দাম বা অন্য কিছু বাড়ি সে কিন্তু ৫৫০ টাকা দিয়ে বাজার করতে পারবে।

মতিউর রহমান চৌধুরী: এই আয়ের মানুষের সংখ্যা কিন্তু বেশি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: না, এই আয়ের মানুষের সাথে মধ্যবিত্ত কিন্তু অনেক রয়েছে যারা ২০ হাজার থেকে ৫০ হাজারের ভেতর জীবনযাপন করে। সেই মানুষগুলোকে আপনি সুরক্ষা কীভাবে দিবেন? এটার জন্য বড় আরেকটা জায়গা ছিল যেটা সরকার সঠিকভাবে নিয়েছে, আমরা এটার জন্য আন্দোলন করেছি, গবেষণা করেছি সেটা হলো সর্বজনীন সামাজিক সুবিধা বা পেনশন স্কিম যাবার জন্য। শুধু পেনশন নয় কিন্তু আমরা সবার জন্য সুরক্ষার কথা বলেছি। এ বছর এটা ঘোষণা হয়েছে, আইন হবে হয়তো, কিন্তু কোনো বরাদ্দ হয়নি। সেহেতু আগামীতে ভতুর্কি বরাদ্দকে আপনার যত দিক থেকে টাকা নিয়ে এসে পারেন বাড়তে হবে এবং সেজন্য আপনার বাজেটের সমর্থন আপনাকে আনতে হবে। যদি একটুখানি বাজেট ঘাটতি আপনার এ বছর বাড়িও তাতে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি করার কিছু নাই। এ বছর মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা এবং জীবনমান রক্ষা করাটা একটা বড় বিষয় হয়ে গেছে এবং সেজন্য যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়নি জিডিপির ২ শতাংশের নিচে আছে শিক্ষা, ১ শতাংশের নিচে স্বাস্থ্য যা তেমন বাড়েনি। কিন্তু সেটুকুই যেন ভালোমত ব্যয় করা হয় এটা বড় বিষয়। এ জন্য একটা কাঠামোগত পরিবর্তন এবং সেটা হলো বাংলাদেশের রপ্তানি শিল্প নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি, সেখানে অনেক শ্রমিক কাজ করে, অনেক নারীরা কাজ করে সেটা ঠিক আছে কিন্তু এ সমস্ত সময় আমাদের আবার মনে করিয়ে দেয় আমাদের অভ্যন্তরীণ বাজারটা কিন্তু কম না। এই যে ১৬-১৭ কোটি মানুষের বাজার তার ভেতরে আমার যে মধ্যবিত্ত গড়ে উঠেছিল যারা এ বাজারের ভেতরে এক ধরনের চাহিদা সৃষ্টি করছিল সে চাহিদাটা যদি আপনারা রক্ষা করতে পারেন তাহলে বড় ধরনের উপকার হতো।

মতিউর রহমান চৌধুরী: বড় ধরনের সংকটের মুহূর্তে জাতীয় অর্থ ছাড়া এ ধরনের সংকট থেকে বের হয়ে আসা তো তাহলে খুব কঠিন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। এ সমস্ত ক্ষেত্রে মনোবল বৃদ্ধি করাটা একটা বড় জিনিস। মনোবল বৃদ্ধি করার জন্য জাতীয় ঐক্যের দরকার হয়। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে পরামর্শ, মতবিনিময় ইত্যাদি দরকার তা এ মুহূর্তে বাংলাদেশে নেই। আগে বিভিন্ন সময় আমার সৌভাগ্য হয়েছে কিবরিয়া সাহেবের সাথে সাইফুর রহমান সাহেবের সাথে কাজ করার। তখন আমি দেখেছি যে উনারা পেশাজীবীদের সাথে একটা আস্থার সম্পর্কে থাকতেন।

এ মুহূর্তে তো নীতিনির্ধারকদের সাথে পেশাজীবীদের সে আস্থার সম্পর্কটা নাই। আমরা দেখেছি যে উনারা যখন নীতি প্রণয়ন করতেন, উনারা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মতামত গ্রহণ করতেন এবং তাদের সাথে আলাপ করতেন, এবারেও সেক্ষেত্রে আমি দেখি নাই। উনারা জনগণের প্রতিনিধিদের সাথেও সংলাপ করতেন। আপনার সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো রয়েছে

সেখানেও বাজেট নিয়ে কোনো আলোচনা হলো না। এমনকি কেবিনেটেও বাজেট নিয়ে নীতি-নির্ধারণী কার্যক্রম যেটা করার কথা সেটা হয়েছে কিনা আমরা জানি না, দেখি নাই। খুবই প্রশাসন নির্ভর একটা প্রক্রিয়া হয়েছে। সেজন্য জাতীয় ঐক্যের যে ব্যাপারটা বলছেন আমি মনে করি রাজনৈতিক ঐক্য যদি নাও থাকে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন নীতিমালার ক্ষেত্রে একটা ঐক্য করার জায়গা নিঃসন্দেহে আছে এবং সেটা গরীব মানুষের পক্ষে, বিকাশমান মধ্যবিত্তদের সাহায্য দেয়ার জন্য এবং বাংলাদেশের যে উৎপাদনশীল উদ্যোক্তারা আছেন তাদের মনোবল যাতে ভেঙে না যায় সেটার জন্য কাজ করার সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি। এই ত্রিমুখী সংকটকে কাটানোর জন্য, এ দুর্ঘোণ আগামী মাসে একটু বাড়বে বলে আমি মনে করি। যদিও না বাড়ুক এটা আমি আশা রাখি।

কেন বাড়বে?

আগামী মাসে বন্যার ফলাফল আসবে। এ বন্যার ফলাফল যে আগামীর ফসলকে কীভাবে আক্রমণ করবে, কৃষিখাতের ভেতরে কি এটাকে ফলাফল দিবে, রপ্তানিখাতে যে সমস্যা যা ইতিমধ্যে দেখা দিচ্ছে, রেমিট্যান্সের আয়ের ক্ষেত্রে যে উঠানামাগুলো হচ্ছে আমি জানিনা তা কতটুকু স্থায়ী হবে। প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ সে অর্থে এ মুহূর্তে আর আসবেনা। আমাদের এ মুহূর্তে পুরো জোরটা যাওয়া উচিত আর্থিক খাতকে সংগঠিত রাখার ব্যাপারে। আর্থিক খাতে আর বাড়ানোর ক্ষেত্রে, কর বাড়ানোর ক্ষেত্রে, নতুন করদাতাদের নিয়ে আসতে যে কথাগুলো বলা হয়েছে তা কার্যকর করা, পুরনো করদাতাদের যেন হয়রানি করা না হয় এবং একই রকমভাবে ব্যয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সংযম এবং এটার দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এছাড়া আমি আর কোনো রাস্তা দেখিনা। আর প্রবৃদ্ধি ৬ হলো কিনা ৭ হলো এটা নিয়ে আদৌ চিন্তা করা উচিত না। মানুষের জীবনমান রক্ষা করাটাই মূল বিষয়, প্রবৃদ্ধি কেউ ধুয়ে মুছে খাবেনা। এখানে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, নীতি প্রণয়নের দক্ষতা এবং যে সামাজিক জবাবদিহিতা, এই তিনটি এক জায়গাতে আনতে হবে এবং আমরা যতখানি পারি বৈদেশিক সাহায্য, যে ন্যায্য সাহায্য সেগুলোকেও সাথে নিয়ে আসতে হবে।

মতিউর রহমান চৌধুরী: অনেক ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনিও ভালো থাকবেন।

চ্যানেল আই 'আজকের সংবাদপত্র'-এ প্রচারিত

২০ জুন ২০২২

অর্থনৈতিক সুশাসন যদি না থাকে তাহলে এক সময় তা রাজনৈতিক সংঘাতে পরিণত হয়

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

রাহুল রাহা: যে জিনিসটা দিয়ে শুরু করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা তো এমন একটা সময় পার করছি যখন হঠাৎ করে একটা চাপ এসে গেলো। অথচ আমরা কিন্তু ভালোই চলছিলাম গত কয়েক বছর। প্রথমে করোনা মহামারী এলো, এরপরে যুদ্ধ এলো। সব মিলিয়ে আপনি সাম্প্রতিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বলছেন দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশ একটা চাপে আছে কিন্তু সংকটে আছে কিনা সেটা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন। আসলে কীভাবে দেখছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেখুন আমি বলেছি যে চাপে আছে কিন্তু এখনো সংকটে নেই। কিন্তু অর্থনীতির নিয়ম বলে যদি আপনি ধারাবাহিকভাবে চাপকে যথাযথভাবে মোকাবিলা না করেন তাহলে সেটা সংকটে উপনীত হয়। অর্থাৎ চাপ মোকাবিলা করতে অর্থনৈতিক পদক্ষেপগুলো ধারাবাহিকভাবে না হলে, সামগ্রিকভাবে না হলে, সমন্বিতভাবে না হলে এ চাপ কতগুলো দুর্বলতা সৃষ্টি করে যা আপনাকে সংকটের মুখোমুখি করে দেয়। এটি হলো আমার বক্তব্য এবং সেক্ষেত্রে আমার আশঙ্কার জায়গাটা হলো সরকারের পক্ষ থেকে এখনো এক ধরনের অস্বীকারের মনোভাবের ভেতরে থাকা হয় যার ফলে সরকার যেটুকু নীতি বিভিন্ন সময়ে নিচ্ছে সেগুলোর কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। দেখুন সরকারের পক্ষ থেকে পরোক্ষ স্বীকৃতি হলো যে বিভিন্ন সরকারি বিনিয়োগে শাস্ত্রীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। আমি বহু আগে বলেছিলাম বিশেষ করে দায়-দেনা পরিস্থিতিতে বিবেচনায় রেখে যে আমাদের অন্য বড় বড় প্রকল্পগুলোকে স্থগিত রাখা দরকার এখন কারণ আমাদের সে আর্থিক সঙ্গতি নাই।

সেক্ষেত্রে সরকার ক খ এবং গ করে তিন ভাগ করেছে। গ কে পরিত্যাজ্য, খ কে বিবেচনায় রাখবো, ক কে পরিচালনা করবো। ঠিক আছে, ঠিক কাজই করেছে। একই ভাবে বলেছিলাম যে বাণিজ্য নীতির মধ্যে পরিবর্তন আনা দরকার। সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ দেয়া হয়েছে, শুল্ক আরোপ করা হয়েছে, নিষিদ্ধও করা হয়েছে। কিন্তু জিনিসটা একই ভাবে দেখুন যে আপনি এক রাতে তেলের দাম বাড়িয়ে দিলেন ৪০ টাকা

আবার কিছুদিন পর ৫ টাকা কমিয়ে দিলেন, আবার হয়তো কয়দিন পর আরেকটা কিছু করবেন। এটা হলো এক ধরনের সমন্বয়হীনতা এবং কার্যকর নীতি-প্রণয়নের অভাব হিসেবে দেখছি। আর যেটা আপনি বললেন যে যাচ্ছিলাম তো ভালোই কিন্তু হঠাৎ করে ঘটনাটা ঘটলো। আসলে আমি কিন্তু বেশ কিছু সময় ধরেই বলেছি যে এরকম কোনো ঘটনা ঘটবে। এর বড় কারণ হলো এ সময়কালে আমার যে অর্জনগুলো আছে যেমন— স্বল্পম্রোত দেশের তালিকা থেকে বের হওয়া বা মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হওয়া বা এমডিজি/এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি, দৃশ্যমান অবকাঠামোর উন্নতি।

আমি সেদিনও বলেছি সাংবাদিকদের কাছে যে খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে, গড় শিক্ষার হার বেড়েছে, পাঁচ বছরের মত প্রায় আয়ুষ্কাল বেড়েছে, প্রণোদনার মাধ্যমে আমরা কোভিড-উত্তর পরিস্থিতি মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছি, অন্যান্য সফল দেশের মত আমরা টিকাদানে সফল হয়েছি। সুতরাং এখানে অভাবে কোনো কিছু নেই। কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে অর্থনীতি এমন একটা জিনিস যেটাকে সর্বদা সংস্কারের ভেতরে রাখা লাগবে। কারণ এখানে সর্বদা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে। ভেতরের সাথেও হচ্ছে, বাইরের সাথেও হচ্ছে। সেগুলোকে মোকাবিলা করতে আপনার যদি প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি না থাকে তাহলে পরের ধাপে যাওয়া তো বড় কথা আপনি এগুলোকেও ধরে রাখতে পারবেন না। দেখুন সাধারণ উদাহরণ হিসেবে আমি বলি আপনারা সবাই বলেন যে বৈদেশিক লেনদেনে ঘাটতির কারণে এখন টাকার উপর চাপ, আমদানিতে আমরা জ্বালানি আনতে পারছি না ইত্যাদি। কিন্তু আসল যে সমস্যাটা আমি বার বার বলছি সেটা হলো দেশে প্রবৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু কর আদায় বাড়েনি। তাহলে প্রবৃদ্ধি যদি হয়ে থাকে, প্রবৃদ্ধি বাড়়া বা জিডিপি বাড়়া মানে তো আয় এবং আয় মানে তো হলো কর। তো ওই করগুলো কোথায় গেল? এর মানে হলো হয় আপনার জিডিপির হিসাব ঠিক নেই নয়ত আপনি কর আদায় করতে পারছেন না প্রশাসনিক বা অন্যান্য কারণে। আপনার ১০ শতাংশের নিচে, ৯ শতাংশ মাত্র।

তাহলে সরকারের এখন যখন সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল কৃষককে ভর্তুকি দেয়া, সারে ভর্তুকি দেয়া, জ্বালানিতে ভর্তুকি দেয়া অথবা আরো বেশি সস্তায় টিসিবির মাধ্যমে পরিবার কার্ডের মাধ্যমে বা উন্মুক্ত বাজারের মাধ্যমে আপনার দেয়ার কথা ছিল ভর্তুকির খাদ্যপণ্য তখন সেটা দেয়ার মত আপনার অর্থ নাই। এটা যদি সময়মত আপনি সংস্কার করতেন তাহলে আজকে আপনার এটা মোকাবিলা করতে সমস্যা হতো না। আমাদের মত দুর্মুখরা যখন সময় ভালো ছিল তখন যখন বলেছি সংস্কার করেন তখন এটাকে অবগুণ্ণ করা হয়েছে। আজকে সময় পার হবার পর এটাকে আমরা অনুভব করছি। আপনি টাকার বিনিময় হারের কথা দেখেন আমরা বলেছি যে আপনি একাধিক বিনিময় হার করবেন না। আশির দশকে এটা থেকে আমরা বের হয়ে এসেছি। পাকিস্তান আমলে পাট রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম দেয়া হতো এটা কোনো দক্ষতার পরিচয় না।

আপনাকে বাজারভিত্তিক এবং প্রতিযোগিতা সক্ষম বিনিময় হার করতে হবে। আপনি বিনিময় হারকে উচ্ছে রাখলেন, শর্ত শক্তিশালী রাখলেন কারণ হয়ত আপনার চিন্তা ছিল মূল্যস্ফীতি হবে বা আমদানিকৃত পণ্যের দাম বেড়ে যাবে। কিন্তু যেটা আপনি করলেন সেটাকে ঠেকে

দেয়ার জন্য আপনি ২ শতাংশ রেমিট্যান্সে দিলেন, কিছু আপনি রপ্তানিকারকদের দিলেন এবং দ্বৈত নীতির সৃষ্টি করলেন। অর্থাৎ এটা তো কখনো টেকসই হয় না কারণ বিনিময় হার ওঠানামা করে আন্তর্জাতিকভাবে। আপনার ২ শতাংশ কিন্তু শতাংশ হিসেবে অনেক বড় অংকতে চলে যায়। এখন দেখেন বাজারভিত্তিক করতে পারছেন না সেহেতু এটা কতগুলো সংস্কারের অভাব। বাংলাদেশ গত এক দশকে যে উন্নতিটা করেছে তার করার একটা সীমাতে পৌঁছে গেছে। এই সীমা থেকে তাকে যেতে হলে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, প্রতিযোগিতা সক্ষম হতে পারবে, আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে তাকে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা তার যে নির্বাহী বিভাগ আছে, তার যে প্রশাসন আছে ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি ‘Regulatory Framework’, তার যে জবাবদিহিতার জায়গাটা, গুণগত মানের জায়গাটা এটাকে যদি শক্তিশালী করতে না পারেন তাহলে আপনার বিনিয়োগের পরিবেশটা হবে না।

রাহুল রাহা: খুবই ভালো বলেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে একটা জিনিস নিয়ে খুবই কথা হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে, সরকার আইএমএফ এর কাছ থেকে ঋণ নেয়ার কথা ভাবছে। এ ব্যাপারে আপনার কি অভিমত?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ঢাকা শহরে আমি বোধহয় সর্বপ্রথম অর্থনীতিবিদদের ভেতরে ১৯শে মে বাজেটের আগে বলেছিলাম যে সরকারকে আইএমএফ-এর কাছে যেতে হবে এবং যাওয়া দরকার। সরকারের সমস্যাটা হলো আইএমএফ-এর কাছে যাচ্ছে মানে আপনি ডাক্তারের কাছে গেছেন এর মানে আপনার রোগ আছে। আপনি তো এতদিন রোগ স্বীকার করেননি সেজন্য একটা মানসিক অসুবিধার ভেতরে আছে। দ্বিতীয়ত যেটা আছে যে আইএমএফ থেকে টাকা তো আর বিনাশ অর্থে আসবে না সরকারের প্রতি অনেক জমে থাকা সংস্কার যেগুলোর কথা আমি বলছি কর আদায় বলেন বা টাকার বিনিয়োগ হার ঠিক করা বলেন বা ভতুর্কির ভেতরে সমস্বয়ের কথা বলেন এগুলো আসবে, এগুলোর জন্য।

আমি মনে করি আইএমএফ-এর কাছে যাওয়াটা দোষের কিছু না, কারণ আইএমএফ সৃষ্টি হয়েছে এরকম পরিস্থিতিতে সাহায্য দেয়ার জন্য। আপনারা মনে করবেন আইএমএফ হলো বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য সৃষ্টি করার জন্য। কিন্তু সরকার তো তারও আগে বিশ্বব্যাংক এবং এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের কাছে গেছে বাজেট সমর্থনের জন্য। অর্থাৎ প্রজেক্ট এইড নয়, বাজেট এইডের জন্য গেছে। আপনি যদি স্মরণ করে দেখেন আজ থেকে বোধহয় দুই মাস কি তিন মাস আগে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমার দেড় বিলিয়ন ডলার দরকার বাজেট সমর্থনের জন্য এখানে সাড়ে চার বিলিয়ন। অর্থাৎ আপনার আর্থিক খাতেও দুর্বলতা, আপনার বৈদেশিক লেনদেনেও দুর্বলতা। এই দুটোকে মেটানোর জন্য আপনি এ মুহূর্তে চট জলদি টাকা আনতে চাচ্ছেন। কিন্তু বিষয়টা সে জায়গায় না, বিষয়টা হলো টাকাটা যে আনবেন তারা তো টাকা আপনার এমনি দিবেনা ফেরত নেয়ার নিশ্চয়তা সহকারে দিবে। ফেরত নেয়ার নিশ্চয়তা হলো দেশের ভেতরে সংস্কার করতে হবে। ১৯শে মে আমি তখন বলেছিলাম যেতে হবে এবং শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞতা বলে গেলে আগে আগে যান, দেবী করে যাবেন না। আগে আগে

গেলে পরে আপনি এখনো কিছু পদক্ষেপ নিতে পারবেন যার ফলে আপনি কিছু কম কষ্টে বের হয়ে আসতে পারবেন।

রাহুল রাহা: কিন্তু শ্রীলঙ্কার সাথে কি বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলনীয়? এটা প্রায়শই আসছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেখুন প্রতিটা দেশ তার নিজের মত করে থাকে। একেক পরিবারে একেক রকম দুঃখ। বাংলাদেশে তার নিজের মত দুঃখ, শ্রীলঙ্কার দুঃখ বাংলাদেশে হবে কেন? শ্রীলঙ্কার টাকা এসেছে বেশিরভাগই হলো ব্যক্তিখাতের থেকে, আমাদের আসে সাশ্রয়ীভাবে বৈদেশিক টাকা থেকে। তাদের থেকে শিক্ষা নেয়ার ব্যাপার আছে কিন্তু তাদের মত যে আমাদের হবে, আমাদের প্রতিচ্ছবি এটা মনে করার কারণ নেই। যে বড় শিক্ষা শ্রীলঙ্কা থেকে নিতে হবে সেটা হলো অর্থনৈতিক সুশাসন যদি না থাকে তাহলে এক সময় না এক সময় এটা রাজনৈতিক সংঘাতে পরিণত হয়। কোনো দেশে দেখবেন অর্থনৈতিক সুশাসনের অভাব রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে, যেমন: শ্রীলঙ্কা, আবার কোনো কোনো দেশে রাজনৈতিক সুশাসনের অভাব অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে যেমন পাকিস্তান, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নেপাল। এরকম ঘটনাবলি আমার পৃথিবীতে চারপাশে আছে। বাঙালি তো বুদ্ধিমান জাতি আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে শিখতে হবে কেনো আমরা তো অন্যের অভিজ্ঞতা থেকেই শিখতে পারি।

রাহুল রাহা: আইএমএফ থেকে কি ঋণ নেয়া উচিত হবে? অনেকে বলে হবে অনেকে বলে হবে না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এ মুহূর্তে তো এছাড়া আর বিকল্প নেই। এ মুহূর্তে চলতি খাতের যে ঘাটতি তা বাংলাদেশের ৫০ বছরের সর্ববৃহৎ ঘাটতি। এ মুহূর্তে আপনার বাণিজ্য ঘাটতি বেশি, সার্বিক লেনদেনের ঘাটতি বেশি সেটা ঠেকা দেয়ার জন্য আইএমএফ-এর কাছে যাওয়া দরকার। যে জায়গাটা আপনাকে বলতে চাচ্ছি সেটা হলো দুঃখের জায়গাটা এখন আইএমএফ এসে আপনাকে যে কাজগুলো করাবে গত এক দশক ধরে এ কাজগুলোর কথা আমরা বলে আসছি। পেশাজীবির, অর্থনীতিবিদরা, স্বাধীন বিশ্লেষকরা এটা বলেছে যেটা গায়ে মাখা হয়নি। এখন আরো বেশি দিয়ে করা হবে এবং কীভাবে করা হবে? আমরা তো বলেছিলাম আপনি যে ভর্তুকি দেন সে ভর্তুকি সমন্বয় করেন, আপনি ক্যাপাসিটি চার্জ দিচ্ছেন না। ঐ ভর্তুকি অন্যায় ভর্তুকি, আপনি ন্যায়সঙ্গত ভর্তুকি দেন। কৃষককে সারের জন্য ভর্তুকি দেন এই যে আমরা আসছে আমনে সারের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এটার ভেতরে বিদ্যুৎ আছে সেখানে ভর্তুকি দেন, তার যে খাদ্য সংগ্রহ করেন সেখানে আপনি উচ্চমূল্য দেন। এখন তো এসে আইএমএফ এগুলো বন্ধ করবে অন্য জায়গাতে হয়তো করবে না। সরকার এখন কিন্তু রাজনৈতিকভাবে বেশি মূল্য দিবে। যদি দেশের নাগরিকদের কথা শুনত তাহলে কিন্তু এ কষ্টটা এ সরকারের হয় না। সরকারের কষ্ট মানে মানুষের কষ্ট এবং মানুষের কষ্ট মানে আপনার আমার সবার কষ্ট।

রাহুল রাহা: আমি যেটা জানতে চাই যে এই যে বিশ্বব্যাপী যে সংকটগুলো সৃষ্টি হয়েছে এর জন্য তো বাংলাদেশ দায়ী না। আপনার কি মনে হয় এর জন্য কোনো ভয়েজ চালু আছে? এই যে ডলার ইচ্ছামত একদল লোক নিয়ন্ত্রণ করছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি তো অনেক বড় প্রশ্ন উত্থাপন করছেন সেটা হলো বৈশ্বিক ব্যবস্থার ভেতরে যে ধরনের কাঠামোগত অসামঞ্জস্য আছে, ওখানে যে শক্তির ভারসাম্যের বিষয় রয়েছে, আমাদের মত দেশগুলোর সেখানে কঠোরতার ব্যাপার রয়েছে এগুলো আমি সবগুলোই আপনার সাথে স্বীকার করি। কিন্তু আমি যদি দেশের ভেতরে থাকতে চাই তাহলে দেখুন অনেকেই এটা বলছেন, সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ না হলে তো আমরা ভালোই ছিলাম। আমি এটার সাথে একমত না। যুদ্ধের কারণে সব হচ্ছে না। ধরুন আপনি রেমিট্যান্সের কথা বলেন, রেমিট্যান্স আয় কিন্তু আমার শ্রীলঙ্কার চেয়ে কম, ভারতের চেয়ে কম, ফিলিপিন্স এর চেয়ে কম এমনকি কিছু ক্ষেত্রে নেপালের চেয়েও কম। তাহলে আমার এই যে মাথাপিছু আয় নেই এর বড় কারণ কী? কারণ হলো তার দক্ষতার অভাব যেমন: সে কম্পিউটার জানে না, ইংরেজি বলতে পারে না এবং সে যে শিক্ষা থেকে এসেছে সে শিক্ষার কোনো বাজারের স্বীকৃতি নেই।

আমরা বার বার বলেছি যে শিক্ষার গুণগত মান যদি উন্নত না করা যায় তাহলে আপনি কোনোদিনই কিন্তু দেশকে সামনে এগিয়ে নিতে যেতে পারবেন না। সকলে বলছে জিপিএ ফাইভ, গোল্ডেন ফাইভ পেয়ে গেছে। পার্থক্যটা দেখুন যে বাজার স্বীকৃতি দিচ্ছে না কিন্তু আপনি উচ্চাস সৃষ্টি করছেন। যে উচ্চাসের ভেতরে বাতাস বেশি, বস্তু কম। একই রকম আপনি দেখেন এই কত বছর ধরে হয়ত আপনি আপনার পেশার শুরু থেকে এই আলোচনা করেছেন যে একটি মাত্র পণ্যের উপরে আমরা ৯০ শতাংশ নির্ভরশীল আমার রপ্তানি আয়ের। তাহলে কেন বহুমুখীকরণ হলো না? কিছুটা হয়েছে ফার্মাসিউটিক্যালসে, কিন্তু আমার ডিজিটাল আয়টি সেরকমভাবে বাড়লো না কেন এত কিছু হবার পরেও? এখানেও শিক্ষার গুণগত মানের বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এলডিসি থেকে বের হয়ে যাবো, আমাদের সাহায্য কমে যাবে এদিকে একটি এপিআই ফ্যাক্টরি ১০ বছর ধরে হয় না। আপনি কাকে বলবেন এগুলো? আমি যেটা আপনাকে বলতে চাচ্ছি ধরুন রোগ হয়েছে, কোভিড হয়েছে, তো কোভিড যখন আপনারও হয় আমারও হয়েছে তো এটাকে মোকাবিলা করার আপনার যে শক্তি আমার তো সেই শক্তি নাই। তো আমি এই একই রোগে, একই বিশ্বব্যাপী সে সংকটে একটি দেশ দুর্বল হয়ে যায়, একটি দেশ চলতে পারে। যদি তার চলার মত শক্তিগুলোকে সংস্কার করে সে আসত তাহলে সে অনেক ভালো অবস্থায় থাকতো। এখানে ‘immunity’ নেই, ‘resilience’ নেই। ভারতের টাকার মান বাড়ে আবার কমে কেন?

রাহুল রাহা: ভারতেও তো কমছে কাল দেখলাম।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: না। আপনি দেখেন ভারতের সব থেকে বেশি শক্তি কোথায় রয়েছে। আমি যে বলছি Fiscal Strength অর্থাৎ দেখেন ভারতে তেলের দাম কীভাবে সমন্বয় করলো? তাদের যে উৎসে করগুলো আছে সেগুলো কমিয়ে দিলো কিন্তু রাজ্যকর কমায়নি। অর্থাৎ

রাজ্যের আয়ের উপর হাত না দিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে করেছে। আর কেন্দ্রীয়ভাবে যেটা করেছে সেটাকে মোকাবিলা করার জন্য বিকল্প উৎস থেকে আবার টাকাগুলোকে নিয়ে আসতে পারলো। এখন পৃথিবীতে জরুরি বিষয় হলো ফিসকাল স্পেস অর্থাৎ আপনি অর্থনীতি কতটা ব্যবহার করবেন। হয় ঋণ নিয়ে দিবেন, নয়ত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে করবেন। সরকার যেহেতু কর হঠাৎ করে বাড়াতে পারবেন না সেহেতু আপনার ঋণ করতেই হবে।

রাহুল রাহা: ভারতের মানুষ কি খুব স্বস্তিতে আছে? সেখানেও তো তেলের দাম কয়েক দফা বাড়িয়েছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: কিন্তু তাও তাদের সহ্য শক্তি আমাদের থেকে বেশি। একটা তো হচ্ছে তা বড় অর্থনীতি। আর তার যে কাঠামোটা আছে একটা হলো ব্যাংকিং খাতের কাঠামো বা গণতন্ত্রের কাঠামো। মোট কথা তাদের যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যেখানে মিডিয়া কথা বলতে পারে। যদিও তাদের গণতন্ত্রের আগের চেয়ে ক্ষয় হয়েছে। আমি আপনাকে যেখানে নিয়ে আসতে চাচ্ছি তা হলো সরকার অনেক সময়েই অনেক পদক্ষেপ নিচ্ছে যেগুলোর সাথে আমি একমত। কিন্তু সরকার তা দেবী করে নিচ্ছে, অসম্পূর্ণভাবে নিচ্ছে, সমন্বয়হীনভাবে নিচ্ছে। আপনার মনে আছে কিনা জানিনা আমি বলেছিলাম এবারের বাজেটকে দুই থেকে তিন বছরে নিয়ে আসেন, কারণ হলো, একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতির ভেতর বিশ্ব এবং বাংলাদেশ আছে। স্মরণ করে দেখেন আমি আজ থেকে ছয়-আট মাস আগে বলেছিলাম।

এখন দেখেন বাজেটের যে সংখ্যাগুলো আছে এগুলোর কি কোনো তাৎপর্য আছে? অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে প্রাক্কলনগুলো ছিল সেগুলো কি আর প্রাসঙ্গিক আছে? নই। এখন আপনাকে উত্তরণের জন্য একটা প্যাকেজের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে আমি যেটাকে বলছি একটা উত্তরণকালীন প্যাকেজ। উত্তরণকালীন প্যাকেজের মধ্যে তিনটা জিনিস থাকতে হবে। প্রথমত আমার সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে হবে এবং মূল্যস্ফীতিকে তার এক নাম্বার শেকড়ে গাঁথতে হবে। মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করাটা হলো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেটাকে মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ আছে তার একটা পদক্ষেপ হলো সুদের হারকে আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে নয়ত সুদের হার, মূল্যস্ফীতি এবং বিনিময় মূল্যের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে না। দ্বিতীয় যেটা করা উচিত সেটা হলো এ সময়কালে অভ্যন্তরীণ বাজারে যারা ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে উৎপাদন করে তাদের সমর্থন দিতে হবে যেন তারা টিকে থাকতে পারে এবং কর্মসংস্থান করতে পারে। বৈদেশিক বাজারের পরিস্থিতিতে দেশের বাজার বাঁচানোর এটি একটি সমূহ প্রয়োজন। বাজারে চাহিদা কমে যাচ্ছে, আয় কমে যাচ্ছে। যারা বিস্কুট বানাতে তারা বিস্কুট বানাতে পারছে না, ছোট ছোট বেকারি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং তারা এখন ১৫০ গ্রামের বিস্কুটকে ১০০ গ্রাম বানিয়ে বাজারে টিকে থাকার চেষ্টা করছে। ছোট ছোট যারা ছিল অপ্রাতিষ্ঠানিক তারা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তৃতীয়ত হলো এ মানুষগুলোকে সুরক্ষা দিতে হবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে যারা রয়েছে তারা সেভাবে কোভিডেরও প্রণোদনা পায়নি এবং তাদের এখন সরকারের পক্ষ থেকে ঐ যে এক কোটি ফ্যামিলি কার্ড যা অনেক মাস ধরে শুনছেন তা এখনো কি হয়েছে? এটার তালিকা কি আপনি দেখেছেন?

মনে করে দেখেন, প্রধানমন্ত্রী ৫০ লক্ষ মানুষকে দিতে চেয়েছিল কিন্তু লক্ষের বেশি মানুষকে দিতে পারেনি। কারণ তাদের তথ্য ছিলনা এবং যাদের মধ্যে দিয়েছে তাদের মধ্যেও সমস্যা ছিল। এখন এই কার্ডের কথা আমরা প্রতিনিয়ত শুনি। একটা সরকার যদি গণতান্ত্রিক হয় তাহলে প্রত্যেকদিন বুলেটিনের ভেতরে এত তারিখে আমরা এই এই এলাকায় প্রদান করেছি এবং তালিকা দেখতে চাইলে ওয়েবসাইটে যান এমন প্রক্রিয়া থাকলে আপনি বলতে পারতেন যারা যারা পাবার কথা তারা পেয়েছেন। ফ্যামিলি কার্ড একটি সঠিক পদক্ষেপ কিন্তু এর ঠিকমত বাস্তবায়ন করতে হবে। টিসিবির গুদামে চাল ঢুকাতে হবে এবং এই টিসিবিকে জেলা পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণ জেলা পর্যায়ে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত খুবই কষ্টের ভেতরে আছে। কলেজ শিক্ষক থেকে আরম্ভ করে, সাংবাদিক থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য পেশাজীবীরা খুব কষ্টের ভেতর আছে। আর যাদের আমরা ভাতা দেই, মুক্তিযোদ্ধা বাদে মাত্র ৫০০ টাকা। আপনি গড় আয় করে ফেলেছেন ৮/১০ লক্ষ টাকা আর ভাতা দেন মাত্র ৫০০ টাকা? এটা কীরকম ন্যায্যতা? এগুলোকে অবধারিত ভাবে ন্যূনতম ১০০০ টাকায় নিয়ে যাওয়া উচিত।

আরেকটি কথা আমি বলতে যাই সেটি হলো এ মুহূর্তে যুবকরা কষ্টে আছে, শিক্ষিত যুবকেরা বেশি কষ্টে আছে কারণ চাকরির বাজার সংকুচিত। আমি মনে করি যুবকদের জন্য সৃষ্টিশীল ক্ষিম আসা উচিত। ভারতের থেকে মমতা ব্যানার্জির উদাহরণ নিয়ে বলছি যে যুবক ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করা উচিত। আপনি যদি ওদের কাছে ২ লক্ষ টাকার একটি সীমা দিয়ে ক্রেডিট কার্ড চালু করেন এবং তার যদি অর্ধেক পরে আপনি যাচাই বাছাই করে সরকারের পক্ষ থেকে ভর্তুকি দিয়ে দেন, আমি মনে করি যুব সমাজকে সামাজিক অসন্তোষের থেকে দূরে রাখা অনেক সহজ হবে। মাদকাসক্তি বা অন্যান্য অপরাধমূলক কাজ থেকে যুব সমাজকে দূরে রাখতে এ ধরনের কাজ করতে হবে বলে আমি মনে করি।

রাহুল রাহা: আপনি বলেছেন যে সরকার অনেক উদ্যোগ নিয়েছে কিন্তু এগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এক ধরনের সংকট দেখা যাচ্ছে যেখানে আপনি সমন্বয়হীনতার কথা বলেছেন। তা এই সমন্বয়হীনতার কারণটা কী বলে মনে হয় আপনার?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি তো অবশেষে অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রয়োগের প্রাণ ভোমরায় হাত দিলেন। আমি বলতে চাচ্ছি কেন রীতি হলেও নীতি বাস্তবায়ন হয় না বা হলেও কেন তা সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে হয় না। এটার একটা বড় কারণ এ মুহূর্তে আমি বলতে পারি জবাবদিহিতার অভাব এবং স্বচ্ছতার অভাব যার কারণে এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে প্রত্যেক প্রশাসনের লোক নিজেকে এখন রাজনৈতিক নেতা মনে করে এবং সেরকম দায়িত্ব পালন করতে চায়। বাংলাদেশে যে কোনো সমস্যা থাকতে পারে এটাকে স্বীকার করাটা উনারা রাজনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। কেউ যে সাহস করে বলবে যে আমার তেল আমদানি করার টাকা নেই তিন মাস পরে এ কথাটা বলবেটা কে? তাই এ জায়গার ভেতরে এক ধরনের জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার অভাব সৃষ্টি হয়েছে। আরেকটি সমস্যা হলো যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান আমরা এগুলোকে মোকাবিলা করতে সৃষ্টি করেছি সেগুলো কাজ করে না। আমি আপনাকে উদাহরণ দিয়ে বলি, আপনি দেখেন এ মুহূর্তে একজন অদৃশ্য ব্যক্তি হলো আমাদের

অর্থমন্ত্রী। এই যে ঘটনাবলী ঘটছে সেখানে আমার প্রিয় মন্ত্রীকে আমি সেরকমভাবে দৃশ্যমান দেখি না।

শুধুমাত্র পার্চেস কমিটির মিটিং ছাড়া আমরা তাকে তেমন কোথাও পাচ্ছি না অথচ পুরো বিশ্ব কিন্তু তাকিয়ে থাকে অর্থমন্ত্রীর দিকে। এটা আমাদের জন্য একটা বড় ঘটতির জায়গা। আপনি দেখেন আর্থিক কমিটি যেগুলো আছে বা অন্যান্য কমিটি যেগুলো আছে তারা কতটুকু এগুলো নিয়ে আলোচনা করে? জনমানুষের প্রতিনিধি, ভোট ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে এ বিতর্কে আমি গেলামই না। কিন্তু উনারা তো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ মুহূর্তে আমার জনপ্রতিনিধি। উনারা কি এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছে? সরকারের পক্ষ থেকে তিন মাস পর পর আর্থিক বিবৃতি দেয়ার কথা যা আইনের ভেতরে আছে। সেই বিবৃতি সংসদে আমরা দেখলাম না। আপনি দেখুন মুদ্রানীতি এবং আর্থিকনীতির মধ্যে সমন্বয় করার জন্য সরকারের একটা কমিটি আছে। সে কমিটি কোথায়? মুহিত সাহেবের আমলে বোধহয় সে কমিটির কিছু মিটিং হয়েছিল কিন্তু এখন তো আমরা কিছু শুনি না। আপনার মনে রাখতে হবে যে বাজার আপনার সাথে সাপলুডু খেলে। এখন আপনি কি সাপের মুখে পড়বেন কি পড়বেন না এটা নির্ভর করে আপনি লুডু খেলায় কতখানি আগ বাড়িয়ে চিন্তা করতে পারেন। এখন এই আগ বাড়িয়ে কথা বলতে আপনার তথ্য লাগবে। অথচ এক মন্ত্রীর সাথে কাল কথা হলো তিনি সংশয় প্রকাশ করছেন কৃষিতে আয় নিয়ে যে তথ্য দেয়া হচ্ছে তা সত্য কিনা। কারণ ওখানেও বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলেছে, ভেবেছে উৎপাদন বেশি হয়েছে আমদানির দরকার নেই। তাই আমদানিও করে নাই। কিন্তু আসলে তো উন্নয়ন হয়নি। এখানে চাল বলেন, আলু বলেন বা অন্যান্য তরিতরকারির কথা বলেন।

এই যে জবাবদিহিতার অভাব তা আমাদের যে গত এক দশকের অর্জন সেটাকে টেকসই করার ক্ষেত্রে হুমকি হয়ে গিয়েছে। আপনি যদি বলেন গণতান্ত্রিক চর্চার অভাবে সবচেয়ে বড় ভিক্টিম কে আমি বলবো তা হচ্ছে সরকার। কারণ সরকারের বড় চিন্তাগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য জনমানুষের অংশগ্রহণ লাগবে, নতুন মধ্যবিত্তের অংশগ্রহণ লাগবে। এই নতুন মধ্যবিত্ত কিন্তু সরকারের গত এক দশকের সৃষ্টি। তারা চাকুরিজীবী হিসেবে, বিভিন্ন পেশাজীবী হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় এসেছে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হিসেবে এসেছে। তাদের সুরক্ষা যদি না দিতে পারে সরকার তাহলে নিজের জায়গাতেই সবচেয়ে বেশি ক্ষয় হবে। এক দেড় বছরের মধ্যে নির্বাচনকে সামনে রেখে যেভাবে চলছে তা কী ধরনের আচরণ তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। তখন আমার মনে হয় রাজনীতিবিদরা কি আদৌ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে?

রাহুল রাহা: এক দেড় বছর তো বড় একটা সময় এটা তো সামলিয়ে ওঠা সম্ভব?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ঠিক আছে। আমি মনে করি এক দেড় বছরে সামলানো সম্ভব। কিন্তু আগামী এক-দেড় বছরের যদি আপনি প্রক্ষেপণগুলো দেখেন পৃথিবীব্যাপী এ মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ একটা মন্দার ভেতরে ঢুকছে। এখন আপনার চিন্তা করতে হবে যদি সত্যিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ মন্দাতে যায় নভেম্বর নাগাদ আমার পোশাক শিল্পে

তাদের চাহিদার পরিমাণ কী হবে। আপনি চিন্তা করে দেখেন এ মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে তাদের পরনের কাপড়ের চেয়ে খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে বরাদ্দ বেশি করতে হচ্ছে। কাল আমাকে একজন গার্মেন্টস উদ্যোক্তা বোঝালেন কীভাবে এ সময়কালে এসে তারা হালকা শীতের কাপড় কিনতেন। এবার খরা এবং বাজারে মন্দা থাকার কারণে তা অনেক কমে গিয়েছে। আমি এ মন্দাকে আর কোনোভাবে দেখছি না শুধু তেলের দাম কীভাবে কমানো যায় এবং কোন উৎস থেকে আনা যায় তা নিয়ে ভাবছি।

রাহুল রাহা: রাশিয়া থেকে তেল আনার বাস্তবতা কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: রাশিয়া থেকে তেল আনার ক্ষেত্রে তিনটি বড় প্রতিবন্ধকতা আমি দেখি। একটা হচ্ছে তারা যে তেল দেন তা আমাদের এখানে কীভাবে পরিশোধন করা দরকার। যদি আমরা অপরিশোধিত না আনি তাহলে অন্যটা আনা যাবে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে তেল আনার পর আর্থিক লেনদেনটা কীভাবে করবেন। আর তৃতীয় যেটা আছে তা হলো রাজনৈতিক। রাশিয়ার সাথে সম্পর্কের মধ্যে একটি তৃতীয়গোষ্ঠী আছে। প্রায় ৫০টির মত দেশ ভারত চীন সহ যারা জাতিসংঘে বিভিন্ন সময় ভোট দিতে একটি নিরপেক্ষ অবস্থায় থাকতে চেয়েছে। এখন রাজনৈতিকভাবে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে ভারত এবং চীন যা পারে আমি তা পারবো কিনা। এর ফলে আবার আমরা অন্য কোনো আক্রমণের স্বীকার হবো না বা কাল আমার পোশাক শিল্পে গুঁজু বাড়িয়ে দিলে কী হবে। সে বিবেচনাটা সরকারের থাকতে হবে।

রাহুল রাহা: স্বর্ণের রিজার্ভ বাড়ালে কি উন্নতি হবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: স্বর্ণের রিজার্ভ বাড়তে স্বর্ণ আনতেও তো টাকা লাগবে। আমাদের তো বৈদেশিক মুদ্রা নেই এ মুহূর্তে। এ পরিস্থিতিতে অন্যান্য দেশ রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিক্রি করছে। কিছু জায়গাতে এ কারণে বেসরকারিকরণ করা যাচ্ছে। সরকারি সম্পদকে তরল করছে, বিনিয়োগ করছে। কিন্তু আসলে নব্বইয়ের দশকে বেসরকারিকরণ করেও অনেক সমস্যা হয়েছে। দুর্নীতি বা অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তাই বাংলাদেশে কিছু একটা বাস্তবায়ন করাটা মূল সমস্যা। বাংলাদেশের সমস্যা সবাই বুঝে, সমাধান ও বুঝে কিন্তু এগুলোকে কার্যকর করার জন্য যে জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছতার সাথে আগানো সেখানে একটি বড় সমস্যা রয়েছে।

রাহুল রাহা: আমি শেষ করতে চাই। আপনি এ মুহূর্তে শেষের জায়গায় যদি বলেন আমরা আশার জায়গা কি দেখতে পাচ্ছি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এখন সবচেয়ে বড় আশার জায়গা হলো আমন ফসল ভালো হতে হবে। আমনের দিকে নজর দিতে হবে। এবার বৃষ্টি কম হয়েছে বলে আমন অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তাই আমনকে ১০০ শতাংশ মনোযোগের ভেতরে আনতে হবে। প্রবাসী শ্রমিক যারা যাচ্ছে তাদের যাওয়াকে সহজ করতে হবে। আর সরকার গরীবদের জন্য যেসব পদক্ষেপের কথা বলেছে তা দ্রুততা এবং স্বচ্ছতার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে। বাংলাদেশের ইতিহাসে

অনেক উত্থান পতন আমাকে দেখতে হয়েছে। সাধারণভাবে আমি বাংলাদেশের মানুষের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করি এবং তা মোকাবিলা করতে পারবে বলে আমি মনে করি। কিন্তু তার জন্য তাকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে সাহায্য করতে হবে।

রাহুল রাহা: একটি বিদেশি পত্রিকায় লেখা হয়েছে যে বাঙালি আবেগ এবং আত্মবিশ্বাস দিয়ে অনেক কিছু করতে পারে যা অন্যরা পারেনা।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি আবেগ এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে মেধাও (আছে বলে) মনে করি এবং এগুলোই ভরসার জায়গা। কিন্তু শুধু সম্পদ তো থাকলেই হয়না, তা টেকসই করতে হবে।

রাহুল রাহা: অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য।

নিউজ টুয়েন্টিফোর 'অর্থনীতির সংলাপ'-এ প্রচারিত

৩০ জুন ২০২২

২০ মেগা প্রকল্পের পরিস্থিতি ও প্রবণতা

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অর্থনৈতিক মহামন্দা ১৯৩০ এর পর থেকে মেগাপ্রকল্পসমূহ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করার জন্য জনপ্রিয় একটি নীতি-হাতিয়ার বা মাধ্যম হিসেবে কাজ করে আসছে। বিশ্বব্যাপী জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা কমপক্ষে ৭ শতাংশ নিশ্চিত করার জন্য "এসডিজি ফ্রেমওয়ার্ক" অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রায় ৫৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করা হবে। এর মধ্যে, প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (প্রায় ৩৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার) বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে মেগাপ্রকল্পের বিনিয়োগের উপর জোর দিয়েছে। বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহ যারা বাহ্যিক অর্থের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, মেগা প্রকল্পগুলো ঋণের বোঝা বাড়ার ঝুঁকি বাড়তে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে বড় প্রকল্পের বিদেশি ঋণ পরিশোধ ভবিষ্যতে নতুন চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বড় ও মেগা প্রকল্পগুলো সময়মতো ও দুর্নীতিমুক্তভাবে বাস্তবায়ন করা না গেলে বিদেশি দায়দেনা পরিশোধে ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। এ ছাড়া গ্রেস পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়ায় বিদেশি ঋণ পরিশোধের সময়ও এগিয়ে আসছে। ২০২৪ সাল থেকে এসব প্রকল্পের ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে। ২০২৬ সাল নাগাদ ঋণ পরিশোধের পরিমাণ দ্বিগুণ হতে পারে। তাই ২০২৪ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা আসছে। এমন পরিস্থিতি মোকাবিলায় এখনই পরিকল্পনা দরকার।

বাংলাদেশের মেগাপ্রকল্পগুলোর বেশির ভাগই বাস্তবায়িত হচ্ছে বৈদেশিক ঋণে। দেনার দাবিদার হিসেবে প্রথম সারিতে রয়েছে রাশিয়া। এরপর জাপান ও চীনসহ অন্যান্য দেশ। ২০০৬ সালে নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে যে রূপকল্প ২০২১ তৈরি করা হয়েছিল সেখানে অবকাঠামোগত উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। প্রায়শই বলা হয় যে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য যে বিনিয়োগ করা হয় তার ফলে সামাজিক খাতে যেটুকু উন্নয়ন হওয়ার কথা সেক্ষেত্রে ছাড় দিতে হয়। বড় প্রকল্পের ক্ষেত্রে রাশিয়া, চীন ও জাপানকেই বেশি অর্থ পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি করা জরুরী। এছাড়া এসব প্রকল্পকে কেন্দ্র করে দায়-দেনার পরিস্থিতি জটিল হওয়া এবং বৈদেশিক অর্থায়নের উপরে নির্ভরশীল হয়ে

যাওয়ার ব্যাপারগুলোও দৃশ্যমান। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশে যে আর্থিক বিপর্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে, শুধু শ্রীলঙ্কা নয়, সেসব দেশও অবকাঠামোগত উন্নয়নের পথেই হেঁটেছে। সেজন্য বাংলাদেশেও এই আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। দেশের ২০টি বড় প্রকল্প বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে এসব প্রকল্পের তালিকার অন্যতম হলো পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, কর্ণফুলী নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল নির্মাণ, মাতারবাড়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মেট্রোরেল, পদ্মা সেতুর রেল সংযোগ ইত্যাদি। এসব প্রকল্পে প্রায় ৫ লাখ ৫৬ হাজার ৯৫৫ কোটি বা ৭০ বিলিয়ন ডলার খরচ হচ্ছে, যার প্রায় ৬২ শতাংশ বিদেশি ঋণ।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রচেষ্টার তাত্ত্বিক ও নীতিগত ভিত্তি

উন্নয়নশীল দেশগুলোর মূল অবকাঠামো (আয় উৎপাদনকারী) ভিত্তিক মেগা প্রকল্পসমূহ বেছে নেওয়ার প্রবণতা বেশি মূলত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে। রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রোজেনস্টাইন রোডেন সর্বপ্রথম ‘বিগ পুশ থিওরি’ সামনে নিয়ে আসেন। উনার বক্তব্য ছিল যদি স্বল্পোন্নত দেশ বা উন্নয়নশীল দেশকে উন্নতির দিকে নিতে হয়, তাহলে প্রান্তিকভাবে অল্প অল্প করে বিনিয়োগ বাড়িয়ে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন খাতের মধ্যে বিনিয়োগ করে কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন আনা যায় না। তিনিই প্রথম তাত্ত্বিকভাবে স্থাপন করার চেষ্টা করেন যে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ যদি একসাথে খাতের ভিতরে না আসে তাহলে বড় ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তন স্বল্পোন্নত দেশে সম্ভব নয়। তারা যে নিম্নমাত্রার ভারসাম্য-এর ভিতরে আটকে যায় সেটা থেকে আর বের হতে পারেন না। তিনটি চরিত্র খুব পরিষ্কারভাবে এটার ভিতরে আসে: এটা রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ হিসেবে আসে এবং মূলত রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে হয়, এটা ভৌত অবকাঠামো খাতে বেশি হয় এবং তৃতীয়ত যেহেতু দেশের ভিতরে সঞ্চয় এবং আয় কম সেহেতু বৈদেশিক উন্নয়ন অর্থায়ন প্রয়োজন হবে। গবেষণায় দেখা যায় যে অবকাঠামো ব্যয়ের আর্থিক গুণক সাধারণ সরকারী ব্যয় গুণকের চেয়ে অনেক বেশি। পূর্ব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে অবকাঠামোগত ব্যয় জিডিপিতে অন্যান্য ধরনের ব্যয়ের চেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অবকাঠামো ভিত্তিক উন্নয়নের পিছনে প্রধান রাজনৈতিক যুক্তি হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করলে বলা যায় যে, ২০০৯ সাল থেকে বড় প্রকল্প নেয়ার ক্ষেত্রে একধরনের জাতীয় ঐকমত্য আছে। বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে দৃশ্যমান উন্নয়ন দেখা যায় বলে রাজনীতিবিদেরা এতে আগ্রহ দেখান।

আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা: সাফল্য এবং বিপর্যয়

বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা বিবেচনায় আনলে দেখা যায় মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়নে সাফল্যের চেয়ে বিপর্যয়ের পরিসংখ্যান বেশি। এর অন্যতম উদাহরণ সংযুক্ত আরব আমিরাত, তুরস্ক, কেনিয়া এবং নাইজেরিয়ার প্রকল্প। আবার, বিপর্যয়ের উদাহরণ হিসেবে বলা যায় লেসোথো, চাঁদ, পাকিস্তান, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা এবং মালয়েশিয়ার প্রকল্পগুলোর কথা। তাই বাংলাদেশের প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাগুলোকে বিবেচনায় রাখতে হবে। এর পাশাপাশি প্রকল্পগুলোর অর্থনৈতিক তাৎপর্য কী, তাত্ত্বিক দিকটি কী, রাজনৈতিক আগ্রহ কেন আছে এই ব্যাপারগুলোকেও বিবেচনায় রাখা জরুরী। এই প্রেক্ষিতে অবশ্যই বাংলাদেশকে খুব

সাবধানতা ও বিচক্ষণতার সাথে বড় ধরনের ধাক্কাগুলোকে মোকাবিলায় আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত।

বিশিষ্ট মেগাপ্রকল্পের সামষ্টিক বিশ্লেষণ

বিশিষ্ট মেগা প্রকল্পে এ পর্যন্ত বিনিয়োগ হয়েছে ৭০ বিলিয়ন ডলার যার দুই-তৃতীয়াংশই বিদেশি ঋণ। এসব প্রকল্পের বেশির ভাগ ভৌত অবকাঠামো সম্পর্কিত। এ খাতে বিনিয়োগ হয়েছে ৫০ শতাংশ। বিদ্যুৎ খাতে ৩৫ শতাংশ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ১২ শতাংশ। বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খাতের প্রকল্পগুলোর গড় আয়তন এবং ব্যয় অনেক বড় এবং বিদেশী অর্থনির্ভর। গত ২০১০ সাল থেকে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হলেও সবচেয়ে বেশি প্রকল্প এসেছে ২০১৪ থেকে ২০১৮ সালে। ২০ প্রকল্পের মধ্যে ১৩টি এসেছে এই সময়ে। তবে দুই-তিনটি প্রকল্প ছাড়া বাকিগুলো বাস্তবায়নের অবস্থা ভালো নয়। বিশেষ করে ২০১৮ সালের পর যেসব প্রকল্প এসেছে সেগুলোর বাস্তবায়ন নগণ্য বা সন্তোষজনক না।

বিশিষ্ট মেগাপ্রকল্পের প্রবণতা বিশ্লেষণ

আগামী ২০২৮ সালের মধ্যে এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শেষ হওয়ার কথা। তবে যেভাবে কাজ এগোচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে আরও সময় নেবে। ওই ২০টি প্রকল্প ২০২৮ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও চলতি দশকে সব কটি শেষ করা সম্ভব হবে না। প্রকল্প বাস্তবায়নে একধরনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাব রয়েছে। বর্তমানে কিছু ক্ষেত্রে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমছে। রাজস্ব আয় প্রত্যাশিতভাবে হচ্ছে না। ঘাটতি আছে প্রকল্প বাস্তবায়নে।

মেগাপ্রকল্পগুলোর সংশোধনের একটি প্রবণতাও লক্ষ করা গেছে। ২০টির মধ্যে ৭টি প্রকল্পই বিভিন্ন সময় সংশোধিত হয়েছে। মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যুক্তিও রয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতায় বলে, যদি মানসম্মত সমীক্ষা না থাকে, সমন্বয়ের অভাব থাকে, বাস্তবায়নের ঘাটতি থাকে, কাজ শেষ হতে সময় বেশি লাগে, দুর্নীতি হয়, সামষ্টিক অর্থনীতি দুর্বল থাকে, তাহলে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের সুফল আসে না। বহু দেশে অনেক মেগা প্রকল্প বিপর্যয় ডেকে এনেছে। সুতরাং বাংলাদেশে এ বিষয়ে সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে।

বিশিষ্ট মেগাপ্রকল্পের অর্থায়ন এবং সরকারি আর্থিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

বাংলাদেশের ২০টি মেগাপ্রকল্পের বৈদেশিক অর্থায়ন সাশ্রয়ীভাবে হয়েছে। এটা বড় সন্তোষের জায়গা। এসব প্রকল্পে ৪৫টি ঋণ প্যাকেজের মধ্যে পাঁচটি অনুদান। ৩৩টি সাশ্রয়ী ঋণ প্যাকেজ, আধাসাশ্রয়ী দুটি ও বাণিজ্যিকভাবে নিতে হয়েছে পাঁচটি ঋণ প্যাকেজ, যা চীন থেকে এসেছে।

তবে যতই বলা হোক, বাংলাদেশ আর শ্রীলংকা এক নয়। কিন্তু এটি তো ঠিক, শ্রীলংকার অর্থনীতি দেউলিয়া হওয়ার পর বাংলাদেশের বাজেটে ঋণ ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ‘বিদেশি ঋণ’ বুঁকি সীমার নিচে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কৃষি সাধনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। আমাদের শ্রীলংকার মতো পরিণতির শিকার হতে হবে না, সাধারণ মানুষের মনোবল চাঙা রাখতে এমন অনেক কথাই বলতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো শ্রীলংকার মতো পরিণতি বিবেচনায় রেখে বুঁকি এড়াতে আমাদের বিদেশি ঋণে ঝাঁক কমাতেই হবে। দেশের রিজার্ভ পরিস্থিতি যেন উর্ধ্বগামী থাকে, অর্থনীতি যেন সুসংহত হয়, সেদিকে মনোযোগ বাড়াতে হবে। ঋণনির্ভরতা কমাতে অবশ্যই অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি করতে হবে। বৈদেশিক ঋণ কাটছাঁট করতে গেলে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে। তবে সব সময় ব্যাংকব্যবস্থা থেকে ঋণ নেয়াও ঠিক নয়। এতে বেসরকারি উদ্যোক্তারা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে। বৈদেশিক ঋণের রেয়াতকালের (গ্রেস পিরিয়ড) দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে চীন তারপর জাপান, রাশিয়া। তাই ঋণ পরিশোধের চাপটা আগে চীন থেকেই আসবে। আশঙ্কার কথা, বৈদেশিক দায়দেনা ১৭ শতাংশে নিচে ও অভ্যন্তরীণ দায়দেনা ১৭ শতাংশের ওপরে। লক্ষ্যণীয় হলো এটা আস্তে আস্তে বাড়ছে। ২০১৮ সালের পর দায়দেনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। আর মেগাপ্রকল্পের ঋণের পরিশোধের সবচেয়ে বড় অংশ ৩৬.৬ শতাংশ যাবে রাশিয়ার কাছে, এরপর জাপানে যাবে ৩৫ শতাংশ এবং চীনের কাছে প্রায় ২১ শতাংশ। যদিও পরিমাণের হিসেবে চীন তৃতীয় হলেও দায়দেনা পরিশোধের সময়সূচি, তাতে সবচেয়ে বেশি পরিশোধ করতে হচ্ছে চীনকে। বিরাট ধাক্কা সামলাতে কর আহরণ বাড়াতে হবে। কারণ কর-জিডিপি পরিমাণ এখনো ১০-এর নিচে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ এখনও বুঁকিসীমার নিচে রয়েছে। ভবিষ্যতে ঋণের এ অবস্থান ধরে রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। বৈদেশিক ঋণের লক্ষ্যমাত্রা কীভাবে কমানো যায়, সে চেষ্টা করতে হবে। বুঁকিসীমার নিচে থাকলেও আমাদের বৈদেশিক ঋণের বুঁকি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা, ইউরোপকেন্দ্রিক ঋণ জটিলতা ও পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নমনীয় ঋণের উৎসও সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এসব প্রতিকূলতায় সংশ্লিষ্টদের দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে হবে। ইআরডি’র তথ্যমতে, স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবৎ বাংলাদেশ যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করেছে। এমনকি ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কিস্তি পুনঃতফসিলীকরণের জন্য বাংলাদেশকে কখনও আবেদন করার প্রয়োজন হয়নি। তবুও কঠিন শর্তের ঋণের বুঁকি প্রশমনে ইন্টারন্যাশনাল রেস্ট প্র্যাকটিসের সঙ্গে সংগতি রেখে ঋণের নমনীয়তা পরীক্ষা ও অনুমোদনে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

এক খাতেই ৪০ বিলিয়ন ডলারের ১১ প্রকল্প

মেগাপ্রকল্পের আওতায় যে সকল খাতে খরচ পরিবাহিত হচ্ছে এর মধ্যে ৪০ বিলিয়ন ডলার খরচ হবে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে। এই খাতে একটি মন্ত্রণালয়ের ১১টি প্রকল্পে পাঁচ থেকে ছয় বছরে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। মেগা প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে সুখম বণ্টন নিশ্চিত করা হয়নি। যদি সুখমভাবে প্রকল্প বণ্টন করা হতো, তাহলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতের মতো প্রয়োজনীয় খাতে আরও বেশি বড় প্রকল্প নেওয়া যেত।

মেগা প্রকল্প যতই যৌক্তিক হোক না কেন, তার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক খাতকে উপেক্ষা করা চলবে না। অথচ বাজেটে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে বরাদ্দ জিডিপির তুলনায় কমে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের একটি ভূমিকা থাকা দরকার ছিল।

আইএমএফের অর্থ নেওয়ার পক্ষে মত

বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গে আলোচনা শুরু বেশ ইতিবাচক। দুই বিলিয়ন ডলার হোক আর সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার, আইএমএফ-এর কাছ থেকে অর্থ নেওয়ার প্রয়োজন আছে। এটা মধ্য মেয়াদে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হবে। বিদেশি বিনিয়োগকারী ও উন্নয়ন সহযোগীরা একধরনের আস্থা পাবেন। বাংলাদেশকে একধরনের পরিবীক্ষণ ও নজরদারিতে রাখছে আইএমএফ। সরকার আইএমএফ-এর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে, এটাই শুভকর ছিল। আইএমএফের কাছে শুধু টাকার জন্য যেকোনো দেশ যায় না, কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে যে পিছুটানমূলক বক্তব্য এসেছে তা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞতা বলে, তারা যখন আইএমএফের কাছে গেছে তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

সাশ্রয়ী হতে তিন পরামর্শ

বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে অর্থ সাশ্রয়ে তিনটি পরামর্শ হলো:

- যেসব প্রকল্পের কাজ শুরু হয়নি, সেসব প্রকল্প জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ না হলে সাময়িকভাবে স্থগিত করা;
- প্রকল্পের কেনাকাটা যেন অতিমূল্যায়িত না হয়;
- বিদেশি দায়দেনা পরিশোধের সময়সীমা পুনর্নির্ধারণ করা

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন: চলমান প্রকল্পগুলোর কাজ কি শেষ করা সম্ভব?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ২০১৮ সালের পরের প্রকল্পগুলো খুব দুর্বল অবস্থানে রয়েছে। এছাড়াও ২০১৪ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যখানের প্রকল্পগুলো সেগুলোও দৃষ্টিভ্রান্ত কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রশ্ন: প্রকল্পগুলোর কর্মসংস্থানে স্থানীয় মানুষদের সম্পৃক্ত করা যায় কিনা?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রকল্প পর্যায়ে পরিস্থিতি বিবেচনা করে এটা করা হয়তো সম্ভব। প্রকল্পে কোন ধরনের দক্ষতার লোক প্রয়োজন সেগুলো বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। তার চেয়ে বড় কথা প্রকল্পগুলো শেষ হওয়ার পর ওই অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে কী ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি

সুযোগ রয়েছে, সেটি নিয়ে আজকে আলোচনার সুযোগ হয়নি। কিন্তু কর্মসংস্থান বিবেচনায় আপনার প্রশ্নটি অত্যন্ত যৌক্তিক।

সাখাওয়াত হোসেন: ২০২৪ সালের পর থেকে আমাদের যে দায়দেনা রয়েছে, সেটির ভবিষ্যৎ কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বর্তমানে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) অনুপাতে বিদেশি দায়দেনা পরিশোধ করা হয় ১ দশমিক ১ শতাংশের মতো। ২০২৬ সাল নাগাদ তা দ্বিগুণ হতে পারে। এই হার ২ শতাংশের পৌঁছানোর আশঙ্কা রয়েছে। দেনার সবচেয়ে বড় দাবিদার হবে রাশিয়া। এ ছাড়া চীন ও জাপানও বড় দাবিদার হবে। তবে চীনের ঋণ পরিশোধের সময়সীমা কম, সেটাও মনে রাখতে হবে। তখন বাংলাদেশ সমস্যায় পড়বে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এটি আসলে নির্ভর করবে ওই সময়ে দেশের রিজার্ভ পরিস্থিতি কেমন থাকে, অর্থনীতি কতটা সুসংহত থাকে, তার ওপর। আমার বড় উদ্বেগের বিষয় সরকার ঋণের ৫০ শতাংশ নিয়েছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। সেটা পরিশোধ না করলে ব্যাংকগুলো তারল্য পাবে না। অন্যদিকে যেসব প্রকল্প শুরু হয়নি, অতি জরুরি না হলে তা স্থগিত করা প্রয়োজন। আর যেসব এগিয়ে চলেছে, কিন্তু ব্যয় কাঠামোর স্বচ্ছতা নেই, প্রকাশ্যভাবে দুর্নীতি কিংবা অতিমূল্যায়িত হয়েছে, সেগুলো পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। আর যেগুলো বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে সেগুলোর দায়দেনার সময় কাঠামোকে পুনঃতফসিলীকরণ করা প্রয়োজন বলে মনে করছি।

মাশরুর শাকিল: বর্তমান পরিস্থিতিতে চীন আমাদের ঋণসমূহের প্রথম সারির দাবিদার। ২০২৪ এর পর যে দায়-দেনার ধাক্কাটা আসবে, সেটির জন্য আমরা কতটুকু তৈরি কিংবা তৈরি না থাকলেও আমরা এই ধাক্কা সামলানোর জন্য কী ধরনের শক্তি প্রয়োজন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: শক্তি প্রয়োজন এটা প্রথমে স্বীকার করতে হবে। পরিস্থিতির সম্যক মূল্যায়ন প্রথম বিষয়। আমাদের অসুবিধা হলো আমরা একটি অস্বীকারের মনোভাবের মধ্যে থাকি এবং সেই মূল্যায়নে ব্যর্থ হই। কিন্তু অর্থনীতির পরিবর্তনশীলতাকে অগ্রাহ্য করলে চলবে না, মনোযোগ সহকারে নীতি বিশ্লেষণ এবং প্রাক্কলন করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রথম কাজটি থেকেই আমাদের দুর্বলতার জায়গাগুলো বের হয়ে আসবে যে আমাদের সমস্যার জায়গাগুলো কী এবং সেটি সমাধানে আমরা কী পদক্ষেপ নিতে পারি। যেমন, আইএমএফের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসাটা এখন গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে সরকারের পক্ষ থেকে যেসব সাশ্রয়ী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, যেমন বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষেত্রে, তার পাশাপাশি এটা মনে রাখা লাগবে যে আমাদের যে সমস্যাটি সামনে আসছে সেটি কোনো মৌসুমী সমস্যা নয়, এটা কাঠামোগত সমস্যা। আপনাদের চিন্তা করতে হবে যে কীভাবে রপ্তানির বহুধাকরণ করবেন, বৈচিত্র্যায়ন করবেন, কীভাবে রেমিটেন্স আয় করবেন, মাথাপিছু রেমিটেন্স কীভাবে বাড়বে, বৈদেশিক সাহায্যে যেগুলো অব্যবহৃত রয়েছে সেগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করবেন। এই মুহূর্তে আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে সমন্বয় বা যে ধরনের যৌথতা দরকার, আমি নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, নীতিচিন্তার ক্ষেত্রে সেটা দেখতে পাচ্ছি না। এটাকে মোকাবেলা করার জন্য

যে নীতি নেতৃত্ব দরকার, সেই নেতৃত্ব এখনো কার্যকরভাবে দৃশ্যমান নয়। সমাধানের পথ খোঁজার জন্য উদ্বেগের আমি অভাব দেখছি। যেটুকু উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে তাও স্বল্পমেয়াদী। যেমন, লোডশেডিং থেকে কবে নাগাদ বের হব, তার একটি ঘোষণা থাকা দরকার। কারণ, অনির্ধারিত সময়ের জন্য লোডশেডিং হলে ব্যক্তি বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতিমারীর উত্তর সময়ে কর্মসংস্থান জরুরি। অর্থাৎ, নীতি প্রতিক্রিয়া দেখা গেলেও নীতি নেতৃত্ব দেখা যাচ্ছে না।

মফিদুল আলম খান: আমাদের মত দেশের জন্য কোনটা সঠিক? ব্যয় সক্ষমতা (cost efficiency)-এর দিকে যাওয়া নাকি উন্নত বিশ্বের মত গ্রীন এনার্জির দিকে ধাবিত হওয়া? আমরা যদি নিজস্ব অর্থায়নে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করতে যাই, তাহলে কি আমরা আন্তর্জাতিক সমর্থন পাব?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশে বর্তমানে ফসিল ফুয়েল থেকে বের হয়ে আসার ব্যাপারে ঐক্যমত্য হয়েছে। আমরা একটা সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। গ্যাসের দাম যেহেতু বেড়ে যাচ্ছে তাই কয়লাভিত্তিক ব্যবস্থা থেকে দ্রুত বের হয়ে আসার সুযোগ আপাতত আমাদের কাছে নেই। বাংলাদেশের পক্ষে সাশ্রয়ী মূল্যে তেল পাওয়ার বিকল্প ব্যবস্থা নেই। তবে আমাদের ফসিল ফুয়েল থেকে বের হয়ে সবুজ জ্বালানির দিকে অগ্রসর হতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

মফিদুল আলম খান: নীতি নেতৃত্বের সমাধানটি কার কাছ থেকে আসবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সাধারণভাবে আমরা এটা বুঝি, অর্থনৈতিক এরকম পরিস্থিতিতে সামষ্টিক অর্থনীতিকে বিবেচনা করতে হলে আপনার আর্থিক পরিস্থিতি, মুদ্রা-নীতি, বাণিজ্য-নীতি এবং এর পাশাপাশি অন্যান্য যেসব প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় রয়েছে সেগুলোকে সমন্বয়ের ভিতরে দেখতে হয়। বিচ্ছিন্নভাবে আলাদাভাবে এগুলো দেখলে হবে না। এসব নীতি দেওয়ার দায়িত্ব অর্থ মন্ত্রণালয়ের। তাদের গঠিত কমিটি আছে যারা এ বিষয়গুলো দেখবে। এর পাশাপাশি বাজারকে এ সম্পর্কে অবহিত করা লাগবে। কারণ নীতি নেতৃত্বের একটি বড় দায়িত্ব হলো বাজারের কাছে এই সমন্বয়কে পরিষ্কার করে তুলে ধরা। এ জায়গাটিতে আমাদের ঘাটতি রয়ে গেছে। সরকার কিছু নীতিকাঠামো করেছে। কিছু জাতীয় কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। সেসব পরিকল্পনাকে মধ্য মেয়াদে এনে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সাথে গণমাধ্যমকর্মীদের ভার্চুয়াল আলাপচারিতার অংশবিশেষ
২১ জুলাই ২০২২

বর্তমানে গণতান্ত্রিক চর্চার অভাবে সরকারই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

মতিউর রহমান চৌধুরী: ড. আকবর আলী খান যেহেতু আপনার সাথে কাজ করেছেন বিভিন্ন পর্যায়ে, আপনি তাকে কীভাবে দেখেছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ড. আকবর আলী খান সাহেব একটা অত্যন্ত অসময়ে আমাদের ছেড়ে গেলেন। সম্ভবত তার সামগ্রিক পেশাগত জীবনে বা পেশা-উত্তর জীবনে জাতির জন্য তার প্রয়োজনটা সবচেয়ে বেশি ছিল এবং সে মুহূর্তেই তিনি চলে গেলেন। তিনি একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন, আলোকিত মানুষ ছিলেন এবং সে অর্থে একজন দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। উনাকে আমাদের বুঝতে হবে মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে তিনি জাতীয় অর্থনীতিতে এবং জাতীয় নীতিমালা তৈরিতে প্রতিফলনের চেষ্টা করেছেন। আমরা রাষ্ট্রের ভূমিকার কথা বলি, উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেটার চেষ্টার অংশ ছিলেন। আবার আমরা বিশ্বের যোগাযোগের সাথে যে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক চাই সেটাতেও তিনি ছিলেন, আমরা আজকে যে নাগরিক সুরক্ষার কথা বলি সে সুরক্ষার কর্মসূচির সাথে তিনি ছিলেন। আমি নব্বইয়ের দশকে কাছ থেকে উনার সাথে কাজ করেছি বিভিন্ন বিষয়ে তাই সেটা দেখার আমার সুযোগ হয়েছিল। তাকে আমি একদিকে মুক্তিযোদ্ধা এবং অন্যদিকে উন্নয়ন যোদ্ধা হিসেবে দেখি।

কিন্তু যেটার জন্য তিনি দেশ এবং জাতির কাছে স্মরণে থাকবেন তা হলো তিনি সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে যে নৈতিক ভিত্তিটা সেটা তিনি তার পেশাগত অভিজ্ঞতা, কর্মতৎপরতা, কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে তিনি যেভাবে বলতেন সেটা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের মনে গ্রাহ্য হতো এবং সাধারণ মানুষ সেটা গ্রহণ করত। তাই তাঁর চলে যাওয়াতে একজন নাগরিক আন্দোলনের মানুষ হিসেবে আমার কাছে মনে হয়েছে আমাদের নৈতিক অবস্থানটাকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে যে কতগুলো আলোকবর্তিকা এখনো আছে বিশেষ করে স্বাধীনতা সময়কালের প্রজন্মের, তিনি তার অন্যতম ছিলেন। আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, তাঁর যে বিশ্বাস তা আমরা সামনে আরো স্থাপন করতে পারবো এই আশ্বা ব্যক্ত করি।

মতিউর রহমান চৌধুরী: ধন্যবাদ আপনাকে। বাংলাদেশের অর্থনীতির নানা দিক রয়েছে, ক্রটি-বিচ্যুতি রয়েছে। সাম্প্রতিককালে আপনার একটি বক্তব্য সামনে এসেছে যেখানে আপনি চারটি বিচ্যুতির কথা বলেছেন। সবকিছু বাদ দিয়ে চারটির কথা কেন বললেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দেখুন এ মুহূর্তে তো সরকারের পক্ষ থেকে গত এক দশকের একটি উন্নয়ন আলোচ্য, একটি আনুষ্ঠানিক বর্ণনা বিভিন্নভাবে চলছে। সে বর্ণনা, অভিজ্ঞতাকে আমরা কীভাবে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিবেচনা করবো সেটা একটা বড় বিষয় আমার মনের ভেতরে আছে। সাম্প্রতিককালে আমি এই জাতীয় উন্নয়ন চিন্তাকে স্থানীয় পর্যায়ে অর্থাৎ তৃণমূলে কীভাবে দেখে এবং তারা কি একইভাবে উপকৃত হলো কিনা সেটা দেখার চেষ্টা করেছি। এর ভেতরে আমি রংপুর গিয়েছি, খুলনা গিয়েছি, সিলেটে গিয়েছি, টাঙ্গাইলে করেছি, ঠাকুরগাঁও, রাঙ্গামাটি এবং চট্টগ্রামে যাবো সামনে এটা বোঝার জন্য যে মানুষের মনের ভেতরে কী আছে। সেখানে যে জিনিসটা বার বার আসছে সেটা হলো যে জবাবদিহিতার অভাবের কারণে সরকারের যে নীতি সরকার বলছে সেগুলো কার্যকর হচ্ছে না।

সেজন্য আমার একটা বড় সিদ্ধান্তের জায়গা হলো বর্তমানের গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব এ সরকারকেই সবচেয়ে বেশি কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত করছে। কারণ তাদের যে নীতিমালাগুলো আছে সেগুলো তারা কার্যকর করতে পারছে না সেটা সুরক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রেই হোক বা অন্যান্য ক্ষেত্রেই হোক এবং এটার শেষ পর্যায়ে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করতে হয় প্রত্যক্ষভাবে যেটা আমরা সিলেটের চা বাগানের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দেখলাম। যে চারটি বিচ্যুতির কথা বলেছি তা গত মধ্য-মেয়াদের মূল্যায়নের বিষয়। সেটা হলো বাংলাদেশের যে প্রবৃদ্ধির কথা আমরা বলি এ প্রবৃদ্ধির ভেতরে আমরা মূলত ব্যক্তিখাতের কোনো বর্ধমান ভূমিকা দেখি না। জিডিপি ২২/২৩ শতাংশ যে আটকে আছে ব্যক্তিখাতের পরিমাণ কিন্তু বাড়ছে না সেভাবে। যেটুকু হয়েছিল সেটা সরকারি যা কোভিডের কারণে এখন কমে যাচ্ছে। ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ এখন একটা বড় জায়গা। এ অভাবটা পুরো দশ বছরের জন্য ছিল। দ্বিতীয় যেটা সমস্যা হয়েছে যে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে কিন্তু কর আহরণ বাড়ে নাই। তাহলে টাকা গেল কোথায়? নাকি প্রবৃদ্ধির হিসাব ঠিক নাই? কর যদি না থাকে তাহলে সরকার এখন ভর্তুকি দিতে পারে না, সরকারকে বিভিন্ন ধরনের সাশ্রয়ী পদক্ষেপে যেতে হচ্ছে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সংকোচন করতে হচ্ছে ইত্যাদি। অর্থাৎ আর্থিক এবং রাজস্ব খাতে তার তেমন কোনো আয় হয়নি। তৃতীয় যেটা হয়েছে সরকার এটা বড় ধরনের সিদ্ধান্ত করেছে সে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যখাতে ছাড় দিয়ে ভৌত অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করেছে। ২০ টা মেগা প্রজেক্টে যে খরচ হয় পুরো স্বাস্থ্যখাতে সে টাকা খরচ হয় পুরো বাংলাদেশের জন্য এবং শিক্ষাখাতে হয়তো তার দুই গুণ খরচ হয়। কোনো জায়গাতেই সেভাবে বাড়ে নি। মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, মানসম্পন্ন শিক্ষার ক্ষেত্রে বড় ঘাটতি রয়ে গেছে। চতুর্থত যে বিচ্যুতির কথা আমি বলেছি সেটা হলো সরকারের পক্ষ থেকে যে সকল সামাজিক শিক্ষামূলক কর্মসূচি হচ্ছে সেগুলো প্রয়োজনের তুলনায় কম, যাদের পাবার কথা তারা পাচ্ছে না এবং যাদের দেয়া হচ্ছে সেটাও সূষ্ঠাভাবে বিতরণ হচ্ছে না। দেখুন সরকারের যে এখন ফ্যামিলি কার্ড দেয়ার কথা সে অর্থে সেটাও হচ্ছে না। এই যে আমি বললাম জবাবদিহিতার অভাব, গণতান্ত্রিক চর্চার অভাব, নাগরিকদের এটায় অসুবিধা হচ্ছে এবং সবারই হচ্ছে। কিন্তু সরকার যে তার নিজেরই এটার

ফলে এক ধরনের স্বীকারোক্তি হচ্ছে সেটার কিন্তু উপলব্ধিটা আমরা এখনো দেখি নাই, সেক্ষেত্রে অনীহাটা রয়ে গেছে। বর্তমান অবস্থায় আসি দেখুন, সাম্প্রতিককালে রিজার্ভ তো আরো কমে গেলো গত দুই দিনে এবং মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে দ্রুত কমে যাবে আমি তো এটা মনে করি না, যদিও মন্ত্রীরা বিভিন্ন সময়ে বলছেন। এগুলো বলার কারণে নীতি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এক ধরনের ক্ষিপ্ততা কমে যাচ্ছে দ্রুততার সাথে যেগুলো করার কথা।

সরকারের যে নীতি সমন্বয়ের অভাব এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো তেলের দাম ঠিক করার বিষয়টি। আপনি ৪০ টাকা বাড়ালেন, দুই সপ্তাহে ৫ টাকা কমালেন, আজকে আবার বলছেন কমবে। অর্থাৎ এর মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই। যারা জ্বালানি নিয়ে কাজ করছে শুষ্ক সমন্বয় এবং দাম ঠিক করছেন তারা করের ব্যবস্থায় কী করছে, আমদানিতে কী হচ্ছে, জনমানুষের জীবনের ক্ষেত্রে কী প্রভাব পড়ছে এটা সেভাবে কিন্তু দেখছেন না। আমি আপনাকে বলি আমি এই যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি এবং যাবো এটাতে যে জিনিসটা পরিষ্কার হচ্ছে সেটা হলো নিম্নবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্তের ভোগ কাঠামোতে একটা বড় ধরনের বিপর্যয় হচ্ছে। যারা ৭০-৮০ হাজার টাকা দামের চাকরি করতেন তারা এখন ছেলেমেয়েদের আগে যে স্কুলে দিতেন এখন তার চেয়ে কম অর্থ খরচ করতে হয় এমন স্কুলে দিচ্ছেন। অনেকের যাদের গাড়ি ছিল তারা তেলের কারণে চালাতে পারছেন না। আমি দেখতে পাচ্ছি যে শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্যখাতেও তাদের ব্যয় সংকোচন করতে হচ্ছে। সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা হচ্ছে সেটা হলো তারা খাদ্যের ক্ষেত্রে অনেকেই সমস্যার ভেতরে পড়েছে। খাদ্যের ব্যাপারে যেটা হয়েছে নিম্নবিত্ত পরিবারের ক্ষেত্রে, প্রথমত হলো খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমানো হচ্ছে। আগে যেখানে তিন বেলা রান্না হতো এখন অনেকে দুই বেলা রান্না করছে এবং রান্নায় যদি তিন পদ হতো এখন সেটা দুই পদে নিয়ে আসতে হচ্ছে। সন্তানদের খাদ্য বা শিশু-খাদ্যকে সুরক্ষা দিয়ে বাকি যারা থাকছে তাদের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ছাড় দিতে হচ্ছে।

এটা কিন্তু একটি বড় বিষয় এবং সামনে ক্রমান্বয়ে এটা প্রকাশ পাবে। এটার সাথে যেটা হয়েছে আমি ঘুরে যেটা দেখছি সেটা হলো বেকার যুবকের সংখ্যা তো প্রচুর বেড়েছে এবং বেকারত্ব বাড়ার কারণে যুবরা যতটুকু অনানুষ্ঠানিক খাতে চাকরি পাচ্ছে তাদের সেখানে বেতন-ভাতা অনেক কম। আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন এখন কিন্তু যুবদের ভেতরে মানসিক চাপ এবং সেখান থেকে আত্মহত্যার প্রবণতাও বাড়ছে। এটার সাথে আমরা দেখছি পাচ্ছি মাদকাসক্তি বাড়ছে এবং উগ্রবাদী চিন্তার দিকেও আকর্ষণ হচ্ছে। এটাও খুব ভালো বিষয় না। ইদানীংকালে আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে ঢাকা শহরে আবার ভিক্ষুক বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন ট্র্যাফিক সিগন্যালে বা অন্যান্য জায়গায় দাঁড়ালে আপনি এটা দেখতে পাবেন। আমি গ্রামে যাই আমার বাড়িতে এবং অন্যান্য জায়গাতেও আমরা লক্ষ্য করছি অনেক ক্ষেত্রে দিনমজুররা প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ পাচ্ছে না বা যে পাচ্ছে সে হয়ত খুব বেশি নয় ৫০০-৬০০ টাকা দৈনিক মজুরি পাচ্ছে। অন্যদিকে আপনি লক্ষ্য করবেন যে চুরি-ডাকাতির পরিমাণ বাড়ছে এবং এটাও এক রকম বেপরোয়া অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে।

আমার দুঃখটা অন্য জায়গায় সেটা হলো গিয়ে এগুলোর একেবারে সমাধান নেই তা না, কিন্তু সমাধান করার জন্য যে মনোভঙ্গিটা দরকার সেটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। কারণ আমরা বিশ্বব্যাংকের কাছে গেছি কাজের সাহায্যের জন্য, আইএমএফ-এর কাছে গেছি বৈদেশিক ঋণ

কমানোর জন্য। কিন্তু এগুলো কী কারণে গেলাম, কেন যেতে হলো, কেন ডাক্তার ডাকতে হলো বা রোগটা কী, আমার পথ্যটা কী, শুধু তো ডাক্তারের ঔষধ খেলে হবে না পথ্যটা কী সেটার ব্যাপারে কিন্তু মনযোগী না এবং সেটা করার জন্য যে নীতি-নেতৃত্ব দরকার পরে সে নীতি-নেতৃত্বটা এ মুহূর্তে খুবই অসম্পূর্ণ এবং ধারাবাহিকতাহীন। আপনি লক্ষ করে দেখেন, কোনো জনপ্রতিনিধিরা এটার সাথে যুক্ত না। কীভাবে ভোট হয়েছে সেটায় গেলাম না কিন্তু যারা আছেন তারা কোনো সংসদীয় কমিটির মিটিং করে না, এটা নিয়ে আলোচনা হয় না, আমরা শুনি নাই কোনো সময় এটা নিয়ে মন্ত্রী পরিষদে আলোচনা হয়েছে। যে সমস্ত বিবৃতি সরকারের পক্ষ থেকে সংসদে দেয়ার জন্য আইনি বাধ্যবাধকতা আছে সেগুলো স্বীকার করা হচ্ছে না। অর্থমন্ত্রী মহোদয় তো অনেক সময় অদৃশ্য থাকছেন এবং মনে হচ্ছে কতিপয় ব্যক্তি বিশেষ আমলারা এ জিনিসগুলোকে এ মুহূর্তে বিভিন্ন ধরনের খাপ ছাড়া ভাবে ঠেকে দিচ্ছেন।

মতিউর রহমান চৌধুরী: যেহেতু সমস্যাটা জাতীয় সমস্যা সেক্ষেত্রে নাগরিক মতামত নেয়াটা কি জরুরি না?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: খুবই জরুরি এবং আপনি যদি লক্ষ করে দেখেন যে শ্রীলঙ্কার অভিজ্ঞতা তো বার বার ফিরে আসে, পাকিস্তানের অভিজ্ঞতা তো বার বার ফিরে আসে, নেপালের অভিজ্ঞতা। কাছের ভেতরেই আমি বলছি। তাহলে আপনি লক্ষ করে দেখবেন যখন একটা সময় ছিল যে যারা হয়ত এটাকে বিভিন্ন ধরনের চলমান ক্রটি-বিচ্ছৃতির কথা বলেছে তাদের প্রতি তারা মনযোগী হয়নি। দেখুন আপনার এই অনুষ্ঠানে বসে তো আমি গত দুই বছর অন্তত এবং বাজটের পরেও আমি এ কথাগুলো বলেছি যে দুই বছর কিংবা তিন বছর খুবই দুঃসময় আসছে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এই বলছে। শুধু কোভিড না, শুধু ইউক্রেন না, আমার পরিস্থিতি এটাকে মোকাবিলা করার জন্য অতটা প্রস্তুত না।

অথচ দেখুন এর এক/দুই মাসের ভেতরেই তাদের আইএমএফ-এর কাছে যেতে হলো, বিশ্বব্যাংক এবং এডিবি'র কাছ থেকে বাজেট সাহায্য আনতে হচ্ছে। এই মতামতগুলো যদি শুনতো আপনার যে মিডিয়া আছে, মিডিয়াতে যে কথাগুলো লেখা হচ্ছে, জনমানুষের অভিজ্ঞতার কথা বলা হচ্ছে সেগুলো যদি গ্রহণ করত এটা তো যেকোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সরকারেরই উপকার হয়। এ জিনিসটা যেখানে যেখানে হয়না সে সমস্ত দেশে অর্থনৈতিক সুশাসনের অভাব ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক বিপদের দিকে ডেকে নিয়ে যায়। শ্রীলঙ্কা হলো তার একদম ধ্রুপদী উদাহরণ যে রাজনীতিতে শুরু হয়নি, শুরু হয়েছিল অর্থনীতিতে যা রাজনীতিকে একটা দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিয়ে গেছে। বাংলাদেশের জন্য এটা আরো গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু আমরা একটা গণতান্ত্রিক উত্তরণের মধ্য দিয়ে যেতে চাচ্ছি। এই গণতান্ত্রিক উত্তরণের ২০১৪ এবং ২০১৮ থেকে ভিন্ন হলো দুটি কারণে। এক হলো পৃথিবী বদলেছে ২০১৪ এবং ২০১৮ এর পরে, আমরা ট্রাম্প-উত্তর যুগে বসবাস করছি এবং ইউক্রেনের ঘটনাবলী ইউরোপীয় ইউনিয়নকেও বুঝতে সাহায্য করেছে।

যদি একটা দেশে সুশাসন এবং গণতান্ত্রিক চর্চা না থাকে সে দেশ বেপরোয়া হয়ে যায়, দেশটার নাম বলছি না এবং তারা আক্রমণে পর্যন্ত যেতে পারে। তাই সুশাসন এবং গণতান্ত্রিক

চর্চাটা তারা উপলব্ধি করছে এবং একই সাথে আমার মনে হয় আমাদের প্রতিবেশীরাও এ উপলব্ধির ভেতরে আছে। কারণ যে সহযোগিতা তারা করতে চান, যে সম্পর্ক করতে চান সেটা বাণিজ্য হোক বা বিনিয়োগ হোক কিংবা ডিজিটাল ক্ষেত্রে হোক এমনকি প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও হোক সে সমস্ত ক্ষেত্রে যে ধরনের দক্ষতা নিয়ে প্রশাসনের কাজ করতে হয়, যে ধরনের জবাবদিহিতা লাগে, যে স্বচ্ছতার ধারাবাহিকতা থাকবে সরকার থেকে অন্য সরকারের ভেতরে সেটার অভাব কিন্তু তাদের কাছেও প্রতিহত হচ্ছে। সেহেতু ক্রমান্বয়ে বিষয়টা এমন না যে আগে অনেকে বলতেন যে নির্বাচন হলে কী হবে? যারা আছেন তারাই তো ক্ষমতায় আসতে পারেন। আমার কথা, হ্যাঁ আসতে পারেন, অবশ্যই পারেন। ভালো কাজ করেছে এটা জনগণকে মতামত দেয়ার সুযোগ দিলে আসতেই পারে। কিন্তু সেজন্য আবার কেউ অনেক সময় প্রশ্ন করেন বিকল্প কী আছে? আমার কাছে দুটো প্রশ্নই অবাস্তব মনে হয়।

মতিউর রহমান চৌধুরী: কেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমার কাছে যেটা মনে হয় এ মুহূর্তে যেটা বিষয় সেটা হলো মানুষের ভোটদানের অধিকারকে নিশ্চিত করা। কে আসবে এবং কে আসবে না সেটা মানুষ ঠিক করবে। আপনি, আমি, আমাদের দায়িত্বটা হলো দেশের ভেতরে এই যে সব জায়গাতে আমি গেলাম বা যাচ্ছি এই জায়গাটায় সবাই পরিষ্কারভাবে আসছে এবং সরকারি দলসহ আসছে যে একটি যদি সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক, প্রতিযোগিতামূলক এবং গ্রহণযোগ্য পর্যায়ের নির্বাচন না হয়, ক্রুটি-বিচ্যুতি থাকতেই পারে তাহলে সেটা বাংলাদেশের পরবর্তী ধাপে আমরা যেখানে যেতে চাচ্ছি উন্নয়নের সে ধাপে নিতে আমাদের কষ্ট হবে। কারণ এর পরের যে ধাপটাতে আমরা যাব মধ্যম আয় বা উচ্চ মধ্যম আয়ে যাবার জন্য সেখানে আপনার প্রতিষ্ঠান কার্যকর হতে হবে, বিচার ব্যবস্থা কার্যকর হতে হবে, ভোক্তা অধিকার রক্ষিত হতে হবে, মিডিয়ার কর্তৃত্ব পরিষ্কার থাকতে হবে, নাগরিক তৎপরতার উপর কোনো ধরনের বিধি-নিষেধ থাকতে পারবেনা এবং সেক্ষেত্রে এ জায়গাটাতে পরিষ্কার না হলে ঐ উত্তরণটাও হবে না।

বাংলাদেশের শাসকবর্গের জন্যেও এটা গুরুত্বপূর্ণ যে একটি গ্রহণযোগ্য, প্রতিযোগিতাপূর্ণ এবং অর্থপূর্ণ নির্বাচন হওয়া দরকার এবং এটা মানুষের মনকে প্রকাশ করে দেয়া দরকার। আপনি দেখুন এ মুহূর্তে কি ঘটনা যে রাজনৈতিক হানাহানি তো বাড়ছে এবং এটি প্রচলিত বিরোধী পক্ষের সাথে এ মুহূর্তে শাসক দলের হচ্ছে। কিন্তু তার চেয়ে কি শাসক দলের নিজের ভেতরে কম হচ্ছে? এই শাসক দলের নিজের ভেতরেই বিভিন্ন ধরনের যে হত্যা, মারামারি ইত্যাদি হচ্ছে এটা নির্বাচনী প্রক্রিয়া সামনে আসলে পরে আরো মনোনিয়ন প্রক্রিয়াকে আনার জন্য এখন এ মুহূর্তে জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য হচ্ছে, তারপর উপজেলার জন্য হবে এবং এ জিনিসগুলো কিন্তু একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থার ভেতরে না থাকলে শাসকগোষ্ঠীও কিন্তু এর ব্যাপারে সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারবে না। প্রক্রিয়া হলো সমাধান, ব্যক্তিবিশেষের গোষ্ঠীতন্ত্র এটাকে সমাধান দিতে পারবে না।

সেজন্য আমি মতিউর ভাই আপনার কাছে যেটা বলতে চাচ্ছি এবং আপনার মাধ্যমে সকলের কাছে সেটা হলো যে এ মুহূর্তে বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক

উত্তরণ সাধারণ মানুষের জন্য দরকার তার সপক্ষে সরকারের যে পদক্ষেপগুলো আছে সেগুলোকে কার্যকর করার জন্য এবং একই রকমভাবে সরকারের নিজের ভেতরে তার সহিংসতা বা তাদের অসহিষ্ণুতা বা তার দলীয় অখন্ডতা রক্ষা করার জন্য এটা প্রয়োজন পড়বে। আগামী দেড়-দুই বছর যে প্রক্রিয়াটা আমাদের চোখের সামনে এখন আসছে সেটা খুব নিশ্চিত করে না আমাদের। এটা অর্থনীতির জন্য বলেন বা রাজনীতির জন্য বলেন। এ ব্যাপারে আমাদের একটি জাতীয় চিন্তা এবং জাতীয় উদ্যোগ সমন্বিতভাবে করা দরকার।

মতিউর রহমান চৌধুরী: ডলার নিয়ে যে সংকটটা তৈরি হয়েছে তা উত্তরণের জন্য আমরা নানামুখী ব্যবস্থার কথা শুনছি, কিন্তু কাজে তো আসছে না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ডলার সংকটের কথা যে বলছি অর্থাৎ টাকার উপর যে চাপটা সৃষ্টি হয়েছে, টাকার মান পতন হচ্ছে। আমাদের রিজার্ভ কমে যাচ্ছে, রিজার্ভের থেকে ডলার বিক্রি করতে হচ্ছে, আমদানির যে ব্যয় সংকোচন করা হয়েছে সেটা যথেষ্ট হচ্ছে না। যদিও রপ্তানি এবং রেমিট্যান্স বেড়েছে গত এক-দুই মাসে। সুতরাং এটি একটি কাঠামোগত সমস্যা। এই সমস্যা যদি আমি সংস্কারের ভেতরে না ঢুকি, ঐ আইএমএফ এসে আমরা এতদিন বলেছি এটা করে নাই এখন আইএমএফ এসে জোর করে এটা করাবে এবং আমরা দেখবো। এর ফলে সরকারের ব্যয় সংকোচন হতে পারে, আর্থিকভাবে এটা আরো নতুন চাপের সৃষ্টি করবে। সুতরাং, এই সমস্যা খুব দ্রুত দূর হচ্ছে না।

চ্যানেল আই 'আজকের সংবাদপত্র'-এ প্রচারিত

১০ সেপ্টেম্বর ২০২২

বাংলাদেশের উন্নয়ন আখ্যানের অন্তর্নিহিত চার বিচ্যুতি

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের ৫০ বছরের অর্থনৈতিক ইতিহাসে সাম্প্রতিক দশকটি যে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ছিল, তা যে কোনো সমালোচককেও স্বীকার করতে হবে। এই দশক ভবিষ্যতেও গুরুত্ব সহকারে মূল্যায়িত হবে। কারণ এ সময়ে বাংলাদেশ নিম্ন আয় থেকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় উঠেছে এবং এলডিসি থেকে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। দু-একটি সূচকে দুর্বলতা ছাড়া এমডিজিতে আমরা বড় সাফল্য দেখিয়েছি এবং এসডিজি বাস্তবায়নের দিকে এগিয়েছি। আমাদের মাথাপিছু রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় বেড়েছে। গড় আয়ু বেড়েছে অন্তত পাঁচ বছর। কৃষি উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ১৮ শতাংশ। শিক্ষার হার ও মাথাপিছু গড় শিক্ষা বছর বেড়েছে। ভোত অবকাঠামো খাতেও পদ্মা সেতুসহ বড় ধরনের পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়েছে। কোভিড অতিমারি মোকাবিলা ও টিকাদান কর্মসূচির বাস্তবায়নও আমরা মোটামুটি সফলভাবে করতে পেরেছি। ফলে ২০১০ থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধ দশক বলেই বিবেচনা করতে হবে।

যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে পেশাদার অর্থনীতিবিদদের দুঃখের জায়গাটা কোথায়? একটা দীর্ঘমেয়াদি চিন্তা থেকে এই অর্জনের অন্তত চারটি জায়গায় 'বিচ্যুতি রেখা' বা 'ফল্ট লাইন' আমি দেখেছি। এগুলো মোকাবিলা করা না হলে উন্নয়নের পরের ধাপে যেতে অসুবিধা হবে এবং আমাদের অর্জনগুলো টেকসই করা জটিলতর হবে।

ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগে স্থবির অবস্থা গত ১০ থেকে ১২ বছরে যে উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি হয়েছে, তার মূল চালিকাশক্তি ছিল রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ। ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ তেমন বাড়েনি। ব্যক্তি বিনিয়োগ জিডিপির ২৩ থেকে ২৪ শতাংশেই আটকে আছে। প্রবৃদ্ধি ৫-৬ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশ ছাড়িয়েছে সরকারি বিনিয়োগে ভর করে। যদিও সরকার দাবি করে দেশে বেসরকারি খাতনির্ভর উন্নয়ন হচ্ছে। তবে এ কথায় কিছুটা ঘাটতি আছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ যেভাবে হওয়ার কথা সেভাবে হয়নি। সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ এখনও জিডিপির এক শতাংশের নিচে। ব্যক্তি বিনিয়োগের এ চিত্র কোনোভাবেই একটি গতিশীল নিম্ন-মধ্যম

আয়ের দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। বিনিয়োগের এই পরিমাণ আগামী দিনে প্রবৃদ্ধির ধারাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্যও যথেষ্ট নয়।

অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি বিনিয়োগের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে দুটি প্রধান মতামত আছে। একটি হলো রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বেশি হলে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ কোণঠাসা হয়। কারণ, ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগের সুযোগগুলো রাষ্ট্রীয় খাত নিয়ে নেয়। দ্বিতীয়টি হলো সরকারি বিনিয়োগ বাড়লে ব্যক্তি বিনিয়োগ সম্পূরক হিসেবে বাড়ে। অর্থাৎ সরকার যদি বেশি বেশি রাস্তা-ঘাট, অবকাঠামো করে তাহলে ব্যক্তি খাত তার সুযোগ নেয় ও বিনিয়োগ বাড়ায়। আমি এই মতের পক্ষে। কিন্তু এটা বাংলাদেশে হয়নি। এখানে সরকারি বিনিয়োগ বাড়লেও ব্যক্তি বিনিয়োগ সেভাবে বাড়েনি। এটা বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারার অন্যতম বিচ্যুতি রেখা। তাই আগামী দিনে ব্যক্তি বিনিয়োগ বাড়ানো খুব জরুরি।

আর্থিক খাতের দুর্বলতা ও কর আহরণে অপারগতা

বাংলাদেশে ৭ দশমিক ২৫ শতাংশ পর্যন্ত জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু কর আহরণ জিডিপি ১০ শতাংশের নিচে। এর অর্থ কী? আমরা কি ধরে নেব আয় হয়নি? নাকি প্রশাসনিক বা অন্য দুর্বলতার কারণে আয় হলেও কর আদায় করা যায়নি? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হবে। কারণ আর্থিক খাতের দুর্বলতা অর্থনীতির সব খাতে ছড়িয়ে পড়েছে। সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী আমদানি করতে পারছে না। সাধারণ মানুষকে পর্যাপ্ত খাদ্য সহায়তা দিতে পারছে না। প্রয়োজন অনুযায়ী শুল্ক কমাতে পারছে না।

কর আহরণ, বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ কর আদায়ের দুর্বলতা সবচেয়ে বেশি সমস্যা করছে। দেশে প্রত্যক্ষ কর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদায়ের মাত্র ৩৫ শতাংশ। এ ছাড়া আহরণের প্রক্রিয়াও বৈষম্যমূলক। অর্থাৎ যিনি বেশি আয় করছেন তিনি কম কর দিচ্ছেন। আর যিনি কম আয় করছেন তার কাছে ভ্যাটের মাধ্যমে বেশি কর নেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ শুধু কর আদায় কম হচ্ছে তাই নয়, বরং সামর্থ্যহীনের কাছে বেশি কর আদায় হচ্ছে। বাংলাদেশের উন্নয়নের দ্বিতীয় বিচ্যুতি রেখা এটি। এখানে এক ধরনের ভেল্কিবাজি হচ্ছে। বড় বাজেট দিয়ে আয়-ব্যয় বড় করে দেখানো হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে আয়-ব্যয় ও ঘাটতি সবই কম। সক্ষমতার অভাবে বিদেশি ঋণ ব্যবহার করা যাচ্ছে না, নির্ভর করতে হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উৎসের ওপর। আমি বাংলাদেশের বৈদেশিক দায়দেনা নিয়ে চিন্তিত নই, বরং আমি অভ্যন্তরীণ দায়দেনা নিয়ে চিন্তিত। বাংলাদেশের ৫৪ শতাংশ দায়দেনাই অভ্যন্তরীণ। এ দায়দেনা মেটাতে রাজস্বের ১৮ থেকে ২০ শতাংশ খরচ হয় এবং সরকার ব্যাংক থেকে বেশি টাকা নেওয়ার ফলে তারল্য সংকট হয়।

ভৌত অবকাঠামোর তুলনায় শিক্ষা-স্বাস্থ্য খাতে অপ্রতুল ব্যয়

বাংলাদেশে গত দেড় দশকে ভৌত অবকাঠামো খাতে যে পরিমাণ ব্যয় হয়েছে, স্বাস্থ্য-শিক্ষায় তা হয়নি। এখানে সরকার বড় ধরনের আপস করেছে বা ছাড় দিয়েছে। বৃহৎ ২০টি মেগাপ্রকল্পে বছরে ব্যয় হয় জিডিপির প্রায় দুই শতাংশ। একই পরিমাণ ব্যয় পুরো শিক্ষা খাতে

করা হয়। স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের পরিমাণ জিডিপির এক শতাংশ। অর্থাৎ ২০টি মেগাপ্রকল্প যা পেয়েছে, শিক্ষা খাতেও সেই পরিমাণ বরাদ্দ পেয়েছে, আর স্বাস্থ্য খাত পেয়েছে তার অর্ধেক। কেন এটা হলো? পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, যখনই কোনো রাজনৈতিক শক্তি বৈধতার সংকটে পড়ে কিংবা আরও শক্তি অর্জন করতে চায় তখন তারা দৃশ্যমান ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে জোর দেয়। শ্রীলঙ্কায় মাহিন্দা রাজাপাকসে ও তুরস্কে রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের মতো নেতারা এটা করেছেন। ক্যামেরুনেও এটা হয়েছে। অর্থাৎ রাজনৈতিক ঘাটতি ভৌত অবকাঠামো দিয়ে মেটানোর চেষ্টা দেশে দেশে হয়েছে। কারণ মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার ফলাফল আসতে দশকের বেশি সময় লাগে। ভৌত অবকাঠামো প্রকল্পে ফলাফল দৃশ্যমান হয় দ্রুত। বাংলাদেশের আন্তঃখাতে এ ধরনের বৈষম্য হয়েছে গত দশক ধরে। এটি আমাদের অর্থনীতির তৃতীয় বিচ্ছৃতি রেখা।

সামাজিক সুরক্ষার অপরিাপ্ত বরাদ্দ ও অদক্ষ বাস্তবায়ন

সরকারের রাজনৈতিক দর্শন ও প্রধানমন্ত্রীর নিজ আগ্রহের কারণে বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এসব কর্মসূচিতে বরাদ্দ খুবই কম। মাথাপিছু সাধারণ ভাতা বর্তমান বাজার অনুযায়ী অত্যন্ত অপ্রতুল। শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মতো এ খাতেও বৈষম্য হয়েছে। আবার যে বরাদ্দ হচ্ছে, তার বিতরণও সুসম নয়। সাধারণ মানুষ অনেক ক্ষেত্রে সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বিষয়ে জানেন না। আবার জানলেও অনেকেই নথিবদ্ধ হতে পারেন না। এমনকি যারা নথিবদ্ধ হন, তাঁরা উপযুক্ত পরিমাণ সহযোগিতা পান না। কোভিড সময়ের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সরকারের নগদ অর্থ প্রদান ও স্বল্প মূল্যে টিসিবি পণ্য বিতরণসহ অন্যান্য উদ্যোগের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যা দেখা গেছে। অর্থাৎ এ খাতে সরকারের আগ্রহ থাকার পরও বাস্তবায়নে বড় ধরনের দুর্বলতা রয়েছে।

এসব বিচ্ছৃতির উৎপত্তি কীভাবে?

২০০১-০৫ সালে তৎকালীন সরকারের বড় সমস্যা ছিল প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যক্তি খাতের অর্থনীতি গড়ে উঠতে না দেওয়া। অর্থাৎ নির্দিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ফলে মেধাভিত্তিক ও প্রতিযোগিতাসম্মত ব্যক্তি খাত সুযোগ পায়নি। এতে উন্নতির ধারা স্লথ হয়েছিল। সাম্প্রতিককালে সেই প্রবণতা আবার দেখা যাচ্ছে। প্রতিযোগিতাসম্মত, মেধাভিত্তিক, আন্তর্জাতিক গুণমানসম্পন্ন, সং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুযোগ না থাকলে যোগ্য লোকরা এদিকে আসবেন না। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠী বিশেষকে সুবিধা দেওয়ার কারণে দেশ সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর অন্যতম উদাহরণ বিদ্যুৎ খাত। এ খাতে শুধু প্রতিযোগিতাই তুলে নেওয়া হয়নি, বিচারের সুযোগও বাতিল করা হয়েছে; যা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। অর্থনীতির ভেতরে এক ধরনের বিচারহীনতা তৈরি করা হয়েছে, যা অর্থনীতির মূলনীতির বিপরীত। প্রয়োজনের নিরিখে স্বল্পমেয়াদি নীতি হিসেবে কুইক রেস্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রকে বিশেষ সুযোগ দেওয়া হলেও পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক সিদ্ধিচার অভাবে তা বন্ধ করা যায়নি। প্রমাণ হয়েছে, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তির সুবিধাভোগীরা অনেক শক্তিশালী। বিদ্যুতের মতো এলএনজিতে অনুরূপ পরিস্থিতি প্রতিভাত

হচ্ছে। অর্থাৎ এখানেও একটি স্বার্থগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেমন— অতিমূল্যায়িত সরকারি প্রকল্পগুলোতে, যিনি কাজ পান তিনি অযোগ্য। কিন্তু রাজনৈতিক বা অন্য কোনো না কোনো সংযোগে তিনি কাজ পেয়ে যান। ফলে কাজ হাতবদল হচ্ছে। সময় মতো শেষ হচ্ছে না। ব্যয় বাড়ছে। আবার প্রতিপত্তি বাড়তে আর্থিক সক্ষমতা নেই এমন প্রকল্পও নেওয়া হচ্ছে। এসবের দায়দেনার বোঝা নাগরিকের ঘাড়ে পড়ছে। কেন এমন হচ্ছে? পৃথিবীর ইতিহাস বলে, দেশে দেশে বাজার অর্থনীতির যখন উন্মেষ ঘটে, তখন এক ধরনের লুণ্ঠন হয়। তারপর নিয়মনীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো মেনে সভ্যতার নীতিভিত্তিক সমাজের দিকে দেশগুলো আগায়। বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এখানে প্রথম লুণ্ঠন শুরু আশির দশকে শিল্প ঋণের মাধ্যমে। তখন ঋণের নামে অনেক কাঁচা টাকা দেওয়া হতো। কিন্তু তা ফেরত আসেনি। বাংলাদেশে খেলাপি ঋণের উৎস খুঁজতে হলে অবশ্যই আশির দশকে ফিরে যেতে হবে। এটা হলো বাংলাদেশে লুণ্ঠনের প্রারম্ভিক উৎস। লুণ্ঠনের দ্বিতীয় উৎস শেয়ারবাজার। গুণমানহীন কোম্পানি বাজারে ছেড়ে ১৯৯৬ সালে ও পরে ২০১০-১১ সালে সাধারণ মানুষের সঞ্চয় লুট করা হয়। এখন সৃষ্টি হয়েছে লুণ্ঠনের তৃতীয় উৎস। সরকারি প্রণোদনায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় অতি মূল্যায়িত বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প, যার সুবিধা পাচ্ছে নির্দিষ্ট ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান।

উদ্যোক্তা শ্রেণির নেতৃত্ব সংকট

এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, উন্নয়ন অর্জন টিকবে কীভাবে ও পরের ধাপে যাওয়ার উপায় কী? পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাথমিক লুণ্ঠনের পর দেশ যখন সভ্য সমাজের দিকে যায়, তখন অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, বিচার ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়, যা মানুষকে আইনের শাসন দেয়। এমন একটা রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক হয়, যেখানে সবাই সমান সুযোগ পান। ব্যবসায়িক বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ হয়। এমন একটা প্রশাসন হয়, যা দলমত নির্বিশেষে সবাইকে সেবা দেয়। এটা হয় বৃহত্তর স্বার্থে। কারণ একটা সময় পরে সবারই সুরক্ষার দরকার হয়। ফলে মুক্ত, স্বচ্ছ রাষ্ট্রকাঠামো হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এটা হয়নি। এর কারণ, যে গোষ্ঠীর বাংলাদেশের পরিবর্তনে সবচেয়ে আগ্রহী হওয়ার কথা ছিল, অর্থাৎ উৎপাদনশীল উদ্যোক্তা শ্রেণি, তারা তা যথেষ্ট পরিমাণে হয়নি। তারা সবাই প্রতিযোগিতার চেয়ে সংযোগে বেশি বিশ্বাস করেছেন, শ্রেণির চেয়ে ব্যক্তি স্বার্থে জোর দিয়েছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, ব্যবসায়ী সমিতিগুলোতে আর প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্ব বাছাই করা হয় না। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচিত না হলে দায়বদ্ধতা থাকে না। এ দায়বদ্ধতাহীন নেতৃত্ব নিজের সুবিধার হিসাবেই ব্যস্ত। বাংলাদেশে দায়িত্বশীল, খেটে খাওয়া, উৎপাদনশীল উদ্যোক্তা শ্রেণির কঠোর কম। সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিয়মনীতির ব্যত্যয় ঘটলে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিচয় ও সংযোগ বিবেচনায় না নিয়ে আইনের শাসন প্রয়োগ করতে হবে। সর্বোপরি, এ বিষয়ে মিডিয়া ও নাগরিক সমাজকে দেশে বস্তুনিষ্ঠভাবে মতামত প্রকাশ করতে দিতে হবে।

সমকাল

১ অক্টোবর ২০২২

উচ্চ প্রবৃদ্ধির দরিদ্র সরকার

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সঞ্চালক: বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কেমন দেখছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: গত দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতি কম-বেশি প্রবৃদ্ধির মধ্যে ছিল। এ সময়ে একটা অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ঘটেছে। যদিও তা মূলত হয়েছে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ও উদ্যোগের ফলে। ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ, দেশীয় ও বিদেশী অর্থনীতির আয়তনের তুলনায় বাড়েনি। কর আহরণ উদ্বিগ্নজনক কম হয়েছে এবং ভৌত অবকাঠামোয়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের বিপরীতে বরাদ্দ বেশি দেয়ার একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে।

বর্তমানে আমরা স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছি, একই সঙ্গে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছি। দু-একটি সূচক বাদ দিলে এমডিজি অর্জিত হয়েছে, অতিমারির আগ পর্যন্ত এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিকেও এগিয়েছি। তবে বর্তমান সময়কালে উন্নয়নের যে চরিত্র তার কিছু দ্বন্দ্ব, বিশেষ করে অন্তর্নিহিত ও আর্থ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব এ অর্জনগুলোকে কিছুটা হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে।

দেখুন, আমরা যখন বাংলাদেশের ৫০ বছর উদযাপন করি তখন বিভিন্ন অর্জনগুলোর সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনটি বিষয়ে অনেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমি সেগুলো স্মরণ করতে চাই, যেহেতু বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে এগুলো প্রাসঙ্গিক হবে। প্রথমত, বাংলাদেশ বিগত ৫০ বছরে আরো বেশি বৈষম্যমূলক সমাজে পরিণত হয়েছে। শুধু আয় কিংবা সম্পদ নয়, ভোগ ও সামাজিক সুযোগের ক্ষেত্রেও বৈষম্য প্রতিফলিত হচ্ছে, যা আমাদের যুবসমাজকে মূলধারা থেকে অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে ধরনের বিনিয়োগ, সেবা ও সুবিধা বণ্টন করা হয়েছে, তা সবার কাছে পৌঁছেনি। লক্ষ্যনির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য শুধু বরাদ্দ কম ছিল তা-ই নয়, ভাতা বিতরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম দেখা দিয়েছে। তাই জাতীয় উন্নয়নের সুবিধা গরিব মানুষ বা অসুবিধাগ্রস্ত সম্প্রদায় কম পেয়েছে। তাদের মধ্যে আবার রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে যোগাযোগবিহীন দরিদ্ররা পেয়েছে আরো কম। তৃতীয়ত, উল্লেখিত দুটি ঘটনা ঘটর একটা বড় কারণ হলো, আর্থসামাজিক উন্নতির ধারাবাহিকতাকে

সচল রাখতে হলে যে ধরনের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক জবাবদিহিতার প্রয়োজন, সেটার ক্ষেত্রে এ সময়কালে বাংলাদেশে বড় ধরনের ঘাটতি ছিল। আমাদের অর্থনীতি বিকাশমান ও সম্প্রসারণশীল; কিন্তু একই সঙ্গে তা ক্রমবর্ধমানভাবে অন্যান্য ও বৈষম্যমূলক।

সঞ্চালক: এটা কি আমাদের উন্নয়নের দর্শনগত সমস্যা?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: গত ১০ বছরে চেষ্টা করা হয়েছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন দর্শনে জবাবদিহির অভাবকে তাত্ত্বিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার। শাসক শ্রেণী ও তার সমর্থকরা বলতে চেয়েছেন, উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে জবাবদিহি নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ উন্নয়ন ও জবাবদিহি একসঙ্গে যায় না। এজন্য অনেকে প্রথমে মালয়েশিয়ার উদাহরণ দেন, এরপর তামাদি হয়ে যাওয়া দক্ষিণ কোরিয়ার পার্ক চুং-হিয়ার মডেলের উদাহরণ দেন। কেউ কেউ আবার চীনের কথাও উদাহরণ হিসেবে আনেন। তারা বলেন, উন্নয়ন আগে গণতন্ত্র পরে, আর আমি বলি এটা মূলত তাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের অপরিপক্ব ধারণা। কেন আমি এটা বলছি, কারণ ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাপী বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচি তৈরি করা হলো, অর্থাৎ দ্য নিউ ডেভেলপমেন্ট কনসেন্সাস বা উন্নয়ন দর্শনের নবতম সমঝোতা, যেখানে বলা আছে, উন্নয়নের ধারায় কাউকে পিছিয়ে রাখা যাবে না। সবচেয়ে পেছনে পড়ে থাকা মানুষের অবস্থাই হবে উন্নয়নের মাপকাঠি; গড় পরিস্থিতি দিয়ে হবে না। এ অবস্থানই এসডিজি নামে পরিচিত। অথচ বাংলাদেশ কিন্তু গড়ের ওপর জোর দিয়েছে; উন্নয়নের সুফলের বিতরণ বিভাজিতভাবে দেখিনি।

দ্বিতীয়ত, নতুন বৈশ্বিক সমঝোতা বলছে, উন্নয়ন কোনোভাবেই প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন ও মানবাধিকারকে বঞ্চিত করে করা যাবে না। উন্নয়ন মানে শুধু আর্থিক বা বস্তুগত উন্নয়ন নয়, মানুষ হিসেবে নাগরিকের যে অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অধিকারগুলো রয়েছে সেগুলোকে কার্যকর করাই উন্নয়ন। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে বৈশ্বিক নেতারা এ অঙ্গীকারে স্বাক্ষর করেছেন। আমাদের সরকারও করেছে, অথচ তারা এখন কার্যত বিপরীতে অবস্থান নিচ্ছে। সুবিধাভোগীরা সমস্যাগুলোকে যৌক্তিক বা রাজনৈতিকভাবে ব্যাখ্যা না করতে পেরে তামাদি চিন্তার আশ্রয় নিচ্ছেন।

আমার সরল কথা হচ্ছে, বাংলাদেশকে উন্নয়নের পরবর্তী পর্যায়ে যেতে হলে এ তিনটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন হতে হবে। এ জায়গাটাকে বিভাজিতভাবে দেখতে হবে ও গড়ের হিসাব থেকে বের হতে হবে। মানবিক ও নাগরিক অধিকার, প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন এগুলো যদি আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি তাহলে গত এক দশকের অর্জনগুলো হুমকির মধ্যে পড়ে যেতে পারে, যার কিছু ইঙ্গিত এরই মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে।

সঞ্চালক: সাধারণত দু'টি কারণে চ্যালেঞ্জগুলো তৈরি হয়, রাজনৈতিক সংকট থেকে অর্থনৈতিক সংকট কিংবা অর্থনৈতিক সংকট থেকে রাজনৈতিক সংকট। বাংলাদেশে হঠাৎ করে এ বিষয়টি কেন হলো?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি তৃতীয় যে বিষয়টির কথা বলেছিলাম, অর্থাৎ জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাব, এটা তার সঙ্গে যুক্ত। অনেক দেশে, বিশেষ করে শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে অর্থনৈতিক সুশাসনের অভাব রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করেছে। কারণ উন্নয়নের ধারায় যারা খানিকটা কম পেল, বিশেষ করে বিকাশমান মধ্যবিত্ত, তারা এটাকে মেনে নিতে পারে না। এশিয়া বা আফ্রিকা, বিশেষ করে ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশের অভিজ্ঞতা এখানে বিবেচনা করতে হবে। পরিবর্তনের ধারায় বিকাশমান মধ্যবিত্তের জন্য এই যে আর্থসামাজিক অব্যবস্থাপনা, মানসম্মত শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্য ও সেবার ক্ষেত্রে ঘাটতি, গণপরিবহনের অভাব, নাগরিক সুরক্ষা বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অভাব, এগুলো তাদের জন্য অগ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক অর্জন আছে কিন্তু সুশাসন নেই, এই ফাঁকটা বুঝতে হবে।

অনেকে সুশাসনের অভাবকে অনেক সময় অর্জনের অভাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে, আসলে তা কিন্তু না। সুশাসনবিহীন অর্জন সুষ্ঠু বণ্টনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি করে। বর্তমানে অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তারা দেখে তাদের যে পরিমাণ টাকা আছে তা দিয়ে দেশের ভেতরে মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে পারছে কিনা। যখন তাদের বিলাত বা সিঙ্গাপুরে গিয়ে শিক্ষা-স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের সামর্থ্য থাকে না, আবার দেশের ভেতরেও তারা এটা পায় না, তখন তারা অসন্তোষ প্রকাশ করে, বিদ্রোহ করে। অর্থাৎ প্রত্যাশা অনুযায়ী কোনো একটা শ্রেণী যখন নিজেদের প্রাপ্যটা পায় না, তখন এ আর্থসামাজিক অসন্তোষ রাজনৈতিক চরিত্র নেয়।

আমরা যদি লাতিন আমেরিকার দিকে তাকাই, তাহলে দেখব যে অনেক মধ্যম আয়ের দেশ ৫০ বছরেও উচ্চ-মধ্যম আয়ের দিকে যেতে পারছে না। এখন তারা বামপন্থী সরকার আনছে চিলির মতো দেশে। দক্ষিণ আফ্রিকায়ও এএনসির মতো দল সুশাসন দিতে পারছে না। এএনসি গরিব মানুষের পক্ষের দল। সে অর্থে মানুষগুলোর প্রান্তিকীকরণ হচ্ছে, রাজনৈতিকভাবে এএনসি প্রভাব হারিয়ে ফেলছে। আবার সুদানে মধ্যবিত্তের প্রত্যাশা পূরণ করার ক্ষেত্রে প্রথাগত রাজনীতি ব্যর্থ হয়েছে। একই রকমভাবে আমরা যদি আমাদের আশপাশের দেশের দিকে তাকাই, যেমন থাইল্যান্ড। তরুণরা প্রথাগত রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। যখন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন তাদের ঐতিহাসিক ও প্রতিশ্রুত মূল্যবোধগুলোকে কার্যকরভাবে ধারণ করতে পারে না, তখন দেখা যায় বিকাশমান মধ্যবিত্ত সংযোগবিহীন ও নেতৃত্বহীনভাবে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আন্দোলনে অংশ নেয়। সব সময় যে তারা রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয় তা নয়, তবে সমাজকে একটা ঝাঁক দেয়।

বাংলাদেশে যেমন নিরাপদ সড়কের আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে অসংগঠিত বিকাশমান মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা। তারা কিন্তু হতদরিদ্রের ছেলেমেয়ে না। ডিজিটাল যুগের বৈশ্বিক জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে তারা যুক্ত। তারা জানে অন্যভাবেও সমাজ পরিচালনা সম্ভব। তাদের কাছে বিকল্পগুলো আছে। কিন্তু তাদের প্রতিবন্ধকতা হলো, তারা অসংগঠিত সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে থাকে, একক নেতৃত্বের মধ্যে থাকে না। সেজন্য অনেক সময় আন্দোলনটা কার্যকর হয় না।

সঞ্চালক: উন্নয়নে মধ্যবিত্ত কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি যদি উন্নয়নের পরবর্তী ধাপের কথা চিন্তা করেন, তাহলে গত এক দশকে যে বিকাশমান মধ্যবিত্ত গড়ে উঠেছে তারাই বাংলাদেশে আগামী দিনে আর্থসামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে বলে আমার ধারণা। তবে ড্রাইভিং ফোর্স বা চালিকা শক্তি এবং ডিফাইনিং ফোর্স বা নিয়ামক শক্তি, এ দুটির মধ্যে তফাৎ আছে। আমি মধ্যবিত্তকে চালিকাশক্তি হিসেবে দেখি, নিয়ামক শক্তির ব্যাপারে নিশ্চিত নই। যখন তাদের মধ্যে এক ধরনের আক্ষেপ জন্ম নেয় যে ‘আমার তো কর্তৃত্ব নেই, আমি কাউকে প্রশ্ন করতে পারি না, প্রশাসন আমাকে অবজ্ঞা করে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে আমি পৌঁছাতে পারি না, তখন সে হতাশাবোধ ও আত্মপীড়নকে (মোকাবিলার জন্য) যদি সংগঠিতভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে রাস্তা করে না দেয়া হয়, তাহলে পৃথিবীর অভিজ্ঞতা বলে তখন তারা বিশেষ করে যুবসমাজ উগ্রবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। লাতিন আমেরিকায় শাইনিং পাথ বা উগ্র বাম আন্দোলন যেমন। সত্তরের দশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের লাতিন আমেরিকা যে জায়গায় ছিল আজ বাংলাদেশ সেখানে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক জায়গায় এখনো এ রূপ অবস্থা দেখি। খুব ঘরের কাছে আপনি ভারতবর্ষের আদিবাসীদের আন্দোলনের মধ্যেও এটি দেখতে পাবেন। যখন স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পথগুলো রুদ্ধ হয়ে যায়, জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনসহ, তখন অবধারিতভাবে জনগণ সহিংসতা ও উগ্রবাদের দিকে চলে যায়। আমার আস্থা ও বিশ্বাস, বাংলাদেশের আলোকিত নেতৃত্ব সে পথ থেকে আমাদের বিরত রাখতে সক্ষম হবে।

সঞ্চালক: আমাদের অর্থনীতির সংকটগুলো কেন তৈরি হলো?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বেশকিছু কারণ আছে। একটা হচ্ছে সরকার তথাকথিত দৃশ্যমান উন্নয়নের ধারাকে বেছে নিয়েছে। সরকার হয়তো মনে করেছে, শাহজাহান চলে গেছে কিন্তু তাজমহল তো রয়ে গিয়েছে। শাহজাহানের আর কোনো অপকীর্তি বা তার সন্তানদের উত্তরাধিকার লাভের চেষ্টায় সহিংসতার কথা কেউ আর মনে রাখেনি। এ রকম একটা তত্ত্ব বোধহয় মাথায় ঢুকেছে। শাহজাহান তো সাম্রাজ্য চালিয়েছে আর আমরা আছি গণতন্ত্রের যুগে। এ দুই সময়কালের মাঝে ৪০০ বছরের ব্যবধানের ফলে রাষ্ট্রের চরিত্রে ও নাগরিকের প্রত্যাশায় গুণগত ও কাঠামোগত পরিবর্তন এসেছে।

আমাদের ২০টি মেগা প্রকল্পের ক্ষেত্রে গড়ে বছরে জিডিপির ১ শতাংশ করে ব্যয় করা হয়েছে। ২০টি মেগা প্রকল্পে যে অর্থ দেয়া হয়েছে, শিক্ষা খাতে সেই একই পরিমাণ টাকা দেয়া হয়েছে, আর গোটা বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার জন্য দেয়া হয়েছে তার অর্ধেক। এক দশক ধরে শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষাকে বঞ্চিত করে মেগা প্রকল্প করা হয়েছে এ প্রত্যাশায় যে এগুলো অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। ঘটনাক্রমে এ প্রকল্পগুলোর অনেকই অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর বা যৌক্তিক নয় বলে এখন প্রকাশ পাচ্ছে। শ্রীলঙ্কার হাফানটোটা বন্দর অপ্রয়োজনীয় দৃশ্যমান উন্নয়নের একটি বড় উদাহরণ। আর বাংলাদেশের মধ্যে এ মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কিংবা মাতারবাড়ী প্রকল্প আমাদের জন্য অনুরূপ। আমরা ভয় পাচ্ছি আগামীতে হয়তো রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র আরো একটি অপ্রয়োজনীয় প্রকল্পের উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত

হবে। এসব প্রকল্প থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার প্রত্যাশা সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আমি মনে করি, গত দশকে মানবসম্পদ খাতের বিপরীতে ভৌত অবকাঠামোকে প্রাধান্য দিয়ে সবচেয়ে বড় ‘সোশ্যাল ট্রেড-অফ’ বা সামাজিক ছাড় দেয়া হয়েছে। এর ফল আমাদের পরবর্তী ১০ বছর ধরে ভোগ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, এসব প্রকল্পের অবদানে যদি প্রবৃদ্ধি হয়ে থাকে তাহলে দেশে আয় বেড়েছে। কিন্তু সে আয় থেকে কর আদায় হলো না কেন? কর কেন জিডিপির মাত্র ৯ শতাংশ? আমি তাই বলি, সরকার ‘উচ্চপ্রবৃদ্ধির দরিদ্র সরকার’। কারণ সরকারের হাতে বর্তমানে টাকা-পয়সা নেই। জিডিপি প্রায় ১৫ শতাংশ সরকারি ব্যয়, যার মধ্যে ৯ শতাংশের মতো কর থেকে আসে, বাকি ৫ থেকে ৬ শতাংশ থাকে ঘাটতি। সরকার এ ঘাটতির প্রায় ৪০ শতাংশ বৈদেশিক ঋণ নিয়ে পূরণ করে, যার মাত্র ২ শতাংশ অনুদান। বাকি ৬০ শতাংশ সরকার অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে নেয়। আগে এ অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রায় পুরোটাই আসত জাতীয় সঞ্চয়পত্র বিক্রি করে, কিন্তু এখন এর ৪০ শতাংশই আসে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে। কিন্তু এটা তো সরকারকে ফেরত দিতে হয় সুদসহ। রাজস্ব বাজেটের ১৮-২০ শতাংশ সুদ ব্যয়ে চলে যায়। এটা হচ্ছে বর্তমান উন্নয়ন ধারার দ্বিতীয় সমস্যা। সরকার দৃশ্যমান উন্নয়ন থেকে আয় করতে পারেনি। ফলে আজ যখন সরকারের ভর্তুকি দেয়ার প্রয়োজন, তখন সে তা দিতে পারছে না। যেটুকু দিতে পারে, সেগুলোও বিভিন্ন কায়মি স্বার্থের কাছ জিম্মি।

তৃতীয়ত, এ উন্নয়নে সর্বদা গড়ের দিকে নজর দেয়া হয়েছে। ফলে নীতিকথা বলা হলেও বাস্তবে ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন বিপন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রয়োজনীয় নজর দেয়া হয়নি। ফলে এরা ক্রমে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিক এবং দুর্বল অবস্থানে পৌঁছেছে। পার্বত্য এলাকার ও সমতলের আদিবাসী, দলিত সম্প্রদায়, নদীভাঙনে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠী, উপকূল অঞ্চলের মানুষ, তৃতীয় লিঙ্গ, শারীরিক প্রতিবন্ধী, প্রবীণ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অনুকূলে আমরা যথাপ্রয়োজন অর্থ বরাদ্দ ও নীতি সমর্থন দিতে পারিনি। গোষ্ঠী পরিচয়বিবর্জিতভাবে আমরা দুর্বল জনমানুষকে এগিয়ে নিয়ে আসতে পারিনি।

সঞ্চালক: সমাধান আসবে কীভাবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রচলিত উন্নয়ন ধারার তিনটি সমস্যার কথা শুরুতে বলেছি। এখন আগের তিনটির সঙ্গে এ তিনটি মিলবে। এগুলোর সংশোধন করতে হলে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার জায়গায় ফিরে আসতে হবে। আর জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার উৎসবিন্দু হচ্ছে স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচন। একটি অংশগ্রহণমূলক ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারার জন্য এখন সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুটি কারণে এটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গত এক দশকে যা সৃষ্টি হয়েছে, সেটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য এবং উন্নয়নের পরের ধাপে যাওয়ার জন্য এটি প্রয়োজন। পরের ধাপে যাওয়ার জন্য জবাবদিহি আরো বেশি প্রয়োজন। কারণ উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে যেতে হলে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অত্যন্ত বড় বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

এলডিসি থাকা অবস্থায় আমাদের বাজার সুবিধা ছিল পণ্যের ভিত্তিতে, অর্থাৎ উৎপাদনে দেশজ উপাদানের ভিত্তিতে। এখন আমাদের পণ্য মানের সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত প্রক্রিয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ভাষায় বলে পিপিএম (প্রসেস অ্যান্ড প্রডাকশন মেথড)। অর্থাৎ পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শিশু শ্রম ব্যবহার করা হয়েছে কিনা কিংবা শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আছে কিনা এগুলো বিবেচনা করা হবে। হয়তো এটা আরো এক ধাপ বাড়বে, তা হলো নাগরিকদের সর্বজনীন মানবাধিকার রক্ষা করা হয়েছে কিনা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে কিনা এগুলোও বিবেচনায় নেয়া হবে।

তাই বলব, যারা ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের অপরিপক্ব ধারণা দিয়েছিলেন যে ‘উন্নয়ন আগে, মানবাধিকার পরে’ তারা যে কতখানি অপব্যখ্যা করেছেন তা আগামীতে প্রকাশ পাবে। সেজন্য খুব দ্রুততার সঙ্গে আমাদের এ বিষয়গুলো সংশোধন করা দরকার। আগামী দেড় বছর পর নির্বাচন হওয়ার কথা। এই গণতান্ত্রিক উত্তরণের সুযোগ নিয়ে উন্নয়ন ধারা সম্পর্কিত বিষয়গুলো সংশোধন করতে হবে। একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহির প্রক্রিয়ায় যে ঘাটতিটুকু আছে তা পূরণ করে নবতর স্তরে আমরা যেন টেকসইভাবে এগিয়ে যেতে পারি সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

সঞ্চালক: চলমান আর্থিক পরিস্থিতি সামলাতে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আগামী দুই বছরের জন্য একটা উত্তরণকালীন বা অন্তর্বর্তীকালীন পরিকল্পনা প্রয়োজন। বর্তমান অর্থবছরের বাজেট, যেটা মাত্র চার মাস আগে দেয়া হয়েছে, সেটার প্রাক্কলনগুলো অনেক ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গিয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২০-২৫) লক্ষ্যমাত্রা তো কেউ উল্লেখই করে না আজকাল। কারণ আমাদের সামনে যে উন্নয়ন বিচ্যুতি ছিল, চ্যালেঞ্জগুলো ছিল, তা আগের চেয়ে অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে আমি মনে করি, কিছু জায়গায় অগ্রাধিকার দিয়ে গুরুত্ব দেয়া দরকার। প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা। এটা করতে হলে যেখানে যে আর্থিক সম্পদ আছে সব এক করে যৌক্তিকভাবে ভর্তুকি দিতে হবে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে ভর্তুকির বিষয়টি সবচেয়ে বড়। ভর্তুকি দেয়ার ক্ষেত্রে দুটি প্রাধিকার হতে হবে। প্রথমত, কৃষি উৎপাদন ও খাদ্যনিরাপত্তা। আমন ধানের মৌসুম চলছে। বিদ্যুৎ, সার ও ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির কারণে আমন উৎপাদন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে, উপরন্তু মৌসুমের শুরুতে বৃষ্টি হয়েছে কম। দ্বিতীয়ত রয়েছে গ্যাস সরবরাহ তথা জ্বালানি প্রাপ্যতা। জ্বালানির লভ্যতা ও মূল্যবৃদ্ধির কারণে শিল্প উৎপাদন ও রফতানি বিঘ্নিত হচ্ছে। শুষ্ক সমন্বয় করে বা অন্য খাত থেকে টাকা নিয়ে এসে জ্বালানি খাতে ভর্তুকি দেয়া যায় না, এমনটা আমি মনে করি না।

সঞ্চালক: সংকট মোকাবেলায় সরকার কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ভর্তুকি বাড়িয়েছে, ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করেছে। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ভর্তুকি দুই ধরনের হয়, ‘ভালো ভর্তুকি’ হয় আবার ‘খারাপ ভর্তুকি’ও হয়। এ মুহূর্তে খারাপ ভর্তুকির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। যেমন ব্যক্তি খাতের অলস বিদ্যুৎ

উৎপাদন ক্ষমতার জন্য ক্যাপাসিটি চার্জ। খারাপ ভর্তুকি বাতিল করে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি প্রয়োগ করে ভালো ভর্তুকি দিতে হবে।

অন্য বিষয়টি হচ্ছে টাকার বিনিময় হার ও সুদের হারকে কিছুটা হলেও বাজারভিত্তিক বা নমনীয় করতে হবে। নয়-ছয় সুদের হারকে শিথিল করে একটা ব্যাল্ডের মধ্যে নিতে হবে। আমানতের ওপর ৬ শতাংশ সুদ আর ৯ শতাংশের ওপর মূল্যক্ষীতির কারণে এমনভাবেই ব্যাংকে আমানতকারীদের টাকার প্রকৃত মূল্যের ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। সুদের হার নয়-ছয় করে আমরা ব্যক্তি খাতে তো বিনিয়োগ বাড়াতে পারিনি। সরকার বা উদ্যোক্তারা যে যুক্তি দিয়েছিল, অভিজ্ঞতা বলে তা সঠিক ছিল না।

আমাদের এখন অভ্যন্তরীণ বাজারকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে আমন, আউশ ধান উৎপাদনে জোর দিতে হবে। কৃষককে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দিতে হবে। নতুন বাজার অনুসন্ধানের পাশাপাশি বিদেশে গমনরত শ্রমিকদের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। মূল্যক্ষীতির কারণে শ্রমিক-কর্মচারীদের কিছু না কিছু সুরাহা দিতে হবে। চা বাগানের শ্রমিকরা আন্দোলনে চলে এসেছে, কোনোদিন হয়তো গার্মেন্ট শ্রমিকরা আন্দোলনে নামবে। রপ্তানিকারী সম্প্রদায়কে মনে রাখতে হবে, টাকার বিনিময় হারের কারণে যে লাভটা তারা বাড়তি পেলে, তার কিছু অংশ শ্রমিকদের দিতে হবে। শ্রমিকদের দেখতে হবে। কৃষকদের দেখতে হবে। প্রবাসীকর্মীদের দেখতে হবে। এ তিন অংশীজনের যদি আমরা নজরে রাখতে পারি তাহলে কর্মসংস্থানের উন্নতি হবে।

সর্বশেষে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া গরিব তথা দুস্থ মানুষকে সুরক্ষা দিতে হবে। টিসিবিকে সম্প্রসারণ করতে হবে, জেলা তথা পৌরসভা পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে যে ফ্যামিলি কার্ডের কথা বলা হচ্ছে, সেটা যেন দ্রুত স্বচ্ছতার সঙ্গে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। এখানে যেন আগের মতো দুর্নীতি ও বিচ্যুতি না হয়। সব ধরনের ভাতাকে সর্বনিম্ন ১ হাজার টাকা করা যায় কিনা এটা চিন্তা করতে হবে। ৫০০ টাকা ভাতা তো মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ২-৩ শতাংশ—এটা তো তাদের সঙ্গে পরিহাসের ব্যাপার। এছাড়া শিক্ষিত ও বেকার যুবকদের এককালীন আর্থিক সমর্থন দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। না হলে এগুলো পরবর্তী সময়ে সামাজিক অসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারে। সময় থাকতে আমি এসব বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার পক্ষে।

আমাদের সরকারের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো আগে অস্বীকারের মনোভাব থাকে, পরে তারা ঠেকে শেখে। বুদ্ধিমানদের তো ঠেকে শিখতে হয় না, তারা পরিস্থিতির আগাম পর্যালোচনা করে ও অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে শেখে। আমি এটাই প্রত্যাশা করব যে আমাদের নেতৃত্ব ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সঙ্গে এই উত্তরণকালীন নীতি সংস্কারকে ধারণ করতে পারবেন।

বণিক বার্তা

২০ অক্টোবর ২০২২

গণমানুষের মুক্তির সংগ্রাম এগিয়ে নিতে হবে

রওনক জাহান

১৬ ডিসেম্বর। আমাদের বিজয় দিবস। প্রতিবছর এই দিনে আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি নাম না-জানা লাখ লাখ মানুষের স্মৃতির উদ্দেশে, যাঁদের অপারিসীম ত্যাগের বিনিময়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করেছিলাম ১৯৭১ সালে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির ও পেশার মানুষ, নারী-পুরুষনির্বিষে পাকিস্তানি সরকারের পরিচালিত গণহত্যায় প্রাণ হারিয়েছিল, নির্যাতনের শিকার হয়েছিল, বাস্তুহারা হয়েছিল।

কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই আমাদের জনগণ কেউ অস্ত্র হাতে, কেউ সহায়কের ভূমিকায় এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। লক্ষ্য ছিল দেশ স্বাধীন করা। আরও বড় লক্ষ্য ছিল এ দেশের মানুষ যারা বহু শতাব্দী ধরে নিপীড়ন ও শোষণের জালে আবদ্ধ, তাদের মুক্ত করা।

আমাদের সংগ্রামের নাম তাই আমরা দিয়েছিলাম মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে জনগণের ভূমিকা স্বীকার করেই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশকে গণপ্রজাতন্ত্র হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭২ সালে আমাদের সংবিধানে বলা হয়েছিল, জনগণই সব ক্ষমতার উৎস। নাগরিকের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সব অধিকার সুনিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছিল।

আজকের দিনে যে প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক, তা হলো বিজয়ের ৫১ বছর পর আমাদের গণপ্রজাতন্ত্রে গণমানুষ কেমন আছে? তারা নিজেদের কতটা মুক্ত বলে মনে করে? গত পাঁচ দশকে নিঃসন্দেহে দেশে আর্থসামাজিক উন্নয়ন হয়েছে। দারিদ্র্যের হার কমেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।

সত্তরের দশকে যেখানে আমাদের দেশের মানুষের গড় আয়ু ছিল ৪০-এর কোঠায়, এখন তা হয়েছে ৭০-এর ওপরে। জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু জনগণের, এমনকি সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীরও চাহিদা কি শুধু জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন?

তাদের কি অন্য কোনো চাহিদা নেই? বঞ্চিত হলেও তারা কি মনে করে না যে নিপীড়ন ও শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রতিবাদ ও সংগ্রাম করার অধিকার তাদের আছে? বাকস্বাধীনতা কি একমাত্র নাগরিক সমাজেরই দাবি? নাকি দরিদ্র, শোষিত জনগণও বাকস্বাধীনতা চায়?

মুক্তিযুদ্ধের প্রায় ২০ বছর পর এবং আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ এ দেশে সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। তারপর থেকে তারা রাজনীতিকদের দ্বারাই শাসিত হয়েছে। কিন্তু জনগণ কি এখন ভাবতে পারছে যে আসলেই তারা রাষ্ট্রের সব ক্ষমতার উৎস, নাকি তারা দেখছে ক্ষমতা ক্রমশ একটি ছোট গোষ্ঠীর হাতে কুক্ষিগত হয়ে যাচ্ছে। এই গোষ্ঠী যেকোনো সরকারই আসুক না কেন, তাদের কাছাকাছি থেকে বিশেষ সুবিধা ভোগ করে, আইন অমান্য করে প্রচুর ধনসম্পদ গড়ে তোলে। আবার সেই অর্থ বিনিয়োগ করে তারাই হয়ে যাচ্ছে জনপ্রতিনিধি। জনগণ কি মনে করে যে জনপ্রতিনিধিদের তারা দায়বদ্ধ করতে পারছে?

জবাবদিহি তো দূরের কথা, গত এক দশকে পরপর দুটি ত্রুটিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচন হওয়ার পর জনগণ এখন পুরো নির্বাচনী ব্যবস্থার ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের যে ন্যূনতম রাজনৈতিক অধিকার, স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভোটের মাধ্যমে সরকার নির্বাচনের অধিকার, তা-ও তারা বাস্তবায়ন করতে পারছে না।

স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে, সভা-সমাবেশ করতেও তারা নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। প্রতিনিয়তই জনগণকে ভিআইপি, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দাপট সহ্য করতে হচ্ছে রাস্তাঘাটে। তাদের প্রায়ই মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে দেশের উন্নতির জন্য তাদের সর্বদা ক্ষমতাসীনদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। দেশের উন্নতির দাবি, সুশাসনের দাবি যে তাদের ন্যায্য দাবি, তার স্বীকৃতি তারা পাচ্ছে না।

এই বিজয়ের মাসে প্রতিবছর আমরা মুক্তিযুদ্ধের গৌরবের দিনগুলোর কথা স্মরণ করি। এই পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন রয়েছে, যাতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম মনে রাখতে পারে, কী লক্ষ্য নিয়ে এ দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের এই গৌরবগাথার মূল নায়ক যে জনগণ, তা প্রতি প্রজন্মকে জানাতে হবে, জানতে হবে।

তবে বিজয় দিবস তো কেবল আমাদের উদ্‌যাপনের দিনই নয়, এই দিনে আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে কী করে আমরা গণমানুষের মুক্তির সংগ্রাম, যার প্রয়োজন এখনো ফুরিয়ে যায়নি, তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। আমাদের নতুন চিন্তা, নতুন কর্মপন্থা আবিষ্কার করতে হবে, যা দিয়ে আমরা আমাদের নানা সমস্যা, নানা সংকটের উত্তরণ ঘটাতে পারব।

আমাদের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক, সামাজিক বৈষম্য দূর করতে হবে। রাজনীতিতে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। একটি শান্তিপূর্ণ, সবার কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে হবে। ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে বিজয়ী দল সব সুযোগ-সুবিধা কুক্ষিগত না করতে পারে

এবং পরাজিত দল সর্বহারা না হয়ে যায়। মুক্তচিন্তার, তর্কবিতর্কের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সবার ওপরে জনগণকে আবার উদ্বুদ্ধ করতে হবে যে গণমানুষের এই মুক্তির সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত জনগণের বিজয় হবে, যেমন আমরা করতে পেরেছিলাম ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়।

প্রথম আলো

১৬ ডিসেম্বর ২০২২

অধ্যায় ৩

শিল্প, বাণিজ্য এবং বাজার ব্যবস্থাপনা

রপ্তানি বহুমুখীকরণে দরকার বাজার বহুমুখীকরণ

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

রপ্তানি বাণিজ্যে পণ্য বহুমুখীকরণ দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত হলেও এ ক্ষেত্রে খুব বেশি অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। সরকারের বিভিন্ন নীতিতে (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা), বার্ষিক কার্যক্রমে (রপ্তানি বর্ষ উদযাপন) বা রাজনৈতিক বক্তৃতায় রপ্তানিকে একমুখী পণ্য নির্ভরতা থেকে বের করে আনার লক্ষ্য ঘোষণার বিভিন্ন উদ্যোগের কথা বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই লক্ষ্যে আমাদের অর্জন সামান্য। রপ্তানি বহুমুখীকরণে আমাদের প্রধান প্রতিবন্ধকতা কোথায়? সরকারের কোন উদ্যোগ এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে, অথবা সরকারের কোন উদ্যোগ এ ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে? উদ্যোক্তাদের কোন দুর্বলতা এ ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে?

প্রথম বাধা সরকারের একমুখী নীতি কাঠামো। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক খাত সরকারের সুবিধা কাঠামোর দুই-তৃতীয়াংশ পেয়ে থাকে। যুক্তি হিসেবে পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা বলেন, যেহেতু এই খাত ৮০ শতাংশ (রপ্তানির চার-পঞ্চমাংশ) অবদান রাখে, সুতরাং বেশির ভাগ সুবিধা এই খাতের প্রাপ্য। অথচ বাস্তবতা হলো, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত বিগত চার দশকের অভিজ্ঞতায় একটি প্রাপ্তবয়স্ক খাতে পরিণত হয়েছে। এরকম একটি প্রাপ্তবয়স্ক খাতের জন্য সরকারের বেশির ভাগ সুবিধার তেমন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। সাধারণত সরকারের বাণিজ্যসংক্রান্ত বা বিনিয়োগসংক্রান্ত সুবিধা দেওয়া হয় উদীয়মান খাতের জন্য—তাদের বিকাশের জন্য। প্রতিটি রাজস্ব বা আর্থিক প্রণোদনার উদ্দেশ্য থাকে, এসব সুবিধা নিয়ে রপ্তানিমুখী বিভিন্ন খাত বিকাশ লাভ করবে। এ ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সুবিধা তৈরি পোশাক খাতকে দেওয়ার ফলে দুই ধরনের ক্ষতি হচ্ছে। প্রথমত, সরকারের বাড়তি রাজস্ব ব্যয়, যা থেকে এই খাতের তেমন কোনো উপকার হচ্ছে না। কেননা এই রাজস্ব ব্যয় না করলেও রপ্তানিতে তেমন নেতিবাচক প্রভাব পড়ত না। দ্বিতীয়ত, একটি খাতে বেশির ভাগ রাজস্ব ব্যয়ের ফলে অন্যান্য উদীয়মান খাতে পর্যাণ্ড রাজস্ব প্রণোদনার সুযোগ থাকে না। যতটুকু প্রণোদনা দেওয়া হয়, তা খুব স্বল্পাকারে বিভিন্ন উদীয়মান খাতের value chain-এ সামগ্রিক উন্নতির সহায়ক হয়। সবচেয়ে বড় কথা,

সরকারের একমুখী নীতি সুবিধা ও সহযোগিতা কাঠামো ব্যবসায়ীদেরও একক খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করে এবং উদীয়মান অন্যান্য খাতে বিনিয়োগে নিরুৎসাহ করে। মোটকথা, রপ্তানি খাতে একমুখী কাঠামো থেকে বের হতে হলে সরকারের রাজস্ব ও আর্থিক প্রণোদনা ও সুবিধা কাঠামোর পূর্ণাঙ্গ সংস্কার ও পরিবর্তন দরকার।

রপ্তানি বহুমুখীকরণে উদ্যোক্তা বা বেসরকারি খাতের দুর্বলতাও চোখে পড়ার মতো। একটি নির্দিষ্ট খাত রপ্তানি বাজারে তখনই এগোতে পারে, যখন পণ্য ক্রেতার (buyer) পণ্যের অর্ডার দেওয়ার জন্য অনেক বিক্রেতার (supplier) খোঁজ পায়। দুর্ভাগ্যজনক হলো, বাংলাদেশের বেশির ভাগ উদীয়মান খাতই মাত্র এক বা একাধিক স্বল্পসংখ্যক বিক্রেতা উদ্যোক্তার ওপর নির্ভরশীল। একটি নির্দিষ্ট খাতের ন্যূনতমসংখ্যক বড়, মাঝারি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার উপস্থিতি না থাকলে ক্রেতা অর্ডার দেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিধাস্থিত থাকে। বেশির ভাগ খাত কিছু বৃহৎ উদ্যোক্তা বা গ্রুপ অফ কোম্পানিজ নির্ভর হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে এসব খাতের বিকাশ স্লথগতিতে হচ্ছে। এসব খাতে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ উদ্যোক্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক মানের পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও প্রদানের ক্ষমতা থাকা জরুরি। মোটকথা, প্রতিটি উদীয়মান খাতের value chain-কে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কাঁচামাল উৎপাদন বা আমদানি মধ্যবর্তী পণ্য উৎপাদন এবং পূর্ণাঙ্গ পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের সক্ষমতা অর্জন জরুরি।

উদীয়মান এসব খাতে স্বল্পতম সময়ে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে দেশি বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা জরুরি। বাংলাদেশে প্রায়ই বলা হয়, বিদেশি বিনিয়োগের জন্য সব ধরনের সুবিধা রয়েছে এবং প্রায় সব খাত বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বাধার সম্মুখীন হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় বিনিয়োগ উৎসাহিত করার অজুহাতে বিদেশি বিনিয়োগকে নিরুৎসাহ করার একটা অলিখিত প্রবণতা সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে রয়েছে। রপ্তানি বহুমুখীকরণে দেশীয় বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগের পথ সুগম করা বিশেষভাবে জরুরি। মনে রাখা দরকার, বিদেশি উদ্যোক্তারা প্রথমে ক্ষুদ্র আকারের বিনিয়োগ দিয়ে শুরু করে ধীরে ধীরে বৃহদাকারের বিনিয়োগে যেতে চায়। সুতরাং ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের বিদেশি বিনিয়োগ উদীয়মান খাতের জন্য উপযোগী এবং এর জন্য সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা দরকার।

পণ্য রপ্তানি বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে বাজার বহুমুখীকরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক বহির্ভূত পণ্যের বড় বাজার অপ্রচলিত বাজারগুলোতে বিশেষভাবে বর্তমান। এসব বাজার মূলত ভারত, শ্রীলঙ্কা, রাশিয়া, চীন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে বর্তমান। এর পাশাপাশি বাংলাদেশি অধ্যুষিত বা বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর অবস্থানরত দেশগুলোতে দেশীয় ঐতিহ্যবাহী পণ্যের বাজার রয়েছে। অবশ্য এসব পণ্যের বাজার খুব বড় নয়। উপরোক্ত সব পণ্যের বাজারে বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা খুব সীমিত আকারেই রপ্তানি বৃদ্ধি করতে পারছে ভিন্ন ভিন্ন কারণে। প্রথমত, অপ্রচলিত প্রায় প্রতিটি বাজারে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এসব দেশ উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায় পণ্য রপ্তানিতে উচ্চ শুল্ক এক বড় বাধা। যেমন— রাশিয়া, ব্রাজিল বা দক্ষিণ আফ্রিকার মতো বড় বাজারে ৩০-৪০

শতাংশ শুল্ক দিয়ে পণ্য রপ্তানি সম্ভব নয়। রাশিয়ার মতো বাজারে সরাসরি এলসি খুলে রপ্তানির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ, যেমন—চীন বা ভারত বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা দিলেও বাংলাদেশ তা পর্যাপ্ত আকারে ব্যবহার করতে পারে না। যেমন—চীনের ক্ষেত্রে উচ্চমূল্যের অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজনের শর্ত থাকায় তা মিটিয়ে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা খুব কমসংখ্যক পণ্যেই পাওয়া সম্ভব। ভারতের বাজারে অ্যান্টিডাম্পিং ডিউটি আরোপের কারণে পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ ছাড়া ভারতের অভ্যন্তরীণ স্ট্যান্ডার্ডের স্বীকৃতি ছাড়া অনেক পণ্য রপ্তানি সহজসাধ্য নয়। এ ক্ষেত্রে ভারত খুব অল্পসংখ্যক পণ্যেই এখন পর্যন্ত পারস্পরিক স্বীকৃতি দিয়েছে। কৃষিজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে স্যানিটারি ও ফাইটো স্যানিটারি স্ট্যান্ডার্ড পরিপালন গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এই স্ট্যান্ডার্ড পরিপালনে সক্ষমতা অর্জন করেনি। ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যের ক্ষেত্রে ইউরোপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানদণ্ডে পণ্য উৎপাদন জরুরি—সেসব দেশে পণ্য রপ্তানির জন্য। এ ধরনের মানদণ্ড পরিপালন খুব অল্পসংখ্যক ল্যাব এবং সীমিতসংখ্যক পণ্যের জন্য ব্যাপক কারিগরি প্রস্তুতি ও বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জন সম্ভব। অন্যদিকে ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক পণ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানদণ্ড রয়েছে, যা পরিপালন দরকার হয় আমদানীকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে। যেমন—আসিয়ানভুক্ত দেশগুলো নিজেদের অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য আঞ্চলিক মানদণ্ড প্রবর্তন করেছে।

মোটকথা, তৈরি পোশাক বহির্ভূত পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের বাজারভিত্তিক, পণ্যমানভিত্তিক ও শুল্কবহির্ভূত বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করা বিশেষ প্রয়োজন।

কালের কণ্ঠ

১০ জানুয়ারি ২০২২

চালের বাজারে নজরদারি বাড়ান

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

দেশে নিত্যপণ্যের দাম মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার ঘটনা উদ্বেগজনক। এর ফলে মানুষের জীবনমানে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। রেকর্ড উৎপাদন ও আমদানির পরও কেন নিত্যপ্রয়োজনীয় এ পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না, তা পরিস্কার হওয়া দরকার। অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পাশাপাশি চালের দাম বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে। দেশে চালের প্রকৃত চাহিদা কত, তার সঠিক মূল্যায়ন করে প্রতি বছর কী পরিমাণ চালের জোগান হয়, তার হিসাব বের করা উচিত।

করোনা-পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম টেকসই হচ্ছে না। আর না হওয়ার কারণ হলো, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার অস্থির। বিশেষ করে খাদ্যপণ্যের। সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকগুলোও স্বস্তিতে নেই। করোনা মহামারির আগেও এসব সমস্যা ছিল। এখন তা বেড়েছে। চালের কী পরিমাণ চাহিদা, তার মূল্যায়ন করা দরকার। আগের চেয়ে চালের চাহিদা বেড়েছে। এর বাণিজ্যিক ব্যবহারও বাড়ছে। ভোগের বাইরেও চালের ব্যবহার বাড়ছে। এসব বিষয় হিসাবে আনা দরকার। ঘাটতি টানাপোড়েনের সুযোগে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করে যাচ্ছে। কতিপয় গোষ্ঠী চালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু বাজার নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোর কার্যক্রম দেখা যাচ্ছে না।

সিপিডির গবেষণায় উঠে এসেছে, গত বছরের অক্টোবর মাসে মূল্যস্ফীতির হার ৫ দশমিক ৪ শতাংশ এবং খাদ্যপণ্যে মূল্যস্ফীতি ৫ দশমিক ৩ শতাংশ বলা হলেও বাস্তবতার সঙ্গে এর বিরাট ফারাক রয়েছে। করোনার সময়ে পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে। এ ছাড়া বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপরও একটা চাপ পড়ছে। বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়ছে। কিন্তু সরকারি সংস্থা বিবিএসের তথ্যে দাম বাড়ার কোনো প্রতিফলন নেই। কারণ হতে পারে, বিবিএস যেসব পণ্যের ওপর ভিত্তি করে ভোক্তা মূল্যসূচক (সিপিআই) করে সেটি অনেক পুরনো। অথচ সাম্প্রতিক সময়ে মানুষের ভোগে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। তাই সময় এসেছে, ভোক্তা মূল্যসূচক করার জন্য নতুন পণ্যের

বাস্কেট করতে হবে। কারণ, বাজারে বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামের সঙ্গে বিবিএসের তথ্যে বেশ ফারাক দেখা যাচ্ছে।

মোটা চাল ও চিকন চালের মধ্যে নিম্ন-মধ্যবিত্তরা সাধারণত মোটা চাল খেয়ে থাকে। চিকন চালের পাশাপাশি মোটা চালেরও দাম বেড়ে যাওয়ায় স্বল্প আয়ের মানুষ সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে। আমাদের দেশে চিকন চালের তুলনায় মোটা চালের চাহিদা অনেক বেশি। অথচ এ ধরনের চালের পর্যাপ্ত উৎপাদন হওয়ায় দাম কম থাকার কথা ছিল। আমরা সিপিডির গবেষণায় দেখিয়েছি, মোটা চালের দাম বেড়েছে মাঠ পর্যায়ে, আর চিকন চালের দাম বেড়েছে বাজারে। মাঠ পর্যায়ে মোটা চালের দাম বাড়ার পেছনে রয়েছে বড় বড় কৃষক ও রাইস মিলারদের হাত। তারা চাল গুদামজাত করে রেখে সংকট তৈরি করে। তখন বাজারে চাহিদার তুলনায় জোগান সংকট তৈরি হয় এবং বেশি দামে ওই গুদামজাত করা চাল বিক্রি করা হয়।

চাল অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে আহরণ করা হয়ে থাকে। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে চাল উৎপাদন হচ্ছে। যদিও বিদেশ থেকে চাল আমদানি করা হয়। চালের দাম বাড়ার পেছনে কাজ করে উৎপাদন ব্যয় ও চাহিদা বৃদ্ধি। বর্তমানে উৎপাদন খরচ ও চাহিদা উভয়ই বেড়েছে। সম্প্রতি জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে। এর ফলে সেচ কাজে ব্যয় বাড়বে। পাশাপাশি পরিবহন ব্যয়ও বেড়েছে। এমনকি জ্বালানি তেলের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেক নিয়ামকের দাম বাড়ায় এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে চালের বাজারে। বর্তমানে আমন চালের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে তেলের দাম বৃদ্ধির প্রভাব খুব একটা থাকার কথা ছিল না। কারণ এ ধান আগেই মাঠ থেকে উঠে গেছে। তারপরও এ মোটা চালের দাম বেড়েছে। আগামী মার্চে বোরো ধান বাজারে এলে তখন আরেক দফা চালের দাম বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ আমনের তুলনায় বোরো উৎপাদনে সেচ খরচ তুলনামূলক বেশি। এর একটি প্রভাব বাজারে পড়বে।

ইদানীং চালের বহুমুখী চাহিদা বেড়েছে। এখন আর চাল দিয়ে শুধু ভাত রান্না করা হয় না। বরং চালকে কাঁচামাল হিসেবে ধরে অন্য অনেক খাদ্যপণ্য তৈরি হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে মুড়ি, চিড়া, খই থেকে শুরু করে নানা ধরনের পিঠা-পায়েস। এগুলো আগেও তৈরি হতো। কিন্তু সাম্প্রতিককালে চাল বাণিজ্যিকভাবে ব্যাপক আকারে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। চাল দিয়ে তৈরি এসব খাবার বাজারজাত করছে বিভিন্ন কোম্পানি। চাল দিয়ে গবাদি পশু ও প্রাণীর খাবার তৈরি হচ্ছে। মাছের খাবার হিসেবে চাল ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রক্রিয়াজাত করে পশু, মৎস্য খাবারে রূপ দেওয়া হচ্ছে চালকে। ফলে এখানেও চাল কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব কারণে চালের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে।

সরকারি ব্যবস্থাপনায় মাঠ থেকে যত বেশি চাল কিনে রাষ্ট্রীয় গুদামে মজুত করা যাবে, তত বেশি অসাধু ব্যবসায়ীরা সতর্ক হবে। কারণ সরকার ন্যায্যমূল্যে কৃষকের কাছ থেকে ধান বা চাল কিনলে কৃষক যেমন ন্যায্যমূল্য পায়, অন্যদিকে অসাধু ব্যবসায়ীরা আর কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে পারে না। কারণ তারা জানে, বাজারে চালের সংকট হলে সরকারের কাছে থাকা মজুত চাল দিয়ে সে চাহিদা পূরণ করা যাবে। এতে বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়।

সরকার কৃষকের কাছ থেকে ধান বা চাল কেনার পাশাপাশি চালের আমদানিও বাড়িয়েছে। পাশাপাশি অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও চাল আমদানি করছে। এতকিছুর পরও শঙ্কা কাটেনি। বাজার নিয়ন্ত্রণে আনার পেছনে কাজ করছে কতিপয় গোষ্ঠী। তারাই চাল গুদামজাত করে রেখে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে এবং সুবিধামতো দাম বাড়িয়ে দেয়। এসব চক্রের লাগাম টেনে ধরতে পারলে বাজার কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে আসবে। তবে আগেই বলেছি, জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন খরচ বাড়ায় শতভাগ নিয়ন্ত্রণে আসবে, এটা বলা যাবে না। চালের বাজার সাধারণ মানুষের ক্রয়সীমার মধ্যে রাখতে হলে খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়কে আরও জোরালো ভূমিকা নিতে হবে। অনেক বিষয় পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। উৎপাদন, মজুত ও আমদানি বিষয়ে প্রয়োজনে নীতিমালা পরিবর্তন করতে হবে। নিবন্ধনভুক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়া নিবন্ধনহীন কেউ যেন চাল আমদানি করে বাজার অস্থিতিশীল করতে না পারে, সে বিষয়েও নজর রাখতে হবে।

এর বাইরে আরও কিছু ভূমিকা নিয়ে চালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বাজারমূল্য নির্ধারণে সরকারকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। সিভিকেটের ওপর নজরদারি বাড়াতে হবে। খুচরা বাজার নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে বড় বড় কৃষক ও রাইস মিলারদের দিকে নজরদারি বাড়িয়ে দিতে হবে। যেন তারা গুদামজাত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে না পারে। এই কাজগুলো করা অত সহজ নয়। তারপরও নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিয়ে আসা দরকার। বড় ব্যবসায়ী ও রাইস মিলারদের নিবন্ধনভুক্ত করতে হবে। অস্বাভাবিক মজুত দেখলে তৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে হবে। একইভাবে আমদানিকারকদেরও নিবন্ধন করে নজরদারির মধ্যে রাখতে হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিযোগিতা কমিশনের জোরালো ভূমিকা রাখার সময় এসেছে। কৃষির আধুনিকীকরণের ফলে ধান তথা চালের উৎপাদন বেড়েছে। একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ভোগ বেড়েছে ১ দশমিক ৭ শতাংশ। এ অবস্থায় উৎপাদন বাড়ানো অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বে এখন করোনা মহামারি চলছে। তার ওপর আমাদের দেশে জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে। সামনে বোরো মৌসুমে চালের দাম বৃদ্ধি পেলে মানুষ কষ্ট পাবে। তাই বাজার সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখতে উদ্যোগ নিতে হবে। চালের আমদানি বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য খোলাবাজারে (ওএমএস) পণ্য বিক্রি অব্যাহত রাখতে হবে। এর ব্যাপ্তি আরও বাড়াতে হবে। না হলে পুষ্টির ওপর প্রভাব পড়বে। স্বল্প আয়ের মানুষের কথা চিন্তা করে যাতে খোলাবাজারে আরও বেশি করে পণ্য বিক্রি করা যায়, সে উদ্যোগ নিতে হবে।

সমকাল

২৪ জানুয়ারি ২০২২

বাজারে ব্যবসায়ীদের এক ধরনের অলিখিত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বাংলাদেশে সব নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে এক ধরনের উর্ধ্বমুখী মূল্য প্রবণতা কয়েক মাস ধরে দেখতে পাচ্ছি। সরকারের মূল্যস্ফীতির তথ্যই বলছে ৬ শতাংশের ওপরে উঠে গেছে এই প্রবৃদ্ধির সূচক। খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত উভয় পণ্যেই এক ধরনের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা। তবে মূল্যস্ফীতিসংক্রান্ত সরকারের দেওয়া তথ্যের সঙ্গে ভোক্তা পর্যায়ে বড় ধরনের ফারাক রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ মূল্যস্ফীতির সরকারি তথ্যের চেয়ে বাজারে মূল্য বেশি।

এ বিষয়ক একটি গবেষণায় সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) দেখেছে যে সাম্প্রতিককালে মূল্যবৃদ্ধির যে প্রবণতা, সেটির ক্ষেত্রে বৈশ্বিক কারণ যেমন রয়েছে, তেমনি আছে অভ্যন্তরীণ কারণও। একই সঙ্গে ক্যাবের একটি রিপোর্টে দেখা গেছে, কিছু পণ্যের মূল্যের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের পারিবারিক ব্যয়ের প্রবণতা অনেক বেশি। কেননা সেসব পণ্য তুলনামূলকভাবে বেশি ব্যবহৃত হয়। আর সে কারণে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন ব্যয় অনেক বেড়ে যায় বলে ক্যাবের রিপোর্টে উল্লেখ হয়েছে।

সাধারণত মূল্যস্ফীতির এই বিষয়টিকে সিপিডির রিপোর্টে দুইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একটি হলো বাজারসংক্রান্ত মূল্যবৃদ্ধির ব্যাখ্যা। আরেকটি হলো বাজারবহির্ভূত মূল্যবৃদ্ধির ব্যাখ্যা। বাজারসংক্রান্ত মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে কোভিড থেকে পুনরুদ্ধার পর্যায়ে সব মানুষ নতুন করে আবার কাজে ফিরতে শুরু করেছে। মানুষের আয় বাড়ছে। হঠাৎ করে পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি বৈশ্বিক পর্যায়ে যেমন সত্য, তেমনি বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে কমবেশি সত্য। হয়তো সব পর্যায়ে সমানভাবে আয় বৃদ্ধির ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু অবশ্যই আয়ের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির একটি প্রবণতা সাম্প্রতিককালে রয়েছে।

বাংলাদেশে অর্থনীতির এক ধরনের পুনরুদ্ধার হয়েছে। দ্বিতীয়বার কোভিড সংক্রমণ বা ওমিক্রনও সেই অর্থে খুব বড় রকমের চাপে ফেলেনি। তবে বৈশ্বিক পর্যায়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। বৈশ্বিক চাহিদা বৃদ্ধির কারণে হঠাৎ করে পণ্যের চাহিদা তৈরি হওয়ায় কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি

ঘটছে। পরিবহন ব্যয় বেড়েছে। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহকারী দেশগুলোও পণ্য সরবরাহ করতে হিমশিম খাচ্ছে এবং তাদের পর্যায়েও কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধি ও রপ্তানি মূল্যবৃদ্ধির সাপেক্ষে সামগ্রিকভাবে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি সাম্প্রতিক বৈশ্বিক প্রবণতা। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। ফলে বাংলাদেশের যেসব আমদানি করা পণ্য, সেখানেও আমরা বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়ার অভিঘাত দেখতে পাচ্ছি। সেটি তেল, চিনি, ডাল ও অন্যান্য আমদানি পণ্যের জন্য কমবেশি প্রযোজ্য।

বাংলাদেশের ভেতরেও কিন্তু মানুষ কাজে ফিরছে। সুতরাং তারও এক ধরনের ব্যয়প্রবণতা বেড়েছে এবং সে কারণে অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে উৎপাদিত যেসব পণ্য রয়েছে, সেটি চাল থেকে শুরু করে পঁয়াজ ও অন্যান্য মসলাজাতীয় পণ্য—সব কটির ক্ষেত্রে কথটি অংশত সত্য। ফলে সেখানেও সরবরাহের একটা ঘাটতি রয়েছে, হঠাৎ করে চাহিদা বৃদ্ধির একটা প্রবণতা রয়েছে। একই সঙ্গে এ কথাও সত্য, বিগত বছরগুলোতে কোভিডের কারণে যে মুনাফা হারানো দেশি পণ্য বা কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী দেশ ও উদ্যোক্তারা এ সময়ে বাড়তি মূল্য নিয়ে বিগত দিনের লোকসান পুষিয়ে নিতে চাইছেন। ফলে সে কারণেও তাঁদের ভেতরে এক ধরনের বর্ধিত মূল্য চাওয়ার পাশাপাশি পচনশীল নয় এমন পণ্য ধরে রাখা এবং সেখান থেকে কিছু বাড়তি মুনাফা করার প্রবণতা রয়েছে। ফলে বাংলাদেশেও আমরা বাজারবহির্ভূত যে কারণগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার মধ্যে যেসব বিষয় রয়েছে সেগুলো হচ্ছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পণ্য ধরে রাখা, মজুদ করে রাখা। যাঁরা বড় সরবরাহকারী, তাঁরা এগুলো ধরে রাখছেন অথবা বৃহৎ আমদানিকারকরা সুবিধাটি নিচ্ছেন।

আবার আমরা দেখি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষ বিশেষ পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হলেও সেই পণ্য নির্ধারিত মূল্যে পাওয়া যায় না। কোনো পণ্য নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি না হয়ে বাজারে বাড়তি মূল্যে বিক্রি হলে, তা বাজারবহির্ভূত কারণে ঘটছে বলে মনে হয়। সাম্প্রতিককালে আমরা দেখেছি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নির্ধারিত সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করে দিলেও সেই দামে বাজারে তেল পাওয়া যাচ্ছে না। একজন ভোক্তাকে বাড়তি মূল্য দিতে হচ্ছে।

সিপিডির গবেষণাতেও আমরা দেখেছি, সাম্প্রতিককালে মূল্য এবং মার্জিনের ক্ষেত্রে সব পর্যায়ে সমপরিমাণের মার্জিন রাখার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। সাধারণত যাঁরা পণ্যের বৃহৎ সরবরাহকারী, তাঁরা কম মার্জিন নিয়ে থাকেন। কেননা কম মার্জিনের ওপর বড় পরিমাণের সরবরাহ দিয়ে তাঁরা ব্যয় মিটিয়ে থাকেন। মুনাফা করে থাকেন। অন্যদিকে যাঁরা অল্প পরিমাণে বাজারে সরবরাহ করেন, তাঁরা একটু বেশি মার্জিন রাখেন। কেননা কম পরিমাণ সাপ্লাই দিয়ে তাঁদের ব্যয় মিটিয়ে পরিবারের জন্য আয় নিশ্চিত করতে হয়। কিন্তু আমাদের গবেষণায় চাল কিংবা তেলের ক্ষেত্রে বা উভয় ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, খুচরা পর্যায়ের মূল্য মার্জিন এবং ফ্যান্ডেড মার্জিন ও ইমপোর্ট মার্জিন প্রায় কাছাকাছি পর্যায়ে ওঠানামা করেছে। তার মানে একজন আমদানিকারকও একজন তুচ্ছ বিক্রেতার মতো সমান পরিমাণে মার্জিন রাখছেন। সেই জায়গাটি নিয়েই আসলে আপত্তি।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রতি মাসে হিসাব করছে। মার্জিন ও পরিবহন ব্যয়ের হিসাব নিচ্ছে। অন্যান্য ব্যয় ধরে তারা পণ্যের মূল্য ঠিক করে দিচ্ছে। কিন্তু সেটি যখন বাজারে বাস্তবায়িত হচ্ছে না, সেখান থেকে প্রশ্নটি আসে যে বাজারে কি আড়াল থেকে এক ধরনের অলিখিত নিয়ন্ত্রণ চলছে? তাহলে অলিখিত নিয়ন্ত্রণের নেপথ্যে কারা? বড় আমদানিকারক ব্যবসায়ী এবং অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে যাঁরা বড় আকারের সাপ্লাইয়ার, তাঁরা?

এ অবস্থায় বলা যেতে পারে, শুধু সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণই যথেষ্ট নয়, বরং আমদানি পর্যায়ে এগুলোর মূল্য কী ছিল, কী মূল্যে বাজারজাত হচ্ছে, আমদানিকারক কী পরিমাণ মজুদ রাখছেন, আমদানিকারক কী মূল্যে এগুলো আড়তদার বা পাইকারি পর্যায়ে ছাড়ছেন, সেগুলো কিন্তু দেখার দরকার রয়েছে। ঠিক একইভাবে অভ্যন্তরীণ পণ্যের ক্ষেত্রেও মাঠ পর্যায়ে কৃষক, বড় কৃষক, রাইস মিলার ও অটো রাইস মিলার কী পরিমাণ মজুদ রাখছেন, কী মূল্যে বাজারজাত করছেন এবং কী মূল্যে তাঁরা কিনেছেন তার হিসাব রাখার প্রয়োজন রয়েছে।

একই সঙ্গে এটিও ঠিক যে সরকার সাম্প্রতিককালে ব্যাপকভাবে ওএমএস কর্মসূচি বৃদ্ধি করেছে, যেটি আসলে যৌক্তিক। কেননা মূল্যস্ফীতির মধ্যে সাধারণ মানুষ, নিম্ন আয়ের মানুষের বর্ধিত মূল্যে সক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে কিছুটা নির্ধারিত মূল্যে সরকার থেকে পণ্য কেনার আগ্রহ বাড়ছে। সরকার যৌক্তিক কারণে ওএমএস কার্যক্রম উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত নিশ্চিত করতে চাচ্ছে। ফলে প্রচুর পরিমাণে পাবলিক স্টকের দরকার পড়ছে। পাবলিক স্টকগুলো সংগ্রহ করা হচ্ছে রাইস মিলার ও কৃষকদের কাছ থেকে। অথবা আমদানিকারকদের কাছ থেকে। ফলে যেটি হয়েছে যে বাজারের জন্য স্বাভাবিক সরবরাহের সঙ্গে এই ওএমএস পর্যায়ে সরবরাহের ক্ষেত্রে এক ধরনের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হচ্ছে। এ কারণে বাজারে সরবরাহকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে তার একটি মূল্যবৃদ্ধির কারণ হচ্ছে বলে অনুমান করা যায়, যদিও সরকারের স্টকে যথেষ্ট পরিমাণ মজুদ রয়েছে। আমরা জানি, ১৬ থেকে ১৮ টন চাল গম মজুদ রয়েছে। সেই মজুদেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাজারে মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা। সেই জায়গাটি কিন্তু এখানে দেখার দরকার রয়েছে। আমরা যেটি মনে করি, এসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বাইরে যে ঘটনাগুলো হচ্ছে, সেই বাজারবহির্ভূত মূল্যের কারণগুলো দেখার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই এবং এ ক্ষেত্রে সরকারের কম্পিটিশন কমিশন যেটি রয়েছে, তাদের আরো সক্রিয় হওয়া দরকার।

আমরা জানি, একটি প্রতিযোগিতা কমিশন রয়েছে, যাদের মূল দায়িত্ব হচ্ছে বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা হচ্ছে কি না তা দেখা। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে বড় সাপ্লাইয়ারদের কাছে আমাদের সরকার অথবা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এক ধরনের অসহায় বোধ করে। ফলে অনেক সময় অনেকটা হাত বুলিয়ে মার্কেট সাপ্লাই ঠিক রাখার একটা প্রবণতা তাদের মধ্যে দেখা যায়। বিশ্বের অন্যান্য দেশে অত্যাবশ্যকীয় গুরুত্বপূর্ণ পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কম্পিটিশন কমিশন জোরালো ভূমিকা রেখে থাকে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কম্পিটিশন কমিশনের কোনো ভূমিকা আমরা দেখছি না। অথচ এটি খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখা দরকার। আমরা তাদের কাছে সঠিক ভূমিকা প্রত্যাশা করি।

সমস্যাটি হচ্ছে, এই মূল্যবৃদ্ধির স্বাভাবিক পরিস্থিতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের জন্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, অন্যান্য জ্বালানিজাতীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির বা ইউটিলিটির মূল্যবৃদ্ধির সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত। আমাদের কাছে এটি এই মুহূর্তের জন্য মোটেই কোনো গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত নয় বলে আমরা মনে করি। আমরা শুনতে পাচ্ছি যে ওয়াসার পানির মূল্যবৃদ্ধির একটি আলোচনা চলছে। কিন্তু আমি বিগত ১০ বছরে ওয়াসার হিসাব দেখতে পাচ্ছি, ওয়াসা নিয়মিতভাবে মুনাফা করে আসছে। ওয়াসাকে ভর্তুকি দিতে হয়নি। ওয়াসা গত ১০ বছরে প্রায় এক হাজার ৪৬৯ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। এখন বলা হচ্ছে, ওয়াসা তার খরচ মেটাতে পারছে না। তার জন্য তার বর্ধিত মূল্য দরকার। আমরা মনে করি, এই যুক্তিটি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই মুহূর্তে পানির মূল্যবৃদ্ধির কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। যদি ওয়াসার আসলে বর্ধিত মূল্যের কোনো যৌক্তিক কারণ থাকে, তাহলে বর্ধিত ব্যয়টুকু ওয়াসার বিগত বছরে যে মুনাফা হয়েছে, সেখান থেকে পূরণ করতে পারে। গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি করাও উচিত হবে না। মনে রাখা দরকার, বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যে জ্বালানি ব্যবহৃত হয়, সেই এলএনজির অংশ খুবই অল্প। সুতরাং অল্প পরিমাণ এলএনজির মূল্যবৃদ্ধির দায়টুকু পুরো বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির মধ্যে সম্পৃক্ত করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি বড় মূল্যবৃদ্ধির এক ধরনের চেষ্টা চলছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় ও বিইআরসি এই বিষয়গুলোকে যৌক্তিকভাবে বিবেচনা করবে এবং বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির জায়গা থেকে সরকার সরে আসবে। যদি কোনো কারণে এলএনজির মূল্যের কারণে বাড়তি ভর্তুকির প্রয়োজন হয়, আশা করি সরকার সীমিত সময়ের জন্য আরো কিছুকাল ভর্তুকি অব্যাহত রাখবে। একই সঙ্গে গ্যাসের মূল্যের ক্ষেত্রে এই কথাটি সত্য বলে আমরা মনে করি। আমরা শুনতে পাচ্ছি, বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যয় অ্যাডজাস্ট করতে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয়কে এই বিষয়টিও বিবেচনায় নেওয়া দরকার যে এই বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির যে অগ্রগতি, সেখানে তুলনামূলকভাবে ছোট অগ্রগতি হয়েছে। সেখানে এক ধরনের অব্যবহৃত রেভিনিউ থেকে যাচ্ছে। আমাদের কাছে মনে হয়, বর্ধিত ব্যয় মেটানোর জন্য সেটি কাজে লাগাতে পারে অর্থ মন্ত্রণালয়। সরকার কিন্তু সরকারি ব্যবস্থাপনা থেকে ঋণ নেওয়ার মাত্রা কমিয়ে দিয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলে সরকার ঋণও নিতে পারে। সরকার এরই মধ্যে ইইউ, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং ওআইসি থেকে যে বাজেটটির সাপোর্ট নিয়েছে, সেটি দিয়ে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি সমন্বয়ের সুযোগ রয়েছে। আমরা মনে করি, সরকার সেটি বিবেচনা করবে।

সরকার বিগত সময়ে ব্যবসায়ীদের বিভিন্নভাবে প্রণোদনা প্যাকেজ দিয়ে তাঁদের ব্যবসা বাঁচিয়ে রাখার জন্য যৌক্তিক উদ্যোগ নিয়েছে। এখন সময় এসেছে সাধারণ মানুষ, ভোক্তা, নিম্ন আয়ের মানুষকে বাঁচিয়ে ও টিকিয়ে রাখার। সুতরাং এই সময়ে সরকারের যে বাড়তি ব্যয় হবে, সেটি ভর্তুকিজনিত কারণে হোক, বর্ধিত মূল্য সমন্বয়ের কারণে হোক, সেগুলো সরকারের করা উচিত। এই ব্যয়ভারকে সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত সাধারণ ভোক্তাদের বিবেচনায়। মনে রাখা দরকার, অন্যান্য গোষ্ঠীর হয়তো রাজনৈতিক শক্তি রয়েছে, ব্যবসায়ীদের রাজনৈতিক ভয়েস রয়েছে। হয়তো নিম্ন আয়ের মানুষের সে পরিমাণ

রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর নেই এবং তারা দুর্বল থাকে। এটি যাতে কোনোভাবেই মূল্যবৃদ্ধির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। বরং সরকারের উচিত সাধারণ মানুষের এই দুর্বল অবস্থানটি যাতে কোনোভাবে ব্যবহৃত না হয়, সেই জায়গাটিতে সরকার যেন যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সাধারণ মানুষের মূল্যস্ফীতির অভিঘাতটুকু যাতে নিম্ন পর্যায়ে থাকে, সে জন্য ব্যবস্থা নেয়।

কালের কণ্ঠ

১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২

পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে হবে

মোস্তাফিজুর রহমান

রমজান মাস এগিয়ে এলে নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যায়। এর কারণ কি পণ্যের সংকট নাকি বাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা? এ নিয়ে আজকের পত্রিকার সঙ্গে বিস্তারিত জানিয়েছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শরিফুল ইসলাম।

আজকের পত্রিকা: কী ধরনের প্রস্তুতি থাকলে রমজানে নিত্যপণ্যের দাম স্বাভাবিক থাকবে?

মোস্তাফিজুর রহমান: পণ্যের দাম অনেকটা নির্ভর করে বাজার ব্যবস্থাপনার ওপর। রমজান এলে কিছু কিছু পণ্যের চাহিদা বাড়ে। আমরা যদি সরবরাহ ব্যবস্থাকে ভালো রাখতে পারি, তাহলে সেই চাহিদাটা মূল্যবৃদ্ধির দিকে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমরা দেখি অনেকে এই সুযোগটা নিয়ে মজুতদারি করেন। এ কারণে বাজারে পণ্যের দাম বাড়ে। মজুতদারি যাতে না হয় সেদিকে নজরদারি করতে হবে।

আজকের পত্রিকা: বাজার নজরদারি কি যথাযথভাবে হয়?

মোস্তাফিজুর রহমান: আমাদের বাজার ব্যবস্থাপনায় নজরদারি, খবরদারির ক্ষেত্রে দুর্বলতা থাকে। আমরা দেখি রমজানের সময় বেশ কিছু পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি হয়। সাম্প্রতিককালে যেসব পণ্যের দাম বেড়েছে। রমজানের সময় সেটার ওপর আরও দাম বাড়লে এটা ক্রয়ক্ষমতার ওপর এবং স্থির আয়ের ভোক্তার ওপর বাড়তি মাত্রায় চাপ ফেলবে।

আজকের পত্রিকা: আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লে আমাদের কি কিছু করার থাকে?

মোস্তাফিজুর রহমান: আন্তর্জাতিক বাজার, শুষ্ক এবং এক্সচেঞ্জ রেট বা বিনিময় হারের সমন্বয়ে আমদানি মূল্য নির্ধারিত হয়। আমদানি পর্যায়ে থেকে একটি পণ্য যখন খুচরা পর্যায়ে আসে, তখন মধ্যস্থত্বভোগীরা বাজারের ওপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কোনো সময়

সিডিকেশন করে, কোনো সময় তারা নিজেরাই এগুলো করে। কিন্তু আমরা দেখি যে আমদানি পর্যায়ে দাম এবং ভোক্তা পর্যায়ে দামের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য থাকে। একই রকম দেখি স্থানীয় পণ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদক পর্যায়ে এবং ভোক্তা পর্যায়ে। এ জন্য বাজার ব্যবস্থাপনা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় কিংবা আমদানি যেকোনো পণ্য যখন সড়ক কিংবা নৌপথে আসে, তখন এগুলোতে নানা ধরনের চাঁদাবাজি হয়। এই বিষয়গুলোতেও জিরো টলারেন্স দরকার।

আজকের পত্রিকা: নিয়ন্ত্রণটা কি আমদানির পর্যায়েও দরকার?

মোস্তাফিজুর রহমান: যাঁরা পণ্য আমদানি করছেন, আমরা জানি কত টাকা তাঁদের লেগেছে। অনেক সময় ভোক্তা পর্যায়ে মজুতদারি করে বাজারে সরবরাহ ঠিকমতো করা হয় না। এছাড়া আগাম ব্যবস্থাপনায়ও নজর দেওয়া দরকার। আগাম ব্যবস্থাপনা মানে হলো আমার চাহিদা কত, সরবরাহ কত, আমার চাহিদা বাড়তে পারে কতটুকু— এগুলো একটা বিশ্লেষণেরও জায়গা। আমাদের দেশে এ ধরনের বিশ্লেষণগুলো ঠিকমতো করা হয় না। তারপর হলো সরকারের নিজস্ব স্টক ম্যানেজমেন্ট এবং টিসিবি। এটা দিয়েও তারা বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এখন যেমন সরকার কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য এক কোটি মানুষকে দিতে যাচ্ছে।

আজকের পত্রিকা: এক কোটি মানুষকে কি যথাযথভাবে পণ্য দেওয়া সম্ভব হবে?

মোস্তাফিজুর রহমান: আমার মনে হয় সম্ভব হবে। করোনার আগে হলে এটা বলতাম না। করোনার সময় কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয়ভাবে একটা ডেটাবেইস হয়েছে। এটাকে ব্যবহার করা যায়। ওই কার্যক্রমটা ভালোভাবে করলে বাজারে চাহিদাটা কমে আসবে। তখন বাজার ব্যবস্থাপনায় চাহিদা এবং সরবরাহ সমন্বয় করাটা আরও সহজ হবে।

আজকের পত্রিকা: মূল্যস্ফীতি যে হারে বাড়ছে, তাতে ভবিষ্যতে আমাদের জন্য কী ধরনের চাপ হতে পারে?

মোস্তাফিজুর রহমান: আমরা দেখছি টিবিসির পণ্য নিতে অনেক নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত লাইনে দাঁড়াচ্ছেন। করোনার একটা অভিঘাত পড়েছে শ্রমবাজার এবং আয়ের উপর। অর্থনীতি কিছুটা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু তারপরেও এর প্রলম্বিত ছায়া অর্থনীতিতে আছে। আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, আমরা মূল্যস্ফীতি তুলনা করি আগের থেকে কত বাড়ল সেটা বিবেচনা করে। কিন্তু আগেরটাও তো অনেক বেড়ে আছে। তার ওপর আবার বাড়ছে। অর্থাৎ ১০০ টাকার পণ্য ৫ শতাংশ বেড়ে ১০৫ টাকা হয়েছে। তারপর আমি বললাম ৪ শতাংশ বেড়েছে, মূল্যস্ফীতি তো কমেছে। কিন্তু সেটা তো ১০৫ টাকার ওপর ৪ শতাংশ বেড়ে ১০৮ টাকা হলো। সুতরাং আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এভাবে কিন্তু জিনিসটার দাম বাড়ছে এবং স্বল্প আয়, স্থির আয়ের যাঁরা, তাঁদের ওপরে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। তাই আমাদের এই মূল্যস্ফীতিটা যাতে না বাড়ে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

আজকের পত্রিকা

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২

আমদানিতে শুল্ক কমিয়ে বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বেশ কয়েক মাস ধরে বাজারে নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় জনজীবনে দুর্বিষহ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য এটি ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। গত মাসের সরকারি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, মাল্টিস্টফীতি ৬ শতাংশের কাছাকাছি চলে এসেছে। আগামী মাসে এটি হয়তো আরও বাড়বে। সম্প্রতি চলমান রাশিয়া-ইউক্রেনের যুদ্ধ বাজারে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। আমরা দেখছি, রাশিয়ার ওপর বিভিন্ন রাষ্ট্র বাণিজ্যিক অবরোধ আরোপ করেছে। এতে আমদানি-রপ্তানি ব্যাহত হচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক কারণেই বাজারে পড়বে। যুদ্ধ হয়তো শিগগিরই থেমে যাবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা সহজে উঠবে বলে মনে হয় না। ফলে আগামী দিনগুলোতে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য সরবরাহে সংকট তৈরি হবে। যার মূল্য আমাদের দিতে হবে।

রাশিয়া থেকে বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণে সার আমদানি করে। এই সংকটকালে যদি সার আমদানি বন্ধ থাকে, তাহলে দেশে সারের সংকট তৈরি হবে। এমনকি সারের দাম বেড়ে যাবে। এর ফলে কৃষিতে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাবে। এর প্রভাব বাজারে পড়বে। বেশি দাম দিয়ে সার কিনে ফসল উৎপাদন করলে সেই ফসল যখন বাজারজাত করা হবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই বাজারে পণ্যের দাম বাড়বে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীরা বুঁকি এড়াতে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে পণ্য আমদানি কমিয়ে দিতে পারে। এর ফলে বাজারে খাদ্য সরবরাহ কমে যাবে। তখন পর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহ পাওয়া যাবে না। এ সময় খাদ্য ঘাটতির আশঙ্কা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে মজুত করার প্রবণতা বাড়বে। তারা আমদানি কমিয়ে দিয়ে মজুতের দিকে মনোযোগী হবে। এসব কারণে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি হবে। বাজারে যদি পর্যাপ্ত পণ্য সরবরাহ না থাকে তাহলে স্বাভাবিক কারণেই দাম বাড়বে। অর্থনীতির ভাষায় সবাই জানেন, চাহিদার তুলনায় জোগান না এলে বাজার উর্ধ্বমুখী হয়।

কয়েক সপ্তাহ পর রমজান মাস। আমরা অতীতে দেখেছি, রমজান মাসে সব ধরনের নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে যায়। এ সময় খাদ্যপণ্যের চাহিদা বাড়ে। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে বলে মনে করি না। রমজান সামনে রেখে ভোক্তাদের সামনে নতুন খড়্গ আসছে। তাদের আবার বর্ধিত বাজারমূল্যের জাঁতাকলে পিষ্ট হতে হবে। বাজারে মূল্যবৃদ্ধির জন্য তিনটি কারণকে চিহ্নিত করা যায়। বৈশ্বিক সীমাবদ্ধতা, উচ্চমূল্যের কারণে পণ্য আমদানিতে ব্যবসায়ীদের ঝুঁকি না নেওয়ার মানসিকতা ও পণ্য মজুত রেখে বাড়তি লাভের প্রবণতা। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারি চলছে। এ সময় দীর্ঘদিন লকডাউনের কারণে স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ থাকায় উৎপাদন কাজ কিছুটা ব্যাহত হয়েছে- এটা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। যদিও মহামারির পর আবার বিশ্ব ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। এখানে আবার নতুন সংকট হয়ে সামনে এসেছে রাশিয়া-ইউক্রেনের অনাকাঙ্ক্ষিত রক্তপাত।

দাম বাড়ার পরের কারণ দুটি আমাদের মানসিকতার কারণে হচ্ছে এবং এটি সমাধানযোগ্য। বিশেষ করে শেষ কারণটি অর্থাৎ পণ্য মজুত করে বাজারে সংকট তৈরি করে দাম বাড়িয়ে দেওয়ার মানসিকতা থেকে ব্যবসায়ীদের বের হয়ে আসতে হবে। এ জন্য তদারকি বাড়াতে হবে। যাতে কোনো অসৎ ব্যবসায়ী চক্র এ কাজটি করতে না পারে, সে জন্য সরকারকে তথা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে তদারকি করতে হবে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার পাশাপাশি গোয়েন্দা নজরদারি বাড়াতে হবে। তবে সরকারের একার পক্ষে এ চক্রকে প্রতিহত করা সম্ভব হবে না। এ জন্য অন্যান্য ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়ী সংগঠনকে এগিয়ে আসতে হবে। ব্যবসায়ীদের নিজেদের মধ্যে যদি নৈতিকতাবোধ জাগ্রত না হয়, তাহলে এটা ঠেকানো অত সহজ হবে না। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে, যুদ্ধবিক্ষুব্ধ বিশ্বে ব্যবসায়ীরা ঝুঁকি নিয়ে লোকসানের আশঙ্কায় আমদানি করতে চাইবে না। এ অবস্থায় সরকার অর্থায়ন করে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আমদানি সচল রাখতে পারে। তাহলে আর ব্যবসায়ীরা লাভ-লোকসানের ঝুঁকিতে পড়বে না।

বাজারের ঊর্ধ্বগতি ঠেকাতে করণীয় হিসেবে আমার সুপারিশ হচ্ছে, পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রেখে বাজারে অস্থিরতা বন্ধ করতে হবে। বেসরকারি আমদানিকারকদের আমদানিতে উৎসাহ দিতে হবে। সরকারি সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে। আমরা দেখি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় টিসিবির মাধ্যমে বিভিন্ন কোম্পানি থেকে টেন্ডারের মাধ্যমে পণ্য কিনে খোলাবাজারে বিক্রি করছে। এর পাশাপাশি সরকারের উচিত ব্যবসায়ীদের টাকা বিনিয়োগ করে তাদের মাধ্যমে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানির ব্যবস্থা করা। এতে ব্যবসায়ীরা স্বস্তি পাবে। তাদের ঝুঁকি কমবে। এক কথায় সরকার যদি লাভ-ক্ষতির হিসাব না করে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে পণ্য আমদানি করে তাহলে বাজার স্থিতিশীল থাকবে।

দ্রব্যমূল্য কমা আর বাজার স্থিতিশীল রাখা এক জিনিস নয়। বাজারে যদি পর্যাপ্ত পণ্য মজুত না থাকে তাহলে বাজারে অস্থিতিশীলতা তৈরি হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে যখন পণ্যের দাম বেশি, তখন আমাদের বাজারে দাম কমার আশা করা যায় না। কিন্তু পর্যাপ্ত আমদানি করে বাজারে ঘাটতি পূরণ করে রাখতে হবে।

সম্প্রতি সয়াবিন তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। সয়াবিন তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে বেড়েছে বলেই আমাদের দেশীয় বাজারকে সমন্বয় করতে হচ্ছে। আমরা তো এ তেল উৎপাদন করে চাহিদা মেটাতে পারছি না। যেহেতু বিদেশ থেকে কিনে এনে আমাদের চলতে হচ্ছে, তাই কেনা দামের সঙ্গে সমন্বয়ের বিকল্প নেই। তবে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে নিম্ন আয়ের মানুষের জীবনধারণে কষ্ট হচ্ছে- এ কথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তাদের কষ্ট লাঘবে সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে।

করোনার সময় আমরা দেখেছি, সরকার ১০ লাখ পরিবারের মাঝে ২ হাজার ৫০০ টাকা করে প্রণোদনা দিয়েছে। এই প্রণোদনা বা ঈদ উপহার আবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আসন্ন রমজানে ৬টি পণ্য খোলাবাজারে (ওএমএস) ন্যায্যমূল্যে বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। রমজান পর্যন্ত অপেক্ষা না করে যত দ্রুত সম্ভব এসব পণ্য বাজারে বিক্রি শুরু করে দিয়ে নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরিয়ে দিতে পারে সরকার। প্রয়োজনে ছোলা ও খেজুর বাদে অন্য ৪টি পণ্য তেল, চিনি, ডাল ও পেঁয়াজ এখনই বিক্রি শুরু করা যেতে পারে।

এ মুহূর্তে কোনোভাবেই জ্বালানির দাম আর বৃদ্ধি করা যাবে না। বিশেষ করে জ্বালানি তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে জনসাধারণের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করা যাবে না। এসব জিনিসের দাম বাড়ালে মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়বে। ফলে সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয় আরও কমবে। সরকারের ঘাটতি মেটাতে গিয়ে এই বাজারমূল্যের সময় জ্বালানি তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির দাম বাড়ালে জনসাধারণ সেই চাপ কাটিয়ে উঠতে পারবে না।

জানি সরকারকে নানা খাতে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। সেই অর্থ সমন্বয় করতে গিয়ে কোনোভাবেই উপরোল্লিখিত জিনিসের দাম বাড়ানো যাবে না। সরকার প্রয়োজনবোধ করলে চাপ সামলাতে আন্তর্জাতিক খাত থেকে স্বল্পমেয়াদে ঋণ নিতে পারে। ২০০৭ সালে সরকার ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে ২৫ মিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছিল। ২০১৮ সালেও ১ বিলিয়ন ডলার ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এ অবস্থায়ও সরকার এ ধরনের ঋণ নিয়ে হলেও সাধারণ মানুষকে বাড়তি চাপ থেকে নিরাপদ রাখতে পারে। বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ছাড়াও সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত থেকে এ ধরনের স্বল্পমেয়াদি ঋণ নিয়ে পরে দীর্ঘমেয়াদে সমাধান আনা যেতে পারে।

বাজার স্বাভাবিক রাখার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক কমিটি করা যেতে পারে। তারা নিয়মিত বাজার তদারকি করে মূল্যায়ন দেবে। পররাষ্ট্র, বাণিজ্য, খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয় সমন্বিতভাবে এই তদারকি কমিটি করতে পারে। কারণ আন্তর্জাতিক বাজার না বুঝে দেশীয় বাজার নিয়ে কাজ করে পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক করা যাবে না।

আরেকটি কথা বলে শেষ করতে চাই। পণ্য আমদানিতে শুল্ক কমিয়ে বাজার দর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এতে বরং ব্যবসায়ীদের পকেটে অতিরিক্ত টাকা যাবে। কিন্তু সাধারণ ভোক্তারা

লাভবান হবে না। বাজারে পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক করা গেলেই সাধারণ মানুষ সুফল পাবে। তবে আপাতত দাম কমার সম্ভাবনা না থাকায় নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য প্রণোদনার বিকল্প দেখছি না। একই সঙ্গে খোলাবাজারে দ্রুত পণ্য বিক্রি শুরু করে দেওয়া উচিত।

সমকাল

৯ মার্চ ২০২২

রপ্তানি ধরে রাখতে দেশকে ব্র্যান্ডিং করতে হবে

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

কয়েক বছর ধরে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যযুদ্ধ চলছে। বর্তমানে রাশিয়ার সঙ্গে চীনের সখ্যের কারণে ব্যবসাবাণিজ্যে অনিশ্চয়তা বেড়েছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের ক্রয়াদেশ চীন থেকে সরিয়ে আনার প্রবণতা আগামী দিনেও থাকবে। অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে মিয়ানমার ও শ্রীলঙ্কা থেকেও ক্রেতারা ক্রয়াদেশ সরাবে।

প্রতিযোগী দেশগুলোতে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার এই সুযোগ বাংলাদেশের রপ্তানি খাত দু'ভাবে নিতে পারে। প্রথমত, সীমিতভাবে ক্রয়াদেশ বেশি নিতে পারেন উদ্যোক্তারা। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘ মেয়াদে বিদেশি বিনিয়োগকে আকর্ষণ করা। এ জন্য আগামী দিনের পণ্যের উৎসের হাব হিসেবে বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং করতে হবে। কারণ, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, পেট্রোকেমিক্যাল, প্লাস্টিক, চামড়া, হালকা প্রকৌশল, সিরামিক ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগের বড় সুযোগ রয়েছে।

রপ্তানি ধরে রাখতে আগামী দিনে জ্বালানি-বিদ্যুৎ বড় চ্যালেঞ্জ হবে। এমনিতেই দেশে গ্যাসের ঘাটতি ছিল। গ্যাস-সংকটের কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদনও ব্যাহত হচ্ছে। আগামী আরও কিছু দিন গ্যাস-সংকট অব্যাহত থাকবে। তাই পোশাক তৈরিতে প্রয়োজনীয় কাপড়ের একটি অংশ আমদানি করে চাহিদা মেটানোর প্রস্তুতি উদ্যোক্তাদের থাকতে হবে।

প্রথম আলো

১০ মে ২০২২

ঢাকা-মস্কো সম্পর্কের ৫০ বছর – মুক্তিযুদ্ধ থেকে রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সম্পর্কের উত্থানে আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক রাজনীতির প্রভাব

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারত প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করলেও পরোক্ষভাবে সর্বাঙ্গিক ভূমিকা রেখেছিল তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৭১ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সহায়তা না পেলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন কষ্টকর হত। বর্তমানে বাংলাদেশ-রাশিয়া সম্পর্ক বলতে মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এবং রুশ ফেডারেশনের মধ্যে দ্বিপাক্ষীয় সম্পর্ককে বোঝায়। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায়, আত্মপ্রকাশ করে রাশিয়ান ফেডারেশন। বাংলাদেশ তখন রাশিয়ান ফেডারেশনকে স্বীকৃতি দেয়। ওই সময় থেকে সম্পর্ক কিছুটা ভালো হতে শুরু করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর বিশ্ব-রাজনীতির ধরণে কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়। সেসময় দেখা যায়, বৃহৎ শক্তির দেশগুলো রাজনৈতিক প্রভাব বলয় তৈরি ও বজায় রাখার জন্য যুদ্ধ বা সংঘাতের পথে না হেটে অর্থনৈতিক প্রভাব তৈরির মাধ্যমে কাজটি করতে শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া-চীন এই দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্কে টানাপোড়েন থাকলেও এরা নিজেদের মধ্যেই সবচেয়ে বড় বাণিজ্য করে। সুতরাং বাংলাদেশকে নিজের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দিকে মনোযোগ দিকে সম্পর্ক রাখতে হবে। যেকোনো সম্ভাবনা কাজে লাগানোর জন্য প্রজ্ঞা এবং বিবেচনা সঠিক হতে হয়, সেটি করা গেলে বাংলাদেশ উপকৃত হবে।

অর্থনীতি বাণিজ্য বিনিয়োগ

রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের এখনকার সম্পর্কের মূল ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ওপর। রাশিয়া বাংলাদেশকে মূলত তিনটি দিকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে, যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করছে। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কে মূলত তিনটি ভিত্তি এখন, প্রথমটি ভৌত অবকাঠামো খাত। এর মধ্যে পড়বে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

খাতে সাহায্য। দ্বিতীয়ত মানবসম্পদ উন্নয়নে কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

পাবনার রূপপুরে নির্মিত হচ্ছে দেশের একমাত্র পারমানবিক বিদ্যুতকেন্দ্র, যার নির্মাণে বড় অংশের অর্থটি এসেছে রাশিয়ার দেয়া ঋণ থেকে এবং এটি নির্মাণ করছে রুশ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠান, রোসাটম। ২০২৪ সালে নির্মাণ শেষে সেখান থেকে উৎপাদিত হবে ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। ইতিমধ্যে ষোড়শালে সাড়ে চারশো মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ-কেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছে রাশিয়া। এদিকে বাংলাদেশের সাথে রাশিয়ার সম্পর্ক পাঁচ দশকের হলেও এখনো দুই দেশের আমদানি রপ্তানি অনেক বেশি নয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ রাশিয়ায় প্রায় ৪৯ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে। একই বছর রাশিয়া থেকে ৭৯ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য আমদানি করেছে।

বিবিসি বাংলা

২৫ জানুয়ারি ২০২২

পণ্যের উচ্চমূল্যের প্রভাব সামাল দিতে প্রয়োজন সামগ্রিক পদক্ষেপ

ফাহিমদা খাতুন

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য ক্রমে আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছে। সারা বিশ্বের পণ্যবাজারই বর্তমানে অস্থিতিশীল। ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উচ্চচাহিদা, কোভিড-পরবর্তী সময়ে জাহাজ, বিমান ও পণ্য পরিবহনের ভাড়া অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যাওয়ার কারণে পণ্য ও সেবার মূল্য পৃথিবীব্যাপী বেড়ে গেছে।

বাংলাদেশের পণ্যের মূল্য বর্তমানে লাগামহীনভাবে বেড়ে চলেছে। বস্তুত কোভিড-১৯ অতিমারী শুরু হওয়ার পর গত ২০২০ সালের জুন থেকেই মূল্যস্ফীতির চাপ বাড়ছে। তার ওপর এ বছরের ফেব্রুয়ারির শেষে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে পণ্যের মূল্য আরেক দফা বেড়ে যায়। বাংলাদেশ যেহেতু বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেই সঙ্গে বাংলাদেশ বহু পণ্য আমদানি করে, তাই আমাদের বাজারেও খুব দ্রুত উচ্চমূল্যের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে।

আমরা বিশ্ববাজার থেকে জ্বালানি তেল ছাড়াও ভোজ্যতেল, চিনি, গমসহ অন্যান্য খাদ্য এবং উৎপাদনের জন্য মধ্যবর্তী পণ্য ও কাঁচামাল আমদানি করে থাকি। যদিও সরকার কিছু পণ্যের ওপর থেকে অগ্রিম আয়কর তুলে নিয়েছে কিন্তু তার প্রভাব বাজারে খুব একটা দেখা যায়নি।

এ রকম একটি পরিস্থিতিতে ভারত গম রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। যদিও ভারত গম রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে কিন্তু তারা এটিও বলেছে যে প্রতিবেশী এবং দুর্বল বা ভঙ্গুর দেশগুলোর জন্য তাদের দরজা খোলা থাকবে। তাছাড়া আমদানির জন্য যে ঋণপত্র খোলা হয়েছে তার অধীনে আমদানি করা যাবে। তবে গমের মূল্যের ওপর এরই মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। কেননা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর ওই দুটি দেশ থেকে গম আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশ গমের জন্য এখন মূলত ভারতের ওপর নির্ভর করছে। মোট গম আমদানির প্রায় ৬৩ শতাংশই ভারত থেকে হচ্ছে। আর বাংলাদেশের মোট গমের

চাহিদার ৮৬ শতাংশই আমদানি করতে হয়। সুতরাং বাংলাদেশের জন্য গম রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকলে শুধু গমের মূল্যই বাড়বে না, চাল ও অন্যান্য পণ্যের মূল্যের ওপরও তার প্রভাব পড়বে। এরই মধ্যে চালের মূল্য বেড়ে গিয়েছে।

এ অবস্থায় পণ্যের উচ্চমূল্য এবং মূল্যক্ষীতির চাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারকে খুব দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। বিকল্প উৎস থেকে গম আমদানির ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। এছাড়া শুধু ভোজ্যতেল বা গম নয়, বাজারে পণ্যের উচ্চমূল্যের বিষয়টি একটি সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এটিকে খণ্ডিত নীতি দিয়ে সমাধান করা যাবে না। কেননা এটি মনে রাখতে হবে যে মূল্যক্ষীতির চাপ আরো কিছু সময় থাকবে। এটি সারা পৃথিবীতেই অনুভূত হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে দু'টি বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রথমত, বাজারে পণ্যের সরবরাহ বাড়তে হবে। এর জন্য দেশের ভেতরে উৎপাদিত পণ্য এবং আমদানীকৃত পণ্যের সংগ্রহ বাড়তে হবে। দ্বিতীয়ত, দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের সহায়তা দিতে হবে যাতে তারা বাজার থেকে পণ্য কিনতে পারে। তাদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে। এছাড়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের প্রণোদনা দিতে হবে, যাতে তাদের ব্যবসা ঘুরে দাঁড়াতে পারে।

তবে প্রশ্ন হচ্ছে এ কার্যক্রমগুলোর জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। সেই অর্থ কোথেকে আসবে? তাই সরকারকে কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে। প্রথমত, আমাদের রাজস্ব আহরণের পরিমাণ খুবই কম। বর্তমানে আমাদের কর-জিডিপি হার মাত্র ৭.৭ শতাংশ, যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে নিম্নতম। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সঞ্চালন না বাড়ালে আমরা উন্নয়ন কার্যক্রমে এবং সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অর্থ বরাদ্দ বাড়তে পারব না।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে সুশাসন। সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়তে হবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ, প্রকল্প বাস্তবায়নে অপচয় রোধ ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। সরকার এরই মধ্যে ব্যয় কমানোর ব্যাপারে কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে। সেগুলো ভালো উদ্যোগ। কিন্তু আরো সাশ্রয়ের সুযোগ রয়েছে।

তৃতীয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের ক্ষেত্রেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যেহেতু আমদানি ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে এবং রফতানি আয় সে তুলনায় বাড়ছে না—রেমিট্যান্স প্রবাহও বাড়ছে না, ফলে চলতি হিসাবে বিরাট ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। এটি চলতে থাকলে তা বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে চাপ সৃষ্টি করবে। এতে টাকার মান আরো কমবে এবং মূল্যক্ষীতিও বাড়বে।

সুতরাং মূল্যস্ফীতি কমানোর বিষয়টি অনেক পদক্ষেপের সঙ্গে জড়িত। এটি পূর্ণাঙ্গ নীতি পদক্ষেপের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব সেটি করতে হবে। কেননা দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির চাপ অব্যাহত থাকলে তা সমাজে আরো বৈষম্য বাড়াবে, যেটি মোটেই কাম্য নয়।

বণিক বার্তা

২২ মে ২০২২

বাজার নিয়ে সময়ে এক ফোঁড় দিন

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ক্রমাগত উর্ধ্বগতির কারণে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী শুধু নয়; স্বল্প আয়ের তথা নিম্নবিত্তরাও কষ্টে রয়েছে। এটা ঠিক, স্বল্প আয়ের এক কোটি মানুষকে টিসিবির মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহ করতে শুরু করেছিল সরকার; কিন্তু সেটিও এখন বন্ধ। যদিও ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের কথা রয়েছে। আমি বলব, সেজন্য খোলাবাজারে ট্রাকসেল বন্ধ করার যুক্তি নেই; বরং ওএমএস কার্যক্রমটি দ্রুত চালু করা উচিত। খোলাবাজারে বরং আরও বেশি সংখ্যক পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। চাল, ডাল, তেল, চিনি, পেঁয়াজের পাশাপাশি অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যও ফ্যামিলি কার্ডের আওতায় বিক্রি করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সরকার দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষের তালিকা সংগ্রহে বিভিন্ন ডাটাবেজ থেকে তথ্য নিতে পারে।

আমরা জানি, এ মাসেই জাতীয় সংসদে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন করা হবে। বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের আওতায় আরও বেশি মানুষকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা উচিত। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করা মানুষের পাশাপাশি স্বল্প আয়ের মানুষের হিসাব করলে সংখ্যা হিসেবে এক কোটি যথেষ্ট নয়। তাই বাজেটে আরও বেশি নিম্নবিত্তকে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে আনতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। করমুক্ত আয়সীমাও বাড়ানো দরকার। যেটা এখন আড়াই লাখ টাকা আছে, এটাকে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে বছরে দু'বার বাজার উত্তাপ ছড়াতে পারে বৈকি— রমজান ও বাজেট ঘোষণার মাসে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে প্রায় সারা বছরই সব পণ্যেরই দাম বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে দেখলাম বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছেন, ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস করা ঠিক হয়নি। এখানে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বিষয়টি মুখ্য নয়। যেটি জরুরি তা হলো বাজারে তদারকি বাড়ানো, যাতে ব্যবসায়ীরা পণ্য মজুত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে না পারে সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

এদিকে ডলারের দাম বেড়ে গেছে। এ কারণে বিশ্ববাজার থেকে আমদানি খরচ বাড়বে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম সামান্য কমলেও ডলারের দাম বাড়ায় বাজারে খুব একটা প্রভাব পড়বে না। বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে সরকার গাড়ি, ইলেকট্রনিক্স পণ্য, ফলসহ বিলাসবহুল পণ্য আমদানিকে নিরুৎসাহিত করতে এসব পণ্য আমদানিতে অতিরিক্ত কর আরোপ করেছে। আমি মনে করি, এটি সময়োপযোগী ও সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু যদি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানিতে অতিরিক্ত কর বা শুল্ক আরোপ করা হয় তাহলে এর নেতিবাচক প্রভাব বাজারে পড়বে। তাই চাল, ডাল, পেঁয়াজ, চিনি, গম, ভুট্টা, ভোজ্যতেল আমদানিতে অতিরিক্ত কর আরোপ করা যাবে না।

মনে রাখতে হবে, করোনার কারণে বিশ্ব অর্থনীতি ধাক্কা খেয়েছে। যখন সেই ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চলাছিল, তখন ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে প্রভাব পড়েছে। এ ছাড়া রয়েছে খাদ্যপণ্য প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এই মুহূর্তে বিশ্বব্যাপী এক ধরনের উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে। আইএলওর তথ্যমতে, চলতি বছরের মার্চ মাসে মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ২ শতাংশ, তার আগের মাসে ছিল ৭ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ২০২১ সালের ডিসেম্বরে ছিল ৬ দশমিক ৪ শতাংশ। তার মানে, মূল্যস্ফীতি প্রায় তিন গুণ। দুর্ভাগ্যজনক হলো, সরকারি হিসাবের সঙ্গে বাস্তবতার ফারাক আরও বেশি। সরকারি পরিসংখ্যানে মূল্যস্ফীতি সিঙ্গেল ডিজিটে থাকলেও গবেষকদের তথ্য-উপাত্তে দেখা যায়, এটি ডাবল ডিজিটে প্রবেশ করেছে।

আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের ব্যবধান যখন দিন দিন বাড়তে থাকে, তখন মানুষ বিভিন্নভাবে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। দীর্ঘমেয়াদি এ অবস্থা চলতে থাকলে এবং আয় না বাড়লে তখন অনেকে সঞ্চয় ভেঙে সংসার চালান। এটা সবাই পারেন না; যাদের সঞ্চয় থাকে তাঁরা এটা করে সাময়িক পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। এভাবে সঞ্চয় ভেঙে যেতে থাকলে তার নেতিবাচক প্রভাব জাতীয় অর্থনীতিতেও পড়ে। সঞ্চয় কমে যাওয়ার চিত্র সরকারের পরিসংখ্যানেও দেখা যায়। যাঁদের সঞ্চয় নেই বা সঞ্চয় শেষ হয়ে যায় তাঁরা ধার বা ঋণ করে চলে। যখন সেই পথও বন্ধ হয়ে যায়, তখন বেঁচে থাকার যুদ্ধে নামেন। পুষ্টিকর খাবার থেকে সরে আসেন। ফলে এসব মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভোগেন। আক্রান্ত হতে থাকেন নানা ধরনের রোগ ব্যাধিতে। দেখা যাচ্ছে আগে যাঁরা সপ্তাহে ৩ দিন আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য বিকল্প হিসেবে ডিম খেতেন, তাঁরা ডিমের দাম বাড়ার ফলে এটা বন্ধ করে দিয়েছেন। আমিষ বাদ দিয়েও যখন সংসার চালাতে হিমশিম খান তখন এসব মানুষ খাবার কমিয়ে দেন। দেখা যায় তিন বেলার জায়গায় দুই বেলা খেয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেন। এভাবে খাবার নিয়ন্ত্রণ করে চলতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে এক পর্যায়ে হতাশা পেয়ে বসে অনেক দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষকে। এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে সামাজিক নিরাপত্তাবলয় জোরদারের বিকল্প নেই।

আর বাজারে নজরদারি ও তদারকির বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে পণ্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণের চেয়ে জরুরি বাজারে সরবরাহ নিশ্চিত করা। খেয়াল রাখতে হবে পণ্য যেন বাজার থেকে উধাও হয়ে না যায়। সরবরাহ না থাকলেই বড় ধরনের সংকট তৈরি হয়। সম্প্রতি ভোজ্যতেল উধাও

হয়ে যাওয়ার পর ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তর ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সয়াবিন তেল উদ্ধার করে। যাদের কাছ থেকে এসব তেল উদ্ধার করা হয় তারা কেউ অনুমোদিত ডিলার নয়। তার মানে বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে পরে বেশি দামে বিক্রির অসৎ উদ্দেশ্যে এসব তেল মজুত করে রেখেছিল খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ীরা।

ভোজ্যতেলের পর এখন আবার চালের বাজারেও সেই সংকট দেখতে পাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী, মিলার ও খুচরা বাজারে কোনো কারসাজি আছে কিনা— সেটা খুঁজে বের করতে হবে। যদি চালের বাজারে সরবরাহ ঠিক রাখা না যায় তাহলে চাহিদার তুলনায় জোগান সীমিত অজুহাতে চালের দাম বেড়ে যাবে। যদিও সরকার এরই মধ্যে অবৈধ মজুতদারদের বিরুদ্ধে অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একই সঙ্গে বাজার নিয়ন্ত্রণে সিভিকিটের ওপর নজরদারি বাড়তে হবে। খুচরা বাজার নিয়মিত তদারকি করতে হবে। মাঠ পর্যায়ে বড় বড় কৃষক ও রাইস মিলারদের দিকে নজরদারি বাড়িয়ে দিতে হবে। যেন তারা গুদামজাত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে না পারে। কাজগুলো অত সহজ নয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা ও দক্ষতা থাকলে অসম্ভবও হতে পারে না।

বাজার নিয়ে সময়ে এক ফোঁড় দিতে না পারলে অসময়ে দশ ফোঁড় দিয়েও লাভ হবে না।

সমকাল

২ জুন ২০২২

রপ্তানিতে নগদ সহায়তা পুনর্গঠন করা দরকার

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

দেশের রপ্তানি খাত ইতিমধ্যে চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। এ বছরের অর্জন ইতিবাচক। তবে সামনের দিনে অনিশ্চয়তার ইঙ্গিত আছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) মূল্যস্ফীতি বেড়ে গেছে। তাতে রপ্তানি আয় কমে যাওয়ার শঙ্কা আছে। তবে কমলেও অন্যান্য প্রতিযোগী দেশের চেয়ে ভালো থাকবে বলা যায়। মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার অবমূল্যায়নের কারণে রপ্তানিকারকেরা সুবিধা পাচ্ছেন। তাঁরা কম দাম পাওয়ার যে অভিযোগ করছিলেন, সেটি ডলারের দাম বাড়ায় পুষিয়ে নিতে পারছেন। এই সুবিধা আরও কিছুদিন থাকবে। তাতে প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরা ক্রেতাদের কম দাম অফার করতে পারবেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে তুলাবিহীন (নন-কটন) পোশাক রপ্তানি বাড়ানোর শক্তিশালী উদ্যোগ নেওয়ার কথা চিন্তা করতে পারে সরকার। এখন তৈরি পোশাক রপ্তানিতে যে ১ শতাংশ বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া হয়, তা নন-কটন পোশাকে দিলে রপ্তানিকারকেরা উৎসাহ পাবেন। এভাবে নগদ সহায়তা পুনর্গঠন করা দরকার। রপ্তানি খাতের দুই-তৃতীয়াংশ সুবিধা পায় পোশাকশিল্প। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) উচিত ট্যারিফ কমিশনের মাধ্যমে নগদ সহায়তা রপ্তানি বৃদ্ধিতে কতটা সহায়ক হচ্ছে, তা পুনর্মূল্যায়ন করে উদীয়মান খাতে সহায়তা দেওয়া।

রপ্তানি বাড়াতে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগকে (এফডিআই) উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা করসংক্রান্ত বাধার কথা বলেন। লাইসেন্স পাওয়া নিয়ে ভোগান্তি আছে। অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তব্যে এই বিষয়গুলো তুলে ধরে তা সহজ করার ঘোষণা দিতে পারেন। পরে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

প্রথম আলো

৮ জুন ২০২২

বহুপক্ষীয় ব্যবস্থায় আস্থা দেখা গেল

মোস্তাফিজুর রহমান

এবার ডব্লিউটিওর মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে ঐকমত্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো— এটাই সবচেয়ে বড় অর্জন। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, জি-২০ দেশসমূহের মধ্যে অনৈক্য, মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের আগের আলোচনায় বিভিন্ন জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই বহুপক্ষীয় বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রতি আস্থা ফিরে আসার লক্ষণ।

মনে রাখা দরকার, ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত ১০ম মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের পর এই প্রথম সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। বাংলাদেশসহ এলডিসিভুক্ত দেশগুলো এলডিসি থেকে উত্তরণ টেকসই করতে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সুবিধা ৬-৯ বছর সম্প্রসারণের দাবি উত্থাপন করেছিল। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত অর্থাৎ কত দিন এই সুবিধা দেওয়া হবে, সে বিষয়ে ঐকমত্য না হলেও এলডিসি দেশগুলোর যে এই সুবিধা প্রয়োজন, তা মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে স্বীকৃত হয়েছে।

বলা হয়েছে, টেকসই উন্নয়নের যাত্রাপথে এলডিসির অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে এবং ডব্লিউটিওর সদস্য দেশগুলো এ বিষয়ে তাদের সহায়তা করবে। আশা করা যায়, এর পরের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে অন্তর্বর্তীকালীন আলোচনার প্রেক্ষাপটে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত হবে।

মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশকে তিনটি পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে হবে। সেগুলো হলো, এলডিসি হিসেবে প্রাপ্য সুবিধা, যা চলমান আছে; এলডিসি উত্তরণ টেকসই করতে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে যেসব সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হতে হবে— সেগুলো।

এ ছাড়া মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে আরও বেশ কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছে, যেগুলো বাংলাদেশকে বিবেচনায় নিতে হবে। যেমন, ই-কমার্সের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক আরোপের এখতিয়ার, যা ১৩তম বৈঠকের পর চূড়ান্ত হবে।

প্রথম আলো

১৯ জুন ২০২২

পদ্মা সেতু হবে অর্থনৈতিক করিডরের মূল কেন্দ্রবিন্দু

মোস্তাফিজুর রহমান

একটি সেতু নির্মিত হয়েছে, কিন্তু বিষয়টি শুধু সেতু নিয়ে নয়, এর সঙ্গে একটি অঙ্গীকার ও স্বপ্নও বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে। ২৫ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু উদ্বোধন করছেন। এই দিন বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পথপরিক্রমায় একটি বিশেষ দিন এবং জাতীয় আত্মমর্যাদার একটি ব্যতিক্রমী মাইলফলক। পদ্মা সেতু নির্মাণের মধ্য দিয়ে দেশের শেষ গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক বাধা দূর হবে এবং একটি সমন্বিত ও একীভূত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ উন্মোচিত হবে, যা বাংলাদেশের শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নেরও অন্যতম পূর্বশর্ত।

ত্রিমাত্রিক এ সেতুর বাস্তবায়ন-নকশা থেকে শুরু করে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, সেতু নির্মাণ, নদীশাসন ও দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ— অনেক দিক থেকেই পদ্মা সেতু পাইওনিয়ারের দাবিদার; বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান সক্ষমতার দৃশ্যমান প্রতীক। নিজস্ব অর্থায়নে এ সেতু নির্মাণের চ্যালেঞ্জ শুধু নয়, এ সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত ছিল বহুমাত্রিক ও বিভিন্নমুখী ঝুঁকি। ২০১২ সালে যখন এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখন বাংলাদেশের জিডিপি ছিল ১৩৩ বিলিয়ন ডলার, এখনকার তুলনায় এক-তৃতীয়াংশের কম। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল মাত্র ১০ বিলিয়ন ডলার, বর্তমানের এক-চতুর্থাংশ, রপ্তানি ও রেমিট্যান্স থেকে প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রার আয় ছিল এখনকার তুলনায় অর্ধেকের কম। নিজস্ব তত্ত্বাবধানে প্রমত্ত পদ্মাকে শৃঙ্খলে আনার কারিগরি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিষয়টা ছিল অভূতপূর্ব। এ ধরনের মাপের বড় প্রকল্পের নিজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ছিল প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার ঘাটতি। প্রধানমন্ত্রী এসব ঝুঁকিকে বিবেচনায় রেখেই নিজস্ব অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনায় পদ্মা সেতু নির্মাণের সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ সেতুর নির্মাণের সঙ্গে সারা দেশের মানুষের যে স্বপ্ন জড়িয়ে ছিল, তা নিশ্চয়ই তাঁর আত্মবিশ্বাস ও প্রত্যয়কে বাড়তি শক্তি জুগিয়েছিল।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, আমাদের প্রকৌশলী, উপকরণ সরবরাহকারী, শ্রমিক, ব্যবস্থাপক আর স্থানীয় ও বিদেশি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরলস

কর্মকাণ্ডের ফসল এ সেতু। বদ্বীপ বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি পরিবর্তনশীল, নদীর গতিপথ অস্থির, নদীর তলদেশ অস্থিতিশীল। একটি জটিল ও দুরূহ পরীক্ষা তাঁরা সম্মিলিত উদ্যোগে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের অবদান পদ্মা সেতু নির্মাণের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পদ্মা সেতুর অবদান নির্মাণ কার্যক্রম প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আগেই শুরু হয়ে গেছে। সেতু ও এক্সপ্রেসওয়ের জন্য নির্মাণসামগ্রীর সরবরাহের একটি বড় অংশ আমাদের স্থানীয় উৎপাদক ও সরবরাহকারীরাই করেছেন। সেতুর জন্য ৭ দশমিক ৫ লাখ টন সিমেন্ট আর ২ দশমিক ২ লাখ টন ইস্পাত স্থানীয় প্রস্তুতকারকেরাই সরবরাহ করেছেন, যা শ্রম নিয়োজনের বাড়তি সুযোগ করেছে এবং বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিতে ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

পদ্মা সেতু নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে আপাত দৃশ্যমান নয় কিন্তু ইতিবাচক আরেকটি দিক হলো, এ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় অর্জিত মানবপুঁজি। এই বিশাল ও জটিল প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বড় অবকাঠামো নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনায় আমাদের যে অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে, সে মানবসম্পদের মূল্যায়ন টাকায় পরিমাপ করা কঠিন। এ প্রযুক্তি-জ্ঞান-অভিজ্ঞতা লব্ধ পুঁজি বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘস্থায়ী সম্পদ, যার ইতিবাচক ফল থেকে অর্থনীতি লাভবান হবে পরবর্তী বহু বছর ধরে।

এ সেতু নিয়ে যে প্রাথমিক সমীক্ষা করা হয়েছিল, তাতে প্রাক্কলন করা হয়েছিল যে অর্থনীতিতে পদ্মা সেতুর গুণক ইতিবাচক প্রভাবে দেশের জিডিপিতে ১ দশমিক ২ শতাংশ বাড়তি সংযোজন হবে। রেল সংযোগের কারণে জিডিপিতে যুক্ত হবে আরও ১ দশমিক শূন্য শতাংশ। নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ নিশ্চিত হওয়ার কারণে যানবাহন পারাপার বর্তমানের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেড়ে যাবে। কর্মসংস্থান হবে সাড়ে সাত লাখ মানুষের। সে অর্থে ৪৩০ বিলিয়ন ডলারের জিডিপিতে ১০ বিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত যোগ হবে, যা গুণক আকারে বাড়বে। এ অবদান আসবে সেতু ও সড়কের সুবিধা নিয়ে যে বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে, পণ্য ও সেবা উৎপাদিত হবে, সময় সাশ্রয়ী ও ব্যয়সাশ্রয়ী পরিবহন হবে, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়বে তার সুবাদে। টোল আদায়ের বাইরে এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যে কর ও করবহির্ভূত সম্পদ আহরণের সুযোগ সৃষ্টি হবে, তার সুবাদেই হবে দেশের অর্থনীতিতে এ সেতুর অবদান। এসব সম্ভাবনার বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হবে এসব বিনিয়োগকে কেন্দ্র করে সেতু থেকে সড়ক করিডর এবং সড়ক করিডর থেকে অর্থনৈতিক করিডরে রূপান্তর অভিযুক্ত নানামুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড।

প্রথম আলো

২৫ জুন ২০২২

সয়াবিন তেলের আরও মূল্য হ্রাসের সুযোগ রয়েছে

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় ২৬ শতাংশ সয়াবিন তেলের দাম কমলেও দেশের বাজারে কমেছে মাত্র আড়াই শতাংশ। এই কমানোকে যৌক্তিক মনে করছেন না গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। তিনি সময়ের আলোকে বলেন, সয়াবিন তেলের আরও মূল্য হ্রাসের সুযোগ রয়েছে।

তিনি বলেন, সয়াবিন তেলের দামটা সরকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মিলে নির্ধারণ করে থাকেন। আমাদের এখানে হ্রাসের সুযোগ রয়েছে। আমরা মনে করি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এ ক্ষেত্রে আমদানিকারকদের সঙ্গে বসবেন। খুচরা-পাইকারি পর্যায়েও কথা বলবেন এবং সেই ভিত্তিতে মূল্য পুনঃনির্ধারণ হয়েছে। কিন্তু এক ধরনের যৌক্তিক পুনঃনির্ধারণের বিষয়ে উদ্যোগ নেবেন।

সময়ের আলো

২৮ জুন ২০২২

রপ্তানি বাড়াতে চারটি কাজ করতে হবে

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

রপ্তানি আয় পাঁচ হাজার ডলারে উন্নীত হওয়া বাংলাদেশের জন্য আনন্দের ঘটনা। এ রকম একটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য স্বাধীনতার ৫০ বছর অর্থাৎ ২০২১ সালকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। একটু পিছিয়ে গেলেও তা তাড়াতাড়িই করা গেছে। এখন দরকার হচ্ছে, ২০৩০ সালের মধ্যে ১০ হাজার কোটি ডলারের রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা। ১০ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি হলে সেটা খুবই সম্ভব। তার আগে চারটি কাজ করতে হবে বাংলাদেশকে— পণ্য বহুমুখীকরণ, বাজার বহুমুখীকরণ, প্রযুক্তি বহুমুখীকরণ, বিনিয়োগ বহুমুখীকরণ। পণ্য বহুমুখীকরণে সবার আগে পোশাকের বাইরে পাট, চামড়া, সিরামিক ইত্যাদি খাতে গুরুত্ব দিতে হবে।

ইউরোপের বাইরের দেশগুলোর দিকে নজর দিতে হবে। যেমন চীন, জাপান, রাশিয়া, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, ভারত— এসব দেশে রপ্তানি বাড়াতে হবে। দরকার হচ্ছে তাদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি করা। বিদেশি ক্রেতা ও ব্র্যান্ডের কাছে বাংলাদেশি পণ্য পৌঁছানোর জন্য দরকার প্রযুক্তি বহুমুখীকরণ। আর বিনিয়োগ বহুমুখীকরণের জন্য দরকার দেশীয় বিনিয়োগের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা।

প্রথম আলো

৫ জুলাই ২০২২

সেবা রপ্তানিতে আরও মনোযোগ দিতে হবে

মোস্তাফিজুর রহমান

১১ শতাংশ হারে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অস্বাভাবিক নয়। অনেক বছর ধরেই এ হারে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধরা হচ্ছে। তবে চলতি অর্থবছরের পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। প্রধান রপ্তানি বাজারগুলোতে চাহিদা কমে আসার প্রমাণ তো নানাভাবেই পাওয়া যাচ্ছে। উদ্যোক্তারা বলছেন, রপ্তানি আদেশ পাওয়ার পর পণ্য উৎপাদনে শুষ্কমুক্ত সুবিধায় কাঁচামাল আমদানির অনুমতি (ইউডি) নেওয়ার হার কমছে। আগামী মাসগুলোর রপ্তানি প্রতিবেদনে সেই চিত্র দেখা যাবে। এ পরিস্থিতি থেকে খুব শিগগিরই উত্তরণ সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

অভ্যন্তরীণভাবে গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট দীর্ঘায়িত হলে রপ্তানি খাত চাপে পড়বে। উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাবে এতে। ক্রেতাদের হাতে সময়মতো পণ্য পৌঁছানো সম্ভব হবে না। ফলে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কমবে। সম্প্রতি তুলাসহ কিছু কাঁচামালের দর আবার কমতে শুরু করেছে। এ রকম পরিস্থিতিতে দর সমন্বয় অর্থাৎ দাম কম দেওয়ার প্রবণতা থাকে ব্র্যান্ড ও ক্রেতাদের মধ্যে। ফলে রপ্তানিমূল্য কমবে। এটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে। কৃত্রিম তন্তুর পোশাক ও মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদন এবং রপ্তানি বাড়ানোর কৌশল নেওয়া যেতে পারে। সেবা রপ্তানি বাড়ানোরও কৌশল নিতে হবে। এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। এমনকি কোন ধরনের সেবা কী পরিমাণ রপ্তানি হচ্ছে, সে তথ্যও পাওয়া যায় না। কী ধরনের সেবা কীভাবে কোন বাজারে রপ্তানি করা সম্ভব, কী সহযোগিতা প্রয়োজন— এ বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে।

সমকাল

২১ জুলাই ২০২২

ভারতের কাছ থেকেও এখন রাশিয়ার তেল কেনা যায়

মোস্তাফিজুর রহমান

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে, তাই ডলারের বিকল্প হিসেবে অন্যান্য মুদ্রা ও ব্যবস্থার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা উচিত। রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার চিন্তাভাবনা চলছে। ফলে বাংলাদেশ যে অঙ্কের পণ্য রাশিয়ায় রপ্তানি করে, ঠিক সেই সমপরিমাণ পণ্য মুদ্রাবিনিময়ের মাধ্যমে আনা যেতে পারে। এর ওপরে যা আনা হবে, সেটা মুদ্রাবিনিময়ের মাধ্যমে করা সম্ভব হবে না। সে ক্ষেত্রে বিকল্প কিছু ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে হবে।

আমাদের রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে। বড় লেনদেন হচ্ছে। ফলে নিছক বাণিজ্যের মধ্যে না থেকে সামগ্রিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের আওতায় কিছু করা যায় কি না, তা ভেবে দেখা উচিত।

তাদের কাছ থেকে আমরা ট্রেড ক্রেডিটের আওতায় পণ্য আমদানি করতে পারি, অর্থাৎ আমরা যে পণ্য তাদের কাছ থেকে আমদানি করব, তার মূল্য কয়েক মাস পরে শোধ করা হবে—এমন বন্দোবস্তে যাওয়া। তবে এর মেয়াদ সাধারণত খুব বেশি হয় না। কয়েক মাসের জন্যও তা পাওয়া গেলে মন্দ হয় না। এটা রুবলে হবে না। এতে হয়তো ডলার কিছুটা এদিক-সেদিক করা যাবে।

অন্যদিকে ভারত আমাদের সঙ্গে রূপিতে বাণিজ্য করার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমস্যা আরও বেশি। কারণ, তাদের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি আরও বেশি, ৬৫০ কোটি ডলারের মতো।

এ ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, অর্থাৎ আমরা ভারতে যতটা রপ্তানি করি, ততটাই মুদ্রা বিনিময় করা সম্ভব। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের ঘাটতি বেশি বলে খুব বেশি বিনিময় করা

সম্ভব নয়। তবে একটা কাজ করা যায়— রাশিয়া ভারতকে ৩০ শতাংশ ছাড়ে তেল বিক্রি করছে বলে জানা যায়। ভারতের বেসরকারি কোম্পানিগুলো এই তেল আমদানি করছে।

প্রথম আলো

১৯ আগস্ট ২০২২

ভোক্তার পক্ষে কেউ নেই বলে অর্থোক্তিক দাম বাড়ছে বাজারে

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

আমাদের দেশে পচনশীল ও অপচনশীল খাদ্যপণ্যের বাজার ও সরবরাহব্যবস্থার ওপর সরকারের তেমন কোনো নজরদারি বা তদারকি নেই। এ ধরনের বাজারকাঠামোতে তাই যখনই কোনো প্রভাব যুক্ত হয়, তখনই এ কাঠামোর শক্তিশালী পক্ষগুলো সেই সুযোগ নেয়।

নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে তারা বাড়তি মুনাফা তুলে নেয়। যেমনটি আমরা বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন পণ্যমূল্যের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি। এ কারণে বাজারে পণ্যের দামের ক্ষেত্রে একধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছে। এ অস্থিরতার ভুক্তভোগী হচ্ছেন ভোক্তারা। যাঁদের পক্ষে কথা বলার শক্তিশালী কোনো পক্ষ বাজারকাঠামো বা সরবরাহব্যবস্থায় নেই। সহজ করে বললে ভোক্তার পক্ষে কথা বলার কেউ নেই। তাই নিয়তি হিসেবে তাঁদের বাড়তি দামের চাপ মেনে নিতে হচ্ছে।

আমরা যদি আমাদের বাজারকাঠামো দেখি তাহলে দেখতে পাই, বাজারে পণ্যমূল্যের দাম নির্ধারিত হয় কখনো উৎপাদক, আবার কখনো মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাবের ওপর। এ কারণে অনেক সময় চাহিদা ও জোগানের মধ্যে খুব বেশি ফারাক না থাকলেও অর্থোক্তিকভাবে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। ফলে বাজারকাঠামোর ওপর যার প্রভাব যত বেশি, তিনি তত বেশি দাম বাড়ান।

গত কয়েক বছরের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিন দফায় বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। প্রথম দফায় হয়েছে করোনাকালে। তখন চাহিদার তুলনায় সরবরাহের ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এক দফা পণ্যমূল্য অস্বাভাবিক বেড়ে গিয়েছিল। এরপর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর আরেক দফা দাম বেড়েছে। এখন দাম বাড়ানো হচ্ছে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিকে কারণ হিসেবে দেখিয়ে। এ কথা সত্য, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে পরিবহন খরচ বেড়েছে।

জ্বালানি তেল এমন একটি উপাদান, যেটির দাম বাড়লে শুধু পরিবহন খরচ নয়, সব ধরনের খরচ বেড়ে যায়। তখন তা ভোক্তাশ্রেণিকে ছাড়িয়ে সব ব্যক্তির ওপর গিয়ে প্রভাব ফেলে। তাতে অনেক ধরনের বাড়তি খরচের চাপ গিয়ে পড়ে পণ্যমূল্যের ওপর। তবে এখন বাজারে আমরা পাইকারি ও খুচরা দামের যে তফাত দেখছি, সেটিকে কোনো সূত্র ও যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। কারণ, যৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধির চেয়ে বেশি হারে দাম বাড়ছে। ভোক্তার পক্ষে সরব হওয়ার মতো শক্তিশালী কোনো পক্ষও এই মুহূর্তে নেই।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে সরকারের অনেক করণীয় রয়েছে। যদি তারা সত্যিকার অর্থেই ভোক্তাকে সুরক্ষা দিতে চায়। এ ক্ষেত্রে সরকার যেটি করতে পারে, তা হলো যৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধির হিসাবটি নিয়মিতভাবে ভোক্তাকে জানানোর ব্যবস্থা করা।

জ্বালানির দাম বাড়ার কারণে পণ্য পরিবহন ও অন্যান্য খরচ মিলিয়ে যৌক্তিকভাবে পণ্যের দাম কতটা বাড়তে পারে, তার একটি পরিসংখ্যান ভোক্তার সামনে তুলে ধরা দরকার। তাতে ভোক্তা যেমন সচেতন হবেন, তেমনি সরবরাহব্যবস্থায় যাঁরা দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন, তাঁরা সতর্ক হবেন।

প্রথম আলো

১৯ আগস্ট ২০২২

পণ্যের দাম বেঁধে দেওয়া সাময়িক ফল দিতে পারে

মোস্তাফিজুর রহমান

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপটিকে আমি নেতিবাচকভাবে দেখতে চাই না। বিশ্বের অনেক দেশেই পণ্যের গায়ে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (এমআরপি) লেখা থাকে। আমাদের দেশে এ ব্যাপারে ঘাটতি রয়েছে।

এটা এক অদ্ভুত বিষয় যে আমদানি করা পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে কমলেও আমাদের দেশে উল্টো বেড়ে যায় বা আন্তর্জাতিক বাজারে যতটুকু বাড়ে, আমাদের দেশে বেড়ে যায় তার চেয়ে অনেক বেশি।

আসলে এখানে সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনাটা গড়ে ওঠেনি এখনো। ফলে সিভিকিট (আঁতাত করে দাম বাড়ানোর জোট) গড়ে উঠতে পারে সহজেই। সিভিকিট চাইলে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। অতীতে বহুবার এমন দেখা গেছে।

তবে বিষয়টিতে সরকারের আরও মন্ত্রণালয় ও দপ্তরগুলোর দায়িত্ব রয়েছে। আমার মতে, সমন্বিতভাবে যথাযথ বাজার ব্যবস্থাপনার দিকে নজর দিতে হবে। ভালো দিক যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অন্তত স্বীকার করছে যে এখানে অযৌক্তিকভাবে দাম বাড়ানো হচ্ছে। আর বৈঠকের সিদ্ধান্ত যেটুকু শুনলাম, তাতে মনে হচ্ছে কাজটি বাস্তবায়িত হলে সাময়িক ফল দিতে পারে।

এটা একপ্রকার সমঝোতাভিত্তিক দাম নির্ধারণ হতে যাচ্ছে। তবে ভোক্তার স্বার্থের দিক বিবেচনা করলে সরকারের উচিত হবে মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পথ বের করা। নইলে তা কাজে দেবে না। কারণ, সুযোগসন্ধানী গোষ্ঠী সব সময় সুযোগ খুঁজবে। সরকার দাম নির্ধারণ করে দেবে, কোনো ব্যবসায়ী হয়তো বলবেন তাঁর পণ্য আগে অনেক বেশি দাম কেনা এবং এখন তিনি কমে বিক্রি করবেন না। তাঁর যুক্তিও ফেলা দেওয়া যাবে না।

মানুষ এখন মূল্যস্ফীতির চাপে। এ অবস্থায় উদ্যোগটিকে আমি সরকারের স্বল্পকালীন চেষ্টা হিসেবে দেখছি। পাশাপাশি চাইছি বড় উদ্যোগের পথে সরকার হাঁটুক। ভোক্তাদের বরাবরই অভিযোগ যে ব্যবসায়ীরা তাঁদের গলা কাটছেন। সরকারের উচিত হচ্ছে গলা কাটার পথ বন্ধ করার ব্যবস্থা করা এবং সারা দেশে প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি করা। মনে হতে পারে যে এমএস রড ও সিমেন্ট নিত্যপণ্যের মধ্যে পড়ে কি না।

আমার বক্তব্য হচ্ছে, নির্মাণসামগ্রী হলেও এগুলো এখন জরুরি পণ্য। সরবরাহব্যবস্থা ঠিক রেখে এগুলোর দাম নির্ধারণ করার কাজটি সরকার কতটা পারবে, সেটা একটা বিষয়। তবে উদ্যোগটি বা উদ্যোগের চেতনাটিকে আমি স্বাগত জানাই।

প্রথম আলো

২৪ আগস্ট ২০২২

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ দিতে অনীহা, ব্যাংকের আগ্রহ বড়দের দিকে

মোস্তাফিজুর রহমান

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, “ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর কিছুটা আস্থার প্রয়োজন। ব্যাংকগুলোতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নানা রকমের আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে যেতে হয় ফলে তারা অনেক কম ঋণ পান। সাধারণত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হয় কারণ ব্যাংকগুলো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ দিতে নারাজ।”

তিনি আরও বলেন, “আমরা সর্বদা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ বিতরণে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার ওপর জোর দিয়ে থাকি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। এটি অর্থনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।”

সিপিডির এই ফেলো বলেন, “কিছু ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং বিকাশ ও নগদ প্ল্যাটফর্মে লেনদেনের ভিত্তিতে ঋণ দিতে চাচ্ছে। এ ধরনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করা উচিত। চলতি অর্থবছরে ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প খাতের জন্য ২৫ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। ব্যাংকগুলোর এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা উচিত। দরকারে তাদের তিন মাস পর পর এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পর্যবেক্ষণ করবেন।”

ঢাকা ট্রিবিউন

২৪ আগস্ট ২০২২

ট্রানজিট প্রস্তাব আরো স্পষ্ট করা দরকার

মোস্তাফিজুর রহমান

ভারতের ভেতরে সড়ক ব্যবহার করে বিনা মাসুলে তৃতীয় কোনো দেশে পণ্য রপ্তানি করতে পারবে বাংলাদেশ। এতে বাংলাদেশের লাভ-ক্ষতি নিয়ে কথা বলেছেন সিপিডি'র সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান। তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মাসুদ রুমী।

কালের কণ্ঠ: ভারত তৃতীয় দেশে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যে ট্রানজিট সুবিধার প্রস্তাব দিয়েছে, তাতে বাংলাদেশের লাভ-ক্ষতি কী?

মোস্তাফিজুর রহমান: ভারত আমাদের নৌ, স্থল ও আকাশপথে ট্রানজিট সুবিধার প্রস্তাব দিয়েছে, তবে সেটা আরো স্পষ্টকরণ করার দরকার ছিল। কোন কোন বন্দর দিয়ে এই সুবিধা দেওয়া হবে, সেটি পরে জানানো হবে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের দিক থেকে যে বন্দরগুলো বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলো ওই তালিকায় আছে কি না সেটা দেখতে হবে। ভুটান, নেপালের ক্ষেত্রে বাণিজ্যসংশ্লিষ্ট স্থলবন্দরগুলো আমাদের বেশি কাজে লাগবে। আমরা ভুটানের সঙ্গে যদি রেল সংযোগ করতে চাই, তাহলে হলদিবাড়ী, চিলাহাটি—এই বন্দর আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটার ফল বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক হবে বলে আমি মনে করি।

কালের কণ্ঠ: বিবিআইএনের সঙ্গে ভারতের নতুন সুবিধায় বাড়তি কী সুযোগ তৈরি হলো?

মোস্তাফিজুর রহমান: আমরা এর আগেই বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপাল মোটরযান চুক্তি (বিবিআইএন এমভিএ) করেছি। সেখানে ভারত তাদের ভূখণ্ড ব্যবহার করে ভুটান ও নেপালের সঙ্গে বাণিজ্য করার সুযোগ দিয়েছে। এর অধীনে সড়কপথে আমাদের কোনো ট্রানশিপমেন্টের প্রয়োজন পড়বে না। এর সঙ্গে আরো সংযুক্ত করে ভারত যে প্রস্তাবটা দিয়েছে, তাতে আমরা তৃতীয় দেশে রপ্তানি সম্প্রসারণ করতে পারি। মোটরযান চুক্তি ব্যবহার করে মুম্বাই পর্যন্ত যেতে পারেন আমাদের রপ্তানিকারকরা। এরপর মুম্বাই বন্দর থেকে ট্রানশিপমেন্ট করে পণ্য পাঠাতে পারেন ইউরোপ-আমেরিকায়। এটা যদি তাঁদের জন্য লাভজনক হয়, তাহলে এই সুবিধা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

যাঁরা নৌপথে পণ্য পরিবহন করেন, তাঁদের কলম্বো কিংবা সিঙ্গাপুর হয়ে অন্যান্য গন্তব্যে যেতে হয়। আমরা যদি সরাসরি মুম্বাই বন্দরে পণ্য নিতে পারি, তা আরো শাস্ত্রী হতে পারে। ভারতের প্রস্তাব আমরা যাচাই-বাছাই করতে পারি। যত বিকল্প থাকবে আমাদের ব্যবসায়ীরা তত প্রতিযোগিতাসক্ষমভাবে আমদানি ও রপ্তানি করতে পারবেন।

কালের কণ্ঠ: ভারত পশ্চিমবঙ্গের হিলি থেকে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে মেঘালয়ের মহেন্দ্রগঞ্জ পর্যন্ত একটি মহাসড়কসহ নতুন উপ-আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্প শুরু করতে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশকে অনুরোধ করেছে। এতে আমাদের কী লাভ হবে?

মোস্তাফিজুর রহমান: গত কয়েক বছর থেকেই ভারত তাদের সাতটি রাজ্যে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিকল্প করতে চাচ্ছে। একটি ছিল আশুগঞ্জকে আন্তর্জাতিক নৌবন্দর করে সেখান থেকে আগরতলা পর্যন্ত চার লেনের মহাসড়ক। ভারতের লাইন অব ক্রেডিটে সেই প্রস্তাব আছে। আরেকটি বিকল্প তারা মেঘালয়ের সঙ্গে করতে চাচ্ছে। আশুগঞ্জ দিয়ে মেঘালয়ে যাওয়া তাদের জন্য ভালো বিকল্প নয়। সরাসরি মেঘালয়ে যেতে এমন মহাসড়ক হলে সেখানে ভারতের সুবিধা হবে। সেখানে মহাসড়ক নির্মাণে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতের বড় অংশগ্রহণ থাকতে হবে। আবার একটি মহাসড়ক যখন হবে, সেখানে কেবল শুরু ও শেষ প্রান্তের মধ্যে যোগাযোগ হবে তা নয়। মাঝখানেও সুযোগ থাকতে পারে। এই সড়ক ব্যবহার করে বাংলাদেশও লাভবান হতে পারে। সেখানে কৌশলগতভাবেও বাংলাদেশের অংশগ্রহণ থাকতে হবে। ভারতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যৌথ বিনিয়োগে এটি করতে হবে। বাংলাদেশও যাতে এই মহাসড়ক পর্যাণ্ডভাবে কাজে লাগাতে পারে, সেই সুযোগ রাখতে হবে।

কালের কণ্ঠ: ভারত আমাদের অন্যতম বাণিজ্য অংশীদার। দেশটিতে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে করণীয় কী?

মোস্তাফিজুর রহমান: ভারত বাংলাদেশের জন্য খুবই সম্ভাবনাময় বাজার। ভারত বছরে বাংলাদেশ থেকে আমদানি করে দুই বিলিয়ন ডলারের পণ্য। আমরা আমদানি করি ১৩ বিলিয়ন ডলারের। উপ-আঞ্চলিক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সংশ্লেষ সফলভাবে করতে পারলেই ভারতের সঙ্গে আমাদের বড় বাণিজ্য ঘাটতি কমবে। আমাদের স্থলবন্দরের অবকাঠামোসহ নানা দুর্বলতা ও সমস্যা আছে। এগুলো দ্রুত দূর করতে হবে। মোটরযান চুক্তির সফল বাস্তবায়ন করতে গেলে এই রুটগুলোকে উন্নত করতেই হবে। আমাদের রপ্তানিকারকরা ভারতে অ্যান্টি ডাম্পিং শুল্ক, নানা রকম অশুদ্ধ বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। আলোচনার মাধ্যমে এগুলোর সমাধান করতে হবে।

কালের কণ্ঠ: ভারত আমাদের জন্য বড় বাজার। সেখানে রপ্তানি বাড়াতে কী পদক্ষেপ নেওয়া দরকার?

মোস্তাফিজুর রহমান: ভারতে বড় ধরনের বাণিজ্যের সুযোগ আমাদের আছে। কিন্তু আমরা এখনো তা খুব একটা কাজে লাগাতে পারিনি। আমাদের বড় সমস্যা হলো, আমাদের রপ্তানি

মূলত পোশাকনির্ভর। ভারতের বাজারে তৈরি পোশাক খুব বেশি রপ্তানির সুযোগ নেই। আমাদের সরবরাহ সক্ষমতা ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়তে হবে। আমাদের যানবাহনের যে খরচ, তাতে ভারতে পণ্য পাঠাতে যে খরচ হয়, অনেক সময় ইউরোপে পাঠাতে গেলে তার চেয়েও কম খরচ হয়। এই প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে হবে। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও যোগাযোগব্যবস্থার ত্রিমাত্রিক সংশ্লেষ প্রয়োজন। ভারতকে আমরা মোংলা ও মিরসরাইয়ে দুটি অর্থনৈতিক অঞ্চল দিয়েছি। সেখানে তারা বিনিয়োগ করে এই সুযোগটা ব্যবহার করতে পারে। ভারত আমাদের যে শূন্য শুল্ক সুবিধা দিয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে ওই বিনিয়োগের পণ্য ভারতের বাজারে যেতে পারে। ভারত যেসব পণ্য বেশি আমদানি করে সেগুলো আমরা তৈরি করে ভারতের শুল্ক সুবিধা কাজে লাগিয়ে ভারতে রপ্তানি করতে পারি। ভারতে আমাদের রপ্তানি বেড়েছে। ১০ বছরে চার গুণ বেড়েছে। এটা খারাপ নয়। এখন এটাকে পরবর্তী ধাপে নিতে হবে।

কালের কণ্ঠ: দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যে একক মুদ্রা এবং বাণিজ্যজোট তৈরির আলোচনা আলোর মুখ দেখে না কেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: ২০১১ সাল থেকে আমরা সাফটার অধীনে ভারতের কাছ থেকে শূন্য শুল্ক সুবিধা পাচ্ছি, যা তারা ২০২৬ সাল পর্যন্ত দেবে। এলডিসি থেকে উত্তরণ সামনে রেখে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করতে হবে। সার্কের অধীনে বাণিজ্যে খুব একটা অগ্রগতি হচ্ছে না; বিমস্টেক, এফটিএতেও খুব একটা গতি নেই। তার চেয়ে দ্বিপাক্ষীয় বাণিজ্য বাড়ানোর দিকে আমাদের বেশি মনোযোগ দিতে হবে। এটা নিয়ে ধাপে ধাপে চিন্তা করতে হবে।

কালের কণ্ঠ: দ্বিপাক্ষীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সেপা নিয়ে আলোচনায় আমাদের অগ্রাধিকার কী হতে পারে?

মোস্তাফিজুর রহমান : ভারতের সঙ্গে কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্ট (সেপা) আমাদের জন্য ইতিবাচক হবে। কিন্তু এটার মধ্যে আমাদের সুবিধা কী, ভারতের সুবিধা কী, আমরা কী প্রস্তাব করতে পারি— এগুলো আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে। ভারতের মতো বড় দেশের সঙ্গে অবশ্যই আমাদের কিছু প্রস্তাব করতে হবে। সেটা এমনভাবে করতে হবে, যাতে আমাদের ওপর এটার অভিঘাত নেতিবাচক না হয়। ভারত আমাদের শূন্য শুল্ক দিয়েছে, কিন্তু আমরা সেটি এক দিনে দিতে পারব না। শক্তিশালী অর্থনীতি হিসেবে তারা হয়তো দ্রুত উদারীকরণ করবে, আমাদের একটু আন্তে যেতে হবে। খুব ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে ভারতের সঙ্গে সেপার আলোচনায় যেতে হবে।

কালের কণ্ঠ: ভারত ও চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ও দ্বিপাক্ষীয় সহযোগিতার ক্ষেত্রে কিছু কৌশলগত সমস্যা আছে। বৃহৎ এই দুই দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত?

মোস্তাফিজুর রহমান: চীন ও ভারতের অর্থনৈতিক শক্তিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে অগ্রসর হতে হবে। প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় রেখেই আমাদের এগোতে হবে। চীনের সঙ্গে আমাদের অনেক অর্থনৈতিক সম্পর্ক আছে, ভারতের সঙ্গেও আছে। এই সম্পর্ককে ভারসাম্যপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হবে। এটা যাতে সাংঘর্ষিক কিংবা বৈপরীত্যমূলক পর্যায়ে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক যে টানাপড়েন সেটা আমাদের উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা হয়ে না দাঁড়ায়, সে দিকটা মাথায় রেখে আমাদের পররাষ্ট্রনীতিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

কালের কণ্ঠ

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

পোশাকশিল্পে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হাতছানি

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

স্বাধীনতার ৫০ বছর পর তৈরি পোশাকশিল্প বাংলাদেশের একটি পরিণত খাত এবং অন্যতম বৈশ্বিক ব্র্যান্ড। আর এটা সম্ভব হয়েছে উদ্যোক্তা, শ্রমিক এবং সরকারের সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে। পোশাকশিল্পের এই অভিযাত্রা সরলরৈখিক ছিল না। এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ওঠা-নামা এবং টানাপোড়েন ছিল। তবে আমাদের এই খাতের অবস্থান দেখে বলা যায়, এসব ওঠা-নামা আর টানাপোড়েন কাটিয়ে বাংলাদেশ এখন একটা উজ্জ্বল জায়গায় পৌঁছেছে।

১৯৭৮ সালে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের যাত্রা শুরু হয়। তখন কিন্তু অনুমান করা যায়নি, আজ এখানে তৈরি পোশাকশিল্প এসে দাঁড়াবে। সে সময় উদ্যোক্তারা পরবর্তী অর্ডার বা শিপমেন্ট কী হবে, সেটা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। ফলে আগামী ৫০ বছরে এই খাত কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, সে বিষয়ে নির্ধারণমূলক বক্তব্য দেওয়া অযৌক্তিক। তবে বিগত ৫০ বছরে পোশাকশিল্পের অর্জনের ভিত্তিমূল পর্যবেক্ষণ করে আগামীর কিছু পথনকশার ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে। তবে তার আগে গত ৫০ বছরে আমাদের এই খাতের সাফল্য আর দুর্বলতাগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করার জরুরত রয়েছে।

এই অর্ধশতকে পোশাক খাতে সবচেয়ে বেশি অর্জন হয়েছে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি খাতে। শুরুর দিকে যখন এই খাতে আমাদের মাত্র ৩০০/৩৫০ মিলিয়ন ডলার রপ্তানি হয়েছে, সেখানে এখন ৩৫ বিলিয়ন ডলারের পরিমাণ রপ্তানি হচ্ছে। তবে বহুগুণ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি যতটা না হয়েছে পণ্যের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে, তার চাইতে বেশি হয়েছে পণ্যের রপ্তানি ভলিউমের জন্য এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পণ্য রপ্তানির জন্য। এই সময়ে দেশে একশ্রেণির উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে, যারা তাদের পরের প্রজন্মের জন্য তৈরি পোশাক খাতকে রেখে যাবে। এই খাতের হাত ধরে টেক্সটাইল, হোম টেক্সটাইল, এক্সসেরিজের মতো ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ ইন্ডাসট্রিজ তৈরি হয়েছে। এই খাতের হাত ধরে ব্যাংকিং, ইন্স্যুরেন্স, কনস্ট্রাকশন, ইলেকট্রনিকস অ্যাপলায়েন্স, একাডেমিক এবং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মতো সংযোগ শিল্প গড়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে আগামী এক দশকে আমাদের কয়েকটি বিষয়ে উন্নতি করার সুযোগ রয়েছে। যেমন- শ্রমিকদের জীবনমান উন্নত করতে হবে। পরিবেশবান্ধব কারখানার ক্ষেত্রে আমরা

এখনো হাঁটি হাঁটি পায়ের পর্যায়ে আছি। এখানে আমাদের প্রভূত উন্নতি করতে হবে। এখন আমরা স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে উন্নত বিশ্বে শুষ্কমুক্ত সুবিধা পাচ্ছি, যেটা আগামীতে না পাওয়ার আশঙ্কা বেশি। তাই এই বিষয়ে এখন থেকে উদ্যোগ নিতে হবে।

আগামীতে তৈরি পোশাকশিল্প খাতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে এটাকে পরিবেশবান্ধব, শ্রমবান্ধব করার পাশাপাশি পণ্যের বহুমুখীকরণ, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা, ভালু চেইন গুড ফ্লোতে শুধু বড় বাজারে সীমাবদ্ধ না থেকে বাজারের বহুমুখীকরণ করা এবং বিনিয়োগকারীদের বহুমুখীকরণের উদ্যোগ নেওয়া দরকার। আমাদের এটা মাথায় রাখা উচিত, ২০২৬ সালে যখন আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হব, তখন সুবিধাগুলো সংকুচিত হয়ে পড়বে। সে সময় আমরা যাতে প্রতিযোগী সক্ষম দেশ হিসেবে অবস্থান করতে পারি, সেটা নিশ্চিত করার প্রয়োজন আছে। আগামীতে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উপযোগী হাইটেক প্রযুক্তিকে এই খাতে প্রয়োগ করতে হবে। এসব আলোকেই আগামীর দশকগুলো সাজানোর প্রয়োজন পড়বে। এখন সর্বাত্মক ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটটি বিবেচনা করে তৈরি পোশাক খাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগগুলো বিবেচনা করতে হবে এবং সে অনুযায়ী কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। ২০৩০ সালের পর আমরা আর শুষ্কমুক্ত সুবিধা পাব না, সেটাকে মাথায় রেখে পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ এবং বাজারের বৈচিত্র্যকরণের উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশেরই একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্তকে আমরা পর্যালোচনা করতে পারি। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আমরা ২০১৩ সালের পর থেকেই শূন্য শুল্কে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে আসছি। কিন্তু সেই সময় থেকে আমরা ভালো পরিমাণ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি করছি। ২০২২ সালেও আমরা সেখান থেকে উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। আগামীতে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, জাপান, চীন এবং কানাডার মতো বাজারে যখন শূন্য শুল্কে রপ্তানি করব বা শুষ্ক সুবিধা সংকুচিত হবে, তখন সেখানকার বায়ারদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের আগের মতো প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য সরবরাহ করার যে সক্ষমতা রয়েছে, সেটা বায়ারদের আশ্বস্ত করতে হবে।

এক্ষেত্রে মূল চাবিকাঠি হবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। সেজন্য প্রযুক্তিগত মানোন্নয়ন করা, শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, কারখানার ম্যানেজমেন্ট বা প্রফেশনালসদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, কারখানার টোটাল প্রোডাক্টিভিটি বৃদ্ধি করা, কারখানা পর্যায়ের অপচয় কমানোর বিষয়গুলোতে নজর দেওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য হাইটেক এবং অ্যাডভান্স মেশিনারিজ ব্যবহার করার উদ্যোগ নিতে হবে। এ ধরনের বাজারে আমাদের উদ্যোক্তারা স্বল্পমূল্যের পণ্য রপ্তানি করে হয়তো খুব বেশি মার্জিন ধরে রাখতে পারবেন না, তাই তাদের মিডিয়ামেন্ট বা হাই ইন প্রোডাক্টি রপ্তানির সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য কারখানার প্রোডাক্ট কম্পোজিশন চেঞ্জ করা, শ্রমিকদের প্রশিক্ষিত করা এবং উচ্চমূল্যের পণ্যের বায়ারদের আকৃষ্ট করার জন্য নেটওয়ার্ক করার মতো কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। সরকারের পক্ষে আগামী দিনে চীন, জাপান, কোরিয়া, ভারতের মতো বাজারে শুষ্কমুক্ত পণ্য রপ্তানি করার জন্য দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ চুক্তি করা যায় কি না, সেই প্রচেষ্টা খতিয়ে দেখতে হবে। সেক্ষেত্রে কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ অ্যাগ্রিমেন্ট বা সেপা এবং বিশেষ বাণিজ্য

চুক্তি বা এসটিএ করার প্রয়োজনীয়তা হতে পারে। এখানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এসটিএ উইংসের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং এ সমস্ত বিষয়ের বেসরকারি খাতের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে লিয়াজোঁ বা নেটওয়ার্ক করার বন্দোবস্ত করতে হবে। এই সময়কালে এসব দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি করার আলোচনা শুরু করা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।

তৈরি পোশাক খাতে পূর্ণমাত্রার কমপ্লায়েন্স গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। এখানে গ্রিন ফ্যাক্টরি তৈরি করা হচ্ছে। তবে মনে রাখতে হবে, গ্রিন ফ্যাক্টরি পূর্ণমাত্রার কমপ্লায়েন্সের একটি অংশমাত্র। সেখানে আমাদের কারখানার বর্জ্য যেন দূষণ না তৈরি করে, ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ইভাস্ট্রিগুলো যেন পুরোমাত্রার কমপ্লায়েন্ট হয়, সেগুলো নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি, শ্রমিকদের মানবাধিকার-সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে, বিশেষ করে ইউরোপের বাজারে ২০২৬ কিংবা ২০২৯ এরপর শুষ্কমুক্ত পণ্য রপ্তানির জন্য ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন বা আইএলওর যে ১৫টি মানবাধিকার-সংক্রান্ত কনভেনশন এবং অন্যান্য বিষয়ের ১২টি কনভেনশন রয়েছে, সেগুলো নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করা এবং কালেকটিভ বাগেনিংয়ের সক্ষমতা তৈরি করতে হবে।

মনে রাখা দরকার, এখন চীনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং আংশিকভাবে ইউরোপের যে বাণিজ্য দ্বৈরথ চলছে, তার কিছুটা সুবিধা বাংলাদেশ নিতে শুরু করছে। তবে পূর্ণাঙ্গ সুবিধা নিতে হলে পূর্ণমাত্রার কমপ্লায়েন্ট হওয়া, পরিবেশগত মানদণ্ডগুলোতে উত্তীর্ণ হওয়া, শ্রমিকদের মানদণ্ড মেনে চলা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটানো, হাই এবং মিডিয়ামেন্ট পণ্য রপ্তানির সক্ষমতা অর্জনের মতো বিষয়গুলোর প্রয়োজন পড়বে। ইউরোপ কিন্তু আগামীর জন্য ধীরে ধীরে সার্কুলার ইকোনমিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। তাই আমরা কীভাবে সার্কুলার ইকোনমির অংশ হতে পারি, সে বিষয়ে নজর দিতে হবে।

আমাদের আগামীর একটি বিষয়কে উপলব্ধি করে কর্মপদ্ধতি সাজাতে হবে। সেটা হলো-২০৫০ এর পরে আমরা তৈরি পোশাক খাতে নতুন এক শ্রেণির উদ্যোক্তাদের দেখতে পাব। তারা সবাই হয়তোবা দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় প্রজন্মের উদ্যোক্তা হবেন। তারা কিন্তু আগের প্রজন্মের মতো শ্রমবহুল কর্মপরিবেশে কাজ করতে অভ্যস্ত হবেন না। কিন্তু শ্রমঘন পরিবেশে কাজ করার জন্য প্রচুর সময় দেওয়া, শ্রমিকদের সঙ্গে নেটওয়ার্ক তৈরি করা, ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে লিয়াজোঁ মেনটেইন করার মতো বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এখানে এই সম্ভাব্য দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মকে এ বিষয়গুলোতে প্রস্তুত করার প্রয়োজন পড়বে।

তবে আগামীতে এই দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্ম আগের প্রজন্মের তুলনায় অনেক বেশি প্রযুক্তিগত দক্ষ থাকবেন এবং প্রযুক্তিবান্ধব হবেন। তাদের মাধ্যমে তৈরি পোশাকশিল্প আরও সম্ভাবনাময় খাতে পরিণত হবে— সেটাই বড় আশাপ্রদ হবার বিষয় বলে মনে করি।

দৈনিক বাংলা

২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২

তৃতীয় দেশে ট্রানজিট নিয়ে বিবেচ্য বিষয়াবলি

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তৃতীয় দেশে পণ্য রপ্তানির জন্য বিনা মাশুলে ভারতে ট্রানজিট সুবিধার প্রস্তাব পেয়েছে বাংলাদেশ। নির্ধারিত স্থলবন্দর, বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করে বাংলাদেশ এ সুবিধা নিতে পারে। এ ছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও জ্বালানি সরবরাহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে ভারত। দুই প্রধানমন্ত্রীর শীর্ষ বৈঠকের পর যৌথ বিবৃতিতে এসব বিষয় উঠে এসেছে। দুই প্রধানমন্ত্রী পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা করেছেন। কোভিড-১৯ অতিমারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে তাঁরা এ অঞ্চলের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের স্বার্থে বন্ধুত্ব ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যাপকতর সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে— ভারতীয় ভূখণ্ড বিশেষত স্থলবন্দর, বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দর দিয়ে বাংলাদেশ থেকে তৃতীয় দেশে পণ্য রপ্তানির জন্য বিনা মাশুলে ট্রানজিট সুবিধা পেতে পারে বাংলাদেশ। এই সুবিধা ব্যবহারে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের আমন্ত্রণও জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সদ্য উদ্বোধন হওয়া চিলাহাটি-হলদিবাড়ী রুটের মাধ্যমে ভুটানের সঙ্গে রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এর কার্যকারিতা ও সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে বিষয়টি বিবেচনা করতে রাজি হয়েছে ভারত। ওদিকে আন্তঃসীমান্ত রেল সংযোগগুলো কার্যকর চিলাহাটি-হলদিবাড়ী ক্রসিংয়ে বন্দর বিধিনিষেধ প্রত্যাহারে বাংলাদেশকে অনুরোধ করেছে ভারত।

বস্তুত প্রধানমন্ত্রীর এবারের ভারত সফরে আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জন্য এক ধাপ অগ্রগতি হয়েছে। ট্রানজিট সুবিধার বিষয়টির মধ্যে বেশ নতুনত্ব রয়েছে। তাই প্রথমেই বিষয়টি ব্যাখ্যার দাবি রাখে। ট্রানজিট সুবিধা বলতে কি কোনো ধরনের মাশুল বা ফি ছাড়া পণ্য আমদানি-রপ্তানি বোঝানো হয়েছে; নাকি আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে অন্য যেসব প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করে, সেগুলো বোঝানো হচ্ছে? যেমন— ট্রানজিটের মাধ্যমে

বাংলাদেশকে ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে পর্যাপ্ত পণ্য আমদানি-রপ্তানির সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। কারণ আমরা দেখি, বাংলাদেশ থেকে ভারত কোন পণ্য আমদানি করবে এবং বাংলাদেশ ভারতে কোন পণ্য রপ্তানি করবে তা নির্দিষ্ট করা থাকে। এমনকি কী পরিমাণ পণ্য আমদানি-রপ্তানি করা যাবে তাও বেঁধে দেওয়া থাকে। এখন ট্রানজিট সুবিধার মানে মাশুল ছাড়া তৃতীয় দেশে আমদানি-রপ্তানির সুযোগ; নাকি চাহিদা অনুযায়ী আমদানি-রপ্তানির সুযোগ— তা স্পষ্ট নয়। এগুলো আমাদের জানা দরকার।

বাংলাদেশের সঙ্গে নেপালের ৬০ মিলিয়ন ডলারের মতো বাণিজ্য হয়; ভুটানের সঙ্গে হয় ৩৭ মিলিয়ন ডলারের। উভয় ক্ষেত্রে বাণিজ্যের ভারসাম্য বাংলাদেশের দিকে বেশি। নেপাল থেকে বাংলাদেশ যেসব পণ্য আমদানি করে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ডাল ও ডাল জাতীয় দানাদার শস্য। নেপালে বাংলাদেশ রপ্তানি করে ম্যানুফ্যাকচারিং ও ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য। এ ছাড়া রয়েছে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন খাদ্যজাত পণ্য। ভুটান মূলত বাংলাদেশে রপ্তানি করে বিভিন্ন ধরনের কৃষিপণ্য। বাংলাদেশ ভুটানে রপ্তানি করে ফার্নিচার, তৈরি পোশাক ও ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্য। বাংলাদেশ-ভুটানের মধ্যকার বাণিজ্যের আকার সীমিত। এটা রাতারাতি বৃদ্ধি পাবে— এমনটা বলা যাবে না। নেপাল-ভুটানের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের বড় বাধা ভারতের রুট ব্যবহার করা। এবার সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ এক ধাপ এগিয়ে গেল। কারণ, নেপাল-ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতির বড় কারণ হয়ে আছে দূরের রুট ব্যবহার করে কাঁচামাল ও পচনশীল পণ্য পরিবহন। এখন যদি ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করা যায় তাহলে স্বল্প সময়ে এসব জরুরি পণ্য আমদানি-রপ্তানি করা যাবে।

বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটানের মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা বাড়াতে হবে। এখানে অনেক বিষয়ে সুরাহার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করে তৃতীয় দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি সুবিধা কার্যকর হবে কিনা, তাও স্পষ্ট করা দরকার। এটা করতে পারলে বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের মধ্যে বাণিজ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হবে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গেও বাণিজ্য বাড়বে। বাংলাদেশ ভারতকে তখনই সুবিধা দিতে পারে যখন দেওয়ার বিনিময়ে সুবিধা পাওয়া যাবে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পুরো বিষয় পরিস্কার করে নিতে পারলে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান- সবাই লাভবান হবে।

বাংলাদেশকে কী ধরনের সুবিধা দেবে ভারত; ট্রানজিট নিয়ে দুই দেশ কী ধরনের সমঝোতায় এসেছে; তা এখনও জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। সরকারের উচিত পূর্ণাঙ্গ আলাপ-আলোচনা করে কৌশল নির্ধারণ করা। এ ক্ষেত্রে দেশের নাগরিক সমাজ, বিশেষ করে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে মন্ত্রণালয়ের উচিত ব্যাপক পরিসরে আলাপ-আলোচনা করা। তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ কৌশল কাঠামো ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এখন থেকেই প্রস্তুত করা দরকার। এ ক্ষেত্রে আমাদের দুটি কৌশল হতে পারে। একটি, আমরা কোনো সুবিধা দেব না; কোনো সুবিধা নেবও না। আরেকটি, সুবিধা দেব এবং সুবিধা নেব। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের উচিত আঞ্চলিক কাঠামোতে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই যোগাযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ার শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও মালদ্বীপের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো দরকার। এমনকি মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ বাড়াতে হবে। এই যোগাযোগ

স্থলপথের পাশাপাশি অন্যান্য রুটেও হতে পারে। কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক কৌশলগত আলাপ-আলোচনা ছাড়া দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উপকৃত হবে না।

বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হচ্ছে। এ দেশে বড় বড় অনেক প্রকল্পের কাজ চলমান। কর্ণফুলী টানেল হচ্ছে; যমুনাযও হবে। পাবনায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ চলছে; ঢাকায় মেট্রোরেল হচ্ছে। পদ্মা সেতু হয়ে গেছে; সেতুতে রেললাইনের কাজ চলছে। এই যে বড় বড় বিনিয়োগ; এগুলো অমূলক নয়; বরং যৌক্তিক বিনিয়োগ। কিন্তু এসবের সুফল পেতে হলে শুধু অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ওপর ভরসা করলে হবে না। এমনকি শুধু ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ-বাণিজ্যই যথেষ্ট নয়; মিয়ানমার, চীন, থাইল্যান্ডের সঙ্গেও যোগাযোগ বাড়তে হবে। স্বল্পমেয়াদের বদলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে। বহুমাত্রিক চিন্তা করতে হবে। ট্রানজিটে বাংলাদেশ আসলে কী পাচ্ছে, তা পর্যালোচনা করতে হবে। তাই আঞ্চলিক যোগাযোগ বাড়িয়ে বাণিজ্যের পরিধি সম্প্রসারণ করতে হবে। এই যোগাযোগ কখনও দ্বিপক্ষীয়, কখনও ত্রিপক্ষীয়; কখনও উপ-আঞ্চলিক, কখনও আবার আঞ্চলিক হতে পারে। অর্থাৎ যখন যা প্রয়োজন তা করতে হবে।

সমকাল

৩ অক্টোবর ২০২২

অধ্যায় ৪

সামাজিক সুরক্ষা

শ্রমজীবী গর্ভবতী নারী, আহত এবং বেকার শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

জার্মানিভিত্তিক উন্নয়ন সংস্থা জিআইজেড বাংলাদেশ ও প্রথম আলোর আয়োজনে এবং লাউডেস ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় 'শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৫ মার্চ ২০২২। আলোচকদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে এক ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হয়। তারই অংশবিশেষ এই নিবন্ধটি।

বাংলাদেশের শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। এখন একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। এ ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগও শুরু হয়েছে। শ্রমিকের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য কী করণীয়, সে বিষয় আলোচনার চেষ্টা করব। আয় নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য একটা সমাজের ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়া হয়। একজন মানুষ বয়স্ক হয়ে যাওয়া, চাকরি না থাকা, অসুস্থ হওয়া, নারীদের গর্ভকালীন স্বাস্থ্যের নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন কারণে সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজন হয়। এত দিন এ বিষয়গুলো তেমনভাবে চিন্তায় ছিল না। কিন্তু আমাদের উচ্চ আয়ের দেশে পৌঁছাতে হলে এগুলো লাগবেই।

সরকারকে ধন্যবাদ এ জন্য যে, এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ উদ্যোগগুলো সব জায়গায় সমপর্যায়ে পৌঁছায়নি। মোট বয়স্ক জনগোষ্ঠীর ৩৯ শতাংশ, শিশুদের ২৯ শতাংশ, গর্ভবতী নারীদের ২১ শতাংশ ও আহতদের ১৮ শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা পান। কিন্তু সেই তুলনায় শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা একেবারেই কম। কেবল আহত শ্রমিকের ১২ দশমিক ৫ শতাংশ এ ভাতা পান। কিন্তু শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বব্যাপী শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা কম।

আমাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে। ২০২৬ সালে স্বল্প আয়ের দেশ থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশে ঢুকব। এ সময়ের মধ্যে অনেক সামাজিক সূচকে উন্নতি করতে হবে। এর

মধ্যে অবশ্যই শ্রমিকের সামাজিক সূচকেও উন্নতি করতে হবে। ২০৩১ সালে উচ্চমধ্যম আয় ও ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হব। তখন আমাদের মাথাপিছু আয় হবে যথাক্রমে ৪ হাজার ও ১২ হাজার ৫০০ ডলার। এই স্তরে অন্যান্য দেশের সামাজিক সুরক্ষার তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। ২০৪১ সালে দেশে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা অনেক বাড়বে। তাঁদের জন্য বড় ধরনের সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজন হবে। এ জন্য কি আমাদের কোনো প্রস্তুতি আছে?

শ্রমজীবী গর্ভবতী নারী, অসুস্থ শ্রমিক, আহত শ্রমিক, বেকার শ্রমিক—এঁদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, এই সময় তাঁদের আয় থাকে না। তাঁরা ভীষণ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েন। এসব ক্ষেত্রে শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা নেই। তবে আশার কথা হলো, সরকারের দিক থেকে ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিমের কথা বলা হচ্ছে। এটা কার্যকর হওয়া উচিত। সরকার জিডিপি ৩ দশমিক ১ শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় করছে। কোভিডকালে এটা আরও বেড়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা, স্টাইপেন্ড, নগদ হস্তান্তর, ক্রেডিট সাপোর্ট ইত্যাদির মাধ্যমে নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে।

মাতৃকালীন ছুটি, বয়স্ক, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ অনেকের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা আছে। কিন্তু শ্রমিক আহত ও বেকার হলে তাঁর জন্য তেমন কোনো নিরাপত্তা নেই। কিন্তু করোনায় সময় ইউরোপিয়ান তহবিলের সহযোগিতায় বেকার শ্রমিকদের আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষার জন্য এখনই প্রস্তুতি নিতে হবে।

প্রথম আলো

২৫ মার্চ ২০২২

সামাজিক নিরাপত্তা জাল বিস্তৃত করা দরকার

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

৯ জুন জাতীয় সংসদে চূড়ান্ত বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী। প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটের আকার প্রস্তাব করা হচ্ছে ছয় লাখ ৭৭ হাজার ৮৬৪ কোটি টাকা, যা মোট জিডিপি ১৫.৪ শতাংশ। নতুন বাজেটে মহামারি-পরবর্তী সময়ে বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় প্রান্তিক মানুষকে রক্ষা করতে কী ব্যবস্থা থাকা দরকার, স্থানীয় শিল্প সুরক্ষায় কেমন বাজেট হওয়া উচিত, অর্থনীতিকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগকে কতটা গুরুত্ব দেওয়ার দরকার, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বরাদ্দ কেমন থাকা উচিত—এসব বিষয় নিয়ে কালের কণ্ঠের মুখোমুখি হয়েছিলেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আলী হাবিব ও আফছার আহমেদ

কালের কণ্ঠ: আগামী অর্থবছরের জন্য প্রাথমিকভাবে ছয় লাখ ৭৭ হাজার কোটি টাকার বাজেট প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা চলতি অর্থবছর থেকে ৭৪ হাজার কোটি টাকা বেশি। এবারের সম্ভাব্য বড় আকারের বাজেটকে কিভাবে দেখছেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: আমাদের মতো উদীয়মান অর্থনীতির জন্য বড় আকারের বাজেটের চাহিদা রয়েছে এবং এটাই স্বাভাবিক। আমরা করোনা-পরবর্তী পুনরুদ্ধার থেকে এখন প্রবৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হচ্ছি। এ প্রেক্ষাপটে বড় বাজেটের চাহিদা রয়েছে। একই সঙ্গে আগামী নির্বাচনের প্রেক্ষাপটও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকতে পারে।

বড় বাজেট ঘোষণার একটি রাজনৈতিক অর্থনীতিও রয়েছে। কারণ বিভিন্ন ব্যয়কে এ ধরনের বড় বাজেটে সন্নিবেশিত করা যায়। অর্জনযোগ্য বা অর্জন অযোগ্য যাই হোক, সবই এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবার এটাও ঠিক যে শুরুতেই বাজেট কাটছাঁট করে আনলে সব কিছু অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। বড় বাজেটের পেছনে এটাও ভূমিকা রাখতে পারে। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট যে অর্থবছরের শেষ পর্যন্ত বাজেটের ব্যয় লক্ষ্যমাত্রার এক-পঞ্চমাংশই অর্জন করা যায় না। ফলে দেখা যায়, অনেক প্রকল্প ঝুলে থাকে এবং ব্যয় বৃদ্ধি

পায়। সুতরাং বড় আকারের বাজেট ঘোষণা এক দিক থেকে বাজেট বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার দুর্বলতার একটি কারণ।

কালের কণ্ঠ: ব্যয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দিক থেকে বাজেটকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: আমরা প্রতিবছরই দেখতে পাই যে বাজেটে যাই থাকুক, বছর শেষে এর বেশির ভাগই অনর্জিত থাকে। যেমন—২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারের ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছিল ৮০.৯ শতাংশ। অর্থাৎ ২০ শতাংশই অনর্জিত থাকে। এর পূর্ববর্তী বছরগুলোতেও কমবেশি একই চিত্র দেখা গেছে। এই অর্জন না হওয়ার পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। এর সঙ্গে সম্ভবত সরকারের রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অনর্জিত থাকার যোগসূত্র রয়েছে। এই অর্জনের মাত্রাটি বিবেচনা করে বাজেটের আকার বলতে মূলত সরকার অর্থবছরের প্রথম ৯ মাস পর করা সংশোধনী বাজেটকেই মূল আকার হিসেবে গণ্য করতে চায়। ফলে সংশোধনী বাজেটের কতটুকু অর্জিত হয়েছে সেটিকেই লক্ষ্য অর্জনের নির্দেশক হিসেবে দেখে। ফলে বড় বাজেট ঘোষণার সঙ্গে বাস্তবায়নের একটি ফারাক সব সময়ই থেকে যায়।

কালের কণ্ঠ: খাতওয়ারি বরাদ্দে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: বাজেটের আকার বড় হয়ে ওঠার পেছনে আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ রয়েছে। খাতভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আমরা এতে বড় কোনো পরিবর্তন দেখতে পাই না। বিদায়ি ২০২১-২২ অর্থবছরে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, সরকারি কর্মীদের পেছনে ১৯ শতাংশ, শিক্ষার পেছনে ১৬ শতাংশ, সড়ক ও পরিবহনে ১২ শতাংশ, সুদর্জনিত ব্যয় ১১.৪ শতাংশ, স্থানীয় সরকারে ৭ শতাংশ, প্রতিরক্ষায় ৬ শতাংশ এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ৫ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়। এবারের সম্ভাব্য বড় আকারের বাজেটেও এই কাঠামোতে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না। তবে পাবলিক সার্ভিস বা সরকারি কর্মীদের পেছনে এত বড় ব্যয় প্রশ্নসাপেক্ষ। আমাদের সুদর্জনিত ব্যয়টাও দিন দিন ব্যয়ের বড় খাত হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। যেমন—সুদর্জনিত ব্যয়ের জন্য আগামী অর্থবছরের জন্য সম্ভবত ৮১ হাজার কোটি টাকা রাখা হচ্ছে। অথচ চলতি অর্থবছরে সুদর্জনিত ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে ৬৭ হাজার কোটি টাকা। এটা বড় বাজেটের পেছনে ভূমিকা রাখছে। এ ছাড়া পাবলিক সার্ভিসের বাইরে প্রতিরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে এমন কিছু ব্যয় ঢুকে আছে, যা প্রকারান্তরে পাবলিক সার্ভিসের ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ারই কথা।

কালের কণ্ঠ: বাজেটের আকার বড় হচ্ছে। অথচ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা জিডিপি তুলনায় এবার আরো কম ধরা হচ্ছে। বিষয়টি কিভাবে দেখছেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: জানা গেছে, আগামী অর্থবছরের বাজেটে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হচ্ছে চার লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপি ৯.৮ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে তিন লাখ ৯৮ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপি

১১.৩ শতাংশ। অর্থাৎ নতুন বছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৩৫ হাজার কোটি টাকা বাড়লেও রাজস্ব আদায়ের হার জিডিপির তুলনায় প্রায় ২ শতাংশ কমানোর প্রস্তাব করা হচ্ছে। এর একটি কারণ হতে পারে বড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির কারণেই হয়তো শতাংশ হিসাবে আমরা কিছুটা কম পাচ্ছি। তবে এটাও ঠিক যে জিডিপির তুলনায় রাজস্ব আয় বৃদ্ধির অনুপাতটি প্রকৃতার্থেই আরো বাড়ানো দরকার। আরেকটা বিষয় হতে পারে যে রাজস্ব আদায়ের কাঠামোতে বড় কোনো পরিবর্তন আসছে না। অর্থাৎ রাজস্ব আদায় বাড়ানোর জন্য সম্ভবত নতুন কর বাড়ছে না। ফলে জিডিপির তুলনায় কম রাজস্ব আদায় হবে।

কালের কণ্ঠ: দেশের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা অনিশ্চয়তায়। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করা লোকদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নতুন করে দারিদ্র্যে পড়া লোকজন। মধ্যবিত্তের একটা অংশও বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তাদের সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়ে বাজেটে কী থাকতে পারে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে বাজেট ও বাজেট-বহির্ভূত দুই ধরনের উদ্যোগই দরকার আছে। বাজেটীয় উদ্যোগের ভেতরে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি একটি উপায়। অবশ্য সরকার প্রতিবছর এর আওতা বাড়ানো— এটা ইতিবাচক। এ ক্ষেত্রে শুধু বয়স্ক, বিধবা, একক মা, স্তন্যদাত্রী মায়েদের নিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা জালের আওতা বৃদ্ধিই নয়, অর্থের পরিমাণও বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন—বয়স্কদের জন্য ভাতা ৫০০ টাকার স্থলে ৬০০ টাকায় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু এটা এক হাজার টাকা হওয়া উচিত। করমুক্ত আয়সীমা বৃদ্ধি করা হলে মধ্যবিত্তকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়া যেতে পারে। তাহলে হয়তো তার প্রকৃত আয় বৃদ্ধির একটু সুযোগ থাকে। এ ছাড়া কর্মসংস্থান সহায়ক সরকারি বিনিয়োগও বৃদ্ধি করা উচিত।

বাজেট-বহির্ভূত জায়গা থেকে বলব, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাজারে নিয়মিত নজরদারি বাড়ানো উচিত। সে ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা কমিশন ও ভোক্তা অধিকার কমিশনসহ বাজার নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা খুব দরকার। সরকারের আইনগত ও নীতিগত অবস্থান থেকে এদের শক্তিশালী করা দরকার।

কালের কণ্ঠ: আমাদের অর্থনীতির প্রধান তিনটি স্তম্ভ— কৃষি, রেমিট্যান্স ও রপ্তানি—এই তিন খাতের জন্য বাজেটে কী কী প্রস্তাব থাকতে পারে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: কৃষি খাতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে সারের ভর্তুকি অব্যাহত রাখা। এই মুহূর্তে সরকারকে গ্যাস আমদানি করতে গিয়ে প্রচুর ব্যয় করতে হচ্ছে, ফলে সারের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাড়তি যে টাকার প্রয়োজন হয় সেটা দিতে সরকারকে প্রস্তুত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, কৃষকের উৎপাদন ব্যয় যদি কম হয়, তাহলে তা ভোক্তার জন্যও শাস্ত্রীয় হবে। একই সঙ্গে ভর্তুকি মূল্যে সার পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৫০ সালে আমাদের ধান উৎপাদন ১১ শতাংশ কমে যেতে পারে বলে পূর্বাভাস রয়েছে। তাই কৃষিতে জলবায়ু অভিযোজনমূলক প্রকল্প নিতে হবে, বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকায়।

রেমিট্যান্সের জন্য আড়াই শতাংশ ভর্তুকির যে ব্যবস্থা আছে সেটা অব্যাহত রাখতে হবে। এর সঙ্গে যা করা দরকার তা হচ্ছে কার্ব মার্কেটের সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার এক্সচেঞ্জ রেটে পাঁচ থেকে ছয় টাকার পার্থক্য রয়েছে। এত বড় পার্থক্য থাকলে সরকারের পক্ষে আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে রেমিট্যান্স আনা কষ্টকর হবে। সুতরাং এ জায়গায় কিছুটা হলেও এক্সচেঞ্জ রেট সমন্বয় করার দরকার হতে পারে, যাতে প্রবাসীরা আনুষ্ঠানিক চ্যানেলে অর্থ পাঠাতে উৎসাহী হন।

আমাদের রপ্তানি খাত ভালো করছে। তবে এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত কিছু সিদ্ধান্ত দরকার। রপ্তানি খাতে যে ভর্তুকি দেওয়া হয় সেটা একক খাতভিত্তিক। এর পরিবর্তন দরকার। অর্থাৎ পুরনো খাত থেকে অর্থ সরিয়ে এনে নতুন খাতকে ভর্তুকি দেওয়া। যেমন—তৈরি পোশাক খাতে ঢালাওভাবে ভর্তুকি না দিয়ে নতুন ধরনের পণ্য, যেমন—সিনথেটিক পণ্য, নন-কটন পণ্য উৎপাদন করার জন্য কেউ যদি প্রযুক্তি আনেন, যন্ত্রপাতি আনেন, কাঁচামাল আনেন অথবা রপ্তানি বৃদ্ধি করেন, তাহলে তার জন্য ভর্তুকি বা ক্যাশ ইনটেনসিভ দেওয়া দরকার। অথবা পরিবেশ উপযোগী মানসম্মত কোনো প্রযুক্তিতে যাওয়া অথবা পণ্যবহুমুখীকরণের জন্য কেউ যদি বিনিয়োগ করেন বা রপ্তানি করেন, তাঁদের ক্যাশ ইনটেনসিভ দেওয়া উচিত।

কালের কণ্ঠ: মহামারি ও মূল্যস্ফীতির প্রেক্ষাপটে প্রান্তিক মানুষকে রক্ষা করতে বাজেটে কেমন বরাদ্দ থাকা দরকার বলে মনে করেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: করোনাকালে সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজে এই শ্রেণির লোকদের আড়াই হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। কিন্তু মূল্যস্ফীতি সময়টাকে ধরে এই উদ্যোগটা আরো প্রলম্বিত করতে পারলে আরো ভালো হতো। প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ হিসেবে দলিত, হিজড়া, নারী ও শিশু, চরাঞ্চলের মানুষ, জলবায়ু উদ্বাস্তু, নদীভাঙনজনিত উদ্বাস্তু, দরিদ্র এথনিক গ্রুপ, শহরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী তথা বস্তিবাসী রয়েছে। সৌভাগ্য হচ্ছে, সরকার এরই মধ্যে এদের চিহ্নিত করছে। তাদের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি বলব, তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা জাল বিস্তৃত করা দরকার, যা উল্লেখ করছি। এ ছাড়া এই শ্রেণির লোকজন যে এলাকাগুলোতে বসবাস করে, যেমন—নদীভাঙনপ্রবণ এলাকা, চর এলাকা, উপকূলবর্তী এলাকা—বাজেটে এসব প্রান্তীয় এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নে বরাদ্দের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হলে মানুষের দারিদ্র্য আরো বেড়ে যায়।

কালের কণ্ঠ: স্বাস্থ্য খাতে কেমন বরাদ্দ আশা করেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: কোভিডের সময় এত আলোচনার পরও আমাদের স্বাস্থ্য খাতে বড় পরিবর্তন আমরা দেখিনি। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ব্যবহারের সক্ষমতার একটা দুর্বলতা রয়েছে। এর ভেতরে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হচ্ছে কোভিডের টিকাদান কার্যক্রম। নানা সীমাবদ্ধতা ও ঘাটতি সত্ত্বেও টিকা গ্রহণ উপযোগী ৭৬ শতাংশ মানুষ টিকা নিয়েছে—এটা সরকারের সফল কার্যক্রম। তবে কিছু ব্যয়ের ক্ষেত্রেও বড় প্রশ্ন রয়েছে। তবে স্বাস্থ্য খাতে সবচেয়ে বড় দরকার হলো সর্বজনীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা। এ জন্য কমিউনিটি সার্ভিস, কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোকে আরো উন্নত করা দরকার ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রীর দিক

থেকে। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সাধারণ ও বিশেষায়িত চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করা দরকার। এখানে স্বাস্থ্য খাতে বড় সরকারি বিনিয়োগের অভাবে আমাদের চিকিৎসা বেসরকারি ব্যবস্থার ওপরই বেশি নির্ভরশীল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের স্বাস্থ্য খাতের ব্যয় আফগানিস্তানের পর সর্বোচ্চ। এই খাতে শাস্ত্রীয় সরকারি বিনিয়োগ বাড়তে হবে।

কালের কণ্ঠ: স্থানীয় শিল্প সুরক্ষায় কেমন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: স্থানীয় শিল্পের সুরক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের স্বাভাবিক যে কাঠামো রয়েছে সেটা হচ্ছে কর ছাড়া এবং কিছু ক্ষেত্রে করারোপ। এর মাধ্যমে আমদানি পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেশে উৎপাদিত পণ্য বেশি সুবিধা পায়। এটা অব্যাহত রাখার বিকল্প নেই। এর পাশাপাশি বেসরকারি খাতে ঋণের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সরকারের ভর্তুকীকৃত ঋণ (সাবসিডাইজড ক্রেডিট) কিভাবে বাড়ানো যায় সে ব্যবস্থা করা দরকার। করোনা-পরবর্তীকালে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অনেক অর্থের প্রয়োজন। তার পক্ষে উচ্চ সুদে ঋণ নেওয়া কঠিন। তারা ঋণ পায়ও কম। বাজেটে তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা দরকার। এ ছাড়া এসএমই ফাউন্ডেশন এবং এনজিও যারা মাইক্রো এন্টারপ্রাইজে ঋণ দেয়, তারা যেন তাদের দিকে এগিয়ে আসে সে জন্য সাবসিডাইজড ক্রেডিটের প্রভিশনটা সরকার চিন্তা করতে পারে। এটা জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বেশি পরিমাণে দিতে হবে।

কালের কণ্ঠ: গত দুই বছরে বিদেশফেরত, বেকার এবং করোনায চাকরি হারিয়েছে অনেক মানুষ। এ অবস্থায় অর্থনীতিকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে কী করা যেতে পারে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগে বড় ভূমিকা পালন করে বেসরকারি খাত এবং এ ক্ষেত্রে সরকার অনুঘটকের ভূমিকায় থাকে। এই অনুঘটকটি হচ্ছে সরকারি বিনিয়োগ। সরকারি বিনিয়োগ দিন দিন বাড়ছে। বিগত অর্থবছরে এটা জিডিপি প্রায় ৮ শতাংশ ছিল। কিন্তু উল্লেখ করার মতো বিষয় হচ্ছে, সরকারি বিনিয়োগ যে হারে বাড়ছে, সে হারে দেশের বিনিয়োগকারী তথা বেসরকারি উদ্যোক্তারা প্রস্তুত অবকাঠামো পাচ্ছেন না। সড়ক, রেল, বন্দর ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশাল বিশাল বিনিয়োগ হয়েছে। এ জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সরকারি বিনিয়োগের প্রকল্পগুলো সময়মতো শেষ করা, যাতে এর সুফল মানুষ পেতে পারে, যাতে বেসরকারি খাত সুবিধা নিতে পারে, বিনিয়োগে আগ্রহী হয় এবং এর মধ্য দিয়ে যাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।

কালের কণ্ঠ: আমদানির তুলনায় রপ্তানি বাড়েনি। রেমিট্যান্সের পতন হচ্ছে। চাপে পড়েছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। এ অবস্থায় বাজেটে কী উদ্যোগ থাকতে পারে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: তুলনামূলকভাবে রপ্তানি কম হয়েছে কথাটি সত্য হলেও এই সময়ে আমাদের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ঈর্ষণীয়। রপ্তানির প্রায় ৩০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দেশে অত্যধিক পরিমাণে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির কারণে আমদানি বেশি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

এমন নয় যে আমরা অনেক বেশি আমদানি করছি। আসলে পেট্রোলিয়াম বা ভোগ্যপণ্য আমদানি করতে আমাদের অনেক বাড়তি অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। এ কারণেই আমদানির সঙ্গে রপ্তানির ফারাক বেশি মনে হচ্ছে। অতিরিক্ত আমদানি ব্যয়ের কারণে রিজার্ভের ওপর চাপ পড়ছে। এ ক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির গতি ধরে রাখা এবং ফরমাল চ্যানেলে রেমিট্যান্স আসা বাড়ানো। এ ছাড়া বৈদেশিক উৎস থেকে সরকারের যে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ, এগুলো কোনো কারণে বিলম্ব না করে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ ব্যাংক এলসি মার্জিন বাড়িয়ে বিলাসদ্রব্য আমদানি নিরুৎসাহ করছে—এটা ভালো দিক। এর পাশাপাশি বাজেটের ভেতর থেকেও কর কাঠামোকে ব্যবহার করে বিলাসদ্রব্য আমদানিতে রাশ টেনে ধরা যাবে।

কালের কণ্ঠ: গত বাজেটে গার্হস্থ্য ব্যবহারের ইলেকট্রনিকস উৎপাদনকারী, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও মোটরযান প্রস্তুতকারীদের যে সুবিধা দেওয়া হয়, এগুলো সার্বিকভাবে দেশি শিল্পকে কি নতুন গতি দিতে পেরেছে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: সরকারের করনীতির একটি উল্লেখযোগ্য উপকারভোগী আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেশে ধীরে ধীরে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প গড়ে উঠছে। এর ফলে আমরা দেশি উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি উদ্যোক্তাদেরও বিনিয়োগ করতে দেখছি। কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পেও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়তে দেখছি। ফলে কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে রপ্তানি বেড়ে এক বিলিয়ন অতিক্রম করেছে ২০২১ অর্থবছরে। মোটরযানের ক্ষেত্রে অন্তত মোটরসাইকেল উৎপাদনে আমরা বড় সুফল দেখতে পাচ্ছি। বাংলাদেশে কৃষিতে যেভাবে উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে, তাতে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের তেমন বিকল্প নেই। তাই কৃষি যান্ত্রিকীকরণের সুবিধাগুলো অব্যাহত রাখতে হবে।

কালের কণ্ঠ: সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: কালের কণ্ঠকেও ধন্যবাদ।

কালের কণ্ঠ

২৭ এপ্রিল ২০২২

নিম্ন আয়ের মানুষকে সুরক্ষা দিতে ভতুঁকি বাড়ানো উচিত

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

করোনার প্রকোপ কমার পর বিশ্বের কয়েকটি দেশে আবার নতুন করে এ মহামারিটির সংক্রমণ বাড়ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইউক্রেন যুদ্ধের অনিশ্চয়তা। আন্তর্জাতিক বাজারে বেড়ে গেছে ভোজ্য ও জ্বালানি তেলের দাম। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামও বাড়ছে হুহু করে। এছাড়া বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ মারাত্মকভাবে কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এরই মধ্যে ইন্দোনেশিয়া পাম তেল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা জারির পর বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় চলছে তুলকালাম। টিসিবির ট্রাকের পেছনে লম্বা হচ্ছে নিম্ন আয়ের মানুষের লাইন। মূল্যস্ফীতির ধাক্কায় চাপে পড়েছে মানুষ। এ অবস্থায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উচ্চমূল্য নিয়ন্ত্রণ করাই সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

মূল্যস্ফীতির বাইরেও বাজেটে আরও দু'টি বিষয়ে এবারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এর একটি হলো নিম্ন আয়ের মানুষকে দ্রব্যমূল্যের চাপ থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য ভতুঁকি বাড়ানো এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মনোযোগী হওয়া।

আগামী বাজেট সামনে রেখে মন্তব্য করলে বলা যায় যে, এবারের বাজেটের দু'টি মূল লক্ষ্য থাকা উচিত। একটি হলো দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং উচ্চ মূল্যস্ফীতি থেকে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা। এজন্য বাজেটে কর-শুল্কের দিক থেকে, সরকারি ব্যয়ের দিক থেকে এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের দিক থেকে কী কৌশল গ্রহণ করা হয় সেটাই সবার দেখার বিষয়।

কাগজে-কলমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ আছে— এটি শুধু বাজেটে তুলে ধরলে হবে না; এটার কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা-ও স্পষ্ট করতে হবে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে যেমন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর শুল্ক-কর কমানোর বিষয় আছে, তেমনি দেশি শিল্পকে সহায়তা দিতে হবে। বিশেষ করে বাজারে পণ্যের জোগানের দিকটাকে শক্তিশালী করতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা যারা আছেন তাদের সহায়তা দেওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত হলো, যেসব পণ্য আমদানি নীতিতে আছে, বিশেষ করে কাঁচামাল আমদানি সহজ করে বাজারের উর্ধ্বগতি সামাল দেওয়ার কৌশল গ্রহণ করতে হবে। প্রবৃদ্ধিনির্ভর বাজেটে একটি প্রাগৈতিহাসিক অর্থনৈতিক চিন্তা। এখন আমরা যে এসডিজি (টেকসই উন্নয়ন অঙ্গীকৃত) যুগে বসবাস করি, সেখানে শোভন কর্মসংস্থান হওয়া উচিত মূল লক্ষ্য। এজন্য বাজেটে প্রাক্কলন থাকা উচিত। প্রতি বছর যে জনশক্তি শ্রমবাজারে আসছে, তাদের মধ্যে কতজন সরকারি খাতে, কতজন বেসরকারি খাতে এবং কতজন স্বনিয়োজিত হবে এর একটা লক্ষ্য ঘোষিত হওয়া উচিত। প্রতি বছর যে ২০ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে আসছে তার মধ্যে কতজনের দেশে আর কতজনের বিদেশে কর্মসংস্থান হবে তারও প্রাক্কলন থাকতে হবে। এসব লক্ষ্য বা প্রাক্কলন অর্জিত হচ্ছে কি না, ধারাবাহিকভাবে তারও মূল্যায়ন করা উচিত।

মহামারি-উত্তর যুগে যেখানে ব্যাপকভাবে আয় কমে গেছে, যেখানে প্রচলিত বেকারত্ব বেড়েছে সেখানে এবারের বাজেটে কর্মসংস্থানের বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়ার দাবি রাখে। যুদ্ধের কারণে নিত্যপণ্য বিশেষ করে খাদ্যপণ্য নিয়ে যে সংকট হচ্ছে তা মোকাবিলায় দেশি উৎপাদন এবং বিকল্প উৎস থেকে পণ্য আহরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া দেশি শিল্পের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন দক্ষতা বাড়ানোর দিকেও নজর দিতে হবে।

বাজেটে সাধারণ মানুষের বাজেটে অগ্রাধিকার দিতে হবে। দেশের সব মানুষকে গড় হিসাবে না ধরে, বিশেষ করে পিছিয়ে থাকা নিম্ন আয়ের মানুষকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনার দিকে যেতে হবে। ফলে এবারের বাজেটেও সরকারের ভতুকের ব্যাপারটাও বড়ভাবে আসবে।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

১১ মে ২০২২

নিম্ন আয়ের মানুষকে সহায়তা দিতে হবে

মোস্তাফিজুর রহমান

নিত্যপণ্যের দাম বাড়ায় নিম্ন আয়ের মানুষ কষ্টে আছেন। এবারের বাজেটে তাই নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সহায়তার দরকার হবে। নিম্ন আয় ও নিম্নমধ্যবিত্তের জন্য খোলাবাজারে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রির আওতা ঢাকার বাইরে বিস্তৃত করা দরকার। খাদ্যসহায়তা ও নগদ সহায়তার মতো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

আগের তুলনায় খাদ্যপণ্যের প্রাপ্যতা বাড়ানো, ভিডি বা আওতা বাড়ানো এবং আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানোর প্রতিও জোর দিতে হবে সরকারকে। বাজেটে সে সংস্থান থাকা উচিত। আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য হয়তো পরে কমে যাবে। তখন আমরা একটা স্বস্তি পাব। তার আগে এখন এসব কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষকে স্বস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা জরুরি।

সরকার রোজার আগে মানুষকে স্বস্তি দিতে ভোজ্যতেল ও চিনির মতো নিত্যপণ্য আমদানিতে গুরুত্ব করে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছাড় দিয়েছিল। বিশ্ববাজারে নিত্যপণ্যের দাম এখনো সহনীয় পর্যায়ে আসেনি। মূল্যস্ফীতির চাপও বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে দাম না কমা পর্যন্ত আবারও গুরুত্ব-কর সমন্বয় করা যেতে পারে। এতে নিত্যপণ্যের দাম একটু সহনীয় হতে পারে।

সংকট কাটাতে ডলারের দাম বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়ায় স্বাভাবিকভাবে পণ্য আমদানিতে খরচ বাড়বে। পণ্য আমদানির খরচের চাপ বাড়লেও এই সিদ্ধান্ত ঠিকই আছে। একটা পর্যায়ে এসে ডলারের বিনিময় মূল্য স্থিতিশীল হবে। এর আগে ২০১২ সালেও বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়ায় ডলারের বিনিময় মূল্য ৭৬ টাকা থেকে বেড়ে ৮৪ টাকায় উন্নীত হয়েছিল।

পরে আবার ৮১ টাকায় নেমে স্থিতিশীল হয়েছে। বাজার ব্যবস্থাপনা ঠিক করার মাধ্যমে মূল্যের চাপ ঠিক করা দরকার। আমাদের এখানে আমদানিকারক ও উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত বাজার ব্যবস্থাপনা দুর্বল। দুর্বল ব্যবস্থাপনায় মধ্যস্বত্বভোগীরা সুবিধা নেয় বেশি। এই ব্যবস্থাপনা উন্নত করা গেলে ভোক্তাকে স্বস্তি দেওয়া যায়।

নিত্যপণ্যের বাজার যখন খুব অস্থির হবে, তখন এটিকে স্থিতিশীল রাখতে সরকারের হাতে যে মজুত থাকে তার কৌশলী ব্যবহার করতে হবে। সরকারের হাতে ১২-১৩ লাখ টন চাল-গমের মজুত থাকে। বাজার অস্বস্তিকর পর্যায়ে গেলে সুবিধামতো সময়ে মজুত ছেড়ে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে পারে সরকার।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পর খাদ্যপণ্য রপ্তানিতে নানা বিধিনিষেধ দিয়েছে অনেক দেশ। সংকটকালে বৈশ্বিক বাজারে খোঁজখবর রাখা উচিত যাতে কোনো দেশ নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার আগে আভাস পাওয়া যায়। আবার সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্যপণ্য আমদানির জন্য বৈশ্বিক বাজার অনুসন্ধানে সরকারের নজর দেওয়া দরকার। তাহলে হঠাৎ করে বিপদে পড়তে হবে না।

এবারের সংকটের কথা মাথায় রেখে আগামী বাজেটে মধ্যমেয়াদি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। এখন খাদ্যপণ্যের সুরক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। বিষয়টি মাথায় রেখে কৃষিপণ্যের উৎপাদন বাড়াতে নজর দিতে হবে।

কৃষি গবেষণা, প্রযুক্তি খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো উচিত। এতে আমরা যেসব পণ্য উৎপাদন করি, সেগুলোর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বাড়তে পারে। আমদানিনির্ভর যেসব পণ্য দেশে উৎপাদন করা যাবে, সেদিকেও নজর দিতে হবে। দেশে উৎপাদন বাড়লে সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্যপণ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব হতে পারে।

প্রথম আলো

৫ জুন ২০২২

ফ্যামিলি কার্ডে নয়ছয়ে কার লাভ?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

সামষ্টিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এই মুহূর্তে এক জটিল পরিস্থিতি পার করছে। এর মূল কারণ চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম। ডলারের সঙ্গে টাকার বিনিময়ে ফারাক তৈরি হওয়ায় সংকট বাড়ছে। বিভিন্ন পণ্যে ভর্তুকির কথা বলে সরকার জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে কৃষি, পরিবহন ও উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত খাতে। জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার পরপরই বাজারে প্রায় সব পণ্যের দাম বেড়ে গেছে।

জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার পর সরকার শুধু পরিবহন ভাড়া নির্ধারণ করে দিয়েছে। যদিও সেই নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত আদায়ের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে প্রতিদিন। কিন্তু জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোর পর অন্যান্য পণ্যের দাম কী হারে বাড়বে, সে বিষয়ে সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের কোনো আলোচনা হয় না। ফলে ব্যবসায়ীরা সুযোগ নিয়ে ইচ্ছামতো দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে। এটি আগেও হয়েছে। এবারও ভোক্তারা বিক্রেতাদের কাছে জিম্মি হয়ে থাকছে। ব্যবসায়ীরা যুক্তি দিচ্ছে, বাড়তি ব্যয় সামাল দিতে গিয়ে দাম বাড়াতে হচ্ছে। তাদের যুক্তির সঙ্গে বাস্তবতার অনেক ফারাক। যেমন ডিজেলের দাম লিটারে ৩৪ টাকা বাড়ার অজুহাতে চালের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ডিজেলের দাম বাড়ায় সেচকাজে বাড়তি খরচ হবে, এটা সত্য। কিন্তু এর প্রভাব পড়ার কথা আগামী মৌসুমের পর। বর্তমানে চালের বাজারে শুধু পরিবহন খাতের প্রভাব পড়ার কথা। এতে সামান্য দাম বাড়ার কথা থাকলেও জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার প্রতিক্রিয়ায় চালের দাম বেড়েছে কেজিতে ৪ থেকে ১৫ টাকা। একইভাবে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার অজুহাতে ব্রয়লার মুরগি, ডিম, মাছসহ সব ধরনের সবজি ও মুদি পণ্যের দাম অযৌক্তিকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে ব্যবসায়ীরা।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির এই দুর্যোগকালে নিম্ন আয়ের মানুষ সবচেয়ে বেশি কষ্টে আছে। এ অবস্থায় এক কোটি মানুষের কাছে ফ্যামিলি কার্ডের আওতায় টিসিবির মাধ্যমে খোলাবাজারে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। খোলাবাজারে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি অব্যাহত রাখার পাশাপাশি সম্ভব হলে আরও বেশিসংখ্যক মানুষকে এই ফ্যামিলি কার্ডের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এরই মধ্যে অভিযোগ উঠেছে,

অনেক নিম্ন আয়ের মানুষ ফ্যামিলি কার্ড পাচ্ছে না। বিপরীতে সামর্থ্যবান অনেকে, যাদের এই কার্ডের জন্য অযোগ্য বলা যেতে পারে, তারা কার্ড পেয়েছে। রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে কার্ড বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে দায়িত্বশীলদের বিরুদ্ধে।

ফ্যামিলি কার্ড বিতরণে জড়িত সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যাপারে নজরদারি বাড়ানো দরকার। সরকার পর্যালোচনা করে দেখতে পারে, কত সংখ্যক যোগ্য পরিবার এই কার্ডের বাইরে থেকে গেছে। একই সঙ্গে অযোগ্য কত সংখ্যক পরিবার এর আওতায় চলে এসেছে। তারপর অযোগ্যদের বাদ দিয়ে যোগ্য পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারে। কার্ডধারীরা যাতে চাহিদামতো পণ্য পায়, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে। এর আগে আমরা দেখেছি, বারবার দিন-তারিখ নির্ধারণ করেও পণ্য সরবরাহ করতে পারেনি টিসিবি। কোথায় সংকট তা শনাক্ত করে দ্রুত সমাধান করতে হবে। আর ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ দ্রুততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে করতে হবে।

বৈশ্বিক কারণে এই মুহূর্তে সরকারের আর্থিক টানাপোড়েন থাকলেও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম কমিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে সেই টানাপোড়েন দরিদ্র মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত হবে না। দরকার হলে সরকারের অন্যান্য খাত থেকে অর্থ সাশ্রয় করে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের পরিসর আরও বাড়তে হবে। তেল, চিনি, ডাল, পেঁয়াজের পাশাপাশি আরও বেশি সংখ্যক পণ্য ফ্যামিলি কার্ডের আওতায় নিয়ে আসা উচিত। কারণ এই মুহূর্তে বাজারে সব পণ্যের দামই এসব মানুষের ক্রয়সীমার বাইরে চলে গেছে। মাসে একবার না দিয়ে এটা প্রয়োজনে প্রতি সপ্তাহে দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ কার্ডধারী সবাইকে চাহিদা অনুযায়ী পণ্য নিশ্চিত করতে হবে। সরকার বিভিন্ন খাতে ব্যয় সংকোচনের কথা বললেও তার বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সরকারের ব্যয় সাশ্রয় নীতি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করা দরকার। অর্থনৈতিক অপচয় কোনোভাবে যাতে না হয়, তা তদারক করতে হবে। তাহলে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসবে।

পাশাপাশি সাধারণ বাজারেও সরকার সব পণ্যের দাম বেঁধে দিতে পারে। সেই দামের তালিকা সংবাদমাধ্যমে বারবার প্রচার করে ভোক্তাদের সচেতন করতে হবে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, জাতীয় প্রতিযোগিতা কমিশনসহ প্রশাসনকে বাজার তদারকিতে আবারও নামতে হবে। অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে অভিযানের পর ভোক্তারা সীমিত আকারেই সুফল পাবে। আর বড় পরিসরে সুফল আনতে হলে জ্বালানি তেলের দাম আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া জরুরি। বিশেষত বৈশ্বিক বাজারে যখন জ্বালানি তেলের দাম কমছে, তখন অভ্যন্তরীণ বাজারে তেলের বাড়তি দাম নির্ধারণ কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

প্রসঙ্গত, গত সাত বছরে (২০১৫-২০২১) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) জ্বালানি তেল বিক্রি করে ৪৬ হাজার ৮৫৮ কোটি টাকা লাভ করেছে। এই তথ্য খোদ অর্থ

মন্ত্রণালয়ের। এর মধ্যে ১০ হাজার কোটি টাকা সরকারকে দিয়েছে বিপিসি। বাকি ৩৬ হাজার কোটি টাকা গেল কোথায়? বিপিসি যেহেতু সব সময় জ্বালানি তেল বিক্রি করে লাভ করেছে; তাহলে এখন ভত্থুকি তুলে নেওয়া হলো কোন যুক্তিতে?

আমরা সিপিডি'র গবেষণায় দেখিয়েছি, কীভাবে বছরের পর বছর লাভ করার পরও জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়ে ভোক্তাদের ওপর বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে বিপিসি। অথচ সুসময়ের বাড়তি আয় দিয়েই বর্তমান দুঃসময় সামাল দেওয়া যেত। বিপিসি থেকে সরকার বছরে যে ৯ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব পায়, সেটা সাময়িক ছাড় দিলেই জ্বালানি তেলের বাড়তি মূল্য সমন্বয় হয়ে যেত। একদিকে সাধারণ মানুষ সঞ্চয় ভেঙে খাচ্ছে; অন্যদিকে সঞ্চয় বাড়াচ্ছে বিপিসি— এই চিত্র একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্রব্যবস্থায় কল্পনা করা যায় না।

আগেই বলেছি, সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জ্বালানি তেলের সম্পর্ক থাকায় নিম্ন আয়ের মানুষ তো বটেই; মধ্যম আয়ের মানুষকেও জীবন ধারণে হিমশিম খেতে হচ্ছে। এর মধ্যে নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য নির্ধারিত ফ্যামিলি কার্ডেও যদি দুর্নীতি ও দীর্ঘসূত্রতা দেখা যায়; এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কী হতে পারে! একদিকে জ্বালানি তেলের অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধি, অন্যদিকে ফ্যামিলি কার্ড নিয়ে নয়ছয়— এ চিত্র যেন বহুল প্রচলিত বাংলা প্রবাদকেই সার্থক করে তুলছে; গোদের ওপর বিষফোড়া। এতে কারা লাভবান হচ্ছে? সরকার একবার ভেবে দেখুক।

সমকাল

২৩ আগস্ট ২০২২

সুরক্ষার আওতা বাড়তে হবে

মোস্তাফিজুর রহমান

তেলের দাম বাড়ানোর ফলে ভোক্তার ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হবে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান। ভোরের কাগজকে তিনি বলেন, সাধারণ ভোক্তা চাপে পড়বে এটা যেমন সত্যি, তেমনি বাড়তি ডলারের প্রভাব আমদানিকৃত পণ্যে পড়ছে— এ বিষয়টিও মানতে হবে। তিনি বলেন, কতটুকু বাড়ানো দরকার ছিল, আর কতটুকু বেড়েছে, এ বিষয়গুলো সরকারি সংস্থাগুলোর নজরদারি করা প্রয়োজন। বিশ্ববাজারের দাম এবং এক্সচেঞ্জ রেটের যে অভিঘাত, সেটা মিলিয়ে দাম নির্ধারণ করা হয়। তবে সে দাম কতটা যৌক্তিক হয়েছে, তা দেখার প্রয়োজন রয়েছে। এ অর্থনীতিবিদ বলেন, এমনিতেই নিত্যপণ্যের বাজারে আগুন। প্রতিনিয়ত প্রায় সব পণ্যের দাম বাড়ছে। এমন সময়ে নতুন করে ভোজ্যতেলের দাম বাড়ালে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার ওপর এটা বাড়তি এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করবে। সরকারকে ব্যবসায়ীদের স্বার্থ যেমন দেখতে হবে, তেমনি সাধারণ ভোক্তার স্বার্থও দেখতে হবে। বিষয়টি সাংঘর্ষিক। এক্ষেত্রে সরকারের সামাজিক কর্মসূচির আওতা আরো বাড়তে হবে। আগে থেকেই সরকারকে সতর্ক অবস্থান নিতে হবে। কারণ অনিশ্চয়তা বেড়েই চলেছে।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, দাম বাড়ানোর বেলায় দ্রুততা থাকলেও কমানোর ক্ষেত্রে বিলম্ব দেখা যায়। ভোজ্যতেলের সঙ্গে কোটি কোটি ভোক্তার স্বার্থ জড়িত। সুতরাং এক্ষেত্রে অবশ্যই দ্বিগুণ সতর্কতা নিতে হবে। আবার দাম কমাতেও আন্তর্জাতিক বাজারে যে পরিমাণ কমে দেশের বাজারে সে পরিমাণ কমে না। এক্ষেত্রে সামঞ্জস্য থাকা জরুরি। এছাড়া কী পরিমাণ আমদানি, মজুদ ও সরবরাহ হচ্ছে, সেদিকেও সরকারের কড়া নজরদারি থাকতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের ভোজ্যতেলের বাজারে হাতেগোনা কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠান আমদানি ও সরবরাহ করে থাকে। এখানে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন যে, এ খাতে নতুন প্রতিষ্ঠানের প্রবেশের ক্ষেত্রে কোনো বাধা রয়েছে কিনা। পাশাপাশি কোনো সিডিকেট রয়েছে কিনা, তাও দেখতে হবে। থাকলে অবশ্যই সেগুলো ভাঙতে হবে।

ভোরের কাগজ

২৪ আগস্ট ২০২২

স্বল্প আয়ের মানুষ আগামীতে পণ্য ক্রয়ের ক্ষমতা হারাবে

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

খাদ্য উৎপাদনে এখন অন্ধি আমরা পুরোপুরি স্বয়ংসম্পূর্ণ নই। যদিও চাল, শাক-সবজি ইত্যাদি উৎপাদনে আমাদের অবস্থান ভালো। তবে কিছু কিছু খাদ্য যেমন তেল, চিনি, গম, পেঁয়াজ ইত্যাদির জন্য আমাদের আমদানি বাজারের উপর নির্ভর করতে হয়। মানুষের আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা বাড়ছে এবং আমদানিকৃত পণ্যের উপরও চাপ বাড়ছে। ফলে দেশের ভেতর উৎপাদিত পণ্যের সাহায্যে আমাদের আগামী বছরের চাহিদা মিটাতে পারব।

যে সমস্ত পণ্য উৎপাদনের জন্য আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করতে হবে সেই জায়গাটিতে যেহেতু বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে আসছে, প্রতি মাসেই গড়ে প্রায় ৮-৩০ মিলিয়ন ডলার কমছে, সেটি যদি অব্যাহত থাকে সেক্ষেত্রে আগামী বছরও আমদানি ক্ষেত্রে আমাদের চাপ বাড়বে। অবশ্য সরকার এক্ষেত্রে আমদানির ক্ষেত্রে সরকার খাদ্যপণ্যকে প্রাধিকারের কথা ঘোষণা করেছেন। আমদানিতে যেন বাধার সম্মুখীন হতে না হয় সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একইসঙ্গে অন্যান্য ধরনের আমদানির সঙ্গে পর্যাণ্ডভাবে বৈদেশিক মুদ্রাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা যাবে কি না তার একটি চ্যালেঞ্জ আমাদের রয়েছে। ফলে সেটি হলে যেটি হতে পারে, আমদানিতে আমাদের একটি চাপ পড়বে। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, বিশেষ করে ধানের উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সেটি স্বাভাবিক মাত্রায় রাখাটাই একটি চ্যালেঞ্জের মধ্যে থাকতে পারে। প্রতিবছর যে কারণে ফসলহানি হচ্ছে। সেটিতেও উৎপাদন কিছুটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর যে ঘোষণা, অব্যবহৃত জমি ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়ানো সেটি একটি ইতিবাচক ঘোষণা।

বাংলাদেশে এমনকিছু অংশ রয়েছে যেখানে জমি পতিত থাকে। সিলেট অঞ্চলের জমি, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জমি ইত্যাদি জমিগুলো সারাবছর ব্যবহার করা যায় না। এখানে আবার অনুপস্থিত কৃষক অর্থাৎ অনুপস্থিত জমির মালিক রয়েছেন। যারা এ সমস্ত জমিগুলো ব্যবহার করেন না। বছরের খুবই অল্প সময় ব্যবহার করেন। ফলে এ ধরনের জমিগুলোকে চিহ্নিত করে যদি ব্যবহার করা যায়, ফলে উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে। আরও একটি

বিষয় হলো উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে খাদ্যপণ্যেরও ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণ আয়ের এবং নিম্ন আয়ের মানুষ তাদের প্রকৃত আয় কমে যাওয়ার কারণে তাদের বাজার থেকে পণ্য আয়ের সক্ষমতা কমছে। ফলে বাজারে হয়তো আগামীতে পণ্য থাকতে পারে, কিন্তু পণ্য ক্রয়ের সক্ষমতা ভোক্তার থাকবে কি না এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সেটি আগামী বছরের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। সেক্ষেত্রে সরকারের যে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি চলছে, যে ১ কোটি পরিবারকে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

তবে এক্ষেত্রে কার্ডের বিতরণ নিয়ে প্রশ্ন আছে। যারা প্রকৃত ভোক্তা তারা নিয়মিত পাচ্ছেন কি না। যারা পাচ্ছেন তারা অনেকে যোগ্য কি না? অনেকক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে অনেকেই প্রভাব বিস্তার করে থাকেন, কার্ড বিলির ক্ষেত্রে আমাদের এসব বিষয়গুলো নজর রাখা দরকার। আমার কথা প্রকৃতরা যেন এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এখন যেটি দেওয়া হচ্ছে দরিদ্র শ্রেণির ক্ষেত্রে। কিন্তু উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে শুধুমাত্র দরিদ্র শ্রেণির চাহিদা তৈরি হচ্ছে না। আগামীতে নিম্ন আয়ের মানুষ অথবা দরিদ্র আয়ের মানুষ যারা দরিদ্র সীমার নিচে নয়, তাদেরও হয়তো এটির দরকার হবে। সেদিক থেকে সরকারের যে উন্মুক্ত বাজার, ট্রাকে করে বিক্রয় ইত্যাদি যেগুলি সারাদেশে চলছে, সেগুলির কলেবর বৃদ্ধি করা দরকার হবে।

সরকারকে বর্ধিত মাত্রায় টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য আমদানি করা এবং সেটির জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা এবং সেভাবে বিতরণের কাঠামো তৈরি করা বর্ধিত আকারে, সেটির প্রস্তুতি থাকা দরকার। এটা আগামী বছরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে।

ঢাকা প্রকাশ

১৫ নভেম্বর ২০২২

অধ্যায় ৫

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

এখন কি জ্বালানির মূল্য কমানো যায় না?

ফাহিমদা খাতুন

গত ৩ নভেম্বর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা একটি দুঃসময়ে এসেছে। ঠিক যখন অর্থনীতি স্বাভাবিক হচ্ছে, মানুষ ধীরে ধীরে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে, কাজে ফিরতে শুরু করেছে এবং করোনাসৃষ্ট অর্থনৈতিক চাপ থেকে বের হতে প্রাণপণে লড়ছে, তখন জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি তাদের বাড়তি চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো, এটি প্রকৃতিসৃষ্ট চ্যালেঞ্জ নয়, এটি মানবসৃষ্ট। এরই মধ্যে প্রায় তিন মাস ধরে খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ক্রমে বেড়ে চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে নিতাপণের দামও বেড়েছে। এর মধ্যে ২৩ শতাংশের মতো ডিজেল ও কেরোসিনের মূল্যবৃদ্ধি অসহায় ভোক্তার ওপর দ্বিগুণ খড়া হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যারা সব দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত।

দেশে যখনই জ্বালানি পণ্যের মূল্য বাড়ানো হয়, সবসময় সরকার মানুষের কাছে অনেক কারণ ও যুক্তি তুলে ধরে। সেগুলো খুব পরিচিত যুক্তি এবং প্রায় সবারই জানা। প্রকৃত বিষয় হলো, উচ্চমূল্যের চূড়ান্ত ভার ভোক্তাদের চাপিয়ে দেয়া একটি বহুল প্রচলিত কৌশল। কেন তাহলে নীতিনির্ধারণকরা এ ধরনের পদক্ষেপ নেন? কোথায় প্রকৃত সমস্যা লুকিয়ে রয়েছে তা বোঝার জন্য যুক্তিগুলো তলিয়ে দেখা যেতে পারে।

বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিগুলোর দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টার কারণে জ্বালানির আন্তর্জাতিক দামে উর্ধ্বমুখী চাপ দেখা দিয়েছিল। বস্তুত, ২০১৬ সালের এপ্রিলে পেট্রোলিয়ামের মূল্য ব্যারেলপ্রতি ৪২ দশমিক ৩ ডলার ছিল। এটি বেড়ে ২০২১ সালের অক্টোবরে ব্যারেলপ্রতি ৮৩ দশমিক ৭ ডলারে পৌঁছে। কোভিড থেকে উত্তরণ পর্যায়ে যেহেতু অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বেড়েছে এবং তার সঙ্গে উচ্চ ভোক্তা চাহিদা বাড়ছে, সেহেতু বাজারে সরবরাহের ঘাটতি রয়েছে। এভাবে উচ্চ চাহিদা, সরবরাহে ঘাটতি এবং ভোগ্যপণ্যের দামের উর্ধ্বগতি কিছু উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে মূল্যস্ফীতি বাড়িয়েছে। আইএমএফ তার ‘ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক’ প্রতিবেদনে পূর্বাভাস দিয়েছে এ প্রবণতা ২০২২ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

বাংলাদেশে এটাই যদি জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির পেছনে যুক্তি হয়, তাহলে কেন আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমে গেলে আমরা দেশে জ্বালানি তেলের দাম কমাতে দেখিনি? সাত-আট বছর ধরে জ্বালানি তেলের দাম কম ছিল। ফলে বাংলাদেশের মতো আমদানিনির্ভর অর্থনীতিগুলো ওই সময়ে ব্যাপকভাবে লাভবান হয়েছিল। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) অনেক মুনাফা করেছিল। তবে ওই সময়ে বিদ্যুতের দাম কয়েক দফা বাড়ানো হয়েছে। করোনার সময় দাম কম থাকায় বিপিসির মুনাফা বিপুল পরিমাণে বেড়েছিল। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২১-এর তথ্যানুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে বিপিসি প্রায় ৫ হাজার ৮৩৯ কোটি টাকা মুনাফা করেছিল; ২০১৯-২০ অর্থবছরে যা ছিল প্রায় ৫ হাজার ৬৭ কোটি টাকা।

জ্বালানি পণ্যে এ ধরনের নিম্নদাম থেকে ভোক্তারা সুফল পাননি। বাংলাদেশে জ্বালানির দাম চাহিদা ও সরবরাহের নিরিখে নির্ধারণ হয় না। সরকার জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ করে দেয়। সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারে নিম্ন দামের সুফল ভোক্তাদেরও পাওয়ার কথা। সর্বোপরি, বিপিসি যে লোকসান করে তা ভোক্তাদের দোষ নয়। এটা সংস্থাটির অব্যবস্থাপনা, সিস্টেম লস এবং দুর্বল সরবরাহ শৃঙ্খলের কারণে। সংস্থাটির দুর্বল সুশাসনের কারণে জ্বালানি বিপণন কোম্পানিগুলো দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে এবং ভোক্তাস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। কাজেই বিপিসিকে শুধু জ্বালানির মূল্য প্রক্রিয়া উন্নত করলে চলবে না, সরবরাহ শৃঙ্খল এবং ক্রয় প্রক্রিয়াও (প্রকিউরমেন্ট) শক্তিশালী করতে হবে। বর্তমানে অনেক দেশই জ্বালানি পণ্যসহ কমান্ডিটি ট্রেডিংয়ের জন্য ফিউচার মার্কেটে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাজারের নিম্নদামের সুযোগ নিতে পারে না, যেহেতু দেশের বিদ্যমান আইন বিপিসিকে ফিউচার মার্কেটে অংশ নেয়ার সুযোগ দেয় না। দাম যখন কম ছিল তখন আমাদের দেশ জ্বালানি তেল আগাম কিনে রাখতে পারত এবং অর্থ সাশ্রয় করতে পারত। অবশ্য এর সঙ্গেও কিছুটা ঝুঁকি যুক্ত। যেমন যদি দাম দ্রুত ও অত্যধিক কমে তাহলে লোকসান হবে। প্রশ্ন আসতে পারে, বাংলাদেশের মতো দেশ কি সেটি পোষাতে পারবে? এর উত্তর হলো, যদি কেউ ফিউচার মার্কেটে অংশগ্রহণ করে তাহলে প্রত্যেককেই বাজারে খেলার নিয়ম পরিপালন করতে হবে এবং ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ফল মেনে নিতে হবে। প্রাথমিকভাবে ফিউচার মার্কেটের মাধ্যমে দেশ সার্বিক জ্বালানি প্রয়োজনের অন্তত কিছুটা অংশ কেনা শুরু করতে পারে। অবশ্যই হ্যাঁ, এসব উদ্যোগের জন্য বিপিসির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

দাম পুনরায় সমন্বয়ের পক্ষে নীতিনির্ধারণকরা অন্য যে সাধারণ যুক্তি দিয়ে থাকেন সেটি হলো, আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোয় বিশেষত ভারতে জ্বালানির দাম কম। কাজেই আমাদের দেশে জ্বালানির দাম কম হলে এটা দেশ থেকে ভারতে পেট্রোলিয়াম পাচার উৎসাহিত করবে। যদি পাচার হয়েও থাকে, তা মোট জ্বালানি মজুদের কত পরিমাণ হবে? তাছাড়া এটি তো নিরীহ ভোক্তাদের কোনো দোষ নয়। এটি আরেকটি সুশাসন সম্পর্কিত বিষয়।

ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি আমাদের অর্থনীতির অনেক খাতকে ক্ষতির মুখে ফেলেছে। বাংলাদেশে ব্যবহৃত মোট জ্বালানির প্রায় ৭০ শতাংশই হলো ডিজেল। সড়ক ও নৌ-পরিবহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও কৃষি উৎপাদনের মতো খাতগুলো ডিজেলের ওপর নির্ভরশীল। সরকারের ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্তে পরিবহন খাতের নেতারা বাস, ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান ও লঞ্চের

ভাড়া বাড়িতে সময় নেননি। এরই মধ্যে ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। করোনাকালীন ক্ষতি উল্লেখ করে পরিবহন নেতারা বলেছেন, তারা বর্ধিত জ্বালানি মূল্যের আঘাত পোষাতে চান। তবে অতিমারী হোক বা না হোক, যাত্রীর ঘাড়ের অতিরিক্ত ব্যয় চাপানো তাদের একটা পুরনো অভ্যাস, পুরনো কৌশল। শুধু তা-ই নয়, সেচ ব্যয়ও বেড়ে গেছে। ফলে কৃষিপণ্য উৎপাদনের খরচ বেড়ে গেছে, যদিও দুঃখজনকভাবে কৃষক কৃষিপণ্যের উচ্চমূল্য পান না। উচ্চ পরিবহন ব্যয়ের কারণে ভোক্তাদেরও ভুগতে হচ্ছে, যেহেতু নিতাপণ্যের দাম ক্রমেই বেড়ে চলছে। এদিকে একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী আজকাল কেরোসিন ব্যবহার করলেও এর উচ্চমূল্য দরিদ্র ভোক্তাদের ওপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

এটি এমন একটি সময়, যখন দাম বাড়ানোর পরিবর্তে সরকারের উচিত মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দেয়া, যাতে মানুষ ভালোভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারে। সরকার কিছুদিনের জন্য জ্বালানি পণ্যে শুল্ক কমাতে পারে, যাতে মানুষের ওপর চাপ কমে এবং মহামারীসৃষ্ট অভিঘাত থেকে ঘুরে দাঁড়াতে পারে। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির বোঝা শুধু সাধারণ ভোক্তা নয়, ব্যবসায়ী বিশেষত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ওপরও পড়েছে, যারা অতিমারীতে সবচেয়ে পর্যুদস্ত হয়েছেন। সরকার জ্বালানির দামের ওপর মূল্য সংযোজন কর, শুল্ক ও বাণিজ্য করসহ বিভিন্ন ধরনের কর আহরণ হরে। এসব কর এখন জ্বালানির দামের প্রায় ৩০ শতাংশ। এ দুঃসময়ে এর একটা অংশ কমানো যেতে পারে। এসব পদক্ষেপ অশ্রুত, অজানা কিছু নয়। দাম কমাতে ভারত পেট্রল ও ডিজেলের ওপর কর কমিয়েছে এবং জনগণকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে। চলতি বছর বিদ্যুৎ ও গ্যাসের খুব উচ্চমূল্য বিবেচনায় নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২০টি দেশ জ্বালানিতে কর কমাতে জরুরি পদক্ষেপ নিয়েছে কিংবা দরিদ্র পরিবারগুলোয় ভর্তুকি দেয়ার ব্যবস্থা করেছে।

প্রতিবার যখন সরকার ঊর্ধ্বমুখী দাম সমস্বয়ের উদ্যোগ নেয় তখন একটা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে স্বচ্ছ মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া থাকাটা অত্যাবশ্যক। উচ্চপর্যায় থেকে একতরফা সিদ্ধান্তের পরিবর্তে পরিবহন মালিক, কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ভোক্তা অধিকার সংগঠনের প্রতিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়া হলে তা সাধারণ মানুষের ভোগান্তি হ্রাসে সাহায্য করতে পারত।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে যখনই সরকার জ্বালানির দাম বাড়ায়, তখনই এর তাৎক্ষণিক প্রভাব খুব তাড়াতাড়ি অনুভূত হয়। এবারো তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিভিন্ন ধরনের পণ্য ও সেবার মূল্যে এরই মধ্যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এটা দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার বিলম্বিত করতে পারে। দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, আন্তর্জাতিক বাজারে অতিসম্প্রতি জ্বালানির দাম কমলেও বাংলাদেশে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম বাড়ার কারণে বাংলাদেশেও সেটি বাড়িতে হবে— এটিই যদি যুক্তি হয় তাহলে এখন কেন বিপিসি দাম কমাচ্ছে না?

বণিক বার্তা

৮ জানুয়ারি ২০২২

এলএনজি আমদানিতে উৎসাহীদের খামানো জরুরি

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

দেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকটের কেন্দ্রে রয়েছে জ্বালানিসংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ। করোনা-পরবর্তী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে জ্বালানি চাহিদা বৃদ্ধি এবং ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার সঙ্গে ইউরোপ ও অন্যান্য দেশের জ্বালানি-বাণিজ্য বন্ধ থাকায় আমদানিনির্ভর দেশগুলো এ সংকটের শিকার। বড় বিপাকে পড়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলো। বাংলাদেশও এ পরিস্থিতির বাইরে নয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর উচ্চ মূল্যে জ্বালানি কেনার সক্ষমতা সীমিত, যা অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশকে জ্বালানি সাশ্রয়, বিকল্প অনুসন্ধান এবং সম্ভাব্য বিকল্প ব্যবহারে বাধ্য করেছে। উন্নত দেশগুলোও জ্বালানি সাশ্রয়ে উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছে। তবে এসব উদ্যোগ এখন পর্যন্ত জ্বালানিসংকটের কোনো দীর্ঘস্থায়ী সমাধান দিচ্ছে না।

এর অর্থ দাঁড়ায় জ্বালানি খাতে সরবরাহ-সংকট একটা মধ্যমেয়াদি চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিশ্বে আবির্ভূত হয়েছে। বৈশ্বিক জ্বালানিবাজারে শিগগিরই উল্লেখযোগ্য হারে দাম কমার সুযোগ কম। ফলে আগামী বছরাধিক কাল তুলনামূলকভাবে উচ্চ মূল্যে জ্বালানি আমদানির জন্য দেশগুলোর প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি উদ্যোগের পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ, যা জ্বালানি আমদানি বা বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহার কমাতে পারে— এমন পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বর্তমান সংকটকালে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প বা সহযোগী জ্বালানি হতে পারে। এ ক্ষেত্রে উন্নত ও উন্নয়নশীল—উভয় প্রকার দেশই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণে সফল পেতে পারে। বর্তমান সংকটকালে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে, নবায়নযোগ্য জ্বালানির সুবিধা শুধু পরিবেশদূষণ রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে না, বরং তা সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এটা বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটে প্রমাণিত।

বর্তমান বৈশ্বিক জ্বালানিসংকট কি শিগগিরই মিটবে? উত্তর, সম্ভবত না। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ শুরুর পর রাশিয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলো সমন্বিত নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এ অবস্থানের ব্যাপক পরিবর্তন না হলে রাশিয়ার জ্বালানি সরবরাহ সীমিত আকারে অবশিষ্ট বিশ্বে অব্যাহত থাকবে। অন্যভাবে বললে, রাশিয়া তার ইউক্রেন নীতি থেকে বড় ছাড় না দিলে ইউরোপ ও আমেরিকার নিষেধাজ্ঞায় বড় পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা কম। উভয় পক্ষই এখনো ব্যাপক ছাড় দেওয়ার অবস্থানে নেই, সে রকম ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ইউরোপীয় দেশগুলো সামনে শীতকাল মাথায় রেখে ১৫ শতাংশ জ্বালানি কম ব্যবহারের উদ্যোগ নিচ্ছে। বিকল্প উৎস (যেমন আফ্রিকা) থেকে জ্বালানি আমদানির আলোচনা শুরু হয়েছে। বর্ধিত পরিমাণে জ্বালানি মধ্যপ্রাচ্য থেকে কেনার কূটনৈতিক উদ্যোগ শুরু হয়েছে এবং জ্বালানি মজুত বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কমিয়ে আনার আন্তর্জাতিক ঘোষণা থেকে সীমিত পরিসরে সরে আসার ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনা অব্যাহত রাখা, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালানো ইত্যাদি।

এসব উদ্যোগে সীমিত আকারে জ্বালানিঘাটতি মিটবে। তবে তারপরও বড় ঘাটতি আগামী দিনগুলোতে অব্যাহত থাকবে বলে মনে হয়। জ্বালানি তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর সংগঠন ওপেক এখনো বড় আকারে তেল উৎপাদন বৃদ্ধির ঘোষণা দেয়নি। ফলে জ্বালানির বাজারে অস্থিরতা আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকতে পারে।

বিশ্বব্যাংকের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বৈশ্বিক জ্বালানিবাজার নিকট ভবিষ্যতে করোনা-পূর্ব সময়কালে ফেরার সম্ভাবনা ক্ষীণ। যদিও জ্বালানির দাম ধীরে ধীরে কমার সম্ভাবনা রয়েছে, তারপরও ২০২৩ সাল নাগাদ অপরিশোধিত জ্বালানি তেল প্রতি ব্যারেল ৯২ মার্কিন ডলার, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) প্রতি এমএমবিটিইউ বা মেট্রিক মিলিয়ন ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট ১৪ ডলার (জাপান), গ্যাস প্রতি এমএমবিটিইউ (ইউরোপ) ২৫ ডলার এবং কয়লা প্রতি মেট্রিক টন ১৭০ ডলারে থাকবে। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো আগামী দিনেও উচ্চ মূল্যে জ্বালানি কেনার চাপে থাকবে। অবশ্য এটাও মনে রাখা দরকার, বিশ্ববাজার সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না।

জ্বালানি কেনার জন্য প্রয়োজনীয় ডলারের মজুত থাকার বিষয়টি শুধু জ্বালানির আমদানি মূল্যের ওপর নির্ভর করবে না। এর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে রপ্তানি কতটা বাড়বে, প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স কতটা আসবে, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বৈদেশিক ঋণ কতটা পাওয়া যাবে, অন্যান্য পণ্যের আমদানি ব্যয় কেমন থাকবে, টাকা পাচার সীমিত থাকবে কি না— ইত্যাদির ওপর। মোট কথা, জ্বালানি খাতের সংকটটি মধ্য মেয়াদে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে থাকছে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সরকার জ্বালানিসংকট মোকাবিলায় বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন চলছে। যেমন জ্বালানি ব্যবহার সীমিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতে লোডশেডিং, পরিবহন খাতে জ্বালানি সরবরাহ কমাতে উদ্যোগ গ্রহণ, বর্ধিত মূল্যে আপাতত এলএনজি না

কেনা এবং পুরনো গ্যাসকূপের অব্যবহৃত গ্যাস উত্তোলনে আংশিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব উদ্যোগ আগামী ৬ থেকে ১২ মাস অব্যাহত রাখার প্রয়োজন পড়বে। পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে কী পরিমাণ জ্বালানি সাশ্রয় হচ্ছে, তা নিয়মিত জনগণকে জানানো প্রয়োজন।

মনে রাখা দরকার, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারের বাৎসরিক যে চক্র, তাতে শীতকালে বিদ্যুতের ব্যবহার কমে আসবে। তবে জ্বালানির ব্যবহার না-ও কমতে পারে। কেননা তখন কৃষিক্ষেত্রে সেচের জন্য বাড়তি জ্বালানির প্রয়োজন হবে। সেই চাহিদা এখন নেই।

সার্বিকভাবে জ্বালানিসংকটে কার্যকর মধ্যমেয়াদি উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন, যা একদিকে জ্বালানি সরবরাহ বাড়াবে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ কমাবে এবং সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ নিশ্চিত করবে।

যা করা যায়

দেশীয় গ্যাসক্ষেত্রগুলো ব্যবহার করে, বিশেষত পুরনো ক্ষেত্রগুলো থেকে গ্যাস উত্তোলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। বলা হয়ে থাকে, পুরনো গ্যাসক্ষেত্রগুলো থেকে উত্তোলনের উদ্যোগ নিলে এক বছরের মধ্যেই গ্যাসপ্রাপ্তি শুরু হতে পারে। এই পুরনো ক্ষেত্রগুলোয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গ্যাস সঞ্চিত রয়েছে, যা উত্তোলনযোগ্য। পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য ত্রিমাত্রিক জরিপ সম্পন্ন করা জরুরি। এ জরিপের ফলাফল ইতিবাচক হলে ভবিষ্যতে গ্যাস উত্তোলনে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা সহজ হবে।

দীর্ঘ মেয়াদে এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন বা জ্বালানি হিসেবে এলএনজি সরবরাহ সীমিত রাখাও জরুরি। দেশে এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ ও আমদানি করে গ্যাস সরবরাহে অতি উৎসাহী একটি পক্ষ কাজ করে, যারা সরকারের ভেতর ও বাইরে রয়েছে। এদের কার্যক্রম সীমিত রাখা জরুরি। বর্তমান অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এবং ভবিষ্যতে জ্বালানিতে বৈচিত্র্যায়ণের জন্য এলএনজিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সীমিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতি পর্যায়ে থাকা ‘সমন্বিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানিব্যবস্থা নীতি’ যেন কোনোভাবেই এলএনজিভিত্তিক জ্বালানি ও বিদ্যুৎকাঠামোকে প্রাধান্য দিয়ে প্রস্তত না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখা জরুরি।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার

আশার কথা, বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটে সবাই ধীরে ধীরে নবায়নযোগ্য জ্বালানির গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন। তবে এ ক্ষেত্রে এখনো বাস্তবানুগ উদ্যোগ গ্রহণ কম হচ্ছে। যেহেতু নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন স্বল্প সময়ে করা সম্ভব, সে ক্ষেত্রে গ্রিডভিত্তিক এবং অফ-গ্রিডভিত্তিক জ্বালানি উৎপাদনে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যিক। সৌরবিদ্যুৎ এবং বায়ুবিদ্যুৎভিত্তিক প্রকল্প বৈদেশিক ঋণের বা বৈদেশিক বিনিয়োগের আওতায় বাস্তবায়ন শুরু করা জরুরি। বাজেট সহায়তা হিসেবে বিশ্বব্যাংক থেকে সরকার ১০০ কোটি ডলার

ঋণসহায়তা চেয়েছে, তার আওতায় নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। পাশাপাশি জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক যেসব বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে, যেমন ডিজেলচালিত, গ্যাসভিত্তিক অথবা এলএনজিনিভর, যাদের দক্ষতার মাত্রা খুব কম ও ব্যয়বহুল এবং কুইক রেন্টালের আওতায় স্থাপিত হয়েছে, এমন বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এসব বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ হলে শুধু জ্বালানি সাশ্রয় হবে, তা নয়, একই সঙ্গে সরকার বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে ভাড়া বা ক্যাপাসিটি চার্জ দেওয়া থেকে মুক্তি পেতে পারে। এর ফলে সরকারের ভর্তুকিজনিত চাপও কমবে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছে সরকার যে ৪৫০ কোটি ডলারের ঋণ চাচ্ছে, তা পেতে হলে শর্ত মানতে হবে। আইএমএফ সাধারণ ভর্তুকি কমানোর শর্ত দিয়ে থাকে। সরকার আইএমএফ-এর ভর্তুকি সমন্বয়ের শর্তের বিষয়টি বিদ্যুৎ খাতের জন্য উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারে। ভর্তুকি সমন্বয়ের বিষয়টি হতে পারে ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র অপসারণ, ব্যয়বহুল জ্বালানিভিত্তিক কেন্দ্র কম ব্যবহার ও ক্যাপাসিটি চার্জ দেওয়ার শর্ত অবলোপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে। আইএমএফ-এর ঋণ একই সঙ্গে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে অর্থায়নের তহবিলেরও উৎস হতে পারে।

এসব উদ্যোগ একদিকে জ্বালানি সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়াবে, অন্যদিকে সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ নিশ্চিত করবে এবং ডলার ব্যবহারের চাপ কমাবে। এ ক্ষেত্রে নির্মোহভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উপযোগিতা এবং বর্তমান সংকটকালে এর গুরুত্ব এবং ভবিষ্যৎ জ্বালানি মিশ্রণে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

প্রথম আলো

৪ আগস্ট ২০২২

নবায়নযোগ্য জ্বালানি টেকসই ও লাভজনক

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

সমকাল: জ্বালানি সংকটের এ সময়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কীভাবে উপকারে আসতে পারে?

গোলাম মোয়াজ্জেম: বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ছিল ২০ থেকে ২২ ডলার, যা এক পর্যায়ে বেড়ে ১৪০ ডলারে পৌঁছায়। এখন আবার ৯৫ থেকে ৯৭ ডলারে নেমে এসেছে। এলএনজির দর ছিল ইউনিটপ্রতি ২ থেকে ৩ ডলার। বর্তমানে বেড়ে হয়েছে ৪০ ডলার। সহযোগী জ্বালানি হিসেবে কয়লারও উচ্চমূল্য রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশসহ জ্বালানি আমদানিনির্ভর দেশগুলো এখন বিপদে আছে। বিদেশি মুদ্রার মজুত যেখানে কমে আসছে, সেখানে বেশি দামে জ্বালানি কিনতে হচ্ছে। এ নিয়ে সরকার হিমশিম খাচ্ছে। ডলারের ওপর এ চাপ খুব সহজেই এড়ানো যেত যদি বিকল্প এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিয়ে সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা থাকত। লোডশেডিং এবং অন্যান্য সাশ্রয়ী পরিকল্পনার মাধ্যমে যে ৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাঁচানোর চেষ্টা সরকার করছে, স্থানীয়ভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি দিয়ে তা পূরণ করা সম্ভব ছিল। এতে একদিকে পরিবেশের জন্য সহায়ক পরিচ্ছন্ন জ্বালানি সহজলভ্য হতো, অন্যদিকে ব্যয়ের দিক থেকে সাশ্রয়ী হতো। ফলে জ্বালানি সংকটের বাস্তবতায় সবচেয়ে ভালো বিকল্প হতে পারে নবায়নযোগ্য জ্বালানি।

সমকাল: এখন দেশে কতটুকু নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন এবং ব্যবহার হচ্ছে?

গোলাম মোয়াজ্জেম: এখন সব মিলিয়ে মাত্র ৭০০ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি দেশে উৎপাদন এবং ব্যবহার হচ্ছে, যা মোট বিদ্যুতের জাতীয় চাহিদার মাত্র ৩ শতাংশের মতো। অথচ সরকারের লক্ষ্য ছিল ২০২০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার ১০ শতাংশে উন্নীত করা। পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার ৪০ শতাংশ করার পরিকল্পনা আছে সরকারের। অর্থাৎ সরকারের পরিকল্পনা আর বাস্তবতার মধ্যে এখনও বিস্তর ব্যবধান।

সমকাল: এত সুবিধা থাকলেও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার কেন বাড়ছে না?

গোলাম মোয়াজ্জেম: অনেক কারণ আছে। প্রথমত, নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য সহায়ক নীতিকাঠামো নেই। যে ধরনের নীতিসহায়তা থাকলে এ খাতে বেসরকারি উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে এগিয়ে আসতেন, তা নেই। ব্যাংক ব্যবস্থা থেকেও অর্থায়নের বিষয়টি সহজ নয়। সরকারের ঘোষণা আর পদক্ষেপের মধ্যে মিল নেই। আবার নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিরুদ্ধে আছে অপপ্রচার। নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়লে যাদের রমরমা মুনাফা কমে যেতে পারে তাদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, প্লান্ট করতে বেশি জমির প্রয়োজন, উৎপাদনশীলতা কম, ব্যয় বেশি এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক নয়। আরও বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের আবহাওয়ায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি লাভজনক হবে না। সৌরবিদ্যুতে দিনে চলবে, রাতে কী হবে। এগুলো আসলে অপপ্রচার। রেলের বিরুদ্ধে যেমন বাসওয়ালারা অপপ্রচার চালায়। এভাবে নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রতি নীতিনির্ধারক এবং সাধারণ মানুষের মনে একটা বাজে ধারণা তৈরি করার জন্য একটা গোষ্ঠী খুব তৎপর।

সমকাল: আপনি বলছেন এগুলো অপপ্রচার, তাহলে সত্যটা কী?

গোলাম মোয়াজ্জেম: সত্যটা হচ্ছে, প্লান্ট স্থাপনে জমি বেশি লাগে না। প্রথম দিকে যে পরিমাণ জমি লাগত, এখন তার অর্ধেকও লাগে না। এ ছাড়া উৎপাদনশীলতা বেড়েছে আগের চেয়ে অন্তত ৫ গুণ। সৌরবিদ্যুতের ক্ষেত্রে দিনের উৎপাদিত বিদ্যুৎ রাতের জন্য সংরক্ষণ করা যায় অন্তত ৬ ঘণ্টা। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির দামও অনেক কমে এসেছে। ইউরোপ-আমেরিকা তো আগে থেকেই নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহার করছে। আমাদের প্রতিবেশী ভারত এবং ভিয়েতনামেও পরিচ্ছন্ন এবং শাস্ত্রীয় জ্বালানির ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। এসব দেশের সরকারও সহায়ক নীতিকাঠামো দিয়ে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করছে।

সমকাল: বিকল্প কোন কোন জ্বালানি দেশে ব্যবহার করা হয় বা হওয়ার সুযোগ রয়েছে?

গোলাম মোয়াজ্জেম: আমাদের দেশে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুশক্তি, জলবিদ্যুৎ, বায়োফুয়েল, জিওথার্মাল, নদীর স্রোত ও সমুদ্রের ঢেউ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদিকে শনাক্ত করা হয়েছে। অনেকে বলে থাকেন আমাদের দেশে বায়ুশক্তির মাধ্যমে জ্বালানি উৎপাদন সম্ভব নয়। আমি মনে করি এটা বড় উৎস হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এর সম্ভাবনা এখন আরও বেড়েছে। শিল্পকারখানা, সেচকাজ, বাসাবাড়িতে ব্যবহার-যে কোনো প্রয়োজনেই এই বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যায়।

সমকাল: জীবাশ্ম জ্বালানির তুলনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির বাণিজ্যিক ব্যবহার কতটা লাভজনক?

গোলাম মোয়াজ্জেম: বিদ্যুৎ উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানি হিসেবে খনিজ তেল, গ্যাস ও কয়লা ব্যবহার করা হয়। আমদানিনির্ভর এসব জ্বালানি কত ব্যয়বহুল এবং তার পরিণতি কেমন হতে

পারে তা তো আমরা এখন খুব হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। অন্যদিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে প্রাথমিক বিনিয়োগের পর আর খুব বেশি বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির দর-দামও কমেছে বিশ্ববাজারে। ফলে বাণিজ্যিক বিবেচনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি টেকসই এবং অনেক বেশি লাভজনক।

সমকাল: নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়তে আপনি কী পরামর্শ দেবেন?

গোলাম মোয়াজ্জেম: জ্বালানিসংক্রান্ত সরকারের নীতিকাঠামো নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য সহায়ক নয়। এটা এখনও এককেন্দ্রিক। এই বৈষম্য দূর করতে হবে। সহায়ক নীতিকাঠামো হিসেবে গ্রিড ক্যাপাসিটি ও ভূমি উন্নয়ন সুবিধা দেওয়া দরকার। পুরনো বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং কুইক রেন্টাল অপসারণ করা দরকার। উৎপাদন সক্ষমতা কমে গেছে এমন বিদ্যুৎকেন্দ্র নতুন করে আর নবায়ন না করা উচিত। এ ধরনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করলে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত হবে। তা নাহলে জীবাশ্ম জ্বালানির উৎপাদন ক্ষমতা ৪২ থেকে ৪৮ শতাংশ উদ্ধৃত থাকার বাস্তবতায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো সহজ নয়। সরকার যদি সত্যিই পরিবেশ সহায়ক শাস্ত্রীয় জ্বালানির ব্যবহার চায় তাহলে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়তেই হবে।

সাফাৎকার নিয়েছেন আবু হেনা মুহিব

সমকাল

২০ আগস্ট ২০২২

অধ্যায় ৬

জেন্ডার ও নারী সমতা

নারীর ভয়ের বিষয়টি আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে

ফাহিমদা খাতুন

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, সিপিডি ও প্রথম আলোর আয়োজনে ‘নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে কেমন বাজেট চাই?’ শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৬ জুন ২০২২। এ আলোচনার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে প্রথম আলো-র এক ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধটি তারই অংশবিশেষ।

শুধু নারীর জন্য বাজেট বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা করলে চলবে না, নারীর ভয়ের বিষয়টি আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে। তাঁরা কী কী বিষয়ে ভয় পান, সে জায়গাগুলো চিহ্নিত করতে হবে। আমাদের সমাজে শুধু নারীদের সহিংসতার শিকার হতে হয় না; আমরা দেখি, ছেলেশিশুরাও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। তাদের গাছের সঙ্গে বেঁধে মারা হয়।

এ ছাড়া তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সহিংসতার শিকার হতে হয়। আমাদের সমাজে যারা দুর্বল, তাদের যেমন ভয় দেখানো হয়, শাসন-শোষণ করা হয়; তেমনি আমাদের সমাজে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নারী সবাইকে দুর্বল হিসেবে দেখা হয়। আমরা সহিংসতার অর্থনৈতিক ক্ষতির কথা বলি। এ ক্ষতি নারীর একার ক্ষতি নয়, সমাজের ক্ষতি। এটা মূলত রাষ্ট্রের ক্ষতি। আমরা বাজেটকাঠামোর চারটি মূল স্তরের কথা বলেছি। আমাদের প্রণয়ন করা বাজেট সবার জন্য একই রকমভাবে প্রয়োগ হয় না।

কিছু বাজেট সুনির্দিষ্ট মানুষের জন্য করা হয়। বাজেট স্বল্প আয়ের মানুষ ও বৃহৎ আয়ের মানুষের কাছে একেক রকম। নারীর প্রতি সহিংসতা দূর করার জন্য কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। বাজেট করতে অর্থ মন্ত্রণালয় কাজ করে থাকে। সে ক্ষেত্রে নারী ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় কতটুকু সহায়তা দেয়, সে দিকটা খেয়াল রাখতে হবে।

নারী ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়কে গুরুত্ব কম দেওয়া হয়। আমাদের নারী সহিংসতার ক্ষতিটা দেখতে হবে। পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে হবে। সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। অস্পষ্টতা দূর করতে হবে। সবার সংযুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। বরাদ্দ বাস্তবায়নের বিষয়টি অবশ্যই তদারকি করতে হবে। তাহলে আমরা নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করতে পারব।

প্রথম আলো

১৭ জুন ২০২২

আর্থিক শিক্ষার বিষয়টি জরুরি

ফাহিমদা খাতুন

সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (সিআরডি) ও প্রথম আলোর আয়োজনে ‘আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে নারী: চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা ও করণীয়’ শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৭ জুন ২০২২। এ আলোচনার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে প্রথম আলোর এক ফ্রোডপত্রে প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধটি তারই অংশবিশেষ।

দেশের অর্ধেক নারী। তাঁরা শ্রমবাজারে আসছেন। তবে আরও বেশি করে আসা প্রয়োজন। শ্রমবাজারে এখন নারীর অংশগ্রহণ ৩৬ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ায় এমনকি স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের নারীরা ভালো করছেন। নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অনেক সুযোগ আছে। অনেক ধরনের আর্থিক উপকরণ আছে। কিন্তু সেটা কীভাবে কাজে লাগানো যাবে, সেটা হলো প্রশ্ন।

কোভিডের সময়ও আমাদের দেশের নারীরা ভালো করেছেন। আর্থিক খাতের অনেক প্রসার হচ্ছে। অনেক ধরনের সেবা বাড়ছে। সেবার গুণগত মান বাড়ছে। প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হচ্ছে। নারীদের চ্যালেঞ্জের যেন শেষ নেই। তাঁরা খুব ইনফরমালি ব্যবসা শুরু করেন। তাঁদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকে না। এ জন্য দিনের পর দিন ঘুরেও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পান না। সামাজিক নিরাপত্তা ভাটা অনেক সময় তিনি তাঁর ছেলে, স্বামী বা অন্য কারও মুঠোফোনের মাধ্যমে আনছেন। এসব কারণে তিনি তাঁর পুরো টাকা নিজে ব্যবহার করতে পারেন না।

এসব ক্ষেত্রে আর্থিক শিক্ষার বিষয়টিও জরুরি। আমি নিজে যখন টাকা পাঠাই, তখন খুব দুশ্চিন্তায় থাকি যে টাকাটা ঠিকভাবে পৌঁছাল কি না। আমাদের দেশে স্কুল ব্যাংকিং আছে। এ ক্ষেত্রে ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েরা জেনে যাচ্ছে, কীভাবে আর্থিক লেনদেন করতে হয়। নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে কোনো তথ্য নেই। আপনারা এ বিষয়ে কাজ করবেন জেনে খুশি হলাম।

কারণ, তথ্য খুব জরুরি। সঠিক তথ্য ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। নারীরা আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মধ্যে আছেন। কিন্তু তাঁরা যেন আরও বেশি সংখ্যায় আসতে পারেন, সে জন্য সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

প্রথম আলো

২১ জুন ২০২২

শ্রমবাজারে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়লেও অনানুষ্ঠানিক খাতেই তারা বেশি কাজ করছে

ফাহিমদা খাতুন

আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস উপলক্ষে গত ১০ অক্টোবর ২০২২ ব্র্যাক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর ব্র্যাক ইন সেন্টারে। আলোচনার নির্বাচিত অংশ এই ফ্রেডপত্রে ছাপা হলো। এই নিবন্ধটি তারই অংশবিশেষ।

বাংলাদেশের শ্রমবাজারে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। এখন শ্রমবাজারে মেয়েদের অংশগ্রহণের হার ৩৬ শতাংশ। এটা এখনো আমরা ৫০ শতাংশে নিয়ে যেতে পারিনি। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটা ভালো অবস্থানে আছে। কিন্তু তারা কোথায় কাজ করছে? অনানুষ্ঠানিক খাতেই তারা বেশি কাজ করছে। যেখানে চাকরির নিশ্চয়তা ও আয় কম। সে জন্য ৩৬ শতাংশ শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের পরেও নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য অনেক বেশি। কারণ, ৩৬ শতাংশের ৮০ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করে। তাই তাদের আনুষ্ঠানিক খাতে নিয়ে আসা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আনুষ্ঠানিক খাতে আনার জন্য দক্ষতা ও শিক্ষা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবারে মা-বাবা উচ্চশিক্ষিত হলে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু এরপরেও আমার অনেক বন্ধুবান্ধবকে মেয়ে ও ছেলেদের মধ্যে পার্থক্য করতে দেখেছি। একটা মেয়ে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু বাবার কথা হলো মেয়েটার তো বিয়েই হয়ে যাবে। কেন তিনি লাখ লাখ টাকা দিয়ে তাকে ডাক্তারি পড়াবেন। মনের গভীরে এ ধারণার শিকড়টা রয়ে গেছে। এই পরিবর্তন পরিবার থেকে শুরু করতে হবে। কারণ, আবার গ্রামের দরিদ্র পরিবার থেকে এসেও উচ্চশিক্ষিত হয়ে উচ্চপদে আসীন হয়েছেন, এমন নারীও রয়েছেন। মেয়েদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় নিয়ে আসা আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হওয়া

উচিত। এ জন্য শিক্ষা, দক্ষতা ও অর্থ, এ তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানসিকতার পরিবর্তনের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন আনা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম আলো

১০ নভেম্বর ২০২২

অধ্যায় ৭

অন্যান্য

অস্থির সময়ের প্রশান্তি

রেহমান সোবহান

অধ্যাপক রওনক জাহান ও ড. আকবর আলি খানের (মরণোত্তর) সংবর্ধনা উপলক্ষে বণিক বার্তার বিশেষ প্রকাশনায় এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

একজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তির গড়ে ওঠা

আমি আমার আত্মজীবনীতে লিখেছি ১৯৭০ সালে নিউইয়র্কের রচেস্টারে একটি ঐতিহাসিক সম্মেলনে রওনকের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল, যেখানে দুটি আলাদা জাতি হিসেবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে পাকিস্তানের গবেষক ও নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে আমরা চূড়ান্ত এক একাডেমিক লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলাম। যদিও রওনক ১৯৫৯-৬৩ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়ন করেছেন এবং তিনি ছিলেন ক্লাসের তারকা শিক্ষার্থী, তাঁর সঙ্গে তখন আমার পরিচয় হয়নি। রওনক অনার্স ও মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণী অর্জন করেন। সে যুগে প্রথম শ্রেণী পাওয়া ছিল একটি বিরল অর্জন।

১৯৬৫ সালে রওনক যখন হার্ভার্ডে পৌঁছেন, তখন শাড়ি পরিহিত কোমর পর্যন্ত লম্বা চুলের ৪ ফিট ১০ ইঞ্চি উচ্চতার মানুষটিকে দেখে সম্ভবত তাঁর শিক্ষক ও সহপাঠীরা তাকে অন্য কোনো জগতের প্রজাতি হিসেবে গণ্য করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি মাধ্যমে পড়লেও পিতা আহমাদুল্লাহর সরকারি চাকরির কারণে মফস্বলে বাংলা মাধ্যমেই পড়তে হয়েছে তাকে। ক্লাসের সবচেয়ে ছোটখাটো আকৃতির শিক্ষার্থী হলেও তিনি যখন যে স্কুলে পড়েছেন সবসময়ই প্রথম হয়েছেন। শিক্ষার প্রতি আলাদা ধরনের আগ্রহ ছিল রওনকের পিতার এবং ছিল মায়ের সমর্থন। কখনো তারা ছেলেমেয়েদের আলাদা করে দেখেননি। তাঁর পিতা নিজে ছেলেমেয়ের হোমওয়ার্কের তদারকি করতেন। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বিভিন্ন বই পড়তে উৎসাহ দিতেন। তাঁদের সব সন্তানই বাংলা ও পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

আহমাদুল্লাহ একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবেও বেশ ব্যতিক্রমী ছিলেন। তিনি সততা ও ন্যায়নিষ্ঠতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতেন। তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের বিভিন্ন

রাজনৈতিক আদেশ অমান্যের জন্য বহুবার তাঁকে শাস্তিস্বরূপ বদলি করে দেয়া হয় এমন সব জায়গায় যেখানে মেয়েদের স্কুল ছিল না।

তাঁর পিতা ও কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত রওনক নিজেই তাঁর সংকল্প এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাঁর পরিবেশগত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেতে পেরেছেন। ১৯৫৭ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় মুসীগঞ্জের এভিজেএম গার্লস স্কুলের ছাত্রী হিসেবে সব শিক্ষার্থীর মধ্যে সপ্তম ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম হন রওনক।

অল্প বয়স থেকেই রওনক বিশ্বাস করতেন শিক্ষাই হবে তাঁর সমগ্র বিশ্বের কাছে পৌঁছানোর বাতায়ন, তাই তিনি কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সর্বোত্তম ফলাফল অর্জনকে গুরুত্ব দিয়েছেন, যাতে স্কলারশিপ নিয়ে হার্ভার্ড কিংবা অক্সফোর্ডের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পারেন এবং তারপর নিজের যোগ্যতার ভিত্তিতে একটি স্বাধীন ক্যারিয়ার গড়তে পারেন। এ প্রচেষ্টায়ও পিতার উৎসাহ পেয়েছেন। কেননা রওনকের বাবা কখনো চাননি যে তাঁর মেয়েরা স্কুল কিংবা কলেজ থেকে ঝরে পড়ুক এবং দিনশেষে কোনো সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে বিয়ের মাধ্যমে তাদের শিক্ষাজীবন কি চাকরিজীবনের সমাপ্তি ঘটুক।

১৯৬৫ সালে রওনক স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে হার্ভার্ডে পড়তে যান এবং ১৯৭০ সালে মাত্র ২৬ বছর বয়সে হার্ভার্ড থেকে পিএইচডি অর্জন করেন। প্রথম কোনো বাংলাদেশী নারী হিসেবে হার্ভার্ড থেকে তিনি এ খেতাব অর্জন করেন। ১৯৬৯ সালে রওনক তাঁর গবেষণা শেষ করেন এবং তার পরই কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্টডক্টরাল ফেলোশিপের প্রস্তাব আসে তাঁর কাছে। আর কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর ‘পাকিস্তান: ফেইলিউর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন’ নামক গ্রন্থটি ১৯৭২ সালে, যা সে সময়ের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ একাডেমিক কাজগুলোর মধ্যে একটি। অর্ধশতাব্দী পরও গ্রন্থটি এখনো দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস ও রাজনীতির শিক্ষার্থীর জন্য পড়া বাধ্যতামূলক।

রওনকের সঙ্গে পরিচয়ের আগে আমাদের মধ্যে যোগাযোগ হয় চিঠির মাধ্যমে। তখন আমি এবং হামিদা হোসেন মিলে সাপ্তাহিক ফোরাম সম্পাদনা ও প্রকাশ করতাম। রওনক পত্রিকাটির জন্য বিদেশ থেকে এক বছরের গ্রাহক হিসেবে টাকা পাঠান। কিন্তু তিনি পত্রিকাটির কপি পাচ্ছিলেন না, তাই তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে চিঠি লিখতে থাকেন। সাপ্তাহিক ফোরামের সব কপি নিয়ে আমি প্রত্যাশা করছিলাম যে মোটা গ্লাসের চশমা পরা ভীষণদর্শন কোনো নারীর সঙ্গে দেখা হবে বুঝি! কিন্তু ছোটখাটো যে রওনকের সঙ্গে আমার দেখা হলো, তাঁর চেহারা ছিল বুদ্ধিমান হাইস্কুল পড়ুয়া একজন শিক্ষার্থীর মতো, যে স্পষ্টভাষী, হাসিতে পরিপূর্ণ আর ফোরামের ডেলিভারি হাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে আইসক্রিম খাওয়াতে প্রস্তুত।

রওনক মাত্র ২৭ বছর বয়সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন, যা আরেকটি বিরল অর্জন, বিশেষ করে একজন নারীর জন্য। তিনি ১৯৭০

সালের নভেম্বরে দেশে ফিরে আসেন এবং ডিসেম্বরের ঐতিহাসিক নির্বাচনের সাক্ষী হন। কিন্তু জাতির উচ্ছ্বাসের সে মুহূর্তে তাঁর পরিবারে নেমে আসে অপ্রত্যাশিত শোকের ছায়া। ১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে মাত্র ৫৭ বছর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন রওনকের বাবা আহমাদুল্লাহ। এ অল্প বয়সে, ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে রওনককে তাঁর পরিবারের দায়িত্ব নিতে হয়।

তাঁর দেশে ফেরার মাত্র চার মাসের মধ্যে এবং পিতাকে হারানোর শোক সামলানোর আগেই বাংলাদেশের জনগণের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত নিপীড়ন শুরু হয়। হার্ভার্ডে রওনকের কয়েকজন শিক্ষক তাঁর পরিস্থিতি অনুধাবন করে তাঁকে একটি একাডেমিক পদে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন, যাতে তিনি তাঁর পাকিস্তান: ফেইলিউর ইন ন্যাশনাল ইন্সটিগ্রেশনের প্রকাশনাকাজ শেষ করতে পারেন। খুব কম লেখকই এমন একটি বই লিখতে ও প্রকাশ করতে পারেন, যেখানে গবেষণার অনুমান, যুক্তি ও ফলাফল রিয়েল টাইমের সঙ্গে মিলে গিয়েছে। হার্ভার্ডে থাকাকালীন ১৯৭২ সালে কেনেডি ইনস্টিটিউটে রওনক বাংলাদেশের ওপর একটি সেমিনার কোর্স পড়ান, যেটা সম্ভবত এ নতুন রাষ্ট্রের ওপর আমেরিকায় প্রথম একটি কোর্স।

১৯৭২ সালের মাঝামাঝি রওনক স্বাধীন বাংলাদেশে ফেরেন, ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ পাসের পর তাঁকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। রওনকের বয়স তখন সবেমাত্র তিরিশ এবং তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র আর দুজন নারী বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। এ ধরনের একটি দায়িত্ব পালনের জন্য একজন শিক্ষক হিসেবেই নয়, একজন প্রশাসক হিসেবেও রওনককে নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে হয়েছিল। সে সময় ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি ছিল অস্থির। অনেক সময় ছাত্রদের মোকাবেলা করতে হতো; যাদের একাংশ ছিল সশস্ত্র বন্দুকধারী এবং যারা শিক্ষকদের কাছে অযাচিত সব দাবি-দাওয়া নিয়ে হাজির হতো। রওনক সাহস ও ন্যায্যতার সঙ্গে তাঁর ওপর অপিত দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

বিভাগীয় প্রধান হিসেবে তিনি অনেক নতুন পাঠ্যসূচির প্রচলন করেন। তাঁর পাশাপাশি গবেষণা কার্যক্রমের উদ্যোগ নেন। তিনি ১৯৭৩ সালের সংসদ নির্বাচনে দুটি নির্বাচনী এলাকায় নাগরিকদের ভোটদানের আচরণ এবং নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের (এমপি) ওপর জরিপভিত্তিক গবেষণার কাজ হাতে নেন, যেটি ছিল বাংলাদেশে নাগরিকদের ভোটদানের আচরণ ও সংসদ সদস্যদের ওপর ভিত্তি করে তথ্য তৈরি করা বিষয়ক প্রথম গবেষণা। অচিরেই রাজনৈতিক বিষয়ে রওনকের গবেষণা এ অঞ্চলের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী তাঁকে স্বীকৃতি এনে দেয়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাঁর পাণ্ডিত্য স্বীকৃতি পায় এবং তিনি সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। পুরুষপ্রধান বয়স্ক পণ্ডিতদের মধ্যে দাঁড়িয়েও তুলনামূলক তরুণ, প্রতিভাবান ও স্পষ্টভাষী নারী হিসেবে রওনক তাঁর মত প্রকাশ করতে কিংবা সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতে পিছপা হতেন না। ১৯৭৫ সালে খুশবন্ত সিংয়ের নেয়া রওনকের (সঙ্গে আরো ছিলেন অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক, কমরেড মণি সিংহ ও আইনজীবী কামাল হোসেন) একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয় নিউইয়র্ক টাইমস ও ভারতের ইলাস্ট্রেটেড

উইকলিতে। ১৯৭৭ সালে রওনক বাংলাদেশের ওপর বক্তৃতা দিতে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহর সফর করেন, যেখানে মন্ত্রী ও একাডেমিক পর্যায়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হন।

একই সময়ে তিনি রাজনৈতিক বিষয় ছাড়াও উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা ও লেখালেখি শুরু করেন। বিশেষ করে গবেষণা ও প্রচার কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীদের অসহায় অবস্থার প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তিনি উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। ১৯৭৩ সালে অনানুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়া বাংলাদেশের প্রথম নারী গবেষণা সংগঠন ‘উইমেন ফর উইমেন’ প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশে নারী বিষয়ক একটি সম্পাদিত ভলিউম প্রকাশ করেন। ১৯৭৪ সালে বুখারেস্টে জাতিসংঘের জনসংখ্যাবিষয়ক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ পান। ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোয় জাতিসংঘের প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনের প্রথম দিনে এনজিও ফোরামের দুটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৭৭ সালে ঢাকায় ‘নারী ও উন্নয়ন’ বিষয়ক দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সম্মেলনের অয়োজন করেন, যা ছিল এ অঞ্চলে এ ধরনের প্রথম কোনো সম্মেলন। ১৯৭৯ সালে তিনি সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলো নথিভুক্ত করে প্রকাশ করেন, যেটি ছিল এ বিষয়ে অগ্রগামী একটি কাজ এবং যা পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী নারী ও উন্নয়নবিষয়ক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

১৯৭৭ সালে তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হন এবং ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনের ওপর আরেকটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এবার তিনি একটি নির্বাচনী এলাকায় প্রচারণার কৌশলগুলোর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। ততদিনে তিনি আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের সঙ্গেও জড়িত হয়ে পড়েছিলেন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করছিলেন। ১৯৮২ সালে কুয়ালালামপুরে জাতিসংঘের এশিয়া প্যাসিফিক ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের (এপিডিসি) পক্ষ থেকে তাকে নারীবিষয়ক কর্মসূচির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনের আমন্ত্রণ জানানো হলে তিনি প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। এপিডিসিতে দুই বছরের কাজের সময়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক কর্মসূচি গড়ে তোলার পর ১৯৮৫ সালে জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থায় (আইএলও) গ্রামীণ নারী, কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন বিভাগের প্রোগ্রাম প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যা রওনককে বিশ্বব্যাপী নারীবিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ ও তা সম্প্রসারণের সুযোগ এনে দেয়। ১৯৯০ সালে রওনক পুনরায় একাডেমিক জীবনে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের সাউদার্ন এশিয়ান ইনস্টিটিউটে শিক্ষাদান ও গবেষণার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এটি ছিল আদর্শ স্থান, যা তাকে শিক্ষা দানের পাশাপাশি নিজের গবেষণা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছিল। একজন একাডেমিক হিসেবে এ স্বাধীনতাকে তিনি সবসময় অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

আমাদের একাডেমিক সহযোগিতা

রওনক যখন আন্তর্জাতিক পরিসরে বিদেশে ক্যারিয়ার গড়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তখন আমি ছিলাম তাঁর বন্ধুদের মধ্যে একজন, যে তাকে বিদেশে যেতে নিরুৎসাহিত করেছিল। রওনককে আমি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস) একজন গবেষণা পরিচালক হিসেবে আমার সঙ্গে কাজে যোগদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলাম, কারণ আমার মনে হয়েছিল তাঁর রাজনীতি ও জেভারবিষয়ক প্রজ্ঞা বিআইডিএসের গবেষণা কার্যক্রমে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আনতে সাহায্য করবে এবং শুধু ‘অর্থনৈতিক’ অধ্যয়নের পরিবর্তে ‘উন্নয়ন’ অধ্যয়নের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে আরো গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। তাছাড়া একাডেমিক ক্ষেত্রগুলোতে আমাদের আগ্রহগুলোও মিলে যায়। তাঁর বইতে পাকিস্তানের সমাপ্তির প্রাসঙ্গিকতাকে চমৎকারভাবে রাজনৈতিক অর্থনীতির বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছিলেন, এ ধরনের বিশ্লেষণ আমিও করতে পছন্দ করি। আমরা প্রায়ই একাডেমিক বিষয়ে এবং রাজনীতি নিয়ে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক করতে পছন্দ করতাম। রওনক ১৯৭৩ ও ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচন এবং সংসদ সদস্যদের ওপর করা তাঁর দুটি বড় গবেষণাকাজের প্রথম খসড়া আমাকে পাঠান। আমার মনে হয় আমিই মাত্র একজন ব্যক্তি যে প্রকৃতপক্ষে তাঁর গবেষণাপত্রের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছে এবং বিস্তারিত লিখিত মন্তব্য প্রদান করেছে।

১৯৯৩ সালের দিকে আমি যখন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর পাশাপাশি তৎকালীন উদীয়মান শাসন ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা শুরু করি, তখন ফোর্ড ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমাকে পরামর্শ দেয়া হয় যে আমি যেন আমেরিকার সুশাসনবিষয়ক গবেষণার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে এবং তাদের সুপরিচিত কয়েকজন চিন্তাবিদদের সঙ্গে আলোচনা করতে সেখানে যাই। আমাকে সাহায্য করার জন্য ফোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে রওনক আমার সঙ্গে থাকবেন, যাতে আমি রাজনীতিতে তাঁর কাজ এবং থিংক ট্যাংক সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর বিস্তৃত জ্ঞান আমার কাজে লাগাতে পারি। রওনক ও আমি নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি, হার্ভার্ড, ইয়েল ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছি বিভিন্ন গবেষকের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। সিপিডি গঠনে প্রাথমিক অবদানকারীদের একজন হিসেবে রওনককে তাই আমি স্বীকৃতি জানাই।

সিপিডি কাজ শুরু করার পর রওনক সবসময়ই সিপিডির সঙ্গে একটি সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের জন্মের ২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়র্কে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সিপিডির প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদার হওয়ার জন্য রওনক আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সম্মেলনের জন্য তহবিল সংগ্রহসহ কার্যত সমস্ত সাংগঠনিক কাজগুলো সামলিয়েছেন তিনি। সম্মেলনের পেপার ও আলোচনা অত্যন্ত সফল হয়। সম্মেলন থেকে প্রাপ্ত বিষয়গুলো একত্র করে তা বইয়ের আকার দেন রওনক। ২০০০ সালে জেড বুকস প্রকাশনী কর্তৃক ‘বাংলাদেশ: প্রমিজ অ্যান্ড পারফরম্যান্স’ শিরোনামে বইটি প্রকাশ হয়। এমন একটি ক্রটিহীন বৃহৎ একাডেমিক ইভেন্টের

আয়োজন করে রওনক প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি কেবল একজন পণ্ডিতই নন, সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতারও অধিকারী, যা তার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হিসেবে এবং পরে এপিডিসি ও আইএলওর কাজেও প্রমাণ দিয়েছেন।

১৯৯০-এর দশকে যখন বিভিন্ন কাজে আমি নিউইয়র্ক যেতাম, তখন আমাদের সবসময়ই দেখা হতো। আমি ব্যক্তি রওনককে আরো ভালোভাবে জানতে পারলাম এবং একাডেমিক আলোচনার পাশাপাশি আমরা সিনেমা, থিয়েটার, অপেরা, জাদুঘর, ভালো রেস্টোরাঁয় গিয়েছি। দেখেছি রওনক তাঁর উপস্থিতি দিয়ে যেমন একটি ঘরকে আলোকিত করতে পারে, আবার প্রয়োজনে তীব্র কঠোরও হতে পারে। এ মুহূর্তে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। সম্ভবত নভেম্বরের দিকে আমি জাতিসংঘের একটি সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। বাংলাদেশী সহকর্মী আদিল খান তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে আমাদের সবাইকে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। অতিথিদের মধ্যে ছিলেন পাকিস্তানের হাফিজ পাশা, ইউএনডিপি'র এশিয়া বিভাগের এএসজি। তিনি ছিলেন ধূমপানে আসক্ত। রওনকসহ অনেকেই যা পছন্দ করতেন না। আদিলের বসার ঘরে হাফিজ হঠাৎ একটি সিগারেট ধরিয়ে বসলে রওনক তাঁকে তিরস্কার করা শুরু করেন এবং প্রচণ্ড শীতের মধ্যে বারান্দায় যেতে বাধ্য করেন।

১৯৯০ দশকের শেষের দিকে রওনক স্বাস্থ্যবিষয়ক গবেষণাকাজে আগ্রহী হতে শুরু করেন। সিপিডির সঙ্গে যৌথভাবে তিনি নারীর স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য খাতে নাগরিক কণ্ঠস্বর নিয়ে দুটো সংলাপের আয়োজন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে, কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ গঠনের উদ্যোগ নেন। ২০০৬ সাল থেকে ব্র্যাক স্কুল অব পাবলিক হেলথভিত্তিক বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ নিয়মিতভাবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন দিক নিয়ে নাগরিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে।

২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে রওনক ও আমি আমাদের জীবনের একটি নতুন পর্বে প্রবেশ করি। আমরা থাকি কিছু সময় নিউইয়র্কে রওনকের অ্যাপার্টমেন্ট আর কিছু সময় ঢাকার গুলশানের আমার বাড়িতে। ২০০৬ সালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনিশিয়েটিভ ফর পলিসি ডায়ালগে একজন ভিজিটিং স্কলার হিসেবে জো স্টিগলিংজ আমাকে আমন্ত্রণ জানান। সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউট আমাকে রওনকের পাশে আর একটি অফিস দেয়। তখন আমি দক্ষিণ এশিয়ায় দারিদ্র্যের ওপর একটি বড় প্রকল্প হাতে নিই। ২০১০ সালে সেজ প্রকাশনী কর্তৃক 'চ্যালেঞ্জিং দি ইনজাস্টিস অব পোভার্টি: এজেন্ডাস ফর ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইন সাউথ এশিয়া' শিরোনামে বইটি প্রকাশ হয়। রওনক আমাকে তাঁর মন্তব্য এবং সম্পাদকীয় পারদর্শিতা দিয়ে কাজটি করতে সহযোগিতা করেছিল। বইটি আমি আমার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হিসেবে গণ্য করি।

২০১০ সালে রওনক কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে দেয়ার পর দিল্লির সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব ডেভেলপিং সোসাইটি তাদের মর্যাদাপূর্ণ রজনী কোঠারি চেয়ারে এক বছরের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানায়, যেখানে বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ জানানো হয়

গবেষণাকাজে অংশ নেয়ার জন্য। রওনকের বক্তৃতা প্রদান উপলক্ষে সিমলা, ত্রিভান্দ্রম এবং বেঙ্গালুরুতে গিয়েছি আমরা। ২০১২ সালে সিপিডির ডিস্টিংগুইশড ফেলো হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন রওনক। এরপর সিপিডির সঙ্গে বার্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিস মিশেলসেন ইনস্টিটিউটের যৌথ অংশগ্রহণে দুটি প্রকল্প হাতে নেন। যার ফলে ২০১৫ সালে প্রকাশ হয় রওনকের আরেকটি বই ‘পলিটিক্যাল পার্টিস ইন বাংলাদেশ’ এবং জাতীয় সংসদের ওপর একটি মনোগ্রাফ।

গত বছর আমরা দুটি বড় একাডেমিক প্রকল্প হাতে নিই। রওনক নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে আরেকটি বড় আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনের। আমরা সম্মেলনের একটি সম্পাদিত ভলিউম প্রকাশের পরিকল্পনা করছি। এছাড়া আমরা বঙ্গবন্ধুর ওপর আমাদের নিবন্ধগুলোও একত্র করি, যা ২০২২ সালে প্রথমা প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত হয় ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: ফিলোসফি, পলিটিকস অ্যান্ড পলিসিস’ নামে। গত এক দশক জুড়ে রওনকের অপর উৎসাহে আমি আমার স্মৃতিকথা লেখার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি। বঙ্গবন্ধু যুগের শেষ অবধি আমার গল্প নিয়ে এ পর্যন্ত দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। আরো একটি চূড়ান্ত ভলিউমের কাজ শেষের দিকে। এ উদ্যোগে রওনক অনুপ্রেরণার উৎস, সমালোচক ও সম্পাদক হিসেবে কাজ করছেন। আমাদের একসঙ্গে জীবন পরিচালনার আরো কঠিন দায়িত্বের সঙ্গে রওনকের ওপর এ ধরনের কঠিন দায়িত্বও চাপানো হয়েছে।

রওনক সবসময়ই স্বাধীনচেতা, কোনো প্রভাবশালীর অন্যায় আদেশ মানতে তিনি প্রস্তুত নন। তাই তিনি গবেষণা, লেখালেখি ও সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পছন্দ করেন। বেশ কয়েকবার যখন তাঁকে মন্ত্রী করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছিল, তখন তিনি আগে থেকেই তাঁর অনিচ্ছার বার্তা পৌঁছে দেন। অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার উচ্চপদস্থ পদে নিয়োগের প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

অনেক বেশি স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বের রওনক গত কয়েক বছরের অপ্রত্যাশিত চাপগুলো বহন করেছেন, সবসময় যে হাসিমুখে তা নয়, তবে তিনি এখনো আমার পথচলার সঙ্গী। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি কেন কাজ করছে না, কেন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং এর নেপথ্যের প্রভাবগুলো কী—সমাজের অপ্রকাশিত এমন অনেক বিষয়ের ওপর গুরুতর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার ক্ষমতা এখনো রওনকের রয়েছে। তাঁর নিজের জীবনের গল্পও কম আকর্ষণীয় হবে না, যা শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গেই নয় বরং সারা বিশ্বে নারীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে এগিয়েছে। আমি তাকে এসব বিষয়ে লেখার জন্য উদ্যোগ নিতে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করব, তবে রওনক যেমন আমার কাজের ক্ষেত্রে তাঁর সময় ও মেধা দিয়ে আমাকে সহযোগিতা করেছে, ততটা পারব কিনা সে বিষয়ে আমি অনেকটাই সন্দেহান।

আমি সবসময় ভাবি রওনক আমাকে যতটা দিয়েছে, তাঁর প্রতিদানে আমি কতটা দিতে পারছি। আমার কাছে রওনক সবসময় নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার অপর উৎস। তিনি একজন ব্যতিক্রমী মানুষ, তাঁর বুদ্ধিমত্তা, কাজ করার দক্ষতা, অসামান্য সততা ও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্যতার জন্য আমার জীবনসহ সবকিছুই দ্বিধাহীনভাবে আমি তাঁর হাতে তুলে

দিয়েছি। এসব বিশেষ গুণ একত্রিত হয়েছে এমন একজন ব্যক্তির মধ্যে, যে সর্বদা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে জীবন উপভোগ করতে পারে, তাঁর চেয়ে অনেক তরুণ বয়সী মানুষের চেয়ে বেশি। বাইরের জগৎ যখন আমার কাছে অন্ধকারাচ্ছন্ন লাগতে থাকে, তখন রওনকের উপস্থিতি আমাকে আশার আলো দেখাতে সাহায্য করে। রওনকের সঙ্গে আমি যে অনন্য এক জীবন কাটাচ্ছি, সেজন্য প্রতিদিন আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, রওনক আমার জীবনে যে উজ্জ্বলতা, আনন্দ ও প্রশান্তি এনেছে, তা অনেক বড় পাওয়া।

বণিক বার্তা

২৫ অক্টোবর ২০২২

আমার জীবন ও কর্ম: কিছু ভাবনা

রওনক জাহান

প্রথমেই আমি বণিকবার্তা এবং বিআইডিএসকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আজকের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য যেখানে ড. আকবর আলি খান এবং আমাকে একই সঙ্গে সংবর্ধনা দেবার কথা ছিল। ড. আকবর আলি খান যে এমন আকস্মিকভাবে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন তা আমি কল্পনাই করতে পারিনি। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। তাঁর পরিবারের প্রতি শোক জ্ঞাপন করছি।

আমাকে বলা হয়েছে আমার অনুভূতি জানানোর জন্য। এক কথায় বলতে গেলে আমি অভিভূত। কিছুটা আশ্চর্যও হয়েছি যেহেতু এই স্বীকৃতিটি আমার কাছে অপ্রত্যাশিত। সংবর্ধনা পেলে, প্রশংসা শুনলে কার না ভাল লাগে? আমিও আনন্দিত হয়েছি। তবে আপনারা যে বিশাল আয়োজন করেছেন তা দেখে কিছুটা বিব্রত বোধ করছি। বণিক বার্তার সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ আমাকে বলেছেন যে তাদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের অনেক লোক বেশ কয়েক মাস ধরে এই আয়োজনের জন্য অনেক শ্রম ও সময় দিয়েছেন, তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিআইডিএস-এর যারা এই আয়োজনের জন্য শ্রম ও সময় দিয়েছেন তাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এর আগে ২০০৮ সালে আমারই আলমা ম্যাটার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় যখন আমাকে র‍্যাডক্লিফ গ্র্যাজুয়েট সোসাইটি অ্যাওয়ার্ড-টি দেয় যা দেয়া হয় হার্ভার্ডের নারী গ্র্যাজুয়েটদের যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছেন তাদের, তখন সেই অনুষ্ঠানটি ছিল নিতান্তই সাদামাটা। আমার সম্মাননা পত্র পড়ে শোনানো হল। এবং আমাকে শুধু একটি বক্তৃতা করিতে হয়েছিল। একজন শিক্ষক এবং গবেষক হিসাবে আমি সাদামাটা অনুষ্ঠানেই অভ্যস্ত, তাই এই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান দেখে সত্যিই অভিভূত।

আমার জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে আপনারা জেনেছেন আজকের ভিডিওটির মাধ্যমে। আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন মফস্বল শহরের বাংলা মিডিয়াম স্কুলে লেখাপড়া করেছি আমার বাবার সরকারী চাকরির সুবাদে। আমার বাবাই ছিলেন আসলে আমার প্রধান শিক্ষক। তিনি ছিলেন

একজন ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ যিনি তাঁর মেয়েদের তাঁর ছেলেদের মত একই ভাবে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। তিনি চাইতেন তাঁর মেয়েরাও স্বনামে পরিচিত হোক। আব্দু স্বাধীনচেতা ও সং সরকারী কর্মচারী হওয়াতে তাঁকে কয়েকবার পানিশমেন্ট পোস্ট-এ যেতে হয়েছিল। আমাকে ক্লাশ নাইন-টেন-এর বেশীর ভাগ সময় বাসায় বসে পড়তে হয়েছে যেহেতু আব্দুকে ভোলায় বদলি করা হয়েছিল যেখানে কোনো মেয়েদের হাই স্কুল ছিলনা। সরকারী ছেলেদের স্কুলে আমাকে ভর্তী করল এক শর্তে যে আমি ক্লাশে আসতে পরব না, শুধু পরীক্ষা দিতে পারব প্রধান শিক্ষকের ঘরে বসে।

ঢাকায় আমি এলাম ১৯৫৭ সনে। ইডেন কলেজে আই.এ. এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ (অনার্স) এবং এম.এ পাশ করলাম। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও শেষের দুই বৎসর রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য তেমন ক্লাস হয়নি। আমি হিসাব করে দেখেছি যেখানে ১৬ বৎসর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার কথা সেখানে আমি মাত্র ১০/১১ বৎসর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছি। এক তৃতীয়াংশ সময়ই আমি লেখাপড়া করেছি একা বাসায় বসে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা থাকলেও এবং আমি শিক্ষকদের প্রিয় ছাত্রী হলেও জ্ঞান চর্চা এবং সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ সীমিত ছিল। আমার শিক্ষা জীবনের সবচেয়ে চমৎকার সময় কেটেছে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে ১৯৬৫-১৯৬৯। হার্ভার্ডে গিয়ে প্রথম একটা কথা শুনলাম যা আমার মাথায় গেথে গেল— স্কাই ইজ দ্যা লিমিট। এতদিন সমাজের কাছে আমাকে শুনতে হয়েছে মেয়ে হিসাবে আমি কী কী করতে পারবনা। প্রথম বারের মত শুনলাম আমার আকাঙ্ক্ষা আকাশচুম্বী হতে পারে। হার্ভার্ডে অনেক নামী অধ্যাপকদের কাছ থেকে নানা বিষয়ে ক্লাস নেবার সুযোগ হল। জ্ঞানের পরিধি বাড়ল। কীভাবে কথা বলতে হয়, সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করতে হয় তা শিখলাম। রাজনীতিকে কিভাবে বিশ্লেষণ করতে হয় তা শিখলাম। সবচেয়ে বড় কথা হার্ভার্ড আমাকে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠতে সাহায্য করল। অনেক বিখ্যাত অধ্যাপকদের প্রিয় ছাত্রী হয়ে উঠলাম।

আমি থিসিস-এর যে বিষয়টি ১৯৬৭ সালে বেছে নিয়েছিলাম তা সেই যুগে ছিল রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল আমাদের বাঙ্গালীদের জন্য এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমার থিসিস-এর বিষয় ছিল তখনকার পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিবর্তন। আমি বিশ্লেষণ করেছি কিভাবে পাকিস্তানের জাতি এবং রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া চলছে এবং তার ভবিষ্যত কী। থিসিসটা লেখার আগ পর্যন্ত আমাদের দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে আমি অতটা সচেতন ছিলাম না, কিন্তু তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে এবং ১৯৬৮ সালে দেশে ফিরে বিভিন্ন লোকের ইন্টারভিউ করতে গিয়ে দেশের রাজনীতি এবং দেশের প্রতি আমার একটা নতুন আকর্ষণ সৃষ্টি হল। মন ঠিক করলাম আমেরিকার আইভি লীগ ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা না করে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষকতা করব, যদিও আমেরিকার কয়েকটি নাম করা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার আমন্ত্রণ ছিল। আমার হার্ভার্ডের থিসিসটি পরে ১৯৭২ সালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে পাকিস্তান: ফেইলিউর ইন ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশন নামে প্রকাশিত হয়। কেন এবং কীভাবে

বাংলাদেশের জন্ম হয় তা বুঝতে বইটি পাঠকদের অনেক সাহায্য করেছিল। সময়োপযোগী হওয়ায় বইটি দেশে বিদেশে সমাদৃত হয়েছিল।

আপনারা আমাকে আজকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন শিক্ষক, গবেষক, নীতি পরামর্শক এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কর্মী হিসাবে। এই সব ধরনের কাজ আমি একসাথে করেছি বাংলাদেশে এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে। বিভিন্ন ধরনের আমার এই সব কাজগুলো কিন্তু বিচ্ছিন্ন ছিলনা। আমার সব কাজের মধ্যেই একটা যোগসূত্র রয়েছে। একটি কাজ আমাকে অন্য কাজের দিকে নিয়ে গেছে।

আমার প্রধান পরিচয় অবশ্যই একজন শিক্ষক হিসাবে। জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই আমি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছি— হার্ভার্ডে ৩ বৎসর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ বৎসর এবং কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ বৎসর। শিক্ষকতার পাশাপাশি এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে আমি গবেষণাও করেছি। আমি মনে করি শিক্ষকতা, গবেষণা এবং নীতি পরামর্শ এই তিনটি কাজ একসঙ্গে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে অবশ্যই গবেষক হতে হবে। শিক্ষক যখন নীতি পরামর্শক হন তখন তাত্ত্বিক জ্ঞানের বাইরে সমাজ ও রাজনীতি নিয়ে তাকে ভাবতে হয়। তাতে তাঁকে গ্রাউন্ড রিয়ালিটি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়।

আমি আট বছর আন্তর্জাতিক সংস্থায় নারী উন্নয়ন বিষয়ক প্রোগ্রামের পরিচালনা করেছি। এই সব সংস্থায় কাজ করে উন্নয়নের যে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট আছে সেই সম্পর্কে আমার জ্ঞানের পরিধি বেড়েছে। আমলাতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও বুঝতে শিখেছি আন্তর্জাতিক আমলাতন্ত্রের ভিতরে কাজ করতে গিয়ে। আমলাতন্ত্রের একটি প্রধান কাজ নীতি বাস্তবায়ন। এই কাজটা খুবই দুর্গম। এটা একা করা যায় না। এটা করতে গেলে বড় টিম দরকার। উপর-নীচ, ভিতর বাহির সব লোকের সমন্বয় করে কাজটি করতে হয়। কাজটি সময়সাপেক্ষ। আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করার সময় আমার মনে হয়েছে আসলে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, তার সঙ্গে গবেষণা এবং নীতি পরামর্শের কাজটা করতেই সবচেয়ে বেশী পছন্দ করি।

যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি মাত্র ১২ বৎসর শিক্ষকতা করেছি তবুও সেই সময়টাই ছিল আমার কর্মজীবনের সবচেয়ে ব্যস্ত ও অর্থবহ সময়। দেশ তখন সবেমাত্র স্বাধীন হয়েছে। আমি বয়সে ছিলাম তরুণ। ১৯৭৩ সালে যখন আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপারসন হলাম তখন আমার বয়স মাত্র ৩০। অন্য সব বিভাগীয় প্রধানরা ছিলেন আমার চেয়ে দ্বিগুণ বয়সী এবং আর দু'জন ছাড়া সবাই ছিলেন পুরুষ। আমার মনে তখন একটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমরা নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন দেশ গড়তে পারব। সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক সমস্যা ছিল। ছাত্রদের বিভিন্ন গ্রুপের কাছে অস্ত্র ছিল। তারা সহিংস কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। তবুও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করে আমি আনন্দ পেয়েছি কারণ তখন আমি অনেক নতুন নতুন কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। নতুন কোনো কাজ যেটা অন্য কেউ আগে করেনি বা করছে না, সে ধরনের কাজ করতে আমি সব সময়ই পছন্দ করি।

প্রথম যেই কাজটা আমি শুরু করি তা হল গবেষণা। ১৯৭৩ সালে যখন বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচন হয় তখন আমি দুটি নির্বাচনী এলাকায় ভোটারদের মতামতের উপর জরিপ করি। তারপর সংসদে যারা নির্বাচিত হন তাদের উপর আর একটা জরিপ করি। তখন পর্যন্ত রাজনীতি নিয়ে সার্ভে রিসার্চ করার কোনো চল ছিল না। আমার মনে হয়েছিল রাজনীতি নিয়ে কিছু বেজলাইন তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। ১৯৭৩ সালের আমার করা কাজটিই বাংলাদেশের সংসদ সদস্যদের শিক্ষা, পেশা, সম্পদ, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ইত্যাদির বেইজলাইন তথ্য সৃষ্টি করে। এছাড়া ১৯৭৩ সালের নির্বাচন ও ভোটারদের মতামত নিয়ে যেই গবেষণার কাজটি করেছি সেটাও এ দেশের নির্বাচন ও ভোটারদের ব্যবহার নিয়ে প্রথম কাজ। এই গবেষণার উপর ভিত্তি করে লেখা পুরো বইটি আমি প্রকাশ করিনি, তবে কিছু তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমার রাজনীতির উপর লেখা দ্বিতীয় বই বাংলাদেশ পলিটিকস: প্রবলেমস অ্যান্ড ইস্যুজ যেটা ১৯৮০ সালে ইউপিএল প্রকাশ করে তাতে দুটো অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করি। এরপর ১৯৭৯ সালের নির্বাচন নিয়েও আমার একটা গবেষণা নরওয়ের সিএমআই থেকে একটি ওয়ার্কিং পেপার হিসাবে প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় যে কাজটি করার সুযোগ পেয়েছিলাম রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হয়ে তা হল সিলেবাস পরিবর্তন করা। তখন আমি সবে হার্ভার্ড থেকে পিএইচডি করে ফিরেছি। সেখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নানা নতুন বিষয়গুলি যা আমি পড়ে এসেছি তার কিছু কিছু বিষয় তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস-এ অন্তর্ভুক্ত করি। আমি মনে করি মাঝে মাঝেই সিলেবাস পরিবর্তন করা দরকার যাতে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে সব বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়ানো হয় তা শিখতে পারে।

১৯৭৩ সালে আমি নারী বিষয়ক গবেষণা ও লেখালেখির কাজ আরম্ভ করি। আমার অনেক সহকর্মীই তখন আমাকে নিরুৎসাহিত করবার চেষ্টা করেছেন। অনেকে এমনও বলেছিলেন যে যেহেতু আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসাবে সমাদৃত, নারী বিষয়ে গবেষণা করে আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। সে যুগে বেশিরভাগ গবেষকই নারী বিষয়ক গবেষণাকে গুরুত্ব দিতেন না। কিন্তু আমার প্রথম বই পাকিস্তান: ফেইলিউর ইন ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশন-এ আমি বৈষম্য নিয়ে গবেষণা করেছি। আমার মনে হয়েছিল সমতা, ন্যায্যতা, গণতন্ত্র, নাগরিকের অংশগ্রহণ এসব বিষয় যেমন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, তেমনই সমাজে নারী পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। দেশের অর্ধেক শতাংশ নাগরিকের সমান অধিকারের প্রশ্নটি আমাদের নতুন দেশে তেমন গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হচ্ছিল না বলে আমার মনে হয়েছিল। সে যুগের উন্নয়নের ধ্যান-ধারণায় নারীদের দেখা হচ্ছিল একটি ওয়েলফেয়ার-এর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। যেন তাদের দয়া দেখানো হচ্ছে। নারীরও যে সমান অধিকার আছে, তারাও যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছে তা সেভাবে দেখা হচ্ছিল না। আমাদের অনেক রাষ্ট্রীয় নীতির যে পরিবর্তন করতে হবে, সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ও মূল্যবোধেরও যে পরিবর্তন করতে হবে, এই সব বিষয়কে একটা পাবলিক ডিসকোর্স-এ আনা তখন আমার কাছে জরুরী মনে হয়েছিল। এবং সেই জন্যই তখন আমি নারী উন্নয়ন নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করি। আমি আমার বাসায় ১৯৭৩ সালে একটি স্টাডি গ্রুপ শুরু করি। পরে

১৯৭৫ সালে উইমেন ফর উইমেন নামে আমাদের প্রথম বইটি প্রকাশিত হয় ইউপিএল থেকে। এই বইটি পরবর্তীকালে নারী বিষয়ে অন্য গবেষণাকে উৎসাহিত করে।

১৯৭৭ সালে ঢাকায় আমি নারী বিষয়ে একটি বড় আন্তর্জাতিক সম্মেলন করি, যার আলোচনার ভিত্তিতে আমার তৃতীয় বইটি প্রকাশ করি উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট: পারসপেক্টিভ ফ্রম সাউথ অ্যান্ড সাউথইস্ট এশিয়া। ১৯৭৯ সালে। তখন উইমেন/জেডার এবং ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে খুব কম বই লেখা হয়েছে। আমার সেই বইটিও তখন বিদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে পাঠ্য পুস্তক হিসাবে সংযোজিত হয়েছিল।

১৯৭৫-এর পর থেকে আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন এবং নারী উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে আমি বেশ জড়িয়ে পড়ি। কারণ তখন এই আন্দোলনে তৃতীয় বিশ্বের নারীদের উপস্থিতি ছিল কম। আমার মনে হয়েছিল এই আন্তর্জাতিক আন্দোলনে তৃতীয় বিশ্বের সমস্যাগুলিকে তুলে ধরতে হলে আমাদের এই আন্দোলনে যুক্ত হতে হবে। এরপর আমাদেরই আন্দোলনের ফলে যখন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি নারী কর্মকাণ্ডের প্রোগ্রাম আরম্ভ করল তখন প্রশ্ন উঠল, এর পরিচালনা কারা করবে, প্রথম বা দ্বিতীয় বিশ্বের নারীরা না তৃতীয় বিশ্বের নারীরা? তৃতীয় বিশ্বের খুব কম সংখ্যক নারীই তখন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিত ছিল। তাই অনেকের অনুরোধে আমি ১৯৮২ সালে কুয়ালালামপুরে এপিডিসি-তে নারী উন্নয়ন প্রোগ্রামের প্রধান হিসাবে কাজে যোগদান করি। তখন আমি এশিয়ার বেশ কিছু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও নারীবাদী নেটওয়ার্ক-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলাম।

১৯৮৪ সালে এপিডিসি ছাড়ার পর আইএলও থেকে আমন্ত্রণ জানানো হলো তাদের রুন্ডাল উইমেন্স এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম-এর প্রধান হিসাবে কাজ করার জন্য। সেখানে আমি ১৯৮৯ পর্যন্ত কাজ করেছি কিন্তু আমি লক্ষ করলাম যে এই সব সংস্থায় কাজ করে শুধু রিপোর্ট লেখা ছাড়া গভীরভাবে গবেষণা করে বই লেখার কোনো সুযোগ পাচ্ছি না। গবেষক হিসাবে আমার আত্মপরিচিতি হারিয়ে যাচ্ছে। তাই আইএলও ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আমার চতুর্থ বইটির কাজ হাতে নিলাম যা পরে ১৯৯৫ সালে লন্ডনের জেড বুকস থেকে দ্যা ইলুসিভ এজেন্ডা: মেইনস্ট্রিমিং উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট নামে প্রকাশিত হয়।

এই বইটিতে আমি নতুন একটা বিশ্লেষণমূলক ফ্রেমওয়ার্ক উত্থাপন করি। আমার বক্তব্য ছিল পুরুষরা যা করছে তার অনুকরণ না করে, নারীদের একটা এজেন্ডা সেটিং দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করতে হবে নিজের দেশের জন্য, বিশ্বের জন্য, তাহলেই আমরা বর্তমান ব্যবস্থার রূপান্তর ঘটাতে পারব। নারীদের শুধু নারী উন্নয়ন নিয়ে ভাবলেই এবং কথা বললেই চলবে না, তাদের সারা দেশের ও বিশ্বের সমস্যা নিয়েও ভাবতে এবং কথা বলতে হবে। আমার এই বইটিও বিদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার ট্রেনিং কোর্স-এ ব্যবহার করা হয়।

১৯৯১-এ কলাম্বিয়ায় ফেব্রার পর নারী বিষয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে আমি কাজ আরম্ভ করি। সেই সময় একটি অনুরোধ আসলো বাংলাদেশের ৭১-এর জেনোসাইড

নিয়ে একটা লেখার জন্য যা পৃথিবীর অন্য জেনোসাইড-এর সঙ্গে একত্র করে একটা সংকলনে প্রকাশিত হবে। এটাকেও আমি একটা নতুন সুযোগ হিসাবে দেখলাম যেহেতু বাংলাদেশের জেনোসাইড-এর কথা সারা বিশ্ব প্রায় ভুলতে বসেছে। আমার এই লেখাটা পরে সেনচুরিজ অব জেনোসাইড নামে একটা বইয়ে প্রকাশিত হয়, যার পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হতে চলেছে। এই বইটাও বিদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়।

তারপর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের ২৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আমি একটা বড় আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করি কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সেই সম্মেলনে পঠিত পেপারগুলো নিয়ে ২০০০ সালে জেড বুকস থেকে প্রকাশ করি আমার ষষ্ঠ গ্রন্থ বাংলাদেশ: প্রমিজ অ্যান্ড পারফরমেন্স। এই বইটি লেখারও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক মন্ডলে বাংলাদেশ সম্পর্কে জানবার একটা কৌতূহল সৃষ্টি করা। বিদেশে দক্ষিণ এশিয়ার উপর অনেক কোর্স দেওয়া হয় কিন্তু কোনো বই পাওয়া যায় না সেই অজুহাতে বাংলাদেশ সম্পর্কে কোনো আলোচনা হয় না। তাই বাংলাদেশকে নিয়ে একটি ভাল পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ করা একটি জরুরী কাজ বলে আমার মনে হয়েছে। বিদেশে শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বাংলাদেশকে পরিচিত করতে পারলে আমাদের দেশ সম্পর্কে তাদের একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব গড়ে উঠবে, যে কাজটা টাকা পয়সা দিয়ে লবিং ফার্ম দিয়ে করা সম্ভব নয়।

এরপর ২০০৫ সালে নিউ ইয়র্ক-এর ফ্রিডম হাউজ আমাকে আমন্ত্রণ জানায় বাংলাদেশের গণতন্ত্রের উপর স্কোর করে একটি লেখা লিখতে। যেহেতু প্রথমবারের মত বাংলাদেশের গণতন্ত্রের উপর মূল্যায়ন করছিল ফ্রিডম হাউজ তাই সেই লেখাটাকেও আমি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি।

২০১২ সালে সিপিডি'র সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার পর সিপিডি-নরওয়ের সিএমআই যখন রাজনীতির উপর দুটো গবেষণা করার উদ্যোগ নেয় তখন আমি জাতীয় সংসদ ও রাজনৈতিক দলের উপর দুইটি মনোগ্রাফ লিখি। পরে ২০১৫ সালে প্রথমা থেকে প্রকাশিত হয় আমার সপ্তম বই যার নাম পলিটিক্যাল পার্টিস ইন বাংলাদেশ: চ্যালেঞ্জের অব ডেমোক্রেটাইজেশন। এই বইটি লেখার সময়ও লক্ষ করলাম যে রাজনৈতিক দলের উপর আমাদের দেশে গবেষণাভিত্তিক, তথ্যভিত্তিক তেমন কোনো বই নেই যা ছাত্র-শিক্ষক বা সাধারণ লোক পড়তে পারবে।

১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আমি নারী স্বাস্থ্য, বিশেষ করে মাতৃস্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণা ও লিখতে শুরু করি। আমার মনে হয়েছিল নীতি নির্ধারকরা পরিবার পরিকল্পনার উপর যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন মাতৃস্বাস্থ্যের উপর ততটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। স্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণা করতে করতে মনে হল, শুধু গবেষণা করলে হবে না, তথ্য ভিত্তিক কিছু প্রচারের কাজও করতে হবে এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করতে গিয়ে ২০০৬ সালে বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ নামে একটি নাগরিক উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হই। এই পর্যন্ত বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ সাতটি প্রতিবেদন এবং ৫০ বৎসরে স্বাস্থ্য খাতের উন্নতি ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রথমা থেকে একটি বই প্রকাশ করেছে।

আমার সর্বশেষ বইটি প্রফেসর রেহমান সোবহানের সঙ্গে লেখা। গত কয়েক বৎসরে আমরা বঙ্গবন্ধুর উপর বেশ কয়েকটি লেখা লিখেছি। সেগুলো সংকলন করে এ বৎসর প্রথমা প্রকাশিত করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: ফিলোসফি, পলিটিক্স এন্ড পলিসিজ। এই বইটিতে বঙ্গবন্ধুর নিজের লেখার উপর ভিত্তি করে তাঁর গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে চিন্তাধারার আমি বিশ্লেষণ করেছি।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে কাজ করতেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি কয়েকটি কারণে। প্রথমত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশটি অন্য সব প্রতিষ্ঠানের চেয়ে মুক্ত ও গণতান্ত্রিক। দ্বিতীয়ত এখানে দায়বদ্ধতা যতটা না কর্তৃপক্ষের কাছে তার বেশী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে। তৃতীয়ত প্রতি বৎসরই নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয় তারা শিক্ষকদের জ্ঞানের দিক থেকে, মনের দিক থেকে নবীন করে রাখে।

এছাড়াও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক একটি অনন্য সম্পর্ক। ১৯৭০-৮০ দশকে যখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতাম, তখন যেখানেই যেতাম সেখানেই কেউ না কেউ ছাত্র বলে পরিচয় দিত এবং সবার আগে আমার কাজটা করে দিত। তখন ভাবতাম, আমার তো কোনো মন্ত্রী বা আমলা হবার দরকার নেই। কোনো ভিআইপি না হলেও আমার কাজটা তো সবার আগে এমনিই হয়ে যাচ্ছে। যদিও আমি লাইনে দাঁড়াতে সবসময় প্রস্তুত।

আজকাল আমার ছাত্র-ছাত্রীদেরও বয়স হয়ে গেছে। কিন্তু আজও কোথাও গেলে আমি চিনতে না পারলেও পুরনো ছাত্ররা এসে পরিচয় দেয় বলে সে হয় বড় ব্যবসায়ী, কিংবা সংসদ সদস্য, কিংবা অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল বা সচিব কিংবা ক্রিকেট ক্যাপ্টেন বা প্রখ্যাত নাট্যকার। আমি চমৎকৃত হয়ে যাই, ভাবি যখন শিক্ষক ছিলাম তখন শুধু ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে মন দিয়েছি, বাকীদের দিকে তেমন নজর দিইনি, কিন্তু এরাই সবাই পরে নিজ গুণে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। তখন তাদের সাফল্যে আমিও গর্ব বোধ করি।

যখন ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে, তারা পেরেছে এটা জানতে পারাটাই একজন শিক্ষকের বড় প্রাপ্তি। আমার মা আমাকে প্রায়ই বলতেন “তুমি সারা পৃথিবীতে কাজ করেছ, নাম করেছ, ঠিকই আছে, তবে জীবনে যদি তুমি একটি ভাল কাজ করে থাকো তা হচ্ছে যে তুমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছ। কিছু ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাদান করেছ। কিছু লোকের উপকার হয়েছে।”

আমার বড় সৌভাগ্য যে আমার কাজের স্বীকৃতি আমি নিজ জীবনেই পেয়েছি। শিক্ষক হিসাবে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সমাদর পাওয়াটাই আমার জন্য সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি।

একজন গবেষক হিসাবে আমি যখন দেখি আমার লেখা বইগুলি দেশে বিদেশে ছাত্র-শিক্ষক পড়েছে এবং এখনও পড়ছে এবং বলছে এই বইগুলি তাদের কাজে লেগেছে, সেটাই আমার একটা বড় পুরস্কার।

আমি দু'টি প্রতিষ্ঠানের, উইমেন ফর উইমেন এবং বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ, প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলাম। সেই কাজেরও প্রতিদান আমি পেয়েছি। আমি দুটি প্রতিষ্ঠানেই স্বৈচ্ছাশ্রম দিয়েছি। যখন এই দুটি প্রতিষ্ঠান নিজ গতিতে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে এবং আমাকে আর তাদের জন্য বেশি শ্রম দিতে হয়নি, তখন আমার মনে হয়েছে আমার উদ্যোগ সার্থক হয়েছে।

৫০ বৎসর আগে আমার পাকিস্তান: ফেইলিউর ইন ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশন বইটির মূল বক্তব্য ছিল যদি কোনো সরকার রাষ্ট্র গঠন করতে গিয়ে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে, শুধু মাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং প্রশাসনের উপর নির্ভরশীল হয় এবং দেশের মধ্যে বিরাজমান বিভাজনের রাজনৈতিক সমস্যা গণতান্ত্রিক এবং অংশিদারিত্বমূলকভাবে সমাধান না করে তখন ক্রমবর্ধমান বিভাজন রাষ্ট্রকে একটি সংকটের দিকে ঠেলে দিতে পারে। আমি মনে করি আমার বইয়ের সেই বিশ্লেষণমূলক ফ্রেম ওয়ার্ক— রাষ্ট্র গঠন না জাতি গঠন, শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন না, তার সঙ্গে গণতন্ত্র এবং মানবধিকার সংরক্ষণ— এইসব প্রশ্ন আজও বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার নীতির বিশ্লেষণে ব্যবহার করা যেতে পারে।

গত ৫০ বৎসরে, যখন থেকে আমি নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি, আমাদের দেশে এবং সারা বিশ্বে নারীদের অনেক উন্নতি হয়েছে। নারী উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমার গবেষণা এবং আমার উদ্যোগ যদি দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নারীর ক্ষমতায়নের সহায়ক হয়ে থাকে তা জেনেই আমার তৃপ্তি।

আগেই বলেছি আজকে আপনাদের দেওয়া সংবর্ধনা আমার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। নিজেকে সম্মানিত মনে করছি। আজকের আয়োজক বণিকবার্তার লোগো— তথ্যেই অগ্রগতি— সেই লোগো একজন গবেষক হিসাবে আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। আমাদের দেশের গবেষকদের কাজের ফলাফল, তথ্য প্রতিনিয়ত আমাদের মিডিয়া জনসম্মুখে প্রচার করে চলছে, এই যোগাযোগটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্য কোনো দেশে গবেষণার ফলাফল ও আলোচনা এত গুরুত্বের সঙ্গে মিডিয়ায় প্রকাশ পায়না। আমি আশা করব মিডিয়া ও গবেষণার এই সংযোগ আমাদের দেশের নানা সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে সাহায্য করবে।

আবারও আমি বণিকবার্তা ও বিআইডিএস-কে কৃতজ্ঞতা জানাই আজকের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য। সেই সঙ্গে আপনারা যারা আজকের অনুষ্ঠানে কষ্ট করে উপস্থিত হয়েছেন এবং ধৈর্য ধরে আমার বক্তব্য শুনেছেন তাদেরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বণিক বার্তা ও বিআইডিএস-এর গুণীজন সংবর্ধনা ২০২২ অনুষ্ঠানে পঠিত বক্তব্য
২৫ অক্টোবর ২০২২

বিভাজন থেকে বিজয়

রওনক জাহান

যখন 'পাকিস্তান :ফেইলিউর ইন ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন' নিয়ে গবেষণার কাজে হাত দিলাম, তখন মূলত এটা দেখাতে চেয়েছি, তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বৈষম্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এই বৈষম্য সৃষ্টিতে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির একটি ভূমিকা রয়েছে। দেখাতে চেয়েছি, কেমন করে আমাদের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হচ্ছে। একজন বাঙালি হিসেবে আমার মনে হয়েছিল, তখনকার সময়ে আমাদের জন্য এ বিষয়টিই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কারণ, এটা নিয়ে তখন আমাদের দেশের মানুষ আন্দোলন-সংগ্রাম করছে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন আমার অ্যাডভাইজর ছিলেন মার্ল ফেইনসড। তিনি আমাকে বললেন, তুমি বরং ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সময়টাকে নিয়ে কাজ করো- তখন পূর্ব পাকিস্তান ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন ছিল। তিনি বললেন, ১৯৪৭-১৯৫৮ সালের তথ্য-উপাত্ত পাওয়া সহজ হবে। আমি তাঁকে জোর দিয়ে বললাম, না, আমি ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত আইয়ুব খানের শাসনকাল নিয়ে কাজ করতে চাই। এটা তখন ছিল বার্নিং টপিক এবং আমি ঘটমান রাজনীতি নিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলাম। পুরনো রাজনীতি নিয়ে ঐতিহাসিক কাজ করতে চাইনি। তখন অনেকেই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনীতির বিশ্লেষণ করতেন। আমি রাজনীতি-অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি একে অপরকে কীভাবে প্রভাবিত করে, তা দেখাতে চেয়েছি। ১৯৬০ এর দশকে অনেক অর্থনীতিবিদ কাজ করছিলেন অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে। কিন্তু এর যে একটি রাজনৈতিক দিক আছে, তা নিয়ে তেমন কোনো কাজ হচ্ছিল না তখন। তাই আমার ইচ্ছা ছিল, অর্থনৈতিক বৈষম্য ছাড়াও রাজনৈতিক যে বিভাজন-বিচ্ছিন্নতা দেখা দিয়েছিল, প্রশাসনিক যে বৈষম্য ছিল, সেই পুরো বৈষম্যকে তুলে ধরার। আমি আমার অ্যাডভাইজরকে বললাম, এটা ঘটমান ও নতুন বিষয় আর এ নিয়ে কেউ কাজও করছে না। তখন তিনি বিষয়টিকে আমার ওপরই ছেড়ে দিলেন।

সরকারি স্কলারশিপে ১৯৬৫ সালে হার্ভার্ডে পড়তে যাই। যখন ১৯৬৮ সালে এ দেশে তথ্য সংগ্রহ বা সাক্ষাৎকার নিতে এলাম, তখন আমাকে অনুমতি নিতে হয় পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে। দুশ্চিন্তা ছিল, আমার গবেষণার বিষয় সম্পর্কে জানালে তারা যদি নিষেধ করে দেয়, তাহলে আর দেশে আসতে পারব না! গবেষণার প্রস্তাবনা সেদিকে খেয়াল করে লিখি। অনুমতির জন্য ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসে যাই, রাষ্ট্রদূত আগা হেলালি আমার গবেষণার বিষয় শুনে হেসে বলেন, 'ও, ইউ আর হ্যান্ডলিং আ হট পটেটো!' আর কিছু বলেননি। আমি অনুমতি পেয়ে গেলাম।

তখন ইন্টারনেট ছিল না। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মূলত খবরের কাগজের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। ১০ বছরের খবরের কাগজ ঘেঁটে তথ্য নিয়ে সাজাতে হয়েছে, কোনটার পর কোনটা ঘটেছে। কখন কী রাজনৈতিক পরিবর্তন হচ্ছে, কখন কী আন্দোলন হচ্ছে- এসব। ১৯৬৭ সালের গ্রীষ্মে ওয়াশিংটনের লাইব্রেরি অব কংগ্রেসে প্রতিদিন প্রায় ৬-৭ ঘণ্টা করে সময় দিয়েছি। ১৯৬৮ সালের গ্রীষ্মে তথ্য সংগ্রহের জন্য দেশে আসি। তখন এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অফিসে গিয়ে তাদের লিফলেট, ইশতেহার সংগ্রহ করি। সরকারি অফিসে গিয়ে অর্থনৈতিক তথ্য-উপাত্ত ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের তথ্য সংগ্রহ করি। গেজেটিয়ার সংগ্রহ করে সেখান থেকে আমাকে হিসাব কষে বের করতে হচ্ছিল কত সংখ্যক বাঙালি প্রশাসনে ও সেনাবাহিনীতে রয়েছেন। এসব তথ্য নির্দিষ্ট কোথাও রাখা ছিল না। অর্থনৈতিক বৈষম্যের তথ্য অর্থনীতিবিদরা বের করেছেন। তাঁদের লেখা ও বিভিন্ন সরকারি রিপোর্টের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্যের তথ্য পাওয়া যেত। কিন্তু প্রশাসন বা সামরিক বাহিনীতে যে বৈষম্য রয়েছে, তার তথ্য কোথাও রাখা ছিল না। সেগুলো বের করে কাজ করতে হয়েছে। রাজনৈতিক তথ্য নেওয়াটা আরও ঝামেলার ছিল। কারণ দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তখন এবং এখনও আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো প্যামফ্লেট, লিফলেট বা ইশতেহার কিছুই তাদের অফিসে রাখে না। সময়মতো কিছুই পাওয়া যায় না। ১৯৬৮ সালে আমি আওয়ামী লীগের অফিসে গিয়ে ছয় দফা দলিলটির কপি যখন চেয়েছি, তখন তারা মুখে মুখে দফাগুলো বলে দিচ্ছে; কিন্তু দলিলটি দিতে পারছে না। পরে অন্য গবেষকদের মাধ্যমে আমি সংগ্রহ করেছিলাম। অনেকের সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করেছি। সেগুলোয় আমার বিশেষ কোনো সমস্যা হয়নি।

আমি হার্ভার্ডে টিচিং ফেলো ছিলাম। সেই ভিজিটিং কার্ড আমি রাজনৈতিক নেতা, প্রশাসনিক পদস্থদের পাঠিয়ে দিতাম। এটা দেখে তাঁরা বেশ ইমপ্রেসড হয়ে যেতেন, সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎকার পেয়ে যেতাম। রাজনৈতিক দলের নেতা ছাড়াও সাধারণ মানুষের সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম, তখন দেখেছি, ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ সাল— তিন বছরের মধ্যেই দেশের মানুষের মনের মধ্যে একটা বড় পরিবর্তন আসে। প্রায় সবাই বলছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান এখন স্বাধীন হওয়ার পথে রয়েছে। সবাই বেশ উন্মুখ হয়ে আছেন। তখন আমি নিজেও ভীষণ উৎসাহ পেয়েছি।

আইয়ুব খানের শাসনামলকে বিশ্লেষণে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমার যে ফ্রেমওয়ার্ক ছিল, সেখানে আমি দেখাতে চেয়েছি, আইয়ুব যে নীতিগত অবস্থান গ্রহণ করেছেন, সেটি হলো স্টেট বিল্ডিং বা রাষ্ট্র গঠন। তিনি সেটার ওপর জোর দিলেন। যেখানে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়।

সেনাবাহিনী, প্রশাসনের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা দেখা দেয়। যে সরকারই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, তাকে যেমন রাষ্ট্র গঠন করতে হয়, তার সঙ্গে নেশন বিল্ডিং বা দেশ ও জাতি গঠন করতে হয়। দেশ বা জাতি গঠনের নীতিতে গণতন্ত্র, নির্বাচনে মানুষের অংশগ্রহণ, পরিষেবা ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতের বিষয়গুলো যুক্ত থাকে। একটি সরকারকে রাষ্ট্রও চালাতে হয়, আবার জনসাধারণের চাহিদাও পূরণ করতে হয়। আইয়ুব আমলে যেহেতু রাষ্ট্রের ওপর জোর দেওয়া হলো এবং সেখানে সেনাবাহিনী, প্রশাসনে বাঙালিরা সেভাবে যুক্ত ছিল না, তাই বাঙালিরা ক্রমেই পাকিস্তানি রাষ্ট্রের ওপর আস্থা হারাচ্ছিল। শুধু রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতেই বাঙালিরা বড় আকারে অংশ নিতে পারতেন। কিন্তু যেহেতু আইয়ুব আমলে রাজনৈতিক বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করতে জোর দেওয়া হয়নি, সেহেতু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভাজনটা আরও বেশি বাড়তে থাকে।

আইয়ুবের শাসন আমলে সিস্টেম যেভাবে বিকাশ হয়, তাতে রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার ওপর অনেক বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। দেশ-জাতি গঠন যার জন্য গণতন্ত্র, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রয়োজন; তার ওপর নজরদারি ছিল না। বৈষম্য, শোষণ, নির্যাতন বাড়তেই থাকে। এর ফলে পাকিস্তানের ভাঙন অনিবার্য হয়ে ওঠে। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে বঞ্চিত বাঙালি বিজয়ী হয়, বাংলাদেশ স্বাধীন হয় ১৯৭১ সালে।

সমকাল

১৬ ডিসেম্বর ২০২২

অর্থনীতি নিয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তা ছিল

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের সাবেক অর্থমন্ত্রী প্রয়াত আবুল মাল আবদুল মুহিত ছিলেন একজন সজ্জন ব্যক্তি। একজন দক্ষ প্রশাসক, একজন মুক্তিযোদ্ধা ও অসাম্প্রদায়িক মানুষ। দেশ-জাতি ও অর্থনীতিতে তাঁর নিজস্ব কিছু চিন্তা ছিল। তিনি অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

তাঁর প্রণীত বাজেটে জনমানুষের চাহিদার প্রতিফলন থাকত। তাঁর মন্ত্রিত্বের সময়ে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হওয়ার স্বীকৃতি পেয়েছে। নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। তাঁর সময়ে বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচির বিভিন্ন অর্জনের নানা সূচকে দেশের উন্নতি হয়েছে।

তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় আশির দশকে, যখন আমি দেশে ফিরি সে সময়ে। পরে তিনি যখন এরশাদ সরকারের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন তখন তাঁর সঙ্গে ঘরে ও ঘরের বাইরে অর্থনীতিসহ অনেক বিষয়ে আমার আলোচনা হয়েছিল।

তখন আমি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির একজন নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করতাম। ১৯৯৬ সালে যখন দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সংকট সৃষ্টি হয় তখন দেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কীভাবে ফের ফিরিয়ে আনা যায় সে বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছিলাম। অবশ্য তখন তিনি আওয়ামী লীগ দলের বাইরে ছিলেন। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রায় দুই দশক মন্ত্রিত্ব ও মন্ত্রিত্বের বাইরে থাকাকালীন তিনি সেন্টার ফর পলিসি (সিপিডি) আয়োজিত নানা সংলাপ, আলোচনায় নিয়মিত যোগদান করেছেন। তাঁর সঙ্গে একাধিক বিষয়ে আমাদের তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। তবে এই তর্ক-বিতর্ক কখনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক নষ্ট করেনি। বরং দেশের অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে সহায়তা করেছে। নানা অনুষ্ঠানে আমি তাঁর সঙ্গে যোগদান করেছিলাম। সেসব অনুষ্ঠানে তিনি আমাকে সদা হাস্যোজ্জ্বল সম্ভাষণ জানিয়েছেন।

তবে আমার কিছুটা দুঃখ আছে, ওনার মতো ব্যক্তিত্বের কাছে আমরা আরো কার্যকর অর্থনৈতিক সংস্কারের উদ্যোগ চেয়েছিলাম। উনি যদি স্বাধীন অর্থনৈতিক বিশ্লেষণকে দেশের নীতি প্রণয়নের জায়গায় আরেকটু জায়গা দিতেন, তাহলে দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে আরো লাভ হতো।

সার্বিকভাবে মুহিত সাহেব বাংলাদেশের অর্থনীতির যেকোনো বিশ্লেষণের একটি রেফারেন্স পয়েন্ট। তাঁর কর্ম ও জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

কালের কণ্ঠ

১ মে ২০২২

সততায় নিঃসন্দেহে উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সদ্য প্রয়াত সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন জনমনস্ক উদার ব্যক্তিত্ব ছিলেন। একজন আপাদমস্তক অসাম্প্রদায়িক মানুষ। ছিলেন সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব। অভিজ্ঞ প্রশাসক ছিলেন, প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কিছু সাফল্যের সঙ্গে তাঁর নাম বহুদিন ধরে উচ্চারিত হবে। যেমন স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণ, নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের (এসডিজি) প্রাথমিক সাফল্য। বাংলাদেশের মতো দেশে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। পিছিয়ে পড়া মানুষদের কথা মাথায় রাখার চেষ্টা করতেন।

অর্থ মন্ত্রণালয় এমন একটি জায়গা যেখানে নেতৃত্বে সততার প্রয়োজন হয় সবচেয়ে বেশি। কষ্টিপাথরের বিচারে সততায় নিঃসন্দেহে উত্তীর্ণ হয়েছেন আবদুল মুহিত। যখন অন্যায় কিছু হতো, তখন তাকে বিচলিত হতে দেখেছি।

একটি ঘটনা মনে হচ্ছে। আবুল মাল আবদুল মুহিত ১৯৮২-১৯৮৪ সালে এরশাদ সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। ওই সময়ে এরশাদবিরোধী আন্দোলন চলছিল। আমরাও সেই আন্দোলনের মাঠের সৈনিক ছিলাম। সেই সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয় অর্থনীতি সমিতির কাজ নিয়ে। তাঁর ওই সময়ের বাজেট-সম্পর্কিত একটি সভার আয়োজন করেছিল অর্থনীতি সমিতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির দোতলায় সভাটি হয়। ওই সভায় বক্তব্যে তিনি ক্ষমতাসীন এরশাদ সরকারের বিভিন্ন বিষয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর ওই সব সমালোচনা শুনে তখন সভায় উপস্থিত আমরা সবাই বেশ বিস্মিত হয়েছিলাম। এর কয়েক দিন পরেই তিনি ওই সরকার থেকে পদত্যাগ করে বিদেশে চলে যান।

মনে পড়ে, ১৯৯৬ সালের মার্চে একদিন ‘জনতার মঞ্চে’-এর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ রাজনৈতিক আলোচনার কথা। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে কথা বলেছিলাম।

এক সময় সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়মিত আসতেন। ২০০০ থেকে ২০০৭ সময়কালে বিভিন্ন বিষয়ে স্বভাবসুলভ সোচ্চার বাচনভঙ্গিতে সিপিডির অনুষ্ঠানে বিতর্কে অংশ নিতেন। মনে আছে, স্থানীয় সরকার নিয়ে এক সংলাপে খুবই আবেগতাড়িতভাবে মতামত দেন।

পরবর্তীতে, সিপিডি কিংবা আমাদের সম্পর্কে অনেক বিষয় নিয়ে তিনি সমালোচনা করেছেন। কিন্তু সামনাসামনি দেখা হলে কোনো তিক্ততার বহিঃপ্রকাশ হয়নি। তাঁর সঙ্গে আমাদের পেশাদার ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভারসাম্য ছিল। সকালবেলায় সাংবাদিকদের কাছে হয়তো আমার কোনো বক্তব্য নিয়ে তিরস্কার করেছেন, আবার সন্ধ্যায় দেখা হলে সহাস্য সামাজিক অনুষ্ঠানে সম্ভাষণ জানিয়েছেন।

তিনি এমন একটি অবস্থানে ছিলেন যেখানে তাঁর পক্ষে সর্বশেষ অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালে রাজনৈতিক চাপ মোকাবিলা করে আরও বেশি কর আহরণ, সরকারি ব্যয়ের গুণগত মান নিশ্চিত করা, পুঁজিবাজারে স্বচ্ছতা আনা, ব্যাংক খাতে সংস্কার, স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করার মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতে আরও বেশি হয়তো কাজ করার সুযোগ ছিল। তাঁর মতো মানুষের কাছে এসব সংস্কার নিয়ে জনগণের অনেক প্রত্যাশা ছিল। এছাড়া স্বাধীন পেশাজীবীদের মতামতকে নীতিনির্ধারণে আরও জায়গা দিলে তিনি নিজে আরও বেশি উপকৃত হতেন। তাই মনে করি, মুহিত মহোদয়ের দীর্ঘ জীবন থেকে বাংলাদেশের নীতিপ্রণেতা ও বাস্তবায়নকারীদের অনেক কিছু শেখার আছে।

মুহিত সাহেবের কর্ম ও স্মৃতির প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা।

প্রথম আলো

১ মে ২০২২

স্মৃতিতে আকবর আলি খান: পরার্থপরতার দর্শন তিনি নিজ জীবনে প্রতিফলিত করেছেন

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আকবর আলি খান একজন প্রগতিশীল চিন্তক, নীতিতাড়িত ব্যক্তি ও আলোকিত মানুষ ছিলেন। তবে নিঃসন্দেহে তাঁর প্রথম পরিচয়, তিনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের নীতি-আদর্শ তাঁর পেশাগত জীবনে প্রতিভাত হয়েছে। ধরাবাঁধা আমলাতন্ত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে তিনি নিজ জীবনে পরার্থপরতার দর্শন প্রতিফলিত করেছেন। ১৯৯০-এর দশকে তাঁর কাজ কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার।

ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তিনি। ন্যায্যতাভিত্তিক সমাজ গঠনের পাশাপাশি সমৃদ্ধ অর্থনীতি গড়ে তোলার চিন্তা করতেন তিনি। ছিলেন আপাদমস্তক অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ।

মুক্তিযোদ্ধার পাশাপাশি তিনি একজন উন্নয়নযোদ্ধাও ছিলেন। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা সৃজনশীলভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন তিনি। জনমুখীন নীতি ও জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান গড়ার কথা বলেছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্ষে তিনি বাজারব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রের ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্কের পক্ষপাতী ছিলেন। চেষ্টা করেছেন বৈশ্বিক পরিসরে ইতিবাচক সম্পর্ক স্থাপনের। একই সঙ্গে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য যে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শক্তিশালী সামাজিক সুরক্ষা প্রয়োজন, সে কথাও জোর দিয়ে বলতেন তিনি।

এখন রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব নীতি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে গৃহীত হতে দেখি, সেগুলো প্রবর্তন ও এর পক্ষে ঐকমত্য সৃষ্টির পেছনে আকবর আলি খানের ভূমিকা ছিল।

আকবর আলি খান গণতান্ত্রিক জবাবদিহিকে উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করতে কখনো পিছপা হননি। বরং এ বিষয়ে তিনি সব সময়ই সোচ্চার ছিলেন। আকবর আলি খানসহ মোট চারজন উপদেষ্টা ১/১১-এর আগের তত্ত্বাবধায়ক সরকার থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। এটি যে

তদানীন্তন জটিল উত্তরণপ্রক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল, তা যথেষ্ট পরিমাণে মূল্যায়িত হয় না।

পরিশেষে বলব, আকবর আলি খান নাগরিক সমাজের উজ্জ্বল প্রতিনিধি ছিলেন। নিজের নীতিগত অবস্থানকে পরিষ্কার করতে চাকরি-উত্তর জীবনে কখনোই দ্বিধা করেননি তিনি।

সে জন্য বলা দরকার, তাঁর অভাব আমাদের জাতীয় জীবনে গভীরভাবে অনুভূত হবে।

প্রথম আলো

১০ সেপ্টেম্বর ২০২২

শ্রদ্ধা ও স্মরণে আকবর আলি খান

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

জ. ই. মামুন: প্রিয় দর্শক, আপনাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের শুভরাত্রি। আপনাদের সাথে আছি আমি জ. ই. মামুন। আজকে আমার সাথে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)। আমাদের সাবেক অর্থনীতিবিদ, সাবেক আমলা এবং আমাদের সকলের শ্রদ্ধার ড. আকবর আলি খান তিনি প্রয়াত হয়েছেন। আমলা বা অন্যান্য যেসব পরিচয় আছে তার বাইরেও তাকে যেটা বলা হয় সেটা হলো তিনি অর্থনীতিবিদ। আপনার কাছে জানতে চাই তিনি কীভাবে অর্থনীতিবিদ হয়ে উঠলেন এবং তিনি কীভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য কাজ করতেন? আপনাদের কীভাবে সহযোগিতা করেছেন বা আপনারা কীভাবে একসাথে কাজ করেছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ধন্যবাদ মামুন। আমি আর সকলের মতই ড. আকবর আলী খানের যে অবদান বাংলাদেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। সে প্রেক্ষিতেই যদি আলোচনা করি, উনার যে অর্থনীতিবিদ হিসেবে পরিচয়, তিনি ইতিহাস থেকে অর্থনীতিতে এসেছেন। আপনি যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতা-উত্তর পরিস্থিতি দেখেন সেখানে যেমন কিছু পেশাদার অর্থনীতিবিদ থাকেন, যেমন— গবেষক, শিক্ষক আমাদের মত। আরেক দল আছেন যারা প্রায়োগিক অর্থনীতি নিয়ে কাজ করেছেন প্রশাসনের ভেতর দিয়ে। এর উদাহরণ আপনি সাইদুর রহমান সাহেবের কাছে পাবেন, মশিউর রহমান এবং অনেককেই এর মধ্যে পাবেন। সকলের নাম বলছি না মাফ করবেন। উনাদের অন্যতম মধ্যমণি হিসেবে ড. আকবর আলী খান এসেছেন। উনারা মূল ধারার অর্থনীতির চর্চা করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং সে শিক্ষাকে প্রশাসনের ভেতর দিয়ে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন নীতিমালা প্রণয়নের মধ্যে দিয়ে।

নব্বইয়ের দশকে এটা আমার উনাদের সাথে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে সাইফুর রহমান সাহেবের আমলে এবং কিবরিয়া সাহেবের আমলে। বর্তমানে যে নীতিগুলোকে আমরা

স্বতঃসিদ্ধ ভাবে গ্রহণ করে থাকি যেমন একটি হলো রাষ্ট্রের একটি ভূমিকা লাগবে, সরকার ও সেটা বিশ্বাস করে। রাষ্ট্রের ভূমিকা না থাকলে দেশের উন্নয়ন করা যায় না। অবকাঠামো তৈরি করতে হয়, স্বাস্থ্যসেবা করতে হয়, এটার ব্যাপারে উনার প্রথম থেকেই আগ্রহ। আপনি উনার বইগুলো পড়লে বা ব্যক্তিগত আলোচনায় আমরা এটা পেয়েছি যে বাজেটপূর্ব আলোচনা যখন হতো তখন অর্থনীতিবিদদের সাথে অর্থপূর্ণভাবে হতো সে আমলের কথা বলছি। এখন অনেক সময় অর্থবহভাবে হয় না। তখন তিনি ব্যক্তিখাতের ক্ষেত্রে, ব্যক্তিখাতের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করার ক্ষেত্রে উনি রাজস্ববোর্ডের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বা যখন অর্থসচিব ছিলেন তখন এগুলো বিবেচনা করেন।

আজকে আমরা যেভাবে বলি পিছিয়ে পড়া মানুষের কথা, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কথা তিনি তখন থেকেই সেদিকে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তার জন্যেই এসেছে পরার্থ অর্থনীতির কথা। আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন, একটি তো শুনলেন সুলতানা আপার কাছ থেকে এবং অন্যরাও বললেন যে উনারা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণের সন্ধিক্ষণে এবং একটি গণতান্ত্রিক দায়িত্ববোধ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। আমি মনে করি উনাদের এই যে অবদানটা এই অবদানটা যথেষ্ট পরিমাণে মূল্যায়িত হয়নি এখন পর্যন্ত। হয়তো বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনোদিন আমরা এটাকে মূল্যায়ন করব। আরেকটি বিষয় আমি আকবর আলী খানের সাথে অর্থনীতি মিলিয়ে বলতে চাই যে আপনারা জানেন তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার উনাকে রেগুলেটরি বোর্ডের সভাপতি করেছিলেন। রেগুলেটরি কমিশনের দায়িত্বই ছিল ব্যক্তিখাতের বিকাশের জন্য যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলোকে দূর করা এবং অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা সেটা অর্থায়ন থেকে শুরু করে, অবকাঠামো থেকে শুরু করে কর ব্যবস্থা ইত্যাদির ব্যাপারে।

দুঃখের বিষয় হলো তিনি কাজটা যে দায়িত্ব নিয়ে শুরু করেছিলেন বা যে দায়িত্ব তাকে দেয়া হয়েছিল বা তার ভেতরে যে সদস্যরা ছিলেন সে কাজটি সেভাবে সমাপ্ত হয়নি কারণ ২০০৮-০৯ এর সরকার আসার পর কাজটা বন্ধ হয়ে যায়। ঐ কাজটা যদি আকবর আলী খান বা ওই কমিটি ভালোভাবে করতে পারতো তাহলে ওই অবদানের জায়গাটা আরো ভালোভাবে উঠতো। আমি আরেকটা ছোট কথা বলে শেষ করি সেটা হলো আকবর আলী খানের পেশাগত জীবন যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমন তার পেশা-উত্তর জীবন বা চাকরি-উত্তর জীবনও কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ না। আমরা একজন ভিন্ন আকবর আলী খানকে আবিষ্কার করেছি তার অবসর সময়ে। একদিকে আমরা পেয়েছি একজন বিদ্বান চিন্তককে এবং আরেকদিকে পেয়েছি একজন নীতিত্যাগিত নাগরিকের প্রতিভা হিসেবে। এই দুই পরিচয়ই হয়েছে তার অবসর জীবনে। কিন্তু এর প্রস্তুতিটি হয়েছে তার চাকরি জীবনে। আমি তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দেখি, উন্নয়নের যোদ্ধা হিসেবে দেখি এবং একই সাথে একটি ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠার যোদ্ধা হিসেবেও দেখি। আমার দুর্ভাগ্য হচ্ছে, সুলতানা আপাও আছেন আমরা যৌথ বিবৃতি দেই আকবর আলী খানের মৃত্যুর দুই দিন আগে নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার জন্য, ইভিএম-এর ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ইত্যাদি। তার আগেও বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে দেখছি যার মধ্যে একটি বড় বিষয় বর্তমানের বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যে একজন অসাম্প্রদায়িক মানুষ

ছিলেন যা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তিনি একান্তরের চেতনা ধারণ করে অসাম্প্রদায়িকতার মধ্যে এসেছেন। গরীব মানুষের প্রতি ন্যায্যতার কথা এটার ভেতরে এসেছে।

আমি যেটা বলে শেষ করতে চাচ্ছি তা হলো, স্বাধীনচেতা নাগরিকদের যারা নীতিনিষ্ঠভাবে সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন, তাদের আপনি কীভাবে সংকীর্ণ, দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখে কোনোদিন কি সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবেন? এ প্রশ্নটা কিন্তু জাতির সামনে আসবে, আপনি তুললেন বড় করে। দেখুন এখন কীরকম হচ্ছে, যে প্রজন্মটি বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে যুক্ত ছিলেন তাদের অনেকেই এখন বিভিন্ন দল করেন এবং তারা পেশাগতভাবে, অন্যান্যভাবে দেশের জন্য অবদান কম রেখে গেছেন এমন তো না। সেহেতু আমরা তাকে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখব? উদারতা এবং কৃপণতা এ দুইয়ের দোলাচলে আমি কীভাবে এদের মূল্যায়ন করব? এই যে আমরা বলি মানুষকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের শিক্ষা দিব, মানুষকে শিক্ষা দিতে হলে কিন্তু অর্জিত শিক্ষার মধ্যে দিয়ে দিতে হয় শুধু গল্প বললে তো হবে না ওখানে আলোচ্য লাগে, জীবনী লাগে এবং দুঃখ কষ্টের উদাহরণগুলো লাগে। এই জায়গাটাতে আমি মনে করছি দেশ হিসেবে আমরা নিজেদের দুর্বল করে ফেলেছি। এটাকে আমাদের সচেতনভাবে মোকাবিলা করা উচিত।

জ. ই. মামুন: তখনকার বিএনপির যে ভূতপূর্ব ইশারা তাদের নেত্রী অর্থাৎ বেগম খালেদা জিয়া এবং তার যে গ্রুপ তার নির্দেশনাতেই ইয়াজউদ্দিন সাহেব তা সে দলগুলো চলতো তখনকার অবস্থা।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি মনে করি সে সময় যে ঘটনাগুলো ঘটেছে বিশেষ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে যে কলুষিত করা হয়েছিল, সেটা কোনো রিমোট কন্ট্রলের বিষয় ছিল না। এর পূর্বে যদি আপনি লক্ষ করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে সর্বশেষ অবসারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারককে আনার জন্য যে যেভাবে অবসরের বয়সকে নিয়ে খেলা করা হলো এই আলোচনা আমি মওদুদ ভাইয়ের সাথেও করেছি সে ঘটনা থেকেই আসলে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ইতিহাস বদল হয়েছে।

যদি আপনি এটার উৎসবিন্দু খুঁজতে চান, বাংলাদেশের ইতিহাসে গণতন্ত্রের ইতিহাস বিকৃতির উৎসবিন্দু হচ্ছে প্রধান বিচারপতির বয়স নিয়ে যে ঘটনাটা করা হয়েছিল এবং তার পর যেটা হয়েছে বিদ্যমান রাষ্ট্রপতিকে আপনি যিনি দলীয়ভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত তাকে আপনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দিলেন মানে বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক প্রথাকে কলুষিত করার জন্য যে ঘটনাটা ঘটেছে, এটা ঘটেছে বর্তমান সরকারের প্রধান বিরোধী দলের ছত্রছায়ায় এটা মনে রাখতে হবে। আমরা অনেক সময় ইতিহাস ভুলে যাই। যারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কলুষিত করেছিলেন বিচারপতির বয়স নিয়ে, ইয়াজউদ্দিনের মত মানুষকে দিয়ে তারা কিন্তু এখন নির্বাচনের সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য আন্দোলন করে। উনারা এটা ভুলে যান যে এটার যে দুর্নামটা সৃষ্টি করা হয়েছে যা বর্তমান শাসক দল ব্যবহার করে সেটা কিন্তু তাদেরই সৃষ্টি।

ঘুরে আসি অন্য বিষয়ে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে যে আলোচনা হলো এটার তো মূল হোতা হলো বর্তমান প্রধানমন্ত্রী।

এ মুহূর্তে এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচনের ফলাফলে নিঃস্পৃহ এরকম আমার ভাষায় নির্বাচনকালীন সরকার হতে হবে যে নির্বাচনের ফলাফলে নিঃস্পৃহ থাকবে। এখন দেখেন আপনি একজন সচেতন নাগরিকের ভূমিকা যদি সে এটাকেও সঠিক না মনে করে তাহলে তার রাষ্ট্রীয় সম্মান পাবার আর কোনো সুযোগ নাই মৃত্যুর পরে। আমরা প্রায়শই ভুলে যাই রাষ্ট্র এবং সরকার ভিন্ন জিনিস, সরকার এবং শাসকদল ভিন্ন জিনিস। শাসকদলের প্রতি অনুরক্ত না হয়েও আপনি সরকারের প্রতি অনুরক্ত থাকতে পারেন, আর সরকারের প্রতি অনুরক্ত না থাকলে পরেই আপনি রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে যান না এই পার্থক্যগুলো আকবর আলী খান করে গেছেন। আমাদের এখান থেকে শিক্ষা নেয়ার আছে।

জ. ই. মামুন: আকবর আলী খান বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন, যেমন— গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন দুই মেয়াদে, বা সব সরকারের কাছেই আমরা শুনি টিআইবি রিপোর্টের কথা যে টিআইবি রিপোর্ট খারাপ অথচ তারা তখন চলে যান তখন আবার বলে যে টিআইবি কত ভালো ছিল। তো এ সকল বিষয় কি জড়িত সরকারের আকবর আলী খানকে পছন্দ না করার পেছনে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমাদের জনপ্রশাসন ইন্সটিটিউট আছে এবং আমাদের নতুন যারা আসে ওখানে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বুনিয়াদি বা উচ্চপর্যায়ে যারা আছেন। এ পর্যায়ে প্রশাসনের এদের ব্যাপারে আকবর আলী খানের বিভিন্ন বই প্রচার করা উচিত এবং বাধ্যতামূলকভাবে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। সাম্প্রতিককালে আমরা দেখেছি যে কত হাজার বই কেনা কত কোটি টাকা দিয়ে কোন সচিবের বই কেনা হচ্ছে। আমার মনে হয় সচিব যদি কারো বই কিনতে হয় তাহলে আকবর আলী খান সচিবের বই কেনা উচিত এবং এগুলোকেই আমাদের পড়ার জন্য পাঠ্যপুস্তকে ভালো করে দেয়া উচিত।

আমি শুধু এ কথাটা বলেই আজকের অনুষ্ঠান শেষ করব যেহেতু আপনার সময় নেই, দেখুন মুক্তিযোদ্ধা আকবর আলী খান, উন্নয়ন যোদ্ধা আকবর আলী খান, প্রশাসক হিসেবে আকবর আলী খান এবং লেখক হিসেবে আকবর আলী খান, আপনি যদি সব বিচার শেষ করেন তাহলে নাগরিক চেতনার আকবর আলী খানই কিন্তু মানুষের মনে থাকবে। এই যে নাগরিক সত্তা, রাষ্ট্রকে আপনি শেষ বিচারে সেবা দিচ্ছেন যে রাষ্ট্র নাগরিকদের সুরক্ষা দিবে সেটার পক্ষে আপনি দাঁড়াচ্ছেন কারণ সে অর্থে তো আমরা অনেক সুযোগপ্রাপ্ত মানুষ। আমি মনে করি আকবর আলী খান আমার জন্য ব্যক্তিগতভাবে উনার এ নাগরিক সত্তা, নাগরিক চেতনা, নাগরিক সাহসিকতা এটিই আমাদের আগামী দিনের কাজের জন্য বড় সহায়তা।

জ. ই. মামুন: এবং উনার সততা এবং দৃঢ়তা যেটা ...

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনি কখনোই নাগরিক সভাকে কার্যকরভাবে প্রভাবক করতে পারবেন না যদি আপনার নৈতিকতা ঠিক না থাকে। কারণ আপনি তো নির্বাচন করে আসেননি। শুধুমাত্র নৈতিকতার জোরে আপনি মানুষকে কিছু বললে মানুষ সেটা গ্রহণ করে। আকবর আলী খান এটার ভালো একজন প্রতীকী ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

এটিএন বাংলা ‘শুভ রাত্রি’-এ প্রচারিত

১১ সেপ্টেম্বর ২০২২

গণতান্ত্রিক চর্চা এবং জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়া সচল রাখতে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আর এই জবাবদিহিমূলক উন্নয়নের সঙ্গে নীতি গবেষণার রয়েছে এক অপ্রতিম সংযোগ। নীতি গবেষণার ফলাফলের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন অংশীজনের কণ্ঠস্বরকে বিস্তৃত পরিসরে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক অনন্য বাহক হচ্ছে গণমাধ্যম। সেই সূত্রেই সিপিডি'র গবেষকরা গণমাধ্যমে সমকালীন নানান বিষয়ে কলাম লেখার পাশাপাশি মন্তব্য, সাক্ষাৎকার ও মতামত দেওয়ার মধ্য দিয়ে সমাজ ও অর্থনীতির জটিল বিষয়গুলোকে সহজবোধ্যভাবে সাধারণ জনগণের কাছে উপস্থাপন করে থাকেন। “সমসাময়িক উন্নয়ন চিন্তা ৭” ২০২২ সালের বিভিন্ন সময়ে দেশের বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় দেওয়া নির্বাচিত কিছুসংখ্যক মতামতের একটি সংকলন।

কোভিড অতিমারি এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ২০২২ সাল ছিল বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য বিশেষভাবে চ্যালেঞ্জের বছর। বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতি এ বছর চাপের মুখোমুখি হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে জাতীয় বাজেট এবং সামষ্টিক অর্থনীতির মূল্যায়ন, বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ সংকটের নানামুখী প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সিপিডি'র ত্রিশ বছরের কাজের ধারাবাহিকতা হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই বাজেট সম্পর্কিত বিশ্লেষণ উঠে এসেছে বইটিতে।

নানাবিধ সংকটের মাঝে কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা চলমান রাখাটা জরুরি। সেইসাথে জরুরি হচ্ছে গণতান্ত্রিক ধারায় উত্তরণ এবং রাজনৈতিক সুশাসন। সেই প্রেক্ষিতে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কীভাবে উন্নয়ন ও অগ্রগতির সহায়ক হতে পারে সেটি তুলে ধরা হয়েছে এ বইতে।

২০২২ সালে পণ্যের উচ্চমূল্য এবং বাজারের অব্যবস্থাপনা দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে বেশ চাপের মুখে ফেলেছে। তবে ঝুঁকির মুখেও দেশের রপ্তানি আয় বেড়েছে এ বছর। দেশের রপ্তানি বাণিজ্য, পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ, সেবা খাতে রপ্তানি, ট্রানজিট, পদ্মা সেতু প্রকল্প ইত্যাদি বিষয়াদি নিয়ে সিপিডি'র গবেষকবৃন্দ বছরজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন ও পরামর্শ দিয়েছেন। তার একটা প্রতিফলন এসেছে এ বইতে।

এছাড়া বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত সংক্রান্ত বিরাজমান সংকট নিয়ে নানা আলোচনা ও দিকনির্দেশনা উঠে এসেছে সংকলনটিতে। একইসঙ্গে জেডার ও নারী সমতা নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। সময়োপযোগী আরেকটি বিষয় আলোচিত হয়েছে, তা হলো সামাজিক সুরক্ষা, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এবং নিম্ন আয়ের মানুষদের সহায়তা প্রদানের বিষয়টি।

বস্তুনিষ্ঠ নীতি গবেষণা এবং সমসাময়িক উন্নয়নমূলক বিষয়ে আলোকপাতের মাধ্যমে সিপিডি'র গবেষকরা সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তারই প্রতিফলন এই প্রবন্ধ-সংকলন। নানামুখী বিষয় নিয়ে অনন্য এই সংকলনটি এবারও উৎসুক পাঠকদের আগ্রহ পূরণে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)

বাড়ি ৪০/সি, সড়ক ১১ (নতুন)

ধানমন্ডি, ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ

ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৪৮১১৮০৯০, ৫৮১৫৬৯৭৯

ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮১ ই-মেইল: info@cpd.org.bd

ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd



978-984-95073-7-6



978-984-95073-7-6